পেপারব্যাক সংস্করণ
তাজউদ্দীন আহমদ
নেতা ও পিতা
শারমিন আহমদ

তাজউদ্দীন আহমদ
নেতা ও পিতা

তাজউদ্দীন আহমদ
নেতা ও পিতা

শারমিন আহমদ

ঐতিহ্য

তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা
শারমিন আহমদ

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

পেপারব্যাক সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৪২১
ডিসেম্বর ২০১৪

প্রকাশকাল
চৈত্র ১৪২০
এপ্রিল ২০১৪

প্রচ্ছদ
এ আর নাইম

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
চারশত পঁচিশ টাকা

TAJUDDIN AHMAD : NETA O PITA by Sharmin Ahmad
Published by Oitijjhya
Date of Publication : April 2014
Paperback Edition : December 2014

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Price: Taka 425.00 US$ 15.00
ISBN 978-984-776-173-2

উৎসর্গ

সত্য, ন্যায়, সুন্দর ও স্বাধীনতার প্রতীক
আব্বু, বঙ্গতাজ *তাজউদ্দীন আহমদ*
ও
আমার জীবনের সর্বোচ্চ প্রেরণা
আম্মা, সৈয়দা *জোহরা তাজউদ্দীন (লিলি)*কে
যিনি আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন।

দুটি কথা

তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা গ্রন্থটির প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ বের হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। গ্রন্থটি যাতে সুলভ মূল্যে পাঠক কিনতে পারেন সেই চিন্তা করেই পেপারব্যাক আকারে বইটি প্রকাশিত হলো। প্রথম প্রকাশিত এই বইয়ের লেখার কোনো অংশ বাদ দেওয়া হয়নি শুধু কিছু ছবি বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে কিছু বানান, স্থানের নাম, তারিখ এবং পদবী সংশোধন, আরও কিছু পাদটিকা ও তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের গৌরবজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের সফল কাণ্ডারি প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জীবন ও কর্ম আলোর দিশারী হয়ে নতুন প্রজন্মকে পথ দেখাবে এই প্রত্যাশা রইল।

শারমিন আহমদ
মেরিল্যান্ড
অক্টোবর, ২০১৪

ভূমিকা

২০০৬ সালের ২ জানুয়ারি এই বইটি লেখা শুরু করেছিলাম উত্তর আমেরিকায়, যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড স্টেটের, সিলভার স্প্রিং-এর বাসভবনে। মধ্য আমেরিকার সৌন্দর্যস্নাত কোস্তারিকা রাষ্ট্রের চির সবুজ সুউচ্চ পর্বতমালার ধ্যানমগ্ন দৃশ্য, প্রশান্ত ও অতলান্তিকের অবিশ্রান্ত সংগীতময় সংলাপ এবং আকাশের সীমাহীনতায় উজ্জ্বল লাল, নীল, হলুদ, সবুজের জমকালো রঙিন ডানা মেলা টুকান, ম্যাকাও এবং অজস্র পাখির আনন্দময় আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে এই বইটি সমাপ্তি লাভ করে।

একটি বইয়ের জন্ম দান, বিশেষত যার জন্ম হয় হৃদয়ের প্রচণ্ড আকুতি হতে, তা যেন অনেকটা সন্তানের জন্ম দানের মতোই। একটি চিন্তার বীজ হতে সৃষ্ট হয় অজস্র কথার ডাল পালায় ঘেরা মহীরুহ সম উপাখ্যান। আবেগ, অনুভূতি, তথ্যও বিশ্লেষণের উপাদানে এক একটি শব্দ হয় সিঞ্চিত। বাক্য মালা হয় নির্মিত। বিনিদ্র নিশীথে, কলমের কালিতে, বেদনাক্লিষ্ট স্মৃতির মোড়ক যখন উন্মোচিত হয়, তখন অশ্রুর প্লাবন ছড়িয়ে পরে অজান্তেই। আবার ঐ বেদনার গভীর হতেই আবিষ্কার করি লুকায়িত মুক্তাসম জীবনদর্শন। তাত্ত্বিকভাবে সর্বজনবিদিত বিমূর্ত বোধটি বোধহয় একমাত্র মূর্ত হতে পারে বেদনার সিঞ্চনেই। ঐ বোধ নিঃশব্দে বলে যায় এ পৃথিবীতে কোনো কিছুই আসলে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায় না। সবই অপেক্ষমাণ এক নির্দিষ্ট সময় মিলিত হবার জন্য। আধ্যাত্মিকতা বলে দেহের মৃত্যু হতে পারে কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। বিজ্ঞান বলে, জড় পদার্থের ক্ষয় হতে পারে, কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও প্রাণীকুলের মধ্যে যে শক্তি সদা বিরাজমান সেই শক্তির কোনো ক্ষয় নেই। সেই হিসেবে প্রিয়জনের সাথে বিচ্ছেদ বেদনা সাময়িক মাত্র। সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার অমোঘ আদেশে পৃথিবীতে মানুষ আসে এক একটা ভূমিকা নিয়ে। সেই ভূমিকা পালন করার পর সে চলে যেতে বাধ্য। আব্বুকে কেন্দ্র করে এই বইটি লিখতে গিয়ে হৃদয়ের বেলাভূমিতে আবারো এমনি ভাবনার তরঙ্গ এসে ঠেকেছে।

আব্বু ও আম্মার সাথে ছেলেবেলার নির্মল আনন্দঘন স্মৃতি, আব্বুর পদত্যাগ, তাঁর পরলোক যাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার কিশোর বয়সের একান্ত অনুভূতিগুলো যা দিনলিপির পাতায় লিপিবদ্ধ করেছিলাম, যার অনেকখানিই ছিল অপ্রকাশিত, এতকাল পরে সেগুলোকে এই বইটির মাধ্যমে মুক্তি দিলাম। হয়তো আজকের কিশোর ঐ দিনলিপির মধ্য দিয়ে স্পর্শ করবে এক ঐতিহাসিক সময়, কাল ও মুহূর্তকে।

বইটি সময়ানুক্রমিকভাবে শুরু করেছি ষাটের দশকের শুরুতে আমার জন্মকাল হতে এবং শেষ করেছি ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাস আব্বুর অনন্তলোক যাত্রায়। আজকের ও আগামীর তরুণ যখন বইটি পড়বে তখন সে হয়তো এর মধ্য খুঁজে পাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এমন এক ব্যতিক্রমধর্মী, মৌলিক চিন্তাশীল, বিস্ময়কর রকমের ন্যায়নিষ্ঠ, দুর্দান্ত রকমের সত্যপ্রিয়, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, নিরহংকার, আত্মপ্রচার বিমুখ ও স্বাধীন চেতা মানুষকে যার নির্মল জীবনাদর্শকে অনুসরণের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়ের সুকঠিন পথটি নির্মাণ করা সম্ভব। বাংলাদেশ একদিন তার নিজস্ব প্রয়োজনেই খুঁজে বের করবে তাজউদ্দীন আহমদকে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে গাজীপুরবাসীদের তাজউদ্দীন আহমদকে দেওয়া বঙ্গতাজ উপাধিটি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেবে এক নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের সুদক্ষ নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের অমর ইতিহাস।

তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা, এই বইটির বীজ প্রথিত হয় ১৯৭৯ সালে। সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানী ম্যাগাজিনের ডিসেম্বরের বিজয় দিবস সংখ্যায় "তাজউদ্দীন নেতা না পিতা" নামে আব্বুর জীবন ও কর্মের ওপর স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধটি সাংবাদিক ও নারী নেত্রী মালেকা বেগম যত্নের সাথে

ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। লেখাটি প্রকাশিত হবার চার বছর চার মাস পর আমি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাই। সুদূর প্রবাসের দ্রুতগামী জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অধ্যায়গুলো অতিক্রমের পাশাপাশি আব্বুকে কেন্দ্র করে লিপিবদ্ধ করি নানাবিধ ঘটনা ও তথ্য। ১৯৮৭ সালের গ্রীষ্মকালে ঢাকায় এসে আব্বুর জন্মভূমি আমার প্রিয় দরদরিয়া গ্রামে আব্বুর শৈশব, ছাত্র জীবন ও আমাদের পিতৃকুলের ইতিহাস সংগ্রহর পাশাপাশি জেল হত্যাকাণ্ডর ওপর তথ্য ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহর কাজও শুরু করি। কারণ তখন পর্যন্ত চার জাতীয় নেতাকে কারাগারে কারা হত্যা করেছিল এবং কীভাবে এই জেল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো সে সম্পর্কে তথ্য ও সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা আমার জানা মতে প্রকাশিত হয়নি। জেল হত্যা তদন্ত কমিশনের সাবেক সদস্য বিচারপতি কে.এম সোবহান, চার জাতীয় নেতার সাথে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে জেলে বন্দী আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এ.এস.এম মহসীন বুলবুল, ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক বীর উত্তম (মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নির্দেশে যিনি জেল হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী তৎকালীন ডিআইজি প্রিজন্স আব্দুল আউয়াল ও জেলার আমিনুর রহমানের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করেন) জেল হত্যার মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, অ্যাডভোকেট বারী প্রমুখের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত হয় "৩ নভেম্বরের জেল হত্যা ও বিবেকের আত্মাহুতি" প্রবন্ধটি। অন্যান্য যাদের সাথে জেল হত্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করেছিলাম তারা সেসময় সে বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি। এছাড়াও আব্বুর ছাত্র ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক ও খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। কোলকাতায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত বাহিনী প্রধান গোলোক মজুমদার ও বিএসএফের নিরাপত্তা অফিসার শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করি এবং তাদের কাছ থেকেও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের তথ্য লাভ করি।

১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে জেল হত্যা দিবসে নিউইয়র্ক হতে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নিয়মিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রবাসীতে "৩ নভেম্বরের জেল হত্যা ও বিবেকের আত্মাহুতি" প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় । পরবর্তীতে ঢাকা ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বাংলা পত্রিকায়। আমার জানামতে জেল হত্যার ওপর ঐ প্রবন্ধটি ছিল প্রথম সাক্ষাৎকারভিত্তিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। পরবর্তীতে নব্বই দশকের প্রথমার্ধে ছোটবোন সিমিন হোসেন রিমি জেল হত্যাকাণ্ডর প্রত্যক্ষদর্শী যেসব জেল কর্মকর্তারা অবসর গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ শুরু করে। জেল হত্যার ওপর সাক্ষাৎকারগুলো ১৯৯৩-৯৪ সালে দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয় এবং ২০০১ সালে রিমির লেখা জনপ্রিয় স্মৃতি কথা "আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ" এ অন্তর্ভুক্ত হয়। জেল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অজানা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, আব্বুর ডায়েরি, ভাষণ, চিঠিপত্র এবং তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ ও বিভিন্ন বইয়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে আব্বুর জীবন, কর্ম ও আদর্শ সমন্ধে জানতে রিমি যুগান্তকারী এবং ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে। এই বইটি লিখতে গিয়ে বাল্য-কৈশোরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি যা আমরা একত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলাম প্রয়োজন অনুসারে তার কিছু অংশের পুনরোল্লেখ করেছি আমার নিজস্ব অভিব্যক্তির মাধ্যমে। রিমির প্রকাশিত বইয়ের তথ্যাবলি এবং টাইপ সেটিঙের কাজে সহায়তা আমাকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে যার জন্য রিমিকে অফুরন্ত ধন্যবাদ।

হাতে লেখা বইটির প্রাথমিক সম্পাদনা ও টাইপ সেটিঙের কাজ রিমির অনুরোধে ইমাম হোসেন সাহেব যত্নের সাথে করেন। আমি হাতে লিখে একটি করে চ্যাপটার শেষ করছিলাম এবং তা টাইপ করা হচ্ছিল। পরবর্তীতে রিমির প্রকাশনা কর্মের সহযোগী রাশেদুর রহমান তারা কম্পোজের দায়িত্ব নেন। বাকি টাইপ সেটিঙের কাজটি নিজ উদ্যোগে ক্যানাডা প্রবাসী অশীতিপর তরুণ অ্যালবার্ট সুকুমার মণ্ডল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং অতি দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করে তাক লাগিয়ে দেন। এর জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করেন যা আমাকে অভিভূত করে। আমার এই বইটি পড়ে তিনি উচ্ছসিত হয়ে বইটি শীঘ্র প্রকাশ করার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগান। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে যখন ঢাকায় আম্মাকে দেখতে যাই তখন কনিষ্ঠতম বোন মাহজাবীন আহমদ মিমি, যে এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে, সে স্বউদ্যোগে এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও

আগ্রহের সাথে আমাকে প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্যর প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইমের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। নাইম বইটি প্রকাশের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সর্বোতভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মামাতো বোন রোকসানা ওয়াদুদ (মুন্নী) আপার স্বামী ওয়াদুদ চৌধুরী প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ যোগান। ঐতিহ্যের কম্পিউটার বিভাগের মো. জহিরুল ইসলাম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে আমার হাতে লেখা সাক্ষাৎকারের ট্র্যান্সক্রাইব, অজস্র সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনাকে টাইপে মূর্ত করে তোলেন। বানান সংশোধন করেছেন ঐতিহ্যর প্রুফ সেকশনের সুরুজ্জামান সাহেব। প্রচ্ছদ করেছেন এ আর নাইম। তাদের সবাইকে আমার প্রাণঢালা ধন্যবাদ।

একটি বই লেখার জন্য শব্দ চয়ন ও তথ্য সংগ্রহর মতোই জরুরি সেই লেখার সময়কার পরিবেশ, পরিস্থিতি, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, সমর্থন ও সহযোগিতা। এই বইটি লেখার সময় বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও দেশের মানুষের যে অকুণ্ঠ অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা লাভ করেছি তা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। অনেকেরই বাংলাদেশের সাথে প্রথম পরিচয় আমার মাধ্যমে। ভিন্ন ভাষা ও জাতি হওয়া সত্ত্বেও এবং বাংলাদেশের সাথে তাদের কোনো প্রকার যোগাযোগ না থাকলেও তারা নিঃস্বার্থভাবে যুগিয়েছে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা। একটি জাতির উন্নতির বৈশিষ্ট্য হলো যখন সেই জাতি তার নিজস্ব গণ্ডি অতিক্রম করে, ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অপরের ভালো কাজকে সমর্থন করতে পারে এবং নতুন চিন্তা, আদর্শ, মানুষ ও ইতিহাস সমন্ধে জানতে আগ্রহী হয়। যে জাতির মধ্য নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরিচিত গণ্ডির বাইরে কোনো কিছু জানার আগ্রহ নেই সেই জাতি তো মৃতপ্রায়। আব্বুর মধ্যে যে বিশ্বজনীন এবং নিঃস্বার্থ চিন্তা-চেতনা বিরাজমান ছিল তারা যেন এই বইটির সেতু দিয়ে নতুন করে সংযোগ স্থাপন করল এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষের সাথে। এই বই লেখার মধ্য দিয়ে আমিও যেন শুরু করলাম নতুন পথে যাত্রা। যার শেষ কোথায়, কখন এবং কীভাবে হবে নিজেও জানতাম না।

বই লেখার শুরুতে ফুফাতো বোন আনোয়ারা খাতুন (আনার আপা) ষাট দশকের রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পর্কে এবং মামাতো বোন লায়লা ম্যাকারথি, সৈয়দা এরফানা এবং নাসরিন রোকসানা বানু মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাদের পরিবার এবং কর্মকাণ্ডর মূল্যবান কিছু তথ্য আমাকে দেন। আমাদের পরিবারের একান্ত আপনজন আবু আহসান (হাসান ভাই) ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ওনার কাছে আমাদের দরদরিয়া গ্রাম হতে আম্মার হাতে লেখা চিঠির কপি দেন। বইটির প্রতি চ্যাপ্টারের শুরুতে কোটেশন যোগ করার আইডিয়াটি দিয়েছে বন্ধু সুজান ক্রেইগ। সৈয়দা সামিনা মির্জা মিম্মো ও ফাতেমা হক লনি বইটি লেখা চলাকালেই সমাপ্ত অংশগুলো আগ্রহের সাথে পড়ে তাদের মূল্যবান মতামত দিয়েছে। বারনাডেট পুস যুক্তরাষ্ট্র হতে কোস্তারিকায় যোগান দিয়েছে আউট অফ প্রিন্ট দুষ্প্রাপ্য কিছু বই এবং অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল নিজ উদ্যোগে আরও কিছু তথ্য দিয়েছেন। প্যাটরিশিয়া ওয়েলস যে আমার প্রথম বই দ্বিভাষিক হৃদয়ে রংধনু– দ্যা রেইনবো ইন অ্যা হার্ট কে উপহারস্বরূপ প্রতিবারই তুলে দিয়েছে নবজাতক শিশু ও তাদের বাবামায়ের হাতে, সে একই উৎসাহ নিয়ে অনেক দূর থেকে ড্রাইভ করে এসে আমার ফুল ও প্রজাপতি আঁকা সাদা লেখার টেবিলের সাথে আমার একগুচ্ছ ছবি তুলে আমাকে অবাক করে দেয়। তার উক্তি যে 'এই টেবিলটি একটি অসামান্য বাবার সম্পর্কে তাঁর মেয়ের লেখার ঐতিহাসিক সাক্ষী' আমার চোখে পানি এনে দেয় এবং এক অদ্ভুত প্রেরণা যোগায়। এলিজাবেথ রেগান পাতার পর পাতা পুরাতন সব নথিপত্র ও লেখনীকে যত্নের সাথে ফটোকপি করে দেয়। তরুণ দম্পতি ফাহিন আরেফিন ইভান ও সামিরা মেহরাজ প্রাযুক্তিক সহযোগিতা প্রদান করে নিষ্ঠা সহকারে। অধ্যাপক ড. মীজান রহমান যিনি তাজউদ্দীন আহমদ সমন্ধে লিখেছেন অসামান্য প্রবন্ধমালা এবং আমার অনুরোধে আব্বু সম্বন্ধে নির্মিত ওয়েবসাইটটির জন্য বাংলা সাক্ষাৎকারগুলো হতে ইংরেজিতে চমৎকার অনুবাদ করে দিয়েছেন। তার কাছ থেকে বাংলা অভ্র ফন্টের সন্ধান পাই। যার ফলে হাতে লেখা বইটির বাকি পরিমার্জন, পরিবর্ধন এবং এই ভূমিকা লেখার কাজটি অভ্র ফন্টের টাইপে অপেক্ষাকৃত দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র

স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন কর্মকর্তা স্টেফেন স্লো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেন আন্তরিকতার সাথে। মুক্তিযোদ্ধা যারা মুক্তিযুদ্ধ কালের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, উপাত্ত ও সাক্ষাৎকার দেন তারা হলেন টেক্সাস হতে মাহবুবুর রহমান জালাল যিনি ওনার নিজস্ব আর্কাইভে সংগ্রহকৃত মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কংগ্রেশনাল রেকর্ড, ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর প্রচ্ছদে আব্বুর ছবি এবং বিভিন্ন মূল্যবান উপাত্ত দেন অকুণ্ঠ চিত্তে। নিউইয়র্ক প্রবাসী আবুল মনসুর খান, ফ্লোরিডা ও টরনটো হতে ফজলুর রহমান ও মাহফুজুল বারী (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী হিসেবে অভিযুক্ত ছিলেন) মুক্তিযুদ্ধর সময়ের উল্লেখযোগ্য তথ্য দেন। টরনটোবাসী কবি দেলোয়ার এলাহী আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারদের নাম আন্তরিকতার সাথে সরবরাহ করেন। এদের সকলের প্রতি আমার অজস্র ধন্যবাদ রইল।

এই বইটি লেখার সময় আরও যারা আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তারা হলেন– আন্দ্রেয়া মারিয়াম যুনিগা ব্রেনেস, আরিফা আহমেদ, এমি ক্র্যাফট, উম্মে কুলসুম রুবী, কানিজ ফাতেমা রহমান সুমি, ক্যারেন ম্যাক্রেইন, নাতালিয়া মারেনকো, বেভারলি ব্রিটন, ড. মাহবুব উদ্দীন, শ্যারন মিহারেজ ও সৈয়দা সাফিনাজ রুপা সবার প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

আব্বুর জীবন ও পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে বড় ফুফু সুফিয়া খাতুন, ছোট কাকু আফসারউদ্দীন আহমদ ও চাচাতো ভাই দলিলউদ্দীন আহমদ মূল্যবান তথ্য ও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আম্মার পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ করেছি নানা সৈয়দ সেরাজুল হক, ছোট মামা সৈয়দ গোলাম মওলা, আম্মার মামাতো বোন সৈয়দা রোকেয়া বেগম ও চাচাতো ভাই সৈয়দ আনওয়ার হোসেনের কাছ থেকে। এছাড়াও আব্বু ও আম্মার পরিবার সম্পর্কে, আব্বুর রাজনৈতিক জীবন, কর্ম, জেল হত্যা, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আম্মা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, আব্বুর শিক্ষক, বন্ধু, সহকর্মী, গ্রামের প্রতিবেশী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, মুক্তিযোদ্ধা এবং বিভিন্ন পেশা ও কর্মের সাথে জড়িত যারা আমার লেখার জন্য তাদের মূল্যবান সময়, তথ্য ও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং যাদের নাম পারিবারিক ইতিহাস, সাক্ষাৎকার ও বইয়ের অন্যান্য অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে ও বইটির সাথে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত থেকেছেন তাদের সবাইকে আমার সুগভীর ধন্যবাদ।

সর্বশেষে কিন্তু কোনোক্রমেই শেষ নয়, আমার স্বামী ড. আমর খাইরি আব্দাল্লা ও পুত্র তাজ ইমান আহমেদ ইবনে মুনির এই দুই প্রিয় মানুষ আমার বই লেখার উদ্যমে জুগিয়েছে অনাবিল প্রেরণা ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা। আদরের পুত্রবধূ প্রিয়াংকা সেরনিয়াবাত তাজ বিনত আবুল খায়ের পরিবারে নতুন হয়েও আমার লেখার সাথে একাত্ম হয়েছে এবং সমর্থন যুগিয়েছে। স্নেহভাজন ছোট ভাই তানজিম আহমদ সোহেল বাবা ও মায়ের আদর্শকে সমুন্নত রেখে, অন্যায়ের সাথে আপস না করে, রাজনীতিতে তার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-রেখেছে সেটিও এই বই লেখাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমর, তাজ, প্রিয়াংকা ও সোহেল তোমাদেরকে আমার প্রাণঢালা ধন্যবাদ।

আম্মা, এই বইটির যাত্রা শুরু হয়েছিল আপনার অনাবিল ভালোবাসায় এবং শেষ হলো আপনার অনন্ত প্রেরণায়। আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল হতে আপনাকে ধন্যবাদ ও অভিবাদন।

শারমিন আহমদ
কোস্তারিকা
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট

প্রথম পর্ব

সাধারণ, অসাধারণ, ছোট, বড় কোনো অভিজ্ঞতাই ফেলে দেবার নয়।
সব অভিজ্ঞতাই জীবনের বিভিন্ন ফুলে গাঁথা মালা।

**ষাটের দশকে ময়মনসিংহ কারাগার থেকে স্ত্রীকে লেখা
রাজবন্দি তাজউদ্দীন আহমদের চিঠির অংশ।**

আব্বু ও আম্মু হেয়ার রোডের বাসভবনে : ১৯৭৪

যাত্রা হলো শুরু

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এরিক এরিকসন তার গুরু ফ্রয়েডের কিছু বিতর্কিত মতবাদ খণ্ডন করেন। এরিকসনের এই নতুন মতবাদ তাঁকে নিওফ্রয়েডিয়ান পণ্ডিতদের মাঝে শীর্ষ আসনে পৌঁছে দেয়। এরিকসনের মতে, মানবজাতির মন-মানসিকতা যৌন প্রবৃত্তি নয়, বরং সমাজ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তা গড়ে ওঠে। তিনি তাঁর এই যুগান্তকারী মতবাদটিকে বিশদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, প্রতিটি মানুষই জীবনের আটটি স্তরে বিশেষ সংঘর্ষপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে থাকে।[১]

জীবনের শুরু থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষকে অগ্রগতির একেকটি স্তর পার হতে যেয়ে সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয়। প্রতিটি স্তরে সে যেভাবে এই সংঘর্ষকে মোকাবিলা করে তার উপরই নির্ভর করে তার পরবর্তী সময়ের অগ্রগতি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এরিকসন বলেন, জন্মের পর থেকে প্রায় ৬ বছর বয়স পর্যন্ত একটি শিশুর পৃথিবীকে চেনার প্রধান মাধ্যম হলো তার মা, বাবা ও পরিবার। এই সময়টিতে শিশু তার মা এবং বাবাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে; পরিবার তাকে প্রভাবিত করে। তাঁদের চালচলন, কথাবার্তা, ভিন্নতা ও সাদৃশ্যতার মাপকাঠিতে সে চেষ্টা করে পৃথিবীকে জানার। বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক সংঘাতকে সে কীভাবে মোকাবিলা করবে তার প্রস্তুতি শুরু হয় ঐ বয়স থেকেই।[২]

সৌভাগ্যবান শিশু, যারা দারিদ্র্যতা, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বাবা-মাকে হারায়নি অথবা বঞ্চিত হয়নি তাঁদের স্নেহছায়া থেকে তাদেরই একজন হয়ে ষাটের দশকের শুরুতে আমার পৃথিবীতে যাত্রা শুরু। এর ফলে বাবা-মায়ের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে আমার জানার চেষ্টাও ধীরে ধীরে হতে থাকে বিস্তৃত। আমার আব্বু ও আম্মা দুজনেই ছিলেন আত্মনিবেদিত, সংগ্রামী নারী ও পুরুষ। তাঁদের চিন্তা আবর্তিত হতো দেশ ও দশকে কেন্দ্র করে। মানুষের প্রতি তাঁদের নিঃস্বার্থ মমত্ববোধ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের অবিচল প্রতিরোধ আমার মতো অগণিত সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁদের করে তোলে অসাধারণ।

শৈশবে আব্বুকে ঘিরে আমার স্মৃতি উজ্জ্বল নীলাকাশে খণ্ড খণ্ড শারদ মেঘের মতোই ভাসমান। তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী জীবন ও সময়ের অগ্রপথিক। তাঁকে ভালোভাবে জানার আগেই তিনি চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। তিনি চলে গেলেন আমার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে। তারপরও তাঁকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি প্রতিনিয়ত ঐ শৈশবের স্মৃতির মেঘমালার সাথি হয়ে। তার মধ্য দিয়েই বিশ্বকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করি, কখনো বিশ্বের অসীম রহস্যের মধ্যে খুঁজি তাঁকে।

আমার এই স্মৃতিচারণা মূলত আব্বুকে নিয়েই। তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাসঙ্গিকভাবে আরও নানা ঘটনা। যে প্রিয়জন চলে যায় অনন্তলোকে তাঁর স্মৃতি হৃদয়ে ভরপুর হয়ে থাকে বেশি মাত্রায়।

ষাটের দশকের পৃথিবীতে যখন হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে পথ চলা শুরু করলাম তখন সারা পৃথিবীতেই ব্যতিক্রমধর্মী নানা চিন্তাচেতনার আলোড়ন দেখা দিয়েছে। যারা ছিল এত কাল বাকরুদ্ধ ও নিপীড়িত তারা সবে সাড়া জাগাতে শুরু করেছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর মাঝে বৃদ্ধি পেয়েছে ক্ষয়রোগ, তারা জায়গা করে দিচ্ছে পৃথিবীর দুই পারমাণবিক শক্তিতে। ধনতন্ত্রবাদী, গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত নেতা তারুণ্য শক্তির প্রতীকরূপে জয়যুক্ত হলেন জন এফ কেনেডি। আর ওদিকে ফ্লোরিডার মাত্র ৯০ মাইল দক্ষিণে কিউবার আর এক তরুণ ফিদেল ক্যাস্ট্রো মাত্র ৩২ বছর বয়সে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র অত্যাচারী শোষক বাতিস্তা সরকারকে হটিয়ে পুরো লাতিন আমেরিকায় ছড়িয়ে দিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের ঢেউ। ষাট দশকের রোমান্টিক বিপ্লবের নায়ক ফিদেলের গেরিলা সংগ্রামের সাথি চেগুয়েভারা বিপ্লব ছড়াতে গিয়ে সিআইএ'র নির্দেশে নিহত হলেন বলিভিয়ায়। প্রিয় 'চে'র প্রতিকৃতি অঙ্কিত লকেট তখন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মুক্তিকামী প্রতিটি তরুণের গলায় ঝুলছে। সর্বত্র মুক্তির সংগ্রাম চলছে সে সময় এবং আদর্শবাদী সৃষ্টিশীল মুক্তচিন্তার জোয়ার বইছে ভিন্ন ধারায়, ভিন্ন পরিবেশে। গণআন্দোলন, রাজনীতি, চিত্রকলা, শিল্পকলা, কাব্য, সাহিত্য, সংগীত এমনকি ক্রীড়া জগৎও মুখর বৈষম্যহীন নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন ও অঙ্গীকারে বিভোর তরুণ নক্ষত্রদের উদ্ভাসিত উপস্থিতিতে। যুক্তরাষ্ট্রের রোসাপার্ক নামের এক নারী বাসে কৃষাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় বসতে অস্বীকার করে বর্ণবাদ-বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিলেন সারা দেশে; মার্টিন লুথার কিং ও ম্যালকম এক্স (আলহাজ মালিক শাবাজ) পরিণত হলেন আফ্রিকান-আমেরিকান মুক্তি আন্দোলনের অগ্নিপুরুষে। বিশ্বকাপ বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী, অভিনেত্রী জেন ফন্ডা, সংগীতশিল্পী জোন বায়েজ প্রমুখ সোচ্চার হলেন বর্ণবাদ ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে। এদিকে বেটি ফ্রিডানের *ফেমিনিন মিস্টিক* বইটি যুক্তরাষ্ট্রের নারী মুক্তি আন্দোলনে এনে দিল নতুন মাত্রা। ওদিকে বিশ্বনন্দিত বিটলস গ্রুপের সংগীত পৌঁছাল কালোত্তীর্ণ মার্গে–তাদের আধ্যাত্মিক বাণী সমৃদ্ধ হৃদয় পরিশুদ্ধির আহ্বানে।

রবিশংকরের অন্তর আলোড়িত সেতারের বিমুগ্ধ আলাপে মিলিত হলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হৃদয়। মধ্যপ্রাচ্যে, ফিলিস্তিন, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়াসহ ষাটের দশকের পৃথিবীর নেতৃত্ব তখন তরুণদের হাতে। আমার মতো যারা সেই সময়টিতে জন্মেছিল তারা পৃথিবীকে কীভাবে দেখছিল এই চিন্তা জন্মাত আমার অভিবাসী হৃদয়ে। চিন্তার সূত্র ধরে আগ্রহ ভরে আলাপ জমাতাম আমার মার্কিনি বন্ধুদের সঙ্গে। দুটি ভিন্ন মহাদেশ, প্রায় দশ-হাজার মাইলের ব্যবধানে আমাদের জন্ম। আমাদের ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ শৈশবের বেশ কিছু অভিজ্ঞতাকে প্রায় একই সঙ্গে আমরা সঞ্চয় করেছিলাম গোলার্ধের দুটি ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেও। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, আজকের বাংলাদেশের গুটিকতক মানুষের ঘরে তখন সাদাকালো টেলিভিশন পৌঁছেছে। আমাদের ঘরে টেলিভিশন ছিল না। আমি ও আমার দেড় বছরের পিঠাপিঠি ছোট বোন রিমি (সিমিন হোসেন) কুতকুত, হাডুডু ইত্যাদি খেলতে যেতাম ধানমণ্ডির পুরাতন ১৯ নম্বর রোডে আমাদের বন্ধু রাখীদের বাড়িতে। খেলার পর ওদের বাড়িতে মাঝে মাঝে টেলিভিশন দেখতাম রাখী, ওর বড় দুই বোন কাজল আপা ও আঁখি আপার সঙ্গে। কখনো, আমাদের দোতলা বাড়ির ভাড়াটিয়া শহীদ সাহেবের দুই ভাতিজি আঁখী আপা (ভিন্নজন) ও ইলা আপার সাথে।

মাসুমা খাতুনের (বর্তমানে ভয়েস অব আমেরিকা হতে অবসরপ্রাপ্ত) মিষ্টি মুখ ও শ্রুতিমধুর ঘোষণার মধ্য দিয়েই টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয়। ষাটের দশকের মধ্যভাগে পূর্ব পাকিস্তানে যে সাদাকালো টেলিভিশনের আবির্ভাব ঘটে, তার তখন একটি মাত্রই চ্যানেল। অনুষ্ঠানও হাতেগোনা। টেলিভিশনও চালু থাকত মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। চ্যানেল ও সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের পছন্দ ও অপছন্দের গণ্ডিও হতো সীমিত। তারপরও ঐ একটি মাত্র চ্যানেল ঘিরে ছোট-বড় সকলেই যারা একই অনুষ্ঠান দেখতাম, মনে হতো আমরা যেন হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। একই গৃহে বসবাস করেও ছোট-বড় সকলেই যেমন আজ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বে বিভক্ত, চারদিকে মাত্রাহীন পছন্দ ও বিনোদনের আতিশয্য, সে যুগে তেমনটি ছিল না। এ যুগে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে অথচ আমাদের মানসিক অগ্রগতি প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। সে কারণেই আমরা পরিণত হয়েছি নয়া প্রযুক্তির দাসে। প্রযুক্তির অভিনব কলাকৌশলকে আমরা যতখানি না শান্তি সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছি তার চেয়ে অশান্তির। এর জন্য প্রযুক্তি দায়ী নয়, দায়ী আমাদের অবিবেচক মন ও মানসিকতা। ফলে আমরা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করছি যুদ্ধের নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়া। বিশ্বব্যাপী দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছি আরও হিংস্রতা ও বন্যতা। একটিমাত্র বোতাম টিপেই নিমেষেই পৌঁছে যাচ্ছি ভিন্ন মহাদেশে, অথচ পারছি না নিজগৃহের অতি আপনজনদের হৃদয়ে পৌঁছাতে।

সারা দিনের খেলার পর শ্রান্ত রিমি ও আমি বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে সেকালের সাদাকালো টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলো দেখতাম মুগ্ধ বিস্ময়ে, আজকের পরিণত বয়সের রং-বেরঙের জটিল ভাবনা ছাড়াই। আমাদের প্রিয় বাংলা হাসির সিটকম ছিল 'হিরা, চুনি, পান্না।' মূল অভিনেতা আশীষ কুমার লৌহ, খান জয়নুল প্রমুখ। ইংরেজি সিরিজ শোর মধ্যে 'আই লাভ লুসি', 'বিউইচড' ও 'ফিউজিটিভ' আমাদের মন কেড়ে নিয়েছিল। ঢাকা ও মার্কিন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় সিরিজগুলো ষাটের দশকে বেড়ে ওঠা আমার সমবয়সী মার্কিনি বন্ধু ও আমার শৈশবের উষ্ণ স্মৃতির একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায়। সেই একই সময় তারা যখন মার্টিন লুথার কিংয়ের নাম ঘন ঘন শুনছিল এবং প্রত্যক্ষ করছিল কৃষ্ণাঙ্গদের সমঅধিকার আন্দোলনের উত্তাপময় অভিযাত্রা, আমি তখন ঢাকার রাজপথে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম। দেখেছিলাম সড়কজুড়ে ব্যারিকেড, বিক্ষোভ ও উত্তাল মিছিলের স্রোতধারা। ভিন্ননাম, ভিন্নদেশ অথচ লক্ষ্য একই—সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রতিজ্ঞা ও সংগ্রাম। ১৯৬০ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে তরুণ জন এফ কেনেডি নির্বাচিত হলেন বিশ্বশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে। পাকিস্তানে তখন আইয়ুব খানের সামরিক শাসন চলছে প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে। স্বৈরাচারী ও শোষক সেই সামরিক সরকারের পক্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার। বিশ্ব রাজনীতির এই পর্যায়টিতে এসেই কিন্তু আমার মার্কিন বন্ধু ও আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখা দেয় বিরাট অমিল। তারা তাদের রাষ্ট্রের মুক্ত নীতির যে রূপ দেখেছে, আমি আমার রাষ্ট্রে তার প্রতিফলন ঘটতে দেখিনি। আমি যখন তাদের বলি যে তৃতীয় বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচয় হলো দুর্নীতিপরায়ণ, সামরিক বা রাজতান্ত্রিক সরকারের বন্ধু ও মানুষের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এক আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে, অনেকেই তখন তাদের নীল, খয়েরি, কালো বা হিজল সবুজ চোখগুলোতে বিস্ময়ের বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে বলে, 'তা কেন হবে ? আমাদের সরকার তো শুধু বর্বর কমিউনিস্টদের খেদাচ্ছিল !'

যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষই মূলধারার কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলোর ব্যাপক প্রচারণার প্রভাবে ঐ চিন্তাধারার অনুসারী। তাদের কারো কারো সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে শিক্ষাঙ্গনে, কর্মক্ষেত্রে ও প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে তখন ভাব-বিনিময় হয় এই প্রসঙ্গে। আমি তখন স্মৃতির গভীর থেকে তুলে আনি মণিমুক্তাসম ঘটনার সম্পদরাশি যা বিশ্বের প্রাচুর্যশীল শক্তিশালী রাষ্ট্রের মুক্তিকামী রাজনৈতিক ও সৃজনশীল আন্দোলনের চেয়ে কোনো

অংশেই কম নয়। আমার ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যেও মূর্ত হয়ে ওঠে মানুষের জন্মগত অধিকার; আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধিকার প্রচেষ্টার গণতান্ত্রিক আন্দোলন। আমার শৈশবের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় নিপীড়িত মানুষের দুর্বার সংগ্রামের অবিস্মরণীয় স্মৃতিতে; স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরবগাথাতে। আমার আজকের এই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিটির শিকড় যে এই মহাদেশের অন্যপ্রান্তে, তা-ও হয় ব্যক্ত। স্বাধিকারের লক্ষ্যে সংগ্রামরত, ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমারেখায় বেষ্টিত বিশাল জনসমুদ্রের দেশ বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার এক সুবিশাল হৃদয় ও চিন্তাধারার রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণের যোগসূত্র ধরেই আমি আবিষ্কার করি মহাবিশ্বকে।

সেই যুগে ঢাকা শহরে যারা আমার মতো বড় হয়েছে তাদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ ছিল রাজনৈতিক পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। আমার বন্ধুদের অধিকাংশই ছিল অরাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। রাজনীতি সচেতন হওয়ার বয়স তখনো আমার হয়নি, কিন্তু চারদিকের অন্যায় ও অবিচারের জঞ্জাল সরিয়ে যে নতুন কিছু গড়ার উদ্যোগ চলছে তা বুঝতে পারতাম। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় তখন। এই সময়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার কেন্দ্রে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (তখনো তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করেননি) ও আব্বু তাজউদ্দীন আহমদ। শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা মুজিব কাকু বলে সম্বোধন করতাম। মুজিব কাকুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব, জ্বালাময়ী ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক ভাবমূর্তির সঙ্গে আব্বুর সাংগঠনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও পরিশুদ্ধ চিন্তাবোধ যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এক নম্বর রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছিল। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি' এই অমর গানটির রচয়িতা সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরীর ভাষায় 'শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত আওয়ামী লীগে শেখ মুজিবের পেছনে প্রকৃত বুদ্ধিদাতা ও কর্মী পুরুষ ছিলেন তাজউদ্দীন ... ফর্সা গোলগাল চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ, বেশি মানুষের ভীড়ে লাজুক এই শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির মানুষটি প্রখর ব্যক্তিত্বশালী নেতা ছিলেন না। কিন্তু তাঁর শিক্ষা, বুদ্ধি ও সংগঠন শক্তির সঙ্গে শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব, সাহস ও জনপ্রিয়তার মিশ্রণে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।'[৩]

মেধাবী ও কৃতীছাত্র আব্বু হতে পারতেন সরকারের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অথবা বেছে নিতে পারতেন নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্য কোনো জীবন। কিন্তু নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য রোধের জন্য তিনি বেছে নেন দুর্গম গিরি কান্তার মরু সমান এক ঝঞ্ঝাতাড়িত জীবন। নেতা তাজউদ্দীনের বিশাল ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকেই তাই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি পিতা তাজউদ্দীনকে।

কুয়াশা ঢাকা শীতের ভোরে আব্বুর হাত ধরে আমার ছোট বোন রিমিসহ আমরা বের হতাম বকুল ফুল কুড়াতে। সঙ্গে হাঁটতে বের হতেন আম্মা ও আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় ফুফাতো বোন আনার আপা (আনোয়ারা খাতুন)। আমাদের ৭৫১ সাত মসজিদ রোডের দোতলা বাড়ির উল্টো দিকের পুরাতন ২১ নম্বর সড়কে ছিল সারিবদ্ধ বকুল ফুলের গাছ। আমরা সবাই মনের আনন্দে সেই ফুল কুড়াতাম। ছেলেবেলায় আব্বু বয়স্কাউটের সদস্য হিসেবে নানারকম জনসেবামূলক কাজ করেছিলেন। আমাদের তা থেকে বিভিন্ন উদাহরণ দিতেন। রাস্তায় যদি কোনো আবর্জনা, ফলমূলের খোসা, ভাঙা টিন, কাচ ইত্যাদি পড়ে থাকত আব্বু সেগুলো নিজ হাতে কুড়িয়ে রাস্তাটিকে জঞ্জালমুক্ত ও নিরাপদ করে তুলতেন। জনহিতকর কোনো কাজই তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ছিল না। আব্বুর সঙ্গে আমরা ঘরে ফিরতাম সৈনিকের মতো লেফট-রাইট মার্চ করে। কখনো সাঁঝের আলোতে জানালায় বেয়ে ওঠা লতাবেলির মিষ্টি সুবাসের মাঝে বসে আব্বুর কাছ থেকে আমরা

গল্প শুনতাম হরেক রকমের। তাঁর বলা একটি গল্প বিশেষ করে আমার মন ছুঁয়ে যায়—এক বুড়ি ও তার দুই বিশ্বস্ত কুকুর রঙ্গা ও ভঙ্গার গল্প। সাধারণত এই লোক-কাহিনিগুলো স্থানভেদে একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হতে দেখা যায়। আব্বু বিছানায় বালিশে মাথা হেলান দিয়ে শুতেন আর আমরা দুই বোন আব্বুর দুই কাঁধে মাথা দিয়ে গোগ্রাসে গিলতাম সব গল্প। আব্বু বলতেন, "এক বুড়ি, সে যাবে তাঁর নাতনিকে দেখতে। লাঠি হাতে ঠুকঠুকিয়ে চলল সেই বুড়ি এক বিজন বনের ভেতর দিয়ে। হঠাৎ করেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক সুচতুর শেয়াল। সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'এই বুড়ি তোকে আমি খাব।' বুড়ি ছিল দারুণ বুদ্ধিমতী। সে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, 'আমাকে খেয়ে তুমি মোটেও স্বাদ পাবে না।' সে তাঁর হাড় জিরজিরে শরীর দেখিয়ে বলল, 'আমার শরীরে নেই একরত্তি মাংস, একটু সবুর করো। নাতনির বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি, সেখান থেকে ভালো খাওয়া-দাওয়া করে গায়ে যখন মাংস লাগিয়ে ফিরব তখন খেয়ো।' শেয়াল একটু চিন্তা করে দেখল যে বুড়ির যুক্তিই সঠিক। তখন সে বলে 'ঠিক আছে। আমি এই পথেই তোর জন্য অপেক্ষা করব।' বুড়ি হাঁফ ছেড়ে চলতে শুরু করল। পথিমধ্যে সে দেখা পেল একটি বাঘ ও ভালুকের। তাদের তর্জন-গর্জনের সামনেও বুড়ি তাঁর সাহস হারাল না। শেয়ালকে যে কথা বলেছিল সেই একই কথা বলে সে তাঁর জীবন রক্ষা করল। নাতনির বাড়ি পৌঁছে বুড়ি মহাখুশি। নাতনির সেবাযত্নে ও মজার মজার হরেক-রকমের খাবারের বদৌলতে সে বেশ নাদুসনুদুস হয়ে উঠল। আনন্দ, আহ্লাদে, হাসি গল্পে কটি মাস কেটে গেল স্বপ্নের মতো। এবার বুড়ির ঘরে ফেরার পালা। ফিরতে হবে, সেই একই পথ দিয়ে। অন্য কোনো পথ নেই। বুড়ি মনে মনে এক বুদ্ধি বের করল। নাতনির সহায়তায় সে ঢুকে পড়ল বাগানের মস্তবড় এক মিষ্টি কুমড়োর ভেতরে। সঙ্গে নিল গুড়, মুড়ি, খই ও তিলের নাড়ু। এবার মিষ্টি কুমড়োটিকে নাতনি দিল এক বিরাট ধাক্কা। সে ধাক্কায় কুমড়োটি এসে পৌঁছল ভালুক-ভায়ার সামনে।

ভালুক কুমড়োটি উল্টে-পাল্টে দেখল। নাহ ! নেহাতই এক কুমড়ো ! সে হতাশ হয়ে কুমড়োটিকে দিল এক ধাক্কা। এবার কুমড়োটি গিয়ে পড়ল ঐ বাঘ মামার সামনে। বাঘও কুমড়োটিকে এপাশ-ওপাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাগে দিল এক মস্ত ধাক্কা। সেই ধাক্কায় কুমড়োটি হড়বড়িয়ে পড়ল শেয়াল পণ্ডিতের সামনে। শেয়াল তো শুধু নেহাতই শেয়াল নয়, সে পণ্ডিতও বটে, তাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। এই বিজন বনে গড়িয়ে চলা কুমড়োটির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সে তার ধারালো দাঁত দিয়ে কুমড়োটিকে করল খণ্ড-বিখণ্ড। আর যায় কোথায় ! বুড়ি বের হয়ে এল, তাঁর নাদুসনুদুস নতুন শরীর নিয়ে। শেয়ালের চোখ খুশিতে হয়ে উঠল চকচকে। তাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ কাজ নয়। বুড়ি যখন দেখল তার মৃত্যু আসন্ন। তখন জীবন রক্ষার জন্য সে শেষ চেষ্টা করল। শেয়ালকে অনুনয় করে বলে, 'আমার মরতে আপত্তি নেই। শুধু মরার আগে আমার একটি ছোট্ট অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।' শেয়াল তার নাক-মুখ খিঁচিয়ে বিরক্তিভরে বলে উঠল, 'বলে ফ্যাল তোর কী অনুরোধ।' বুড়ি বলল, 'আমি খুব গান গাইতে ভালোবাসি। মরবার আগে আমার শেষ গানটি গাইতে চাই।' 'তথাস্তু', শেয়াল বলে উঠল। বুড়ি তখন বনের প্রান্তে একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। সেই জায়গাটিতে ছিল একটি উঁচু মাটির টিলা, সেই টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সে গাইল তার শেষ গান 'আয়রে আমার রঙ্গা, ভঙ্গা, আয়রে আমার রঙ্গা, ভঙ্গা।' বুড়ির করুণ ডাক পৌঁছল তার দুই কুকুর রঙ্গা ও ভঙ্গার কানে। তারা তুমুল ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এল বুড়িকে রক্ষা করতে। ঐ দুই বাঘা-কুকুরের তাড়া খেয়ে শেয়াল পণ্ডিত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল। বুড়িও উপস্থিত বুদ্ধির বলে তাঁর প্রাণ বাঁচাল।" গল্প শুনতে শুনতে আমরা দুইবোন আব্বুর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম। স্বপ্নের রাজ্যে দেখা দিত অত্যাশ্চর্য কল্পকাহিনির জগৎ, যেখানে পশুপাখি কথা বলে, জ্যোৎস্নার প্লাবনে সিক্ত আকাশে পরীরা ওড়ে, মৎস্যকন্যারা নির্ভয়ে গায় গান। গল্পের জগৎ পৃথিবীকে চেনার ক্ষেত্রে যুক্ত করে বিশেষ মাত্রা। ধূর্ত শেয়াল ও হিংস্র বাঘভালুক-সমান মানুষের অরণ্যে প্রকৃত বন্ধুর সাহায্যের হাত

মুক্তির সংগ্রামকে করে তোলে জয়যুক্ত। (অনেক মানুষ এতই নিকৃষ্ট যে পশুর সঙ্গে তুলনা করলে বরং পশুরই অপমান হয়)। ১৫ নম্বর পুরানা পল্টনে ছিল আওয়ামী লীগের অফিস। মুজিব কাকু ও আব্বুর যৌথ নেতৃত্বে এই নবীন রাজনৈতিক দলটিতে তখন অসামান্য গতি সঞ্চার হয়েছে। দলের কাজে নিবেদিত আব্বুর নাওয়া-খাওয়ার কোনো সময় ছিল না।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে কিছু সুযোগ-সন্ধানী মানুষের হীন চক্রান্ত ও পাকিস্তান সরকারের উসকানিতে শুরু হয় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা। আনার আপা তখন বাংলাবাজার স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। সহপাঠী অধিকাংশই হিন্দু। মুসলিম মেয়েরা তখনো শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। দাঙ্গার সময় স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। স্কুল যখন খুলল আনার আপা অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর ক্লাস প্রায় ফাঁকা। তাঁর প্রিয় ফুটফুটে সুন্দরী সহপাঠী অরুণাসহ অধিকাংশ হিন্দু ছাত্রীই নিরাপত্তার অভাবে পরিবারসহ দেশ ত্যাগ করেছে। আব্বু, মুজিব কাকু ও অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ দাঙ্গা রুখতে ও জনজীবনে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য দাঙ্গাক্রান্ত এলাকায় স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সামরিক সরকার দমন আইন প্রয়োগ করে মুজিব কাকু, আব্বুসহ অনেকের বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা ঠুকে দিল। ঢাকার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া দাঙ্গার রূপটি ছিল মৃত্যুর মতো হিমশীতল। সেই দুঃসময়ে রায়ের বাজার এলাকার কাঠমিস্ত্রি নিতাই দাস ও এক হিন্দু গোয়ালা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাড়ায় দুধ বিলি করার সময় দুর্বৃত্তরা গোয়ালার মাথা ফাটিয়ে দেয়। ঘটনাটি আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ঘটে। দাঙ্গাবিরোধী স্বেচ্ছাসেবকরা ধরাধরি করে গোয়ালাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। আব্বু নিজ হাতে গোয়ালার মাথা ধুইয়ে রক্ত পরিষ্কার করে তার মাথায় যত্ন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন। শুশ্রূষারত আব্বুর পাশে বসে সেই প্রথম জানলাম মানুষের আর একটি ভিন্ন পরিচয়ও আছে। আরও বুঝলাম বিশ্বাস ও মতের ভিন্নতার কারণে মানুষের মানুষ পরিচয়টি হতে পারে মূল্যহীন ও ক্ষত-বিক্ষত এক নিমেষেই।

লিপ ইয়ার। আমার চার বছরের প্রথম জন্মদিনটিতে। ছবির বাঁয়ে মিম্মো ও ডানে রিমি। পেছনে খালাতো ভাই জুলু ফুফাতো বোন আনার আপা ও খালাতো বোন নীলু আপা।
২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি আমার প্রথম জন্মদিনে আনার আপা ও খালাতো বোন নীলু আপা বেলুন ও কাগজের ফুল দিয়ে ঘর সাজালেন। বন্ধু মিম্মো ও রিমিকে পাশে নিয়ে আমি কেক কাটলাম। আম্মা আমার বেশ কটি ছবি তুললেন। ছোট কাকু, দলিল ভাই, ভুলু ভাই, হাসান ভাই ও অন্যরাও জন্মদিনের আনন্দে যোগ দিলেন। আতাউর রহমান খান (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী) এলেন তাঁর স্নেহভাজন তাজউদ্দীন-কন্যার চতুর্থ (লিপইয়ারে জন্মাবার কারণে প্রতি চার বছরে ঐ দিনটি আসে) বছরে পদাপর্ণের প্রথম জন্মদিনে যোগ দিতে। তিনি আমার জন্য নিয়ে এলেন মনকাড়া এক পুতুল। আব্বু নিয়ে এলেন মনোমুগ্ধকর একরাশ ফুল।

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরুতে, পাকিস্তানের জনক মহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে আমাদের বাসায় বসেছিল নির্বাচনী প্রচারণা ক্যাম্প। তিনি স্বৈরাচারী জেনারেল ও স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁর প্রতীক ছিল হারিকেন। রিমি ও আমি সারাদিন ঘুরঘুর করতাম সদাব্যস্ত নিবেদিত কর্মীদের আশপাশে। আমাদের বাড়ির ফোন ঝনঝন করে সর্বক্ষণ বাজত। কেউ যখন আমাদের ফোন নাম্বার জানতে চাইতেন আমি উৎসাহ ভরে বলতাম 83532।

পিতল রঙের ছোট হারিকেনের পিন জামায় গেঁথে আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতাম কর্মীদের কাজকর্ম। আমাদের বাসার সামনের লম্বা বাগানের একপ্রান্তে বাতাবি লেবু গাছের পাশে বসানো হয়েছিল লাকড়ির চুলা। তাতে বিরাট বড় ডেকচি বসিয়ে কর্মীদের জন্য রান্না হতো। রান্নার খুশবু, লাকড়ির চুলার ধোঁয়া, কর্মীদের সদাব্যস্ত কোলাহল, নির্ঘুম রাতের সৃষ্টি হাজারো ইশতেহার ও বিবৃতির মাঝ দিয়ে আমার সামনে ধীরে ধীরে উম্মোচিত হয় রাজনীতির বিশাল জগৎটি।

উল্লেখ্য ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল করে, সংসদকে অবলুপ্ত করে ও সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দুর্বল প্রশাসক, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে হঠিয়ে, পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম মার্শাল ল প্রবর্তনকারী যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন ও নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন।

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ঐ লোক দেখানো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতেমা জিন্নাহ্র বিরুদ্ধে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং জোর জুলুম ও নিষ্পেষণের মাধ্যমে নির্বাচনে জেতেন।

১৯৬৫ সালে আমার নানি সৈয়দা ফাতেমা খাতুন পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। খবরটি শোনামাত্রই আব্বু আওয়ামী লীগ অফিস থেকে ফিরে এসে নিজ হাতে নানির শুশ্রূষায় লেগে যান। সেকালের নামকরা ডাক্তার নন্দী নানিকে দেখতে আসেন। ডায়াবেটিসের রোগী নানিকে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ডাক্তার নন্দী রোগ নির্ণয়ে এবং রোগীর চিকিৎসায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সেকালে তো আর এ যুগের মতো প্রযুক্তিনির্ভর ও উন্নত চিকিৎসা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু চিকিৎসকের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান, যা ব্যতীত কোনো চিকিৎসাই সফল হয় না এবং সম্পূর্ণতা লাভ করে না, তা পুরোটাই ডাক্তার নন্দীর আয়ত্তে ছিল। সেই সময় ঢাকার চিকিৎসক মহলে বহুল পরিচিত একটি নাম ছিল ডা. নন্দী। তাঁর মতো একজন মহৎ সেবাপরায়ণ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। আব্বুর পাশে বসে আমি সে সময় ইতিহাসের এমন ধারাকেই পর্যবেক্ষণ করছি শিশুর দৃষ্টি দিয়ে, যেন স্বপ্নের মাঝে আলো ও আঁধারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।

১৯৬৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর আমাদের তৃতীয় বোন মিমি জন্মগ্রহণ করে। সে সময় বাজারে মিমি চকলেট সদ্য এসেছে। আমার মিমি চকলেটপ্রীতির কারণে সদ্য জন্ম নেওয়া পুতুলের মতো ফুটফুটে বোনটিকে আমি মিমি নামেই ডাকা শুরু করলাম; ওর মিমি নামটি এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মিমি তার দুই বড় বোনের মতোই জন্মেছিল ভোরবেলায়। সেই ভোরে ঘুম ভেঙে

দেখি আম্মা পাশে নেই। আব্বুও নেই। আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে রিমির হাত ধরে ঘরের বাইরে বের হলাম। দেখি পাশের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে আব্বু উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। উষার আগমনের কিছু আগে ঘরের ভেতর নবজাত শিশু সরবে ভূমিষ্ঠ হলো। আম্মা হাসপাতালের যান্ত্রিক পরিবেশে সন্তান জন্ম দেওয়ার চেয়ে নিজ গৃহের পরিচিত ও স্বাভাবিক পরিবেশে সন্তান জন্ম দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সে যুগে এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল। (বর্তমানে পাশ্চাত্যের কোনো কোনো রাষ্ট্রে নিজগৃহে সন্তান জন্ম দেওয়ার এই প্রথাটির পুনর্জাগরণ দেখা দিয়েছে, অথচ আমাদের দেশে আমরা ক্রমশই হারিয়ে ফেলছি সন্তান জন্ম দেবার স্বাভাবিক পরিবেশ ও প্রক্রিয়াকে।)

আমাদের তৃতীয় বোন নিয়মানুসারে ডাক্তার খোদেজা সরকারের হাতেই জন্ম নেয়। সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পর আমাদের পুরনো দাইমা—যাকে সবাই সুলতানের মা বলে সম্বোধন করত—বের হয়ে এলেন আতুড় ঘর থেকে। তাঁকে দেখে আব্বু ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে ?' দাইমার বহু আশা ছিল যে এবার ছেলেই হবে এবং সেই সুবাদে সে মোটা বকশিশেরও প্রত্যাশা করছিল। তাই প্রশ্নের উত্তরে মুখ ব্যাজার করে অনেকটা তাঁতানো স্বরেই জবাব দিল, 'কী আবার হইব, মাইয়াই হইছে !' বাড়িরও সবার আশা ছিল এবার ছেলেই হবে। কিন্তু তারা সবাই নিরাশ হওয়াতে আব্বু নবজাতক শিশুকে গভীর স্নেহে আদর করে তার নামকরণ করলেন আদুরী। আদুরী বোন মিমিকে পৃথিবীতে স্বাগতম জানাতে আব্বু কিনে আনলেন রাশি রাশি মিঠাই-মণ্ডা। আমি ও রিমি খাটের চারপাশ ঘিরে নেচেগেয়ে নতুন বোনকে স্বাগত জানালাম। নতুন বইয়ের ছড়া গানটিই আমরা গাইলাম—

'খুকুমণি জনম নিল যেদিন মোদের ঘরে,
পরীরা সব দেখতে এল কতই খুশি ভরে।
আদর করে দুধ খাওয়াল সোনার পেয়ালাতে,
দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াল জ্যোৎস্না মাখা রাতে।
নেচে গেয়ে হেলে দুলে হাত ধরে সব তায়,
কতই খেলা খেলল তারা ফুলের বিছানায়।

মিমির জন্মের মাস খানেক পরই বোধকরি রোজার ঈদ এল। আব্বু সেই ঈদের ভোরবেলায় হুলস্থূল লাগিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে ও রিমিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের পেছনের বাড়ির প্রতিবেশী ও পারিবারিক বন্ধু রাজু খালা ও তার স্বামী হাজি মহসিন খালুকেও ডেকে তুললেন। সে সময় ঢাকা শহরে বেশ শীত পড়ত। শীতের সকালেই আম্মা ও আনার আপা আমাদের গরম পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিলেন। আব্বু, ছোট কাকু (আফসারউদ্দীন আহমদ), আমার নানা সৈয়দ সেরাজুল হক এবং পাড়ার অনেকেই গেলেন ঈদের নামাজ পড়তে। এদিকে আমি ও রিমি আম্মার হাতে তৈরি করা নতুন ডিজাইনের ঈদের ফ্রক পরে মাথায় লাল ফিতার বাহারি ঝুটি বেঁধে পাড়া বেড়ানোর জন্য প্রস্তুত। সে সময় কৃষ্ণচূড়া, বকুল ও নারকেল গাছে ঘেরা ধানমণ্ডি ছিল প্রায় ফাঁকা, যানজট ও কোলাহলমুক্ত মনোরম এক আবাসিক এলাকা। অতটুকু বয়সেই আমরা পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াতে ও খেলতে যেতাম নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায়। সন্ত্রাস, ছিনতাই, রাহাজানি, অপহরণ ইত্যাদি শব্দগুলো আমাদের মনের অভিধানে তখনো যুক্ত হয়নি।

রোজার ঈদের পরপরই আব্বু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফার আন্দোলন নিয়ে। ছয় দফার অন্যতম রূপকার আব্বু লাহোরে বিরোধী দলীয় সম্মেলনে যোগদান

করেন মুজিব কাকুসহ। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬; এই দিনে, এই সম্মেলনে মুজিব কাকু স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি হিসেবে ছয় দফাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। আইয়ুব খানের বৈদেশিক মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো তখন ছয় দফাকে অযৌক্তিক প্রমাণ করার জন্য মুজিব কাকুকে ঢাকার পল্টনের জনসভায় তর্কযুদ্ধের আহ্বান জানালেন। মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গে পরামর্শ করে ভুট্টোর চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলেন। বাকর্লে-অক্সফোর্ডের তুখোড় ছাত্র ভুট্টো ঢাকায় এলেন এক বিরাট উপদেষ্টার দল সঙ্গে নিয়ে। তিনি নিশ্চিন্ত যে এই তর্কযুদ্ধে তিনি মুজিব কাকুকে হারিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে আব্বু ইতোমধ্যেই ছয় দফার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য প্রস্তুত করেছেন এক বিশদ প্রমাণপত্র। আব্বু ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করে মুজিব কাকুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সংবাদটি আনুষ্ঠানিকভাবে জ্ঞাপন করলেন। আব্বুর সঙ্গে কথা বলার পরপরই ভুট্টো বুঝতে পারলেন ছয় দফার যৌক্তিকতা আব্বু এমন নিপুণ ও তথ্যবহুল যুক্তিতে দাঁড় করিয়েছেন যে, মুজিব কাকু ও তাঁর দলকে তর্কে হারানো মুশকিল। আব্বুর সঙ্গে কথা শেষ করার পর ভুট্টো মুসলিম লীগের নেতাদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন, 'হি ইজ ভেরি থরো। শেখের যোগ্য লেফটেন্যান্ট আছে দেখছি !'[৪] তর্কযুদ্ধের দিন পল্টনের জনসভায় শরিক হওয়ার জন্য যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে ঢাকায় মানুষের সমাগম হতে শুরু করেছে ঠিক সেই দিন সকালবেলাতেই ভুট্টো তার উপদেষ্টার দলসহ চুপিসারে ঢাকা ত্যাগ করলেন। ঢাকার বহু কাগজ ঐ ঘটনার উপর বিশদ আলোকপাত করে। একটি কাগজের শিরোনাম ছিল 'ভুট্টোর পলায়ন।'[৫] ভুট্টো ও পল্টন ময়দান নাম দুটি আমার শৈশবের ক্ষুদ্র স্মৃতির ভাণ্ডারে সে সময় প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়। এই দুটি নামের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্বন্ধে জানতে পারি অবশ্য অনেক পরে।

তখন আমি বানান করে পড়তে শিখেছি এবং ভীষণ ব্যস্ত খেলাধুলা ও নতুন কুকুর পিপিকে নিয়ে। আমাদের জাপানি প্রতিবেশী রিমি ও আমার সমবয়সী খেলার সাথি শিওমি ও নিশিও-র বাবা-মা ঢাকায় জাপান মিশনের দায়িত্ব পালনের পর দেশে ফেরার আগে তাদের কুকুর পিপিকে উপহার হিসেবে আমাদের কাছে রেখে যান। কালো ও বাদামি রঙে মিশানো পিপিকে পেয়ে আমি মহাখুশি। আব্বুও যোগ দিলেন আমার খুশিতে। রিমি ছোটবেলা থেকেই কুকুর-বেড়ালকে ভয় করত। সে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে পিপির সঙ্গে আব্বু ও আমার হই-হুল্লোড় করে খেলা দেখত। একদিন পিপির সঙ্গে আব্বু ও আমি বাগানে বল ছোড়াছুড়ি করে খেলছি। হঠাৎ দেখি, গেটের বাইরে এক কালো কুচকুচে কুকুর আকুতি ভরা নয়নে আমাদের খেলা দেখছে, যেন সে-ও যোগ দিতে চায় আমাদের খেলায়। আব্বু খেলা থামিয়ে গেট খুলে কুকুরটিকে ভেতরে ঢোকালেন। নতুন কুকুরটিও যোগ দিল আমাদের খেলায়। আব্বু প্রস্তাব দিলেন এই কুকুরটির নামকরণের। আমরা দুজন মিলে ভেবেচিন্তে ওর নাম দিলাম শিপি। আব্বুর সঙ্গে খেলাধুলা, গল্প ও নির্মল আনন্দঘন সময় কাটানোর মধ্যেই আব্বুকে জানছি। ঠিক এই সময়ই আব্বুর সঙ্গে আমার পরিচয়ের পর্বটিতে হঠাৎ করেই ছেদ পড়ল। বাবা তাজউদ্দীনের একদিন ডাক এল জননেতা তাজউদ্দীনের কাছ থেকে। জননেতা আমার বাবাকে কেড়ে নিল সুদীর্ঘ দিনের জন্য।

১৯৬৬ সালের ৮ মে ছয় দফা আন্দোলনের কারণে মুজিব কাকু ও আব্বুসহ বন্দী হলেন আওয়ামী লীগের জহুর আহমদ চৌধুরী, নূরুল ইসলাম ও রাজশাহীর মুজিবর রহমান; ধীরে ধীরে দলের আরও নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলো। সেই ৮ মের গভীর রাত দেড়টার সময় আম্মার হাতের ধাক্কায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখি যে ঘরের সব বাতি জ্বলছে। ঘরের মেঝেতে রাখা খোলা একটি সুটকেসে আব্বুর লুঙ্গি, গেঞ্জি, শার্ট ও প্যান্ট ভাঁজ করে রাখা। আম্মা আরও কিছু কাপড়চোপড় ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখছেন। আমাদের বড় খাটটি—যেখানে আব্বু, আম্মা, রিমি ও আমি ঘুমাতাম, সেখানে দেখি আব্বু নেই। খাটের পাশের

দোলনায় আমাদের চারমাস বয়সী ছোট্ট বোন মিমি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। রিমি আমার মতোই অবাক বিস্ময়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আম্মা, আব্বু কোথায় ?' আম্মা বললেন, 'তোমার আব্বু ড্রইংরুমে আছেন। এই সুটকেসটা তোমার আব্বুকে দিয়ে এসো।' সুটকেসের ঢাকনা বন্ধ করে আম্মা সেটা আব্বুর কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার কাছে তুলে দিলেন। আমি খুশি মনে লাফাতে লাফাতে সুটকেসটাকে দুই হাতে ধরে টানতে টানতে ঘরের ঠিক পাশের ড্রইংরুমটিতে নিয়ে গেলাম। দেখি ড্রইংরুমে আব্বু বসে আছেন। পাশে খাকি পোশাক পরা দুজন মানুষ। একজনের চেহারা বেশ হাসিমাখা। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। সুটকেসটা আব্বুকে দেওয়ার পর আব্বু আমাকে কোলে তুলে আদর করলেন। রিমি ও আমাকে আদর করে আমাদের হাত ধরে বাড়ির সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আমাদের পাশে আম্মা, ছোট কাকু ও আব্বুর অতি আদরের ভাগনি আনার আপা দুচোখ ভরা বিষণ্ণতা নিয়ে বিদায় জানাতে এলেন। আমি বিস্ময়ভরা চোখে দেখি আমাদের পুরো বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্ত্রধারী আরও কিছু পুলিশ। আমাদের হাত ছেড়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জিপের মধ্যে আব্বু উঠে গেলেন, জিপটা চলতে শুরু করল। আমি আব্বু আব্বু বলে হাত নাড়লাম। আব্বু আমাদের দিকে হাত নেড়ে হাসলেন। পুলিশ ভরা আরও চার-পাঁচটা জিপ আব্বুর জিপের সঙ্গে চলা শুরু করল ধানমণ্ডির ২ নম্বর সড়কের দিকে।

আব্বুকে প্রথমে অন্তরীণ করা হলো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। তাঁকে রাজবন্দিদের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীতে না রেখে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা হলো। আম্মা ও আনার আপার সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাৎ হওয়ার পর আব্বু তাঁদের জানালেন যে, প্রচণ্ড গরমে একদিন তিনি ঘুমাতে পারেননি। কিছুদিন পর তাঁকে ঢাকা কারাগার থেকে হঠাৎ করেই স্থানান্তরিত করা হলো ময়মনসিংহ কারাগারে।

আব্বুকে যে সময় গ্রেপ্তার করা হয়, সে সময় ছয় দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলন তীব্রভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। গ্রেপ্তারের আগে আম্মার প্রশ্নের জবাবে আব্বু অভয় দিয়ে বলেছিলেন, আব্বুসহ আওয়ামী লীগের মূল নেতৃবৃন্দকে আটক করা হলেও সংগ্রাম থেমে থাকবে না। কারণ, তৃণমূল পর্যায়ে তাঁরা রেখে যাচ্ছেন এমন একটি শক্তিশালী সংগঠন যা সংগ্রামকে অব্যাহত রাখবে। পরে আব্বুর কথাই সঠিক প্রমাণিত হলো। ৭ জুন দেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল পালিত হলো। রাজবন্দিদের মুক্তি ও ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবিতে স্কুল, কলেজ, কলকারখানা, গাড়িঘোড়া সব বন্ধ হয়ে গেল বিক্ষুব্ধ জাতির ঐকান্তিক সমর্থনে। স্বৈরাচারী সেনা-রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান ও তাঁর দুষ্কর্মের সঙ্গী গভর্নর মোনায়েম খান ১৪৪ ধারা জারি করলেন। ১৪৪ ধারা অমান্যকারী বিদ্রোহী শ্রমিক ও জনতার ওপর চলল কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ। শ্রমিক মনুমিয়াসহ এগারোজন অকুতভয় ত্যাগী বীর সেদিন শহীদ হলেন। ৭ জুন এমনি করেই অমরত্ব লাভ করল। ঐ ঐতিহাসিক দিনটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আব্বু বলেছিলেন, 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম এগোয় সর্পিল গতিতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে। রক্ত-পিচ্ছিল এই পথ। বাধা এখানে অসংখ্য। পার হতে হয় অনেক চড়াই-উতরাই। সংগ্রামের এক একটা মোড় পরিবর্তনে ইতিহাসে সংযোজিত হয় নতুন অধ্যায়। ৭ জুন আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এমনি একটি যুগান্ত কারী মোড় পরিবর্তন। ... ৭ জুনকে এক অর্থে বলা যায় ছয় দফার দিবস। এই দিনে ছয় দফার দাবিতে বাঙালি রক্ত দিতে শুরু করে। স্বাধিকারের এই আন্দোলনই ধাপে ধাপে রক্তনদী পেরিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে গিয়ে শেষ হয়েছে। কাজেই বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে ৭ জুন অমর।'[৬]

আব্বুসহ মূল নেতৃবৃন্দ যখন কারান্তরীণ তখন আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম ও মিজানুর রহমান চৌধুরী। দলের চরম দুর্দিনে তাঁরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং ছয় দফার বক্তব্যকে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হতো আমাদের বাড়ির

নিচতলার বৈঠকখানায়। আমেনা বেগম তাঁর ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে আসতেন। সে ছিল আমাদের বয়সী। আমরা একসঙ্গে নানারকম খেলা খেলতাম। একদিন আমেনা বেগম আমাদের বললেন, 'তোমরা এই বইগুলো নিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকো। যারাই সভায় আসবে, তাদের হাতে একটি করে বই দেবে।' বই বিলি করার দায়িত্ব পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি। সবুজ রঙের বইটির মলাটে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল সেই যুগান্তকারী বৈপ্লবিক বাণী 'পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসন চাই'।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি অতি উৎসাহে আব্বুকে ময়মনসিংহ কারাগারে চিঠি লিখলাম, "আব্বু আজ আমি অনেকগুলি বই মিটিংয়ে বিলি করেছি। বইয়ের নাম 'পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসন চাই'।" আব্বু তাঁর অতি সুন্দর মুক্তার মতো হস্তাক্ষরে চিঠির উত্তর দিলেন। তিনি জানালেন আমার বই বিলি করার সংবাদে তিনি খুশি হয়েছেন। (কারাগার থেকে লেখা আব্বুর সব চিঠি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বাসা থেকে বিনষ্ট হয়ে যায়।)

তারপর দেখতে দেখতে ১৯৬৭ সাল চলে এল। রোজার ঈদের আগের দিন আম্মা রাত জেগে মুরগির রোস্ট, কাবাব, পরোটা, জর্দা ইত্যাদি রান্না করলেন। এ ধরনের মজার খাবার রান্না হলেই বুঝতাম যে কারাগারে আব্বুর সঙ্গে দেখা করার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আম্মার হাতের অতুলনীয় খাবারে টিফিন কেরিয়ার বোঝাই করে কাক ডাকা ভোরে আমরা ছুটতাম ঢাকার ফুলবাড়িয়া স্টেশনে যেখান থেকে গ্রিনঅ্যারো রেলে চড়ে রওনা হতাম ময়মনসিংহের পথে। আমাদের ঈদের নতুন জামাকাপড় হয়নি, অথচ মনজুড়ে খুশির লক্ষ ফানুস উড়ছে। আমরা ঢাকার ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছি ময়মনসিংহে, যেন সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যাচ্ছি আশ্চর্য সুন্দর অজানা এক রাজ্যে যেখানে আব্বু পথ চেয়ে রয়েছেন আমাদের অপেক্ষায়। আম্মা রেলগাড়ির জানালা দিয়ে উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকতেন কোন সুদূরে। তাঁর কাঁধে তখন ঘর ও বাইরের সব দায়িত্ব এসে পড়েছে। তিনি সবকিছুই একাকী সামলাচ্ছিলেন তেজস্বী মনোভাব নিয়ে। একদিকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম, তিনটি শিশুর লালনপালন, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের সাহায্য-সমর্থন, রাজবন্দিদের পরিবারের খোঁজখবর, তাঁদের মুক্তির দাবিতে মিটিং, মিছিল, সমাজসেবা আবার লেখাপড়াও চালিয়ে যাচ্ছিলেন পূর্ণোদ্যমে।

আম্মার সংগ্রামী জীবনে বইছে যে কত ঝড়ের তাণ্ডব তা বোঝার বয়স তখনো আমাদের হয়নি। আমরা রেলগাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতাম উৎফুল্ল নয়নে। রিমি ও আমি রেলগাড়ির ঝমাঝম শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছড়া আবৃত্তি করতাম।

রেলগাড়ি ঝমাঝম,
পা পিছলে আলুর দম,
ইস্টিশনের মিষ্টি কুল,
শখের গোলাপ পারুল ফুল।

ময়মনসিংহে গিয়ে আমরা উঠতাম অ্যাডভোকেট জুলমত আলী খানের বাসায়। (পরবর্তী সময়ে বিএনপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ভুটান ও থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং সামরিক প্রশাসক, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদেশে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কর্নেল তাহেরের তিনি আইনজীবী ছিলেন।) তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাদের যথেষ্ট আদর করতেন। তাঁদের মেয়ে নীতার সঙ্গে আমরা খেলাধুলা করতাম। নীতার পোষা কালো ময়না পাখিটির ঠোঁট ছিল কমলালেবুর মতো উজ্জ্বল বর্ণের। আমাদের দেখলেই সেই ঠোঁট দুটি নেড়ে খনখনে গলায় শুধাত, 'কী গো কেমন আছ?' ছোট্ট শান্ত মনোরম শহর ময়মনসিংহ। তার চেয়েও আমাদের দৃষ্টিতে মনোরম ছিল ময়মনসিংহ কারাগারটি। কারাগারের সামনে ছিল বিশাল গাছপালায় ঘেরা বিরাট দিঘি এবং ভেতরে আব্বুর হাতে গড়া সূর্যমুখী ও গোলাপের বাগান।

কারাগারের জেলার ছিলেন অমায়িক মানুষ। নিয়মের ব্যতিক্রম করে ঈদের দিন কারাগারের ভেতরের বিশাল লোহার গেটটি খুলে দিলেন আমার আর রিমির জন্য। আম্মা ওয়েটিংরুমে বসে রইলেন আর আমরা উড়ন্ত প্রজাপতির মতো আনন্দের পাখায় ভর করে ছুটে গেলাম রাজবন্দিদের জন্য সংরক্ষিত গৃহটির সামনে। একটি টানা লম্বা টিনের চালা দেওয়া পাকা ঘরের মেঝেতে সারি সারি লোহার খাট পাতা, যার একটি আব্বুর শয্যা। সেখানে দেখা হলো মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, অজয় রায়, রফিকউদ্দীন ভুঁইয়া, মনোরঞ্জন ধরসহ বহু রাজবন্দির সঙ্গে। মুক্ত পৃথিবীর প্রতীক দুটো বাচ্চা মেয়েকে দেখে তাঁরা ভীষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের কোল থেকে কোলে আমরা দুবোন ঘুরতে থাকলাম। দুজন সিপাই আমাদের নিয়ে গেল আব্বুর কাছে তাঁর প্রিয় বাগানে। তিনি সে সময় একটি সাদা হাফহাতা গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরে বাগানের কাজ শেষ করছিলেন। জেলার সাহেব চমক দেওয়ার জন্য আমাদের ভেতরে আসার সংবাদটি আব্বুকে জানাননি। আব্বু আমাদের দুই বোনকে দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলেন। রাজবন্দিরা আমাদের জানালেন যে আব্বু একটি খোলা নর্দমাকে ভরাট করে এই সূর্যমুখী, গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকার বাগানটি করেছেন। সেই কত কাল আগের কথা ! আজ মনে হয় বাগানটি ছিল আব্বুর নির্মল চরিত্রেরই একটি সমুজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর জীবনের আরাধনাই ছিল মাটির কাছাকাছি হয়ে সব জঞ্জাল সাফ করে সৌন্দর্যের বীজ বুনে যাওয়া, দেশ ও দশকে অসত্য, অবিচার ও অন্যায়ের হাত থেকে মুক্ত করা।

শীতের রৌদ্রালোকিত নরম উষ্ণ অপরাহ্নে হাওয়ায় ভেসে আসা গোলাপের মিষ্টি সুবাসে মন মাতিয়ে স্বপ্নের বাগানের রচয়িতা আব্বুকে সেদিন যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম। আম্মার কাছে ফিরে যাওয়ার আগে আমরা দু'বোন রবি ঠাকুর রচিত 'আজি ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা যে ভাই লুকোচুরির খেলা' গানটির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচলাম। আব্বু ও বাকি সব রাজবন্দি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমাদের নাচ দেখলেন, গান শুনলেন। নাচ, গান ও পাখির মতো আমাদের কথাবার্তার কলকাকলি শেষ হওয়ার পর আব্বুর হাত ধরে আমরা দু'বোন ফিরে এলাম অপেক্ষাকক্ষে যেখানে আম্মা আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে রয়েছেন।

ঈদের ছুটির পর স্কুল খুলল। আমাদের শিক্ষয়িত্রী আপা ছাত্রীরা কে কেমন করে ঈদ পালন করেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। প্রায় সবাই বলল, তারা ঈদের ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে গোসল করে অতি সযত্নে লুকিয়ে রাখা নতুন জামাকাপড়-জুতো পরেছে। তাদের বাড়িতে রান্না হয়েছে পোলাও, কোর্মা, জর্দা, সেমাই ইত্যাদি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সেদিন ভিড় করেছে তাদের বাড়িতে। তারাও বেড়াতে গিয়েছে বাবা-মা'র সঙ্গে। শুধু একটি মেয়ে বলল, সে ঈদের আনন্দ করতে পারেনি কারণ তার সেদিন খুব জ্বর ছিল। আমার বলার পালা এলে আমি দাঁড়িয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বললাম, 'আমরা নতুন জামাকাপড় পরিনি। আমাদের বাসায় বন্ধু-বান্ধবও আসেনি। কিন্তু আমরা সেদিন খুব মজা করে ঈদ পালন করেছি আব্বুর সঙ্গে জেলখানার ভেতর।' আমাদের ব্যতিক্রমধর্মী বাবার কারণে আমাদের জীবনের একটি বিরাট অংশ যে ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে পড়ছিল তা আমি উপলব্ধি করতাম। আমার উত্তর শুনে আমার এক সহপাঠী জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আব্বু কি চুরি করেছে ?' রাজনীতি কী ? তার সঠিক সংজ্ঞা আমার জানা ছিল না। মনে মনে দুঃখ পেলেও যথাসাধ্য তাকে এবং কৌতূহলী অন্য সহপাঠীদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম আব্বু আমাদের সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করছেন। যাঁরা দেশের জন্য কাজ করেন তাঁদেরকে সরকার জেলে পুরে দেয়।

সেই ঘটনার কিছুদিন পর আমাদের শিক্ষয়ত্রী আপা জানালেন যে, অভাবী ছাত্রীরা আর্থিক সহায়তার জন্য পুয়োর ফান্ডের আবেদনপত্রে আবেদন করতে পারে। এ জন্য অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ ফরম পূরণ করে স্কুলে জমা দিতে হবে। ক্লাসে ফরম বিতরণ করা হলো। আমিও

একটি ফরম নিয়ে বাসায় ফিরলাম। ফরমটায় চোখ বুলিয়ে আম্মা বেশ হাসলেন। কৌতুক ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, আমরা গরিব ?' আমি বললাম, 'ঈদে আমরা নতুন জামা-কাপড় পাইনি, আব্বু জেলে, তাহলে তো আমরা গরিব ! আমার ক্লাসে ক'জন মেয়ে আমাকে সে কথাই বলেছে।' আম্মা বললেন, 'শোনো নতুন কাপড় পরলেই কেউ ধনী হয়ে যায় না। যার যতটুকু রয়েছে তার থেকে যে অকাতরে দান করতে পারে, সেই ধনী। তোমার আব্বু নিজের জীবনকে দান করেছেন দেশের জন্য। ক'জনের আব্বু অমন করে দান করতে পারে ?'

আম্মার সেদিনের আত্মপ্রত্যয় ভরা গর্বিত উক্তিটি আমার শিশুমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। অন্তরের ঐশ্বর্য যে বস্তু ও বিলাসসামগ্রী থেকে শ্রেষ্ঠ তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন এবং নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে আব্বুর অসাধারণ অবস্থানটিও তিনি তুলে ধরলেন আমার পৃথিবীর পথে পথ চলার উষালগ্নে। নিঃস্বার্থ দেশসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত আব্বুর যথার্থ জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন তিনি। এমন সবল চরিত্রের অনন্য সাধারণ বাবা-মায়ের সন্তান হতে পারার বিরল সৌভাগ্যই তো জীবনের এক অতুলনীয় প্রাপ্তি।

বাবা ও মায়ের জীবনসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ঢাকার উত্তপ্ত রাজপথকে আমি আবিষ্কার করি। একদল খুদে বন্ধুর সঙ্গে হাডুডু ও লুকোচুরি খেলার ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসে রাজপথের বিদ্রোহী শ্লোগান, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই...'। আতাউর রহমান খান তখন ছিলেন রাজবন্দি সাহায্য কমিটির চেয়ারম্যান এবং আম্মা সেই কমিটির আহ্বায়ক। একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত। নারী অধিকার আন্দোলনের সংগ্রামী ও নিবেদিত নারীনেত্রী কবি সুফিয়া কামাল, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম, মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, নূরজাহান মুরশিদ, নূরুন্নাহার সামাদ প্রমুখের সঙ্গে আম্মার আদর্শিক সখ্যতা গড়ে ওঠে নারীর অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। মহিলা পরিষদের সঙ্গে এভাবেই যুক্ত হয়ে যান তিনি। বাল্য ও কৈশোরে ঘোড়ার দৌড়, সাঁতার, সাইকেল প্রভৃতি খেলার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হতেন। রান্না, সূচিশিল্প ও বুননে পারদর্শী আম্মা আমাদের জন্য নিজ হাতে তৈরি করতেন চমৎকার পোশাক। হাওয়াই গিটারে তুলতেন মনোরম সুরের আলাপ। ছবি তুলতেন চমৎকার। হোমিওপ্যাথির ওপর ডিপ্লোমা নিয়ে তিনি বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করতেন। কুরআন তেলাওয়াতও করতেন অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ। আত্মিক ও জাগতিক গুণাবলির সমন্বয়ে আম্মার মধ্যে আত্মনির্ভরশীল, মমতালব্ধ, ত্যাগী ও সাহসী চেতনার এক বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আব্বু কারারুদ্ধ হওয়ার পর আম্মার সৃজনশীলতা আত্মপ্রকাশ করে ভিন্ন পথে, রাজপথের সংগ্রামে। (পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫ সালে জাতীয় নেতৃবৃন্দর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এই আম্মাই জাতির চরম দুর্দিনে, নেতৃত্বের মহা সংকটপূর্ণ সময়ে আহ্বায়িকা হিসেবে তাঁর জীবনসাথির প্রাণপ্রিয় দলটির হাল ধরেন। ত্যাগ ও সাহসিকতার সঙ্গে মৃত আওয়ামী লীগের পুনরুত্থানে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন। এমনকি যে সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনকালে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করতে মানুষ ভয় পেত, সেই দুঃসময় আম্মার নিঃস্বার্থ নির্ভিক নেতৃত্বেই সর্ব প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আর্মি পুলিশের বাধা সত্ত্বেও ৩২ নাম্বার রোডের সামনে প্রকাশ্য সভা করে ১৫ আগস্ট ১৯৭৭, বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নির্মম হত্যাকাণ্ডের দিনটি শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়।)

অম্লান সেই অতীতের এক গনগনে উত্তপ্ত উত্তাল সময়ে আমার কানে ভেসে আসে আগরতলা শব্দটি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাক্যটির সঙ্গে আগরবাতির কেমন একটা সম্পর্ক যেন খুঁজে পেতাম। মুজিব কাকু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামি, ব্যাপারটি সে সময় জানা হয়ে যায়। রাজনীতির অশান্ত জগৎটি তখনো আমার ভাবনার রাজ্য থেকে অনেক

দূরে। সে সময় দস্যু বনহুর সিরিজের বইগুলো লোভনীয় চকলেটের মতো আমি সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে গোগ্রাসে গিলছি। সহজ, সরল ভাষায় লেখা সিরিজগুলো আমাদের আট-নয় বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের দ্রুত পঠনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে চলছিল। যদিও সিরিজগুলো আমাদের মতো ছোট বয়সের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়নি। সে যুগে শিশু-সাহিত্যের সংখ্যা হাতেগোনা হলেও অবসরে বই পড়ার মতো সংস্কৃতিটি মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। দস্যু বনহুরও এমনি করেই আমাদের হাতে এসে পড়ে। দুর্বৃত্তের যম বনহুর নামের একজন মহৎ হৃদয় ও নির্মল চরিত্রের দস্যুর প্রতিকৃতি সহজেই আমাদের শিশুমনে আসন গেড়ে নেয়। একই সময়ে শিশু-সাহিত্যের মধ্যে হাশেম খান রচিত পরীর দেশে ফুলের বেশে, সাজেদুল করিমের চিংড়ি ফড়িং-এর জন্মদিনে, নাসির আহমেদের লেবু মামার সপ্তকাণ্ড ও মেঘমল্লার সংকলনের ভেতর রাহাত খান রচিত 'হাজার বছর আগে' গল্পটি আমাকে দারুণ মুগ্ধ করে।

রাহাত খান তাঁর এই মনোমুগ্ধকর রূপকথার গল্পটির মধ্য দিয়ে এক অপরূপ লাবণ্যময়ী শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ শ্যামল বাংলাকে মূর্ত করে তোলেন। সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাংলায় তাঁতি, মাঝি ও চাষিরা তাদের শ্রমের ফসল উপভোগ করে নির্ভয়ে। নারী ও পুরুষ পরস্পরের সঙ্গী হয়ে জীবনের ঐশ্বর্যকে বরণ করে নেয়। তারা গান গায়,

যখন আকাশে জ্বলন্ত বৃত্তিকারা পাক খায়
হরিণশিশু স্বপ্ন দেখে
সবুজ ঘাস।
আমরা তখন এক, দুই, তিন, চার ফিরছি
কী সুন্দর জীবনের এই
অপরূপ অবকাশ।

ঐ অপরূপ জীবনেও ঝড় আসে। আগ্রাসী সম্পদ লুণ্ঠনকারী ভিনদেশি রাজা স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা সবুজ বাংলাকে গ্রাস করে নেয়। শুরু হয় সংগ্রাম। জিৎ হয় শোষিতের। বাংলা হয় মুক্ত।

তথ্যসূত্র

১. Erikson, E.H (1950) in M.J.E. Sean (Ed) Symposium on the healthy personality. New York : Josiah Macy, Jr., Foundation, 1950, P.104
২. David R. Schaeffer. Developmental Psychology, Theory, Research and Applications. California : Wadsworth, Inc., 1985, P. 51-52
৩. আবদুল গাফফার চৌধুরী, 'একজন বিস্মৃত নেতার স্মৃতিকথা।' ঢাকা : যায় যায় দিন, ১১ জুন ১৯৮৫ পৃ. ৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৬. তাজউদ্দীন আহমদ, ৭ জুন মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মোড় পরিবর্তন। দৈনিক বাংলার স্টাফ রিপোর্টারের সাথে সাক্ষাৎকার, ৭ জুন ১৯৭২

দ্বিতীয় পর্ব

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তর্দৃষ্টি

রাজপথের সংগ্রামকে আমি আবিষ্কার করি গল্পে। আব্বুর কাছে লেখা আমার পরবর্তী সময়ে চিঠিতে ঐ বইগুলোর একটি তালিকাও দিই। আব্বুর উত্তরের অপেক্ষায় আমি দিন গুনতে থাকি। কারাগার থেকে চিঠি পৌঁছাতে সময় লাগে। নানা বিধিনিষেধ পেরিয়ে আব্বুর চিঠিটি একদিন আমাদের কাছে পৌঁছায়। খুব ছোট, মুক্তার মতো অক্ষরে সাজানো পরিপাটি চিঠিতে তিনি ব্যক্ত করলেন নিজেকে। আমার বইয়ের তালিকা পড়ে খুব খুশি হয়েছেন জানালেন। ছোটবেলায় তিনি ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করায় আরব্য উপন্যাসের 'আলীবাবা ও চল্লিশ চোর' বইটি পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন তাও লিখলেন। বাড়িতে অনেক পুঁথি ছিল। ছোটবেলায় তিনি সেই পুঁথি সুর করে পড়তেন—সোনাভানের গল্প, সয়ফলমুলুক বদিউজ্জামাল এবং গাজী-কালু ও চম্পাবতীর কাহিনি। কলেজে উঠে মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাসও তিনি পড়েছেন, সেগুলোরও নাম লিখলেন। কন্যার সঙ্গে বই পড়ার তালিকা বিনিময় করার পর জানালেন তাঁর উদ্বেগের কথা। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে পিপি এক অন্ধগলির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ফেরার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ওর একটি চোখ যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে চোখের নীরব ভাষায় কাকুতিমিনতি করে বলছে ওকে যেন একলা সেই অন্ধগলিতে ফেলে আমরা চলে না যাই। বাড়ির ভেতরের টানা খোলা বারান্দায় বসে আম্মা ও আমি যখন সেই চিঠি পড়ছি ঠিক সে সময় রাস্তা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে পিপি বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল। তার একটি চোখ রক্তাক্ত ও অন্য চোখটিতে ভয় ও বেদনামিশ্রিত আকুতি।

ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় তখন বিক্ষোভ ও হরতাল চলছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তি দাবি, ছাত্রনেতা আসাদ হত্যার (২০ জানুয়ারি '৬৯) বিচার দাবি এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসন ও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত সময় সেই উনসত্তর। ঢাকার রাজপথে সারি বাধা কৃষ্ণচূড়ার মতো লাল রঙের রক্ত বহানোর বছর সেটি। জোট বাঁধা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল ভাঙার প্রচেষ্টায় যানবাহনশূন্য রাস্তায় বিকট শব্দে এদিক থেকে সেদিক ছুটে যেত পাকিস্তানি সেনাদের জিপ। সেই জিপগুলোর গতি নিশ্চল করার জন্য সংগ্রামী জনতা ব্যারিকেড ফেলে রাখত। আবার অদৃশ্য থেকে ঢিল-পাটকেলও ছুটে যেত ঐ জিপ গাড়ি লক্ষ্য করে। ঐরকম কোনো ঢিলই বোধহয় পিপির চোখে লেগেছিল। কারাগারের অন্তরাল থেকে আব্বু কেমন করে দেখলেন এই ভবিষ্যৎকে, কে জানে ! তবে ভালোবাসার চোখ যে অন্তর্ভেদী এবং স্রষ্টার সকল সৃষ্টির সঙ্গেই যে হতে পারে আত্মিক যোগাযোগ, এই ধারণাটি ঐ ঘটনা থেকে আমার মনে গেঁথে যায়। পিপি তার কিছুদিন পরই মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়ে পশু হাসপাতালে মারা যায়।

উনসত্তর সালের বারোই ফেব্রুয়ারি, পড়ন্ত বিকেলে বাগানের উড়ন্ত প্রজাপতির পেছনে ছুটে চলেছি। ঠিক এমনি সময়ই আমাদের বাড়ির সামনের পোর্চের নিচে একটি বেবিট্যাক্সি এসে থামল। বেবিট্যাক্সি থেকে যিনি নামলেন তিনি আমাদের সেই আশ্চর্য রহস্যময় আব্বু। শেষ বিকেলের সোনালি রোদের অভিবাদন সারা শরীরে জড়িয়ে আব্বু ঘরে ফিরে এলেন।

এর পরের অধ্যায় এক সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রমের ইতিহাস। এই ইতিহাসের এক উজ্জ্বল চরিত্র এবং শঙ্কাকুল মুক্তিযুদ্ধের নায়ক আমার আব্বু। তাঁর কাহিনিতে ভরা গল্পের ঝুলি। উনসত্তরের এই নতুন অধ্যায়ে এসে আমার পিতা তাজউদ্দীন হারিয়ে গেলেন নেতা তাজউদ্দীনের বলিষ্ঠ আবির্ভাবে।

অজস্র জনতার ভিড়ের মাঝে হঠাৎই আব্বুর দেখা পেতাম কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

আব্বু মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরই আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হন কেরামত আলী নামের লম্বা চওড়া ও মস্ত গোঁফওয়ালা মিশমিশে কালো বর্ণের এক ব্যক্তি। জমিজমাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ কৃষক কেরামত আলীর সঙ্গে তার প্রতিবেশীর তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা গড়ায় হাতাহাতিতে এবং প্রতিবেশীর দা-এর কোপ এড়াতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কোপ দিয়ে হত্যা করে বসে সে প্রতিবেশীকে। তারপর কারাবাস। দীর্ঘ এক যুগ সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর সে সদ্য খালাস পেয়ে সোজা চলে এসেছে আমাদের বাড়িতে। কারাগারে সে রাজবন্দিদের দেখাশোনা করত। আব্বু মুক্তি লাভের সময় তাঁকে আমাদের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলেন। গ্রামে সরাসরি ফেরত যেতে কুণ্ঠিত, অনুতপ্ত কেরামত আলীর আশ্রয় মিলল আমাদের বাড়িতে। আব্বু তাঁকে নিজ হাতে ধরে শেখালেন বাগানের কাজ। দাগি আসামি কেরামত আলী রূপান্তরিত হলো আমাদের ফুলবাগানের মালিতে। খুরপি দিয়ে জমি নিড়াতে নিড়াতে সে তার গল্পের ঝুলি থেকে আমাকে ও রিমিকে উপহার দিত হরেক রকমের গল্প। তিন বছরের ছোট্ট মিমিকে কোলে করে আমি আর রিমি গোগ্রাসে গিলতাম সেই সব আজগুবি কল্পকাহিনি। কেরামত আলীর আগমনের মধ্য দিয়েই আব্বুর জীবনদর্শন সম্বন্ধে আরও একটি পরিচয় ঘটে। তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত অপার সম্ভাবনার প্রতি প্রচণ্ডভাবেই আস্থাশীল ছিলেন। একজন অপরাধী তার আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে দিয়েই বিবর্তিত হতে পারে মানব উন্নতির উচ্চসোপানে। এবং সে জন্য প্রয়োজন মানুষ ও সমাজের সার্বিক সহায়তা। আব্বু তাঁর ব্যক্তিজীবনের নিভৃত কর্মকাণ্ডে সেই বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করেছিলেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সদ্যমুক্ত মুজিব কাকুর সঙ্গে আব্বু। ১৯৬৯

আব্বু কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমাদের বাড়ি আবারো সরগরম হয়ে উঠল। এরই মধ্যে কারাগার হতে মুক্তি পাওয়ার মাত্র ৬দিন পরেই, ১৮ ফেব্রুয়ারি আব্বু রওয়ানা দিলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির পথে। রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তুতি কমিটির সভায় যোগ দিতে। গোলটেবিল বৈঠকে পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা ভবিষ্যৎ নির্বাচনের পরিকল্পনা ও শাসনতন্ত্রের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করবেন। রাওয়ালপিণ্ডির পথে রওয়ানা দেবার আগে আব্বু ঢাকায় কুর্মিটোলার সেনানিবাসে কারাবন্দী, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি মুজিব কাকুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি প্রস্তুতি কমিটির সভায় যোগ দিতে যাচ্ছেন মুজিব কাকুর ইচ্ছানুযায়ী ও তাঁর প্রতিনিধি হয়ে। এই সভায় যোগদানের নেপথ্য ইতিহাস হলো যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রসঙ্গে মুজিব কাকুর সাথে যখন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের কারাগারে সাক্ষাৎ হয়, তখন আমীর-উল ইসলাম বলেছিলেন যে নিঃশর্তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে না নিলে গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগ যোগদান করবে না, এই প্রস্তাবটি প্রস্তুতি কমিটিতে উত্থাপন করা যায়। পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ও গোলটেবিল বৈঠকের সমন্বয়কারী নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানও বলেছেন যে ঐ প্রস্তাব কমিটিতে আনতে বাধা নেই।[১] (উল্লেখ্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগই ছিল মূল ও পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব দানকারী সে সময়ের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। সে তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল খুবই সীমিত) কথাটি শুনে মুজিব কাকু বললেন, 'যে দলের প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারি দুজনেই জেলে, তাদেরকে বাদ দিয়ে কী করে গোলটেবিল বৈঠক হতে পারে ?' তিনি এই প্রশ্নটি উত্থাপন ও আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব বাদে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের গোলটেবিলে যোগদানের অযৌক্তিকতা ও অসারতা যুক্তি ও প্রজ্ঞার সাথে তুলে ধরার জন্য একজন প্রতিনিধি পাঠাবার কথা বললেন। তারপর একটু চিন্তা করে বললেন 'দলের মধ্যে একজনই রয়েছে যে রাওয়ালপিণ্ডিতে দলের সুযোগ্য প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। সে হলো তাজউদ্দীন। যদি তাজউদ্দীন জেল থেকে ছাড়া পায়, সেই এই কাজটি করতে পারবে।' আমীর-উল ইসলাম লক্ষ করলেন যে আব্বুর মেধা, যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার প্রতি মুজিব কাকুর রয়েছে পরম আস্থা। তারপর মুজিব কাকুর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের সাথে দেখা করলেন। তিনি তখন ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের পথে রওয়ানা দেবেন। আমীর-উল ইসলাম তাকে মুজিব কাকুর মেসেজটি পৌঁছে দিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাবশালী এই রাজনীতিবিদ (আইয়ুব খানের সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী রাজনীতিবিদদের অন্যতম, পাঠান বংশদ্ভূত নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালের জুন মাসে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন।) সাথে সাথেই কয়েক জায়গায় ফোন সেরে আমীর-উল ইসলামকে বললেন, 'আপনি এক ঘণ্টা পরে তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে তার বাসায় সাক্ষাৎ করুন।' প্রস্তুতি কমিটির মিটিং এ 'impressive ও convincing ভাবে' (ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের ভাষায়) আব্বু তার দল ও মুজিব কাকুর প্রতিনিধিত্ব করলেন। তিনি প্রশ্ন তুললেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বাদে গোলটেবিল বৈঠকের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে। তিনি নিঃশর্তে তার মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপন করলেন। মুজিব কাকু অবশেষে, আব্বুর কারা মুক্তির দশ দিন পর ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেলেন।

রাস্তায় জনতার উৎফুল্ল শ্লোগান, 'জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি'। গণ-আন্দোলনের চাপে ও সঠিক রাজনৈতিক চিন্তা ও পদক্ষেপের কারণে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিনা শর্তে প্রত্যাহার হওয়ার পর রাজনৈতিক মঞ্চে মুজিব কাকুর পুনরায় আবির্ভাব বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু হিসেবে। এই সময়টিতে তিনি আমাদের বাড়িতে ঘন

ঘন আসতেন। আব্বুর সঙ্গে আলাপ-পরামর্শ করেই তিনি দলীয় প্রধান হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করতেন। আব্বুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ওপর মুজিব কাকুর গভীর আস্থা ছিল। আম্মাকে তিনি ছোট বোনের মতোই স্নেহভরে লিলি (আম্মার ডাক নাম) বলে সম্বোধন করতেন। আব্বু ঘুমাতেন খুব কম এবং প্রায়ই রাত জেগে দলীয় বিবৃতি এবং সূক্ষ্ম রাজনৈতিক পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন করে প্রাঞ্জল ভাষায় ঢেলে সাজাতেন। আব্বুর খাটুনির মাত্রা বেশি হলেই মুজিব কাকু গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আম্মাকে বলতেন, 'লিলি, তাজউদ্দীনের দিকে খেয়াল রেখো, ওকে ছাড়া কিন্তু সব অচল।' তিনি যখন আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন আমি ও রিমি মুজিব কাকু বলে দৌড়ে তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। মুজিব কাকু আমাদের সঙ্গে টুকিটাকি কথা বলতেন এমন উষ্ণ স্বরে যে ওনাকে ভালো না বেসে পারা যায় না।

নিজ দলের নেতা ও কর্মীবৃন্দ ছাড়াও আমাদের বাড়িতে অন্যান্য দলের নেতা ও কর্মীদেরও সমাগম হতো। আম্মা ট্রেতে চা-নাশতা সাজিয়ে দিতেন আর রিমি ও আমি উৎসাহভরে সেগুলো পরিবেশন করতাম। কাজের লোকের বদলে প্রায় সময়ই এই দায়িত্বটি আম্মা আমাদের ওপরই তুলে দিতেন। চা-নাশতা পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকেই আমাদের পরিচয় ঘটে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ, মোজাফফর আহমদ, নেজামি ইসলামী পার্টির নেতা মৌলবি ফরিদ আহমেদ প্রমুখের সঙ্গে। ফরিদ আহমেদের মেয়ে জাকিয়া ছিল আমাদের খেলার সাথি। আব্বুর যুগের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে ব্যক্তিগত সৌজন্য সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণে কখনোই ছেদ পড়েনি।

কোরবানির ঈদ বোধ হয় এল ফেব্রুয়ারির শেষ বা মার্চের শুরুতে। নানা কোরবানি ঈদ উপলক্ষে একটা খাসি কিনে আনলেন। জামাতার জেল মুক্তির আনন্দে তিনি উৎফুল্ল। আব্বুকে নিয়েই খাসিটি কোরবানি দেবেন ঠিক করলেন। কিন্তু খাসি জবাইয়ের সময় আর আব্বুকে খুঁজে পেলেন না। আমাকে বললেন আব্বুকে খুঁজতে। আমি সারা ঘর খুঁজেও আব্বুকে পেলাম না। তারপর ছাদে গেলাম। সেখানেও আব্বু নেই। তারপর কী মনে করে ছাদের পানির ট্যাংকের পেছনে উঁকি দিয়ে দেখি আব্বু সেখানে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে মাটিতে বসে রয়েছেন। যেন লুকোচুরি খেলা খেলতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, এমনি সকাতর নয়নে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ব্যথিত স্বরে বললেন, 'আমি ছোটবেলা থেকেই পশু-পাখির জবাই দেখতে পারি না।' নানা শেষ পর্যন্ত জামাতাকে না পেয়ে অন্যদের নিয়ে খাসিটি কোরবানি দিলেন।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ। আমাদের দোতলা বাড়ির ভাড়াটিয়া শহীদ সাহেব টিভিতে খবর দেখছিলেন। খবর দেখে দোতলার বারান্দা হতে নিচতলায় আম্মার উদ্দেশে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন 'ভাবি জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাওয়ার নিয়ে নিয়েছে।' প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের তোড়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বাধ্য হলেন পদত্যাগ করতে। অশুভতর আরও ভয়াবহ জঙ্গিবাদী জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছেই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই, আইয়ুব খানের মতোই, ইয়াহিয়া খানও নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পর, উনসত্তরের কোনো একদিন (যতদূর মনে পড়ে মধ্যাহ্নের সময়) আমাদের ধানমণ্ডি স্কুলে এলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, ছাত্রলীগের উদ্যমী অ্যাকটিভিস্ট রাফিয়া আখতার ডলি (১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র ২৬ বছর বয়সে, আওয়ামী লীগ দল হতে সাংসদ নির্বাচিত হন), তাঁর সাথে আরও অনেক বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীর দল। স্কুলের বড় আপা ও ছোট আপার নিষেধে কাজ হলো না। স্কুলের বাইরে তরুণদের উত্তপ্ত শ্লোগান চলতে থাকল। মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তান সরকারের জোর জুলুমের প্রতিবাদে স্কুল বন্ধের আহ্বান জানান হলো। কেউ কেউ শ্লোগান দিল, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১ নম্বরের বেহাইয়া।'

শেষপর্যন্ত নাছোড়বান্দা রাফিয়া আখতার ডলি ও আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী স্কুলের ভেতরে ঢুকলেন। তিনি আমাদের স্কুলের পেছনের মাঠে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। পুরো স্কুল ভেঙে পড়ল তাঁর ভাষণ শুনতে। তিনি বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের বাজার মাত্র। পূর্ব পাকিস্তানে চালের মণ ৪০ টাকা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ টাকা। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন করেই পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাষকগোষ্ঠী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এই দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে হবে। তিনি সেদিন বটতলার সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের আহ্বান জানালেন। আমি মাঠের পাশের লাগোয়া নিচতলার ক্লাসের খোলা জানালায় বসে মুগ্ধ চিত্তে তাঁর ভাষণ শুনছি। ভাষণ শেষ হবার পর তিনি বললেন স্কুলে গণআন্দোলনের পক্ষে প্রতিনিধি থাকতে হবে। উৎসাহী অনেকের সাথে আমিও হাত তুললাম। প্রাইমারি ক্লাসগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আমাকে বানালেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, অপর এক ছাত্রীকে বানালেন প্রেসিডেন্ট। উচু ক্লাসগুলো হতেও প্রতিনিধি মনোনীত করা হলো। তিনি বা তাঁর সাথের কেউ একজন এবার ঘোষণা দিলেন, 'তোমাদের মধ্যে সাহসী কে যে স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজাবে।' ব্যাস আর যায় কোথায়। দুঃশাসনের প্রতিবাদে ঘণ্টা বাজাবার চাইতে স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হবে এই আনন্দে আমার সাথে ছুট দিল আরও কয়েকজন। যতদূর মনে পড়ে, উঁচু ক্লাসের এক ছাত্রী ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। দপ্তরি হা হা করে তেড়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে স্কুলের বিশেষত উঁচু ক্লাসের অনেক ছাত্রীই বটতলার সভায় যোগদানের জন্য প্রস্তুত।

উনসত্তরের ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় আমাদের গ্রামের বাড়ি দরদরিয়া থেকে সংবাদবাহক বয়ে আনল এক মর্মান্তিক সংবাদ—দাদি মেহেরুননেসা খানম ইহলোক ত্যাগ করেছেন। পরদিন ১৯ আগস্ট রিমির জন্মদিন উপলক্ষে আমরা বেলুন দিয়ে ঘর সাজাচ্ছিলাম। দাদির মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাড়িতে নেমে এল শোকের ছায়া। আব্বু সেদিন ঢাকার বাইরে রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঢাকায় ফিরে দরদরিয়া যাওয়ার জন্য রেলস্টেশনের পথে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে আমি।

রেলস্টেশনে আনার আপা ও ছোট কাকুও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি চলছে। যেন আমাদের শোকাহত মনের সঙ্গে প্রকৃতিও তাল মিলিয়েছে। গভীর রাতে আমরা পৌছলাম শ্রীপুর রেলস্টেশনে। চারদিকে ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ এবং প্রায় জনমানবশূন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন আশপাশ মিলে এক ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সেই ঝড়ঝঞ্ঝাপূর্ণ গভীর রাতে কোনো রিকশা বা গরু-মহিষের গাড়ি পাওয়া গেল না। যানবাহনের জন্য ভোররাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আব্বু এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে নারাজ। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পাঁচ মাইল পথ আমরা হেঁটেই পাড়ি দেব।

ঝড়বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত লালমাটির পিচ্ছিল পথটি পাড়ি দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আমি বারবারই পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম। আব্বু আমার হাতটি শক্ত করে ধরে শেখালেন কী করে পায়ের আঙুলগুলো সামান্য মুড়ে মাটিকে খামচে পিচ্ছিল মেঠো পথে হাঁটতে হয়। আব্বুর হাতে হাত রেখে তাঁরই দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতি মতো জুতো খুলে খালি পায়ে একটু একটু করে সম্মুখে এগোতে থাকলাম। শাল গজারি বনের ওপর যখন ভোরের প্রথম আলো পৌছাল শীতলক্ষ্যার জল প্রভাতী সূর্যের কিরণে ঝলমল করে উঠল, আমাদের ক্ষুদ্র কাফেলাটিও তখন পৌছল তার গন্তব্য স্থলে দাদিকে শেষ বিদায় জানাতে। লাল মাটি ও টিনের চাল দিয়ে তৈরি দক্ষিণ ও পশ্চিমের দুটি কোঠাবাড়ি। পশ্চিমের কোঠাবাড়িতে আব্বুর জন্ম। এবং দক্ষিণের কোঠাবাড়ির ঘরে দাদির শেষ শয্যা। মাত্র নয় মাস আগেই দাদির প্রিয় সঙ্গী নানির পরলোক যাত্রা ঘটে। নানি অসুস্থ হওয়ার আগের রাতে আমাকে সন্ধ্যাতারা নামের এক রাজকন্যার গল্প বলেছিলেন। এক সন্ন্যাসীর উপদেশ অনুযায়ী সন্ধ্যাতারার রাজ্যের উত্তরে যাওয়া নিষেধ ছিল। সেই নিষেধ উপেক্ষা

করে কৌতূহলী কিশোরী রাজকন্যা গোপনে পথ পাড়ি দেয় উত্তরের দিকে। এইটুকু বলে নানি থামেন। 'তারপর ?' নানির পাশ ঘেঁষে আগ্রহে আমি প্রশ্ন করি। নানি বলেন, 'আজ রাতটুকু এই পর্যন্ত থাক, বাকিটুকু কাল শোনাব।' আগামীকালের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ঘুমের রাজ্য পাড়ি দিই। সেই প্রতীক্ষিত আগামীকালটি আর কোনো দিনও আসে না। পরদিন নানি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করলে আব্বুকে কারাগার থেকে দুই ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি প্রদান করা হয় নানিকে দেখার জন্য। বাড়িভর্তি মানুষজন ও অস্ত্রধারী পুলিশ পরিবেষ্টিত আব্বু নানির শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন মৌন তাপসের মতো।

নভেম্বর মাসের চার তারিখে মধ্যাহ্ন বেলায় নানি পরলোকে পাড়ি জমান। নানি মারা যাওয়ার পর তাঁর বলা সেই অর্ধসমাপ্ত গল্পটিকে আমি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করি বিভিন্ন রকম উপসংহার টেনে। কোনোটাই মনঃপূত হয় না। বড় হওয়ার পর এই উপলব্ধি হয় যে, জীবনটাই যেন কোনো এক অর্ধসমাপ্ত গল্প, যার শেষ কোনো দিনও জানা হবে না। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও না।

দাদির শেষ শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বিস্ময় ও বেদনায় হতবাক আমি বারবারই খুঁটিয়ে দেখছিলাম চিরঘুমন্ত দাদিকে। এক ফুঁৎকারেই কী করে এই তেজোদীপ্ত প্রাণ নিভে যেতে পারে ! নানির মৃত্যুর পর দাদি প্রায়ই বলতেন তাঁরও বিদায় নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর কথার মর্ম তখনো আমরা বুঝিনি।

দাদিকে ধরে আব্বু কাঁদলেন ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু কর্তব্যপালনে থাকলেন সজাগ। দাদির জন্য কবর খোঁড়া, তাঁর জানাজা থেকে শুরু করে সমাধিস্থ করা পর্যন্ত সবকাজেই তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন। আমবাগানে ছাওয়া বৃষ্টিতে স্নাত দূর্বাঘাসের আচ্ছাদনে ঢাকা পারিবারিক গোরস্তানে দাদা মৌলবি মুহাম্মদ ইয়াসিন খানের কবরের পাশেই দাদির শেষ শয্যা রচিত হলো। আমার জীবনের প্রথম দেখা এই কবর খোঁড়া ও কবরের গহিনে প্রিয়জনের হাতে প্রিয়জনকে শায়িত করার দৃশ্যটি মনে গেঁথে রইল নানির রেখে যাওয়া অসমাপ্ত সন্ধ্যাতারার গল্পটির মতো।

দাদিকে কবর দেওয়ার পর আব্বু দাদির ঘরটির সামনে বসে অঝোরে কাঁদলেন। এই ঘরটিতেই ডাকাতরা যখন দাদার মাথা লক্ষ্য করে কুড়ালের কোপ বসাতে যায় তখন দাদি হাত বাড়িয়ে কুড়ালটি ধরে ফেলেছিলেন। এর ফলে তাঁর হাতের মাঝখানের আঙুলটি টুকরা হয়ে পড়ে যায়। দাদা প্রাণে বেঁচে যান।

ছোট ছোট লাল মাটির টিলা, বিশাল গড়, শাল ও গজারির বনে ঘেরা এই এলাকায় সেকালে বাঘের উপদ্রব হতো। আব্বুর দাদা ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন বাঘ শিকারি। একবার বাঘ শিকারের সময় ঘাপটি মেরে থাকা আহত বাঘ হঠাৎই তাঁর গায়ে ঝাঁপ দিয়ে ১৭টি কামড় দেয়। বাঘের কামড়ের বিষক্রিয়া তাঁর সারা শরীরের ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সাতদিন পর তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরও বাঘের সম্পর্কে আমার দাদির কোনো ভয়ডর ছিল না। তিনি মশাল জ্বেলে বাঘ তাড়াতেন।

একবার গভীর রাতে গরু-ছাগলের খোঁয়াড়ে বাঘ হামলা চালায়। দাদি সবার আগে ছুটে যান বাঘের হাত থেকে গরু-ছাগল বাঁচাতে। শুকনা পাটখড়ি ও ডাল পালার জ্বলন্ত মশাল হাতে দাদিকে ধেয়ে আসতে দেখে বাঘ চম্পট দেয়। আব্বু ছিলেন এমন দুর্দান্ত সাহসী মায়েরই সন্তান। দাদির স্মৃতিচারণা করে আব্বু সেদিন বললেন, 'মায়ের প্রচণ্ড উৎসাহ ছাড়া আমার লেখাপড়া সম্ভব ছিল না।' আরবি ও ফারসি শিক্ষায় শিক্ষিত দাদা ছিলেন ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের ইংরেজি শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী। গৃহে প্রতিষ্ঠিত মক্তবে দাদার কাছে আরবি ও ধর্মীয় শিক্ষা

সমাপ্ত করার পর দাদির ঐকান্তিক প্রয়াস ও ইচ্ছায় আব্বুকে ভর্তি করা হয় ভুলেশ্বরের প্রাইমারি স্কুলে। জন্মস্থান দরদরিয়া গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরের কাপাসিয়া মাইনর ইংরেজি (এম.ই) স্কুলে পড়ার সময় তিনজন ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বিপ্লবী নেতার সান্নিধ্যে তিনি আসেন। এই তিন বিপ্লবী বীরেশ্বর ব্যানার্জি, মণীন্দ্র শ্রীমানী ও রাজেন্দ্র নারায়ণ চ্যাটার্জি আব্বুর মেধা ও চারিত্রিক গুণাবলিতে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তাঁদের সুপারিশে তিনি কালীগঞ্জের সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। উল্লেখ্য, আব্বু কিশোর বয়সেই ধূমপান ও নেশা পানের অপকারিতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস নেন ও সমাজসেবার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আব্বু কুরআন চর্চাও অব্যাহত রাখেন এবং কুরআনে হাফেজ হন। একসময় গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করে ভর্তি হন ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুলে। ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থান লাভ করা সত্ত্বেও সমাজসেবা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার কারণে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সময় মতো দিতে পারেননি। মেধাবী পুত্রের নিয়মিত লেখাপড়ায় ছেদ পড়েছে দেখে দাদি ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। দলের কাজে নিবেদিত আব্বু সে বছরও পরীক্ষা দেবেন না বলে মনঃস্থির করেছিলেন। কিন্তু দাদির দৃঢ় ইচ্ছার কাছে তিনি হার মানলেন। পুত্রের লেখাপড়ার বিষয়টি যে তাঁর কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যক্ত করলেন এভাবে। আব্বুর হাতে একটি রামদা ধরিয়ে দিয়ে দাদি বললেন, আব্বু যদি সে বছর পরীক্ষা না দেন তবে এই দা দিয়ে দাদিই নিজেকে কতল করবেন। মাতৃভক্ত আব্বুর এরপর পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। ১৯৪৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান লাভ করে তিনি দাদির মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে ভালো মা দাও, আমি তোমাদের ভালো জাতি উপহার দেব'। একজন ভালো মা পেতে হলে প্রয়োজন পরিবার ও সমাজের সহায়তা। নারীর আত্মনির্ভরশীল চিন্তা ও চেতনার বিকাশে সহায়ক সমাজেই সৃষ্টি হতে পারে মানুষ গড়ার কারিগর সুদক্ষ মা ও সুন্দর সন্তান। শাল-গজারির বনে ঘেরা গ্রামে বড় হওয়া দাদির মতো অগ্রগামী চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন দৃঢ়চেতা সাহসী মায়ের দেওয়া অনন্য উপহার ছিল আব্বুর মতো বিশাল হৃদয়ের অকুতোভয় সংগ্রামী, ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক।

দাদি মারা যাওয়ার কয়েক মাস পর আমাদের একমাত্র ভাই জন্ম নিল ১৯৭০ সালের ৫ জানুয়ারি। সেদিন বেলা দুটায় আমাদের ধানমণ্ডির বাড়ির নিচতলার বন্ধ ঘরটি থেকে ভেসে আসে নবজাতকের চিৎকার। ওই ঘরটির জানালা ছিল আমাদের ফুল বাগানের দিকে মুখ করা। সেই জানালার নিচের বাগানে বসে সাদা হাফহাতা গেঞ্জি ও চেক লুঙ্গি পরিহিত আব্বু খুরপি দিয়ে মাটি নিড়াচ্ছিলেন। গোলাপ, কসমস, জিনিয়া, সুইটপি, ডালিয়া প্রভৃতি রংবেরঙের মৌসুমি ফুলে ভরা বাগানের পরিচর্যারত আব্বুকে তাঁর একমাত্র পুত্র জন্মাবার সংবাদটি আমিই সর্বপ্রথম পৌঁছে দিই। তিনি খুরপি মাটিতে রেখে ঝলমলে হাসিভরা মুখ নিয়ে নবজাতককে দেখতে ঘরে প্রবেশ করলেন। আব্বুর ছেলে হওয়ার খুশিতে মুজিব কাকু সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ অফিসে উপস্থিত সব নেতা ও কর্মীকে মিষ্টি কিনে খাওয়ালেন। এদিকে বাড়িভর্তি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আব্বুকে অনুরোধ করলেন মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য। তিনি অভিমান ভরা স্বরে বললেন, তাঁর তিন নম্বর মেয়ে যেদিন হলো সেদিন কেউ কেউ হতাশ হয়েছিল। তিনি সেদিন মিষ্টি কিনে সবাইকে খাইয়েছিলেন। আজ যখন ছেলে হওয়াতে তাঁরা এতই খুশি তখন তাঁরাই যেন মিষ্টি কিনে খাওয়ায়। আব্বু যখন সত্যিই কোনো মিষ্টি কিনলেন না তখন আমাদের ছোট মামা সৈয়দ গোলাম মাওলা মিষ্টি কিনে আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

নবজাতকের ডাক নাম কী রাখা হবে তা নিয়ে আমাদের বাসায় জল্পনা-কল্পনা চলছে। তখন বাংলা নামের প্রতি সকলের আকর্ষণ বেড়েছে। আমি কারো কারো প্রস্তাবিত নাম নিয়ে 'নামের বিভ্রাট' একটি মজার ছড়া লিখে ইত্তেফাকের কচিকাঁচার আসরে পাঠিয়ে দিলাম।

আমার একটি ভাই হলো
রাখব কী তার নাম
ভাবছি বসে তাই।
ভালো যদি নাম পেয়ে যাই
আর ভাবনা নাই।
আম্মা বলেন, রাখব আমি তাপস
আমি বলি, যদি হয়ে যায় সে
জুতা মোছার পাপোশ !
আনার আপা বলেন
রাখব আমি অমি
আমি বলি যদি হয়ে যায় সে
পাশের বাড়ির টমি।

(অংশবিশেষ)

আমার কাঁচা হাতের ছড়াটি নিয়ে যখন বাড়িতে হাসির হুল্লোড় চলছে, সেই সময়ই আমার গল্পভাণ্ডারের ভেতর থেকে প্রতিভাদীপ্ত কিশোর গোয়েন্দা সোহেলের নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে ছোট ভাইটিকে সোহেল নামে ডাকা শুরু করলাম। রিমি আর মিমিও আমার সঙ্গে তাল মেলাল। বড়দের ভেটো দিয়ে আমার ভাইয়ের সোহেল নামটি চালু হয়ে গেল।

ছোট ভাই সোহেলকে নিয়ে আমরা তিন বোন বেশ মেতে থাকলাম। কিছুদিন পর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলো। আব্বু ব্যস্ত তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে, আর আমরা ব্যস্ত সোহেলকে নিয়ে। এই সময় এক দুর্ঘটনা ঘটল। অক্টোবর মাসের কোনো একদিন আম্মা বারান্দা থেকে তাড়াহুড়ো করে নিচের লনে নামার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেন। আব্বুর কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তার এম.এ করিম, আমাদের প্রিয় পারিবারিক চিকিৎসক সদা হাস্যময় করিম কাকু আম্মার পায়ে দক্ষতার সাথে এবং সুন্দর করে প্লাস্টার করে দিলেন।

নির্বাচনী প্রস্তুতির শত ব্যস্ততার মধ্যেও আব্বু আম্মার পরিচর্যার দিকে খেয়াল রাখতেন। আব্বুর সাথে আমি প্রায়ই চলে যেতাম ধানমণ্ডির ২৭ নম্বর রোডে হাড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ওমর জামিলের বাসভবনস্থ চেম্বারে। আব্বু তাঁকে আম্মার অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করতেন এবং আম্মার ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেন। আম্মাকে দেখানোর জন্য ডাক্তার ওমর জামিলকে সাথে করে অনেক সময় আমরা বাড়ি ফিরতাম। এরই মধ্যে নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে এল। চারদিকে আনন্দমুখর পরিবেশ। ঠিক তখনই জাতীয় দুর্যোগ। ১২ই নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে দশ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের চরম অবহেলা ও বাঙালির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রকট হয়ে ওঠে এই মর্মান্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে। আব্বু ও মুজিব কাকু তখন চরকির মতো দুর্গত এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষকে সাহায্য করছেন। সঙ্গে গোটা আওয়ামী লীগই তখন পালন করছে বিকল্প সরকারের ভূমিকা, যোগ্যতা ও আন্তরিকতা সহকারে। তখন কিছু মানুষ আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। আম্মা তাঁর পায়ে বাঁধা অতিকায় প্লাস্টারটি নিয়েই ক্রাচে ভর দিয়ে সহায়-সম্বলহীন উদ্বাস্তুদের তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হাঁটুর নিচের (টিবিয়া বোন) দুই টুকরো হয়ে যাওয়া হাড়টি জোড়া লাগতে অনেক সময় নেয়।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণে নির্বাচনের তারিখ কিছুদিন পিছিয়ে যায়। নির্বাচন আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি না তা নিয়ে দেখা যায় সংশয়। শেষ পর্যন্ত সেই নির্বাচন পুনর্নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরিবেশটি ছিল আনন্দমুখর। উৎসবমুখর এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আপামর মানুষ তখন প্রচণ্ড আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্নকে লালন করেছে। নির্বাচনে ৬ দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পরও পাকিস্তানের সামরিক সরকার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার পূর্ব-প্রতিশ্রুতির ওপর কুঠারাঘাত করে বেছে নিল গণহত্যার পথকে। এরপর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো শরিক হলো ষড়যন্ত্রে।

পাকিস্তানের সামরিক সরকার একাত্তরের ৩ মার্চ পূর্ব-নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করল ভুট্টোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এতে সারা দেশ ফেটে পড়ল স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে। অথচ তখন পর্যন্ত জনগণের আশা ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে।

সে সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসাধারণ কার্যকারিতার সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়। বাঙালির প্রাণের দাবি মেটাতে এই ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের মূল নীতি-নির্ধারক ও সংগঠক হিসেবে আব্বু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এদিকে ৬ মার্চে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত রেডিও ও টেলিভিশনের ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ ও অখণ্ডতা ধ্বংসের অভিযোগ আনেন। সেই সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের মূল নেতৃবৃন্দ যারা 'হাইকম্যান্ড' হিসেবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা মুজিব কাকুর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে এক সভায় মিলিত হন। ৭ মার্চের জনসভা, যা ইয়াহিয়া খানের ভাষণের আগেই নির্ধারিত হয়েছিল সেটিকে অপরিবর্তিত রেখে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

মুজিব কাকুর নিজস্ব ভাষা ও বাচনভঙ্গির মধ্য দিয়েই আব্বুর লিখে দেওয়া মূল পয়েন্টগুলো ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।[২] আম্মা ও রিমির সঙ্গে রেসকোর্সের ময়দানে শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ঐতিহাসিক ভাষণটি শোনার সৌভাগ্য আমারও হয়। মুজিব কাকু তাঁর তেজোদীপ্ত আবেগময় ভরাট গলায় আসন্ন স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রস্তুতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন। এই ভাষণে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়নি। পাকিস্তান সরকার যাতে তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়ার সুযোগ না পায় এবং বিশ্ববাসী যাতে বুঝতে পারে যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়া সরকারের প্রচণ্ড অসহযোগিতা ও নির্যাতন সত্ত্বেও শেষ অবধি চেষ্টা করেছে শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বৈরাচারী সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে। বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখেই অত্যন্ত ভারসাম্যের সঙ্গে জনগণের কাছে স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির বার্তা প্রেরণ করা হয়। ৭ মার্চের ভাষণটি পরবর্তী সময়ে লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষকে স্বাধীনতার জন্য চরম আত্মত্যাগে অনুপ্রেরণা জোগায়। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ১৫ মার্চ আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আব্বু দেশ পরিচালনার জন্য ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্দেশগুলো পালন করে প্রমাণ করে আওয়ামী লীগই প্রকৃত সরকার।

মার্চের এই অস্থির ও অনিশ্চিত সময়টিতে আমাদের ডান ও বাম পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ও খেলার সাথিরা দেশ ত্যাগ করে। আমাদের ডান পাশের বাড়িতে থাকতেন, যুগোশ্লাভিয়া দূতাবাসের ঢাকা শাখার কর্মকর্তা। আমার সমবয়সী তাঁর বড় মেয়ে সাকিবা ও ছোট ছেলে সামির ছিল আমাদের খেলার সাথি। সাকিবার কুতকুত খেলায় হাতেখড়ি হয় আমার হাতে। মার্চের এক অপরাহ্নে সে তার সোনালি বাদামি ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে দৌড়ে এল আমাদের বাড়িতে। জানাল যে তারা ভাইবোন মায়ের সাথে যুগোশ্লাভিয়ায় চলে যাচ্ছে। তাদের বাবা অফিসের কাজ গুটিয়ে কিছুদিন পর ওদের সঙ্গে স্বদেশে মিলিত হবেন। আমাদের জলছাদের

নিচে মাধবীলতার ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে সাকিবা নীলাভ রঙের কাগজে তার বাবার নাম ও বাড়ির ঠিকানা লিখে দিল। বাবার নাম আবদাল্লা। ঠিকানা : সারাএভো, যুগোশ্লাভিয়া।

সাকিবার সঙ্গে সেই শেষ সাক্ষাতের দুই যুগ পরে সারায়েভো যুগোশ্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসনিয়ায় (সারাএভো যার রাজধানী) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণহত্যা বন্ধের আন্দোলনে আমি জড়িয়ে পড়ি একসময়। ভবিতব্য একেই বলে ! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ও রাজপথে চলে আমাদের আন্দোলন। হোয়াইট হাউসে উইমেনস ব্যুরোর ৭৫তম (১৯৯৫) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমন্ত্রিত হওয়ার সুযোগে রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন ও ফার্স্টলেডি হিলারি ক্লিনটনের কাছে সরাসরিই দাবি উত্থাপন করি। যুগোশ্লাভিয়ার সার্ব-সরকার ও সার্ববাহিনী, যারা বসনিয়ায় নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করি। বিল ক্লিনটন আশ্বাস দিয়ে বলেন ন্যাটোর মাধ্যমে শিগগিরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বসনিয়ার নারীদের ওপর সার্ব-সৈন্যদের পাশবিক নির্যাতন প্রসঙ্গে আমার মন্তব্যের প্রেক্ষিতে হিলারি বলেন, বসনিয়ার নারীদের লাঞ্ছনা ও কষ্ট তাঁর হৃদয়েও গেঁথে রয়েছে।

আমার সহকর্মী ও বন্ধু বসনিয়ায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত এক দুরন্ত সাহসী নেত্রী বেভারলি ব্রিটন। যিনি নিজের জীবন বাজি রেখে অতি সন্তর্পণে বসনিয়ার রাজধানী সারাএভোর বুকেই চালিয়েছেন মানবাধিকারের কাজকর্ম। বসনিয়া প্রসঙ্গে আমার বিশেষ আগ্রহের কারণ জানতে চাইলে আমি তাঁর কাছে ব্যক্ত করি ১৯৭১-এ পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের ওপর নৃশংস গণহত্যার কাহিনি। সেদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিজয়ী বাঙালিদের চরম মাসুল দিতে হয়েছিল। আজ যেমন গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয়ী স্বাধীন সার্বভৌম বসনিয়ার ওপর নেমে এসেছে তার প্রাক্তন প্রভু যুগোশ্লাভিয়ার খড়গহস্ত। নীল কাগজে সাকিবার হাতে লেখা ঠিকানাটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হারিয়ে যায়। সেদিনের বিক্ষুব্ধ অস্থির এবং রক্তাক্ত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কখনো ভাবিনি যে আমি একদিন স্মৃতিতে অঙ্কিত সারাএভোর পথ ধরে খুঁজে ফিরব ছেলেবেলার খেলার সাথি সাকিবাকে ! অথবা স্বাধীনতাকামী ভিন্ন কোনো জাতির মধ্যেই খুঁজব বাংলাদেশের হৃদয়।

আমাদের বাঁ পাশের প্রতিবেশী মরহুম হারুন-উর-রশিদ সাহেবের বাড়ির পরের বাড়িটাতে থাকত আমাদের খেলার টিমের বন্ধু ফাতেমা, খাদিজা ও হোসেন। অবাঙালি হওয়ার সূত্রে তারা ঢাকার বিক্ষুব্ধ মাস্তান যুবকদের রোষদৃষ্টিতে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাপদগ্ধ একদিনে তাদের বাড়ি লুটপাট হয়ে যায়। আব্বু তাদের নিরাপত্তার জন্য তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও ফাতেমার বাবা, যিনি ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি, তিনি পরিবারসহ করাচির পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। সন্ত্রাস, রক্তপাত ও যুদ্ধের একটি নির্মম দিক হলো প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ; প্রিয় বন্ধুকে চিরতরে হারানো।

তথ্য সূত্র

১. আমার ডায়েরি। সোমবার, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। ঢাকা, বাংলাদেশ। ঐ দিন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম একরাশ লাল-সাদা ফুলের তোড়া ও ফল সম্ভার নিয়ে আম্মার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। সে সময় তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের যোগদানের নেপথ্য ইতিহাসের স্মৃতিচারণ করেন

২. মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের নাম "৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের নেপথ্য কথা ও তাজউদ্দীনের ভূমিকা।" ঢাকা : দৈনিক আজকের কাগজ, ২০ মার্চ, ১৯৯২

তৃতীয় পর্ব

যে জলে আগুন জ্বলে

—হেলাল হাফিজ

দুর্বার প্রতিরোধ

ইয়াহিয়া সরকার যে আওয়ামী লীগের কাছে পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনার ভার কখনোই হস্তান্তর করবে না তা ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেকোনো মুহূর্তে আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও বাঙালি জনগণের ওপর হামলা চালাতে পারে এই আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখন সামনে খোলা থাকবে একটাই পথ—সেটা স্বাধীনতার পথ। আব্বুকে আম্মা প্রশ্ন করেছিলেন যে মুজিব ইয়াহিয়া বৈঠক যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা কী হবে ? আব্বু উত্তর দিয়েছিলেন 'আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাব তারপর স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেব।'

২৩ মার্চে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডে, মুজিব কাকুর বাড়িতে ছাত্ররা স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করল। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করলেন। আলোচনার আবরণে অপারেশন সার্চলাইট গণহত্যার নীল নকশা তখন সম্পন্ন। দুবছর আগে ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের দিনকে বেছে নেওয়া হলো বাঙালির ওপর মরণ আঘাত হানার জন্য। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫ মার্চের ভয়াল কালো রাতে আব্বু গেলেন মুজিব কাকুকে নিতে। মুজিব কাকু আব্বুর সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবেন সেই ব্যাপারে আব্বু মুজিব কাকুর সাথে আলোচনা করেছিলেন। মুজিব কাকু সে ব্যাপারে সম্মতিও দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী আত্মগোপনের জন্য পুরান ঢাকায় একটি বাসাও ঠিক করে রাখা হয়েছিল। বড় কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আব্বুর উপদেশ গ্রহণে মুজিব কাকু এর আগে দ্বিধা করেননি। আব্বুর, সে কারণে বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে মুজিব কাকু কথা রাখবেন। মুজিব কাকু, আব্বুর সাথেই যাবেন। অথচ শেষ মুহূর্তে মুজিব কাকু অনড় রয়ে গেলেন। তিনি আব্বুকে বললেন, 'বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকো, পরশুদিন (২৭ মার্চ) হরতাল ডেকেছি।' মুজিব কাকুর তাৎক্ষণিক এই উক্তিতে আব্বু বিস্ময় ও বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এদিকে বেগম মুজিব ঐ শোবার ঘরেই সুটকেসে মুজিব কাকুর জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখতে শুরু করলেন। ঢোলা পায়জামায় ফিতা ভরলেন। পাকিস্তানি সেনার হাতে মুজিব কাকুর স্বেচ্ছাবন্দি হওয়ার এইসব প্রস্তুতি দেখার পরও আব্বু হাল না ছেড়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে মুজিব কাকুকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি কিংবদন্তি সমতুল্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদাহরণ তুলে ধরলেন, যাঁরা আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু মুজিব কাকু তাঁর এই সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে রইলেন। আব্বু বললেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য হলো পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ রূপেই নেতৃত্ব-শূন্য করে দেওয়া। এই অবস্থায় মুজিব কাকুর ধরা দেওয়ার অর্থ হলো আত্মহত্যার শামিল। তিনি বললেন, 'মুজিব ভাই, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হলেন আপনি। আপনার নেতৃত্বের ওপরই তারা সম্পূর্ণ ভরসা করে রয়েছে।' মুজিব কাকু বললেন, 'তোমরা যা করবার কর। আমি কোথাও যাব না।' আব্বু বললেন, 'আপনার অবর্তমানে দ্বিতীয় কে নেতৃত্ব দেবে এমন ঘোষণা তো আপনি দিয়ে

যাননি। নেতার অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হবে, দলকে তো তা জানানো হয়নি। ফলে দ্বিতীয় কারো নেতৃত্ব প্রদান দুরূহ হবে এবং মুক্তিযুদ্ধকে এক অনিশ্চিত ও জটিল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।' আব্বুর সেদিনের এই উক্তিটি ছিল এক নির্মম সত্য ভবিষ্যদ্বাণী।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্বু স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে নিয়ে এসেছিলেন এবং টেপ রেকর্ডারও নিয়ে এসেছিলেন। টেপে বিবৃতি দিতে বা স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর প্রদানে মুজিব কাকু অস্বীকৃতি জানান। কথা ছিল যে, মুজিব কাকুর স্বাক্ষরকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে শেরাটন) অবস্থিত বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং তাঁরা আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনা করবেন। আব্বু বলেছিলেন, 'মুজিব ভাই, এটা আপনাকে বলে যেতেই হবে, কারণ কালকে কী হবে, আমাদের সবাইকে যদি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তাহলে কেউ জানবে না, কী তাদের করতে হবে। এই ঘোষণা কোনো-না-কোনো জায়গা থেকে কপি করে আমরা জানাব। যদি বেতার মারফত কিছু করা যায়, তাহলে সেটাই করা হবে।'[১] মুজিব কাকু তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে দলিল হয়ে থাকবে। এর জন্য পাকিস্তানিরা আমাকে দেশদ্রোহের জন্য বিচার করতে পারবে।'[২]

আব্বুর লেখা ঐ স্বাধীনতা ঘোষণারই প্রায় হুবহু কপি পরদিন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়। ধারণা করা যায় যে ২৫ মার্চের কয়দিন আগে রচিত এই ঘোষণাটি আব্বু তাঁর আস্থাভাজন কোনো ছাত্রকে দেখিয়ে থাকতে পারেন।[৩] স্বাধীনতার সমর্থক সেই ছাত্র হয়তো স্ব-উদ্যোগে বা আব্বুর নির্দেশেই স্বাধীনতার ঘোষণাটিকে বহির্বিশ্বের মিডিয়ায় পৌঁছে দেন।

মুজিব কাকুকে আত্মগোপন বা স্বাধীনতা ঘোষণায় রাজি করাতে না পেরে রাত নয়টার কিছু পরে আব্বু ঘরে ফিরলেন বিক্ষুব্ধ চিত্তে। আম্মাকে সব ঘটনা জানালেন। মুজিব কাকুর সঙ্গে পুরান ঢাকার পূর্ব নির্ধারিত গোপন স্থানে আব্বুর আত্মগোপন করার কথা ছিল। মুজিব কাকু না যাওয়াতে পূর্ব-পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। সেই রাতে আম্মারও ঘরে থাকার কথা ছিল না। শিশু সোহেল ও ছোট মিমিকে সঙ্গে করে তাঁরও বাসা ত্যাগ করার কথাই ছিল। আমাকে ও রিমিকে বুদ্ধি করে আম্মা তাঁতিবাজারে খালার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র দু'দিন পূর্বেই। আব্বুর বন্ধু আওয়ামী লীগের এমএনএ ও কোষাধ্যক্ষ আবদুল হামিদ সেই সন্ধ্যায় এসেছিলেন আম্মাকে ফরাশগঞ্জে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে। আম্মার ইচ্ছে ছিল যে আব্বুকে বিদায় জানিয়ে তারপর বাসা থেকে যাবেন। আব্বুর ফেরার কথা ছিল অনেক আগেই। কিন্তু মুজিব কাকু বাসা না ত্যাগ করার ফলে তাঁকে বুঝাতে আব্বুর অনেক সময় লেগে যায়। এদিকে হামিদ কাকুও আমাদের বাড়িতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে যান। সে সময় রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ও জনতা গাছপালা কেটে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। নেতৃবৃন্দের কাছেও খবর পৌঁছে গিয়েছে যে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করার পরপরই সামরিক বাহিনী আক্রমণ ও ধরপাকড়ও শুরু করবে। আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও ছাত্রদের ওপর আঘাত আসবে এই ধারণাটি বদ্ধমূল থাকলেও নিরস্ত্র ও নিরীহ জনসাধারণের ওপরও যে ঢালাওভাবে আঘাত হানা হবে এই কথাটি অনেকেই ভাবতে পারেননি।

সেদিন আব্বু বাসায় ফিরে খুব রাগান্বিত হয়ে আম্মাকে বললেন, 'মুজিব ভাই কিছুতেই বাসা থেকে যাবেন না। আমিও কোথাও যাব না।' বাইরের পোশাক বদলে আব্বু ভগ্নচিত্তে সটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরই প্রচণ্ড অস্থিরতা নিয়ে উঠে পড়লেন। বাসায় তখনো লোকজন আসা যাওয়া করছে। সবার মধ্যেই উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা বিরাজমান। এরই মধ্যেও নূরজাহান খালা (বেগম নূরজাহান মুরশিদ। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ও অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদের স্ত্রী) আমাদের বাসায় এলেন। তিনি দেখেন আব্বুর মন খুব খারাপ। বাসায় ক্রমাগত ফোন আসছে। আব্বু বললেন যে দেশের কী হবে ঠিক নেই আর এখন মহিলারা

ফোন করছেন মহিলাদের আসনে নমিনেশনের ব্যাপারে তদবির নিয়ে। নূরজাহান খালা নিজে বেশ কিছু ফোন রিসিভ করলেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামও এলেন আব্বুর খোঁজে। এসে দেখেন যে বেগম মুরশিদ বাইরের ঘরে বসা। ভেতরের ঘরে আব্বুর গলা তিনি শুনতে পেলেন। আব্বু জোরে জোরে আম্মার সাথে কথা বলছিলেন। সে সময় আর আব্বুর সাথে তাঁর দেখা হলো না। তিনি, বেগম মুরশিদকে তাঁর ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারে নামাতে চলে গেলেন। (পরিশিষ্টে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকারে উল্লেখিত। পৃ. ১৯১) আম্মার কাছে রাখা রাইফেলের ব্যাগটি না পাওয়ায়, আব্বু রেগে বলছিলেন যে রোগীকে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য অজ্ঞান করা হয়েছে, অপারেশনের জন্য। ঐ পনেরো মিনিটের বাইরে এক মিনিট অধিক সময়ও রোগীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। যাই হোক, আম্মা শেষ পর্যন্ত ব্যাগটি খুঁজে পেলেন। চটের ব্যাগ ও তার মধ্যে রাখা রাইফেলটি তাড়াহুড়ায় শোবার ঘরের আলমারির মাথায় রেখে ভুলে গিয়েছিলেন। ব্যাগটি খুঁজে পাবার পরও আব্বুর অস্থিরতা কমল না। মুজিব কাকু বাসা থেকে বের হলেন না, কোনো নির্দেশও দিলেন না এই ব্যাপারটি তাকে গভীরভাবে মর্মাহত ও বিচলিত করে। রাত প্রায় এগারোটার দিকে, মুজিব কাকুর বাসা থেকে ড. কামাল হোসেনকে সাথে করে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম আবারও ফিরে আসেন আমাদের বাসায়। আব্বু তখন সামনের ফুল বাগানে ঘেরা লনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। তাঁর পরনে লুঙ্গি ও হাফ হাতা গেঞ্জি। গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম কথা বললেন আব্বুর সাথে। তিনি বললেন, 'Military has taken over আপনাকে যেতে হবে আমাদের সাথে।' আব্বু প্রচণ্ড অভিমানের স্বরে বললেন, 'কী করব ? কোথায় যাব ?' আমীর-উল ইসলাম যখন আব্বুকে তাঁদের সাথে যাবার জন্য জোর তাগাদা দিচ্ছেন, তখনিই আমাদের বাসার দক্ষিণে ইপিআর অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (পরে বিডিআর– বাংলাদেশ রাইফেলস; এখন বিজিবি– বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ) এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের কুমিল্লা হতে নির্বাচিত এম. এন. এ (মেম্বার অব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) মোজাফফর সাহেব দৌড়াতে দৌড়াতে গেটের কাছে এসে বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ইপিআরকে নিরস্ত্র করছে। কথাটি শোনার পর আব্বুর মনে পরিবর্তন এল। তিনি মুজিব কাকুর কাছ হতে নির্দেশ না পাওয়া জনিত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেললেন। দ্রুত গতিতে ঘরের ভেতর গেলেন। যখন ফিরে এলেন, কাঁধে তাঁর রাইফেল ঝুলছে, কোমরে পিস্তল গোঁজা। লুঙ্গির ওপর সাদা ফতুয়া স্টাইলের হাফ হাতা শার্ট। সহচরদের সাথে আব্বু বেরিয়ে পড়লেন অজানার পথে। আম্মাকে তড়িঘড়ি করে বলে গেলেন 'তোমরা কী করবে কর। আমি চলে গেলাম।'

আম্মা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে গাড়িটি ঝিগাতলার দিকে ছুটে গেল এবং একটু পর আবার ঘুরে এসে লালমাটিয়ার পথে সাঁ করে মিলিয়ে গেল। এই সময় আম্মাও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন যে সোহেল ও মিমিকে নিয়ে তিনি বাড়ি ত্যাগ করবেন আমাদের গাড়িতে করে। কিন্তু তার আগেই গুলি ও ফ্লেয়ার ছুড়তে ছুড়তে পাকিস্তানি বাহিনীর জিপ গাড়িগুলো আমাদের বাড়ির দিকে আসতে থাকল। ফ্লেয়ার ছোড়ার ফলে নিকষ কালো রাত্রি প্রভাতের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোনো ক্ষুদ্র প্রাণীরও লুকিয়ে রাস্তা পার হবার উপায় নেই, গাড়ি করে পালানো তো দূরের কথা। টেলিফোন ও বিদ্যুতের লাইনগুলো ঝমঝম শব্দে খুলে পড়ল। আম্মা উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে সোহেল ও মিমিকে নিয়ে চলে গেলেন দোতলায়, যেখানে মাত্র বছর খানেক আগেই নতুন ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন কালীগঞ্জ ছাত্রলীগের একসময়ের সহ-সভাপতি বিলেত-ফেরত তরুণ ব্যারিস্টার আবদুল আজিজ বাগমার ও তাঁর প্রাণবন্ত, সদালাপী নবপরিণীতা স্ত্রী আতিয়া বাগমার—আমাদের প্রিয় আতিয়া কাকি। আম্মা ও আতিয়া কাকি উর্দুভাষী ভাড়াটে সাজলেন। আতিয়া কাকির পরনে শেলোয়ার-কামিজ। আম্মা শাড়ি বদলে শেলোয়ার-কামিজ পরার সময়

পাননি। তাঁরা দুজনেই গৌরবর্ণের, সাধারণ বাঙালি নারীর তুলনায় লম্বা চওড়া এবং উর্দুভাষায় দুজনেই পারদর্শী ছিলেন। পাকিস্তান বাহিনী শেল ও গুলি ছুড়তে ছুড়তে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হলো। তারপর দোতলার শোবার ঘরে প্রবেশ করে আম্মা ও আতিয়া কাকির বুকের ওপর স্টেনগান ধরে রুক্ষ স্বরে উর্দুতে জিজ্ঞাসা করল, 'তাজউদ্দীন কোথায় ? মিসেস তাজউদ্দীন এখানে কোন জন ? তুমি না তুমি ?' আতিয়া কাকি খুব দৃঢ় স্বরে উর্দুতে প্রতিবাদ করে বললেন, 'আপনারা ভুল করছেন। এখানে মিসেস তাজউদ্দীন নেই। আমরা সকলে ভাড়াটিয়া। আমাদের বাড়িওয়ালা তাজউদ্দীন সাহেব নিচতলায় থাকেন।' আম্মার দারুণ আশঙ্কা হচ্ছিল যদি নিচের তলায় ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলো দেখে আম্মাকে চিনে ফেলে ! তিনি কোলে করা সোহেলকে নিয়ে নিজের মুখটা খানিক আড়াল করে কপট ধমকের স্বরে আতিয়া কাকিকে উর্দুতে বললেন, 'আমি তোমাকে প্রথমেই মানা করেছিলাম রাজনীতিবিদের বাড়ি ভাড়া না নিতে। হায় আল্লাহ ! এখন ছেলেমেয়ে নিয়ে এই ভোগান্তি আমার নসিবে ছিল ! আমি কালই করাচির টিকিট কেটে এই দেশ ছাড়ব।'

আতিয়া কাকি ও আম্মার অভিনয়টি দারুণ হয়েছিল। তাঁদের দিকে তাক করা স্টেন গানগুলো সরে গেল। তাঁরা সেযাত্রা রক্ষা পেলেন। পরবর্তী সময়ে আম্মা ও আতিয়া কাকির মুখে এই ঘটনাটি এতবার আমরা শুনেছিলাম যে পুরো সংলাপ আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

আতিয়া কাকি ও আম্মা রক্ষা পেলেও অন্য ঘর ও নিচতলা থেকে আজিজ কাকু, তাদের বাবুর্চি আব্দুল, আমাদের ফুফাতো ভাই তফাজ্জল হোসেন, মামাতো ভাই হাসান মাহমুদ, আমাদের বাড়ির যিনি দেখাশোনা করতেন সেই বারেক মিয়াকে পাকিস্তানি সৈন্যরা বন্দী করে। আটক থাকা অবস্থায় তাদের ওপর চলে প্রচণ্ড নির্যাতন। সেদিন, অর্থাৎ ২৫ মার্চ রাতে নিচতলায় কাজের ছেলে কিশোর দিদারের ওপর আসে আক্রমণের প্রথম ঝাপটা। তাঁকে আব্বু ও আম্মার সন্ধান জিজ্ঞেস করা হয়। তখন সেই কিশোর উপস্থিত বুদ্ধি না হারিয়ে বলে ওঠে যে দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে তাঁরা কোথায় চলে গিয়েছেন সে জানে না। দিদার সে যাত্রায় পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছ থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে যায়। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর সে চুপি চুপি আবার ফিরে আসে নানার কাছে। সৈন্যরা নিচতলায় আমাদের ৭৮ বছরের বর্ষীয়ান নানা সৈয়দ সেরাজুল হকের বুকেও স্টেনগান ঠেকিয়ে কর্কশ স্বরে আব্বু ও আম্মার খবর জানতে চায়। অসুস্থ নানা উঠে বসে ইংরেজি ও উর্দুতে কথা বলার চেষ্টা করেন। দুজন অপেক্ষাকৃত ভদ্র গোছের অফিসার নানাকে শুয়ে পড়তে বলে। নানা সেই আদেশকে মৃত্যুর সংকেত মনে করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলমা পড়তে পড়তে পুনরায় শুয়ে পড়েন।

এরপর কিছুদিনের মধ্যে পুরো বাড়িটিই পরিণত হয় পাকিস্তানি বাহিনীর ছোটখাটো ক্যাম্পে। নানা কিছুতেই বাড়ি না ছাড়ার সংকল্প নেওয়ায় দিদারসহ গৃহবন্দি হন। প্রথম যে দল ক্যাম্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের উর্ধ্বতন অফিসার বিভিন্ন অছিলায় নানার কাছ থেকে আম্মা ও আব্বুর সন্ধান জানার চেষ্টা করে বিফল হয়। প্রথম ব্যাচের অফিসারটি ছিল আচরণে শ্রদ্ধাশীল। নানা তাঁর জ্ঞানের ঝুলি থেকে তাকে নানারকম মূল্যবান উপদেশ দিতেন। শেখ সাদির নীতি উপদেশগুলোর মধ্যে দিয়ে তিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার অমানবিক নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনা করতেন।

পাকিস্তান বাহিনীর ঐ অফিসার আব্বুর কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বারান্দায় স্তূপাকারে রাখা খবরের কাগজের সামনে তাঁকে নিয়ে বলেন যে, 'এই খবরের কাগজগুলো পড়লেই আপনি তাজউদ্দীন সম্বন্ধে জানতে পারবেন।'

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নানার আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি জ্ঞান ও ধর্মীয় বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই অফিসার একসময় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'সৈয়দ সাহেব, আপনি ছিলেন আরবির প্রফেসার এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও আপনার অগাধ জ্ঞান

রয়েছে। অথচ আপনার মেয়ের কি না বিয়ে দিলেন এক হিন্দুর সঙ্গে।' নানা প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমার জামাতা হিন্দু নয়। ওর নাম তাজউদ্দীন আহমদ। ঢাকা কলেজে সে আমার আরবি ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিল।' কিন্তু সেই অফিসার পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিবাদ করে নানাকে বললেন, 'ওর নাম তাজউদ্দীন নয়। ওর আসল নাম হলো তেজারাম। সে এক ভারতীয় হিন্দু। পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছে পাকিস্তান ভাঙার জন্য।' পুরো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মস্তিষ্কে ঐ বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক ও বানোয়াট তথ্যগুলো সুপরিকল্পিতভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুজিব কাকু পাকিস্তান কারাগারে বন্দী। তার পরও স্বাধীনতার যুদ্ধ থেমে থাকেনি। হুঁশিয়ার কাণ্ডারির মতোই আব্বু ধরেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হাল। সে কারণেই পাকিস্তান সরকার আব্বুকে তাদের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

আম্মা ও আতিয়া কাকি তাঁদের উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস দিয়ে সেদিন পাকিস্তানি সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর আম্মা আবারও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন দ্বিতীয় কোনো বাহিনী চলে আসার আগেই গৃহ ত্যাগ করার। ২৬ মার্চ চারদিকে কারফিউ চলছে, বাড়ির সামনে পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর আনাগোনা। পাশের বাড়ির ছাদে নিজেকে আড়াল করে সাকিবার বাবা ইশারায় আম্মাকে বললেন, তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর বাড়িটি আমাদের বাড়ির মতোই বড় রাস্তার ওপরে হওয়াতে পাকিস্তানি সৈন্যদের নজর এড়িয়ে সেখানে আশ্রয় নেওয়া দুরূহ। আতিয়া কাকির সহায়তায় আম্মা অতি সন্তর্পণে দোতলা থেকে নিচ তলায় নেমে এলেন। কোলে সোহেল এবং মিমির হাতে হাত ধরা। সঙ্গে কাজের মেয়ে আমেনা বেগম। নিচতলায় ভেতরের বারান্দায় নানা বসা। তাঁর দৃষ্টিতে যেন সব-হারাবার ব্যথা। আম্মা নানার পা ছুঁয়ে সালাম করে দোয়া চাইলেন। বললেন, তিনি পেছনের বাড়ির দেওয়াল টপকিয়ে পালাতে যাচ্ছেন। নানা ব্যাকুল কণ্ঠে আম্মাকে রুখতে চাইলেন। বললেন, 'লিলি, তুই যাসনে, মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে যাবি।' চারদিকে তখনো কারফিউ চলছে। ধরা পড়ার ভয় প্রতিপদে। আম্মা আর পিছু ফিরে নানার দিকে চাইলেন না। ভয় হলো কী জানি যদি মায়ার টানে দুর্বল হয়ে পড়েন। পেছনের বাড়ির ভদ্রলোক ছিলেন অতি সজ্জন এক ব্যক্তি। সিলেটে তাঁর বাড়ি, নাম আবদুল মুবিন চৌধুরী। (মুক্তিযোদ্ধা : বীরবিক্রম মেজর (অব.) শমসের মুবিন চৌধুরীর পিতা)। তিনি ও তাঁর স্ত্রী তাহমিদুন নাহারসহ পুরো পরিবার ছুটে এল আম্মা ও শিশু ভাইবোনকে দেওয়াল পার করানোর জন্য সহযোগিতা করতে। ভদ্রলোক আম্মাকে তাঁর 'মেয়ে' সম্বোধন করে অতি সমাদরে বরণ করলেন। অথচ নতুন এই প্রতিবেশীদের সঙ্গে আম্মার আগে কোনো আলাপ-পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়নি।

২৭ মার্চ সকাল আটটায় কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। তখন আমাদের অসম সাহসী বড় মামু ক্যাপ্টেন সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আম্মাকে তাঁর আশ্রয়দাতার বাড়ি থেকে নিয়ে যান। শঙ্কা ছিল আম্মার খোঁজে সামরিক বাহিনী আশপাশের বাড়িতেও হামলা চালাতে পারে। আতিয়া কাকিও সেদিন চলে গেলেন শান্তিনগরে তাঁর মায়ের বাড়িতে। যাওয়ার সময় নানার কাছে তিনি কিছু টাকা রেখে গেলেন। যদি আজিজ কাকু ফিরে আসেন তখন এই টাকা কাজে লাগবে।

সেদিন বেলা ১১টায় বড় মামুর ধানমণ্ডির ১৩/২-এর বাড়িতে মুসা সাহেব নিয়ে আসেন সেই ঐতিহাসিক চিরকুট। আম্মা রুদ্ধশ্বাসে বারবার করে পড়লেন আব্বুর পরিপাটি মুক্তার মতো হাতে লেখা ছোট্ট কটি অসামান্য বাক্য। 'লিলি আমি চলে গেলাম। যাবার সময় কিছুই বলে আসতে পারিনি। মাফ করে দিও। আবার কবে দেখা হবে জানি না ... মুক্তির পর। তুমি ছেলেমেয়ে নিয়ে সাড়ে-সাত-কোটি মানুষের সঙ্গে মিশে যেও। দোলন চাঁপা।' (দোলনচাঁপা আব্বুর ছদ্ম নাম)। আব্বুর চিরকুটটি পড়ার পর আম্মা তাঁর হৃদয়ের অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে—'কতক্ষণ যে কাগজখানা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম জানি না। সেদিনের সেই

মুহূর্তে এ কথা কয়টি শুধু কথার কথাই ছিল না। জীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুরু করার জন্য সেই লেখাগুলো ছিল এক পবিত্র প্রেরণার উৎস। সাড়ে-সাত-কোটি মানুষের সঙ্গে নিজেকে নতুনভাবে নতুন রূপে আবিষ্কার করেছিলাম সেদিন। তারপর ফিরে পেলাম এক নতুন সত্তা। শুরু হলো এক অবিস্মরণীয় মহান যাত্রা।'[৪] এরপর তিনি প্রস্তুতি নিলেন বন্ধুর যাত্রাপথ অতিক্রমের জন্য। আব্বুর চিঠিটি আম্মার মধ্যে অসামান্য প্রেরণার সঞ্চার ঘটাল। বড় মামুর বাড়ির ওপরও পাকিস্তানি সেনাদের চোখ পড়তে পারে এই আশঙ্কায় আম্মা বড় মামুর প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশপাশের কিছু বাড়িতে ক্ষণস্থায়ী অবস্থানের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। এক বাড়ির দরজাই খুলল না এবং অপর বাড়ির সরকারি কর্মকর্তা তাঁকে গৃহে আশ্রয় দেওয়ার কিছু পরে রাতের আঁধারে বের হয়ে যেতে বাধ্য করলেন। আম্মা ফিরে এলেন বড় মামু ও মামির উষ্ণস্নেহ ছায়াতলে। তারপর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আবারো স্থান পরিবর্তন।

৩০ মার্চ সকালে মগবাজারের রাস্তায় আম্মার সঙ্গে রিমি ও আমার দেখা হলো। খালাতো ভাই সাঈদ ভাই আম্মার কাছে আমাদের পৌঁছে দিলেন। ২৫ মার্চের ভয়াল রাত্রির পর আমাদের প্রতিটি দিন যেন এক এক যুগের মতো কেটেছে। মনে হলো কত যুগ পর আম্মার দেখা পেলাম। ছোট্ট ভাই সোহেল ও আদুরী মিমিকে আমরা দুই বোন জাপটে ধরে বড় মামুর লাল হিলম্যান গাড়িতে আম্মার ও আমেনার পাশে চড়ে বসলাম। বড় মামু গাড়ি চালাচ্ছেন, পাশে আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক আফতাবউদ্দীন মিয়া, আজিজ কাকুর দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতি ও ব্যবসায়ী। আমরা ডেমরা ঘাট দিয়ে লঞ্চে করে আফতাবউদ্দীন সাহেবের কালীগঞ্জের বাড়ি জামালপুরে যাব। নিরাপত্তার খাতিরে শহর আমাদের ছাড়তেই হলো। গাড়িতে বসে আম্মার কাছে উজাড় করে দিলাম আমাদের এক সপ্তাহের রোমহর্ষক ট্র্যাজিক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি।

২৫ মার্চের সন্ধ্যা পর্যন্ত রিমি ও আমি তাঁতিবাজারে খালাতো ভাইবোনদের সঙ্গে খোলা ছাদে যারপরনাই আনন্দে খেলে বেড়িয়েছিলাম। স্কুলে যেতে হচ্ছিল না তাই মনে একটু বেশিই আনন্দ। দু'দিনের মধ্যেই আমরা মাঞ্জা দিয়ে ঘুড়ি উড়াতে শিখে গেলাম। পাশের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছাদে রং-বেরঙের ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা শুরু হলো। ঘুড়ি ওড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে আমি মহা উদ্যমে খালার বাড়ির পুরো দেওয়াল, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকার ছবি সাদা চকে এঁকে ভরে ফেললাম। পাশে বড় বড় করে লিখলাম 'জয় বাংলা'। খালার বাড়ির চারপাশে বাঁদরের উপদ্রব। খাবারদাবার সামলে রাখতে হতো। আমাদের চোখের সামনেই রান্নাঘর থেকে কলা তুলে বাঁদর চম্পট। সবচেয়ে মজা লাগত মা-বাঁদর যখন সন্তানকে পিঠে নিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি পুরনো বাড়ির এক কার্নিশ থেকে অপর কার্নিশে নির্ভয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যেত। সেই ভয়াল কালোরাতের সন্ধ্যায় আমাদের খেলা অনিচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ হলো খালার তাগাদায়। হাতমুখ ধুয়ে খালার হাতের মজাদার খাবার খেয়ে সারা দিনের খেলাধুলায় শ্রান্ত আমরা গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় মধ্যরাতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল ভয়ানক গোলাগুলি ও অগণিত মানুষের চিৎকারের শব্দে। হিন্দু-অধ্যুষিত তাঁতিবাজার ও পার্শ্ববর্তী শাঁখারিবাজারে আগুন জ্বলছে। চারদিকে শুধু মরণ চিৎকার ও বাতাসে পোড়া গন্ধ। বিস্ময়, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা মিশ্রিত রাতটি দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল। পরদিন সারাদিন কারফিউ। তার মধ্যেই দিনদুপুরে খালার বাড়ির পেছনের নাগরমহল সিনেমা হলের কাছ থেকে ভেসে এল অসহায় মানুষের মরণ আর্তনাদ ও প্রচণ্ড ব্রাশ ফায়ারের শব্দ। খালার বাড়ির পেছনের বারান্দা দিয়ে নাগরমহল সিনেমা হলের একাংশ দেখা যেত। আমাদের চোখের সামনেই সিনেমা হলটিকে জ্বলতে দেখলাম। আগুনের সঙ্গে বিশ্রী কালো ধোঁয়া চারপাশের বাড়ির দিকে ধেয়ে এল। খালার বাড়ির ভেতরও ভরে গেল ধোঁয়ায়। মনে হলো মৃত্যু বুঝি আসন্ন। আমরা সকলেই

আল্লাহর নাম স্মরণ করতে থাকলাম। আগুনের হাত থেকে খালার বাড়ি রক্ষা পেলেও আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা বড়দের ঘিরে ধরল। ছোট হওয়ার একটি বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, আমরা বিচরণ করতাম বর্তমানে। অপরিবর্তনীয় অতীত ও অজানা ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশি ভাববার চেয়ে আমরা সহজেই মানিয়ে নিতাম বিরামহীন বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে। তাৎক্ষণিক স্বস্তি সঞ্চয়ের জন্য ধ্যানাভ্যাসের প্রথম পর্যায়ে সদা ভ্রাম্যমাণ মনটিকে, অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে মুক্ত করে যেমন সন্নিবিষ্ট করা হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান ও পতনের সঙ্গে, আমরা ছোটরাও তেমনি মগ্ন হয়ে যেতাম সদা বিরাজমান বর্তমানের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে। এ কারণেই দুশ্চিন্তা যেমন আঁকড়ে ধরত না তেমনি স্মৃতির পটে যা আঁকা হয়ে যেত তা হতো নিখাদ ও পক্ষপাত দোষমুক্ত অভিজ্ঞতার এক অনুপম চিত্রলিপি।

২৬ মার্চ সারা দিন ও রাত্রির কারফিউয়ের মধ্যে দিয়েই সন্তর্পণে অলিগলি পেরিয়ে ও পাঁচিল টপকিয়ে খালার বাড়িতে আশ্রয় নিল বহু মানুষজন। অকুতোভয় খালা সকলকে সাদরে বরণ করলেন। আশ্রিতদের কাছেই শোনা গেল নাগরমহল সিনেমা হল-এ আগুন লাগার কাহিনি। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা আশপাশের বস্তিতে গুলি চালিয়ে ও আগুন জ্বালিয়ে বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। অনেকে প্রাণ বাঁচাতে নাগরমহল সিনেমা হলে আশ্রয়গ্রহণ করার পর বর্বর সেনারা সেই হলটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন থেকে বাঁচবার জন্য দলে দলে মানুষ রাস্তায় বের হওয়ার পর তাঁদের ওপর ঢালাওভাবে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। শতাব্দীর জঘন্যতম, সুপরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডগুলোর অন্যতম কারণটি ছিল জাতিভিত্তিক। হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে, বাঙালি হওয়ার কারণেই নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়।

ঘটনার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে আমাদের পরিচয় গোপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারফিউয়ের মধ্যে বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশি ও হত্যাকাণ্ডের খবরটিও ইতোমধ্যে জানা হয়ে গিয়েছে। রিমি ও আমাকে বলা হলো যদি সৈন্যরা আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমাদের পরিচয় জানতে চায় আমরা যেন আব্বুর নাম গোপন করি, খালু সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকেই যেন বাবা হিসেবে পরিচয় দিই। চারপাশের এই নৃশংসতা দেখে আমার মনটি বিদ্রোহ করতে চাইল। আমি বললাম, 'যদি মরতে হয় আব্বুর পরিচয় দিয়েই মরব।' আমার সেদিনের উক্তিটি ছিল মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার আলিঙ্গনে পিষ্ট এক বালিকার অবোধ আস্ফালন মাত্র। বাড়ির সকলে ইতোমধ্যেই আমার চক দিয়ে আঁকা নৌকার ছবি ও জয়বাংলা শব্দমালা মুছে ফেলেছে। এতটুকু অসতর্ক হলেই বাড়িভর্তি সকল মানুষই মৃত্যুমুখে পতিত হবে এই রূঢ় সত্যটি দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠল। ২৭ মার্চ সকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য কারফিউ তুলে নেওয়া হলো। সেই সময়ই বড় মামু মামাতো ভাই মাসুদকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন মুক্তির দিশারী রূপে। আমাদের দুই বোনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন মগবাজারের পথে। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অগণিত লাশের সারি ও রক্তাক্ত রাজপথের মধ্যে দিয়ে পথ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল বড় মামুর লাল হিলম্যান গাড়িটি।

আব্বু ও আম্মার খবর জানবার জন্য আমাদের মন অধীর হয়ে উঠল। আমাদের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর বড় মামু দিলেন খুব সংক্ষেপে। আব্বু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন বাঙালি জাতিকে মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। আম্মা আত্মগোপন করে রয়েছেন ঢাকা শহরের মধ্যেই। বড় মামু আমাদের নিয়ে গেলেন মগবাজারের ছোট মামুর (সৈয়দ গোলাম মওলা) বাড়িতে। সেখানে আমরা একরাত কাটালাম। পরদিন খুব ভোরে তিনি পরিবারসহ বরিশালের উলানিয়া অঞ্চলে মামির বাবার বাড়িতে চলে গেলেন। রিমি ও আমি এরপর আশ্রয় নিলাম মগবাজারেই সদ্য বিবাহিত দম্পতি আমাদের খালাতো ভাই সাঈদ (সামসুল আলম চৌধুরী) ও ফুফাতো বোন আনার আপার স্নেহাশ্রয়ে। ৩০ মার্চ সকালে বড় মামু আবারো এলেন আমাদের নিতে। শিশুকাল

থেকেই বড় বোনের ভালোবাসা দিয়ে যে আনার আপা আমাদের আগলে রেখেছিলেন তাঁকে ছেড়ে আসতে আমাদের যারপরনাই কষ্ট হচ্ছিল। আমরা ব্যথিত চিত্তে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। দুরন্ত সাহসী সাঈদ ভাই ও বড় মামু আমাদের নিয়ে গেলেন মগবাজারের রাস্তার এক পাশে রাখা পরিচিত হিলম্যান গাড়িটির কাছে। গাড়ির ভেতর আবিষ্কার করলাম আম্মাকে। শুরু হলো উজাড় করে হৃদয়ের কথা বলা বন্ধুর অজানা পথে পাড়ি দেওয়ার প্রারম্ভে।

সতর্কতা অবলম্বনের জন্য টিকাটুলি মোড়ে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। দুটা বেবিট্যাক্সি আমাদের পৌঁছে দিল ডেমরা ঘাট পর্যন্ত। কৌতূহলী মানুষের নানা জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়ে লঞ্চে করে আমরা পৌঁছলাম কালীগঞ্জে আফতাবউদ্দীন মিয়ার বাড়িতে। এই এলাকায় তিনি 'পাগলা' আফতাব নামেই বেশি পরিচিত। সাদা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরিহিত কুচকুচে কালো ও লম্বা দাড়িওয়ালা সদাহাস্য আফতাব মিয়া নাকি এককালে মানসিক রোগাক্রান্ত ছিলেন। ভালো হয়ে যাওয়ার পর তাঁর 'পাগলা' উপাধিটি রয়ে যায়। তাঁর বাড়িতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো আসন্ন বৈশাখের কালবৈশাখী ঝড়। পড়ন্ত বিকেলের রক্তিম আভা ঢাকা পড়ে গেল ঘন কালো মেঘে। পাড়ার মেয়েদের আমন্ত্রণে রিমি ও আমি ঝড়ো হাওয়ার মতোই মিলিয়ে গেলাম আমের বনে আম কুড়াতে। মহা ফুর্তিতে কচি আমে কোঁচড় ভরে ফিরে এলাম আম্মার কাছে। ঘরে কুপিবাতি টিমটিম করে জ্বলছে।

আম্মা আশঙ্কা করছিলেন যে এই বিজলিবাতিহীন জঙ্গলের পরিবেশে আমরা হয়তো ভয় পাব। কিন্তু আম্মার আশঙ্কাকে খণ্ডন করে আমি উৎসাহভরে বলে উঠলাম, 'আম্মা, আমরা আর ঢাকায় যাব না। এখানে দিনের বেলায় গাছের নিচে নিচে ঘুরে বেড়াব আর রাতে পড়ব। কী মজা হবে না আম্মা !' এগারো বছরের জ্যেষ্ঠ কন্যার এই অভাবনীয় প্রস্তাবটি শুনে আম্মার ভাবনার রাজ্যে যে কথাগুলো সেই মুহূর্তে জড়ো হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়ে তিনি প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে—'আমি ঐ জঙ্গলের মধ্যে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রাগের পরিবর্তে সশব্দে হেসে উঠলাম। আমার সঙ্গে মেয়েরাও হাসছে। ওরা ভেবেছে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি, তারই জন্য এই হাসি। যেন শিশু-প্রাণের ভয়লেশহীন এক অবাধ গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওরাও চলেছে। সেখানে কোনো ভয়, দুশ্চিন্তা ও পরবর্তী মুহূর্তের নিদারুণ অনিশ্চয়তার বিন্দুমাত্র নেই কোনো চিহ্ন ও লেশ।'[৫] আফতাবউদ্দীন মিয়া ও তাঁর পরিবার-পরিজন আমাদের সাদরে বরণ করে আশ্রয় দেওয়ার পরেও পরদিন গভীর রাতেই সেই স্থানও ত্যাগ করতে হলো। আমাদের আসার খবর চারদিকে রটে গিয়েছে। এরপর আমরা সোজা রওনা দিলাম আব্বুর জন্মভূমি আমাদের গ্রামের বাড়ি দরদরিয়ার পথে। এবারে আর রেলগাড়িতে যাত্রা নয়, শীতলক্ষ্যা নদী পথে রৌদ্রালোকিত ভোরের মিষ্টি বাতাসে আমাদের ছইওয়ালা নৌকা তরতর করে এগিয়ে চলল। মাঝির কাছে আমাদের পরিচয় গোপন রাখা হলো। আম্মা তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী রেডিওতে কান পেতে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও কোলকাতার আকাশবাণী বেতার কেন্দ্রের সংবাদ শোনার চেষ্টায় রত। আকাশবাণীর সংবাদে ভেসে এল জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোনালি কণ্ঠ : 'এপার বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা, ওপার বাংলায় গণহত্যা ও যুদ্ধের দামামা।'

আব্বুর সহোদর মেজ ভাই, আমাদের মফিজ কাকু (মফিজউদ্দীন আহমদ) আমাদের আশ্রয় দিলেন তাঁর পরম আদর ও স্নেহের ডানাতলে। ওখানে আমাদের সমবয়সী চাচাতো বোন ইপি ও দিপির সঙ্গে শুরু হলো খেলা আর খেলা। জ্যোৎস্না ভরা রাতে উঠোনের পাশে রাখা খড়ের গাদার পেছনে ও দক্ষিণের কোঠাবাড়ির কাঠের মাচায় উঠে আমরা লুকোচুরি খেলতাম। আমাদের খেলায় যোগ দিত ওহিদুল, পেয়ারা, খোকন, সোমত্ত, হোরেসা এইসব আত্মীয় ও গ্রামের ছেলেমেয়েরা। বাড়ির সামনের পুকুরের ঢেউয়ে চাঁদের আলো থিরথির করে কাঁপত। শাল ও গজারির বন চৈতি হাওয়ার দোলায় দুলত শনশন শব্দ করে। ঝিঁঝি পোকার অবিশ্রান্ত ডাক,

হাজার জোনাকির নক্ষত্র মালায় ঘেরা বন ও হারিকেনের ফিকে আলোয় আমাদের লুকোচুরি খেলা দারুণ জমে উঠত। আলো ও আঁধারের রহস্য কেটে কেটে আমরা খুঁজে বেড়াতাম একে অন্যকে।

১০ এপ্রিল রাতটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আকাশবাণী কোলকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে বারবারই প্রচার করা হচ্ছিল যে রাত ১০টার পর একটি বিশেষ সংবাদ প্রচারিত হবে। রান্নাঘরে ব্যস্ত কাকিকে (হোসনে আরা বেগম) আম্মা পশ্চিমের কোঠার দোতলায় আমাদের শোবার ঘরে ডেকে নিলেন। আম্মার নির্দেশে খেলা ফেলে ইপি ও দিপিসহ রিমি ও আমি জড়ো হলাম আম্মার খাটের ওপর। বাইরের বাংলা ঘরের বারান্দায় গ্রামের লোকজনসহ রেডিও ঘিরে মফিজ কাকুও অপেক্ষা করছেন সেই বিশেষ সংবাদের।

রাত ১০টায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতেজ ও মসৃণ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদটি। তিনি বললেন, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামের নতুন এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। এখন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রচারিত হবে। তারপর শুরু হলো আব্বুর ভাষণ। আব্বুর কণ্ঠ শুনে বিপুল বিস্ময় ও আনন্দে আমরা বাকরুদ্ধ। যেন স্বর্গলোক থেকে ভেসে আসছে কোনো দৈবকণ্ঠ, ইথার তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ভেসে আসা আব্বুর কণ্ঠস্বর আমরা শুনলাম এমনই একাগ্রতার সঙ্গে।

আব্বু বললেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাইবোনেরা, বাংলাদেশের সাড়ে-সাত-কোটি মুক্তি পাগল গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাঁদের, যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তাঁদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছেন। যত দিন বাংলার আকাশে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা রইবে, যত দিন বাংলার মাটিতে মানুষ থাকবে, তত দিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের বীর শহীদদের অমরস্মৃতি বাঙালির মানসপটে চির অম্লান থাকবে।... পুরাতন পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবার সঙ্কল্পে আমাদের সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে গেলে চলবে না যে এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ এবং সত্যিকারের অর্থে এক কথাই বলতে হয় যে এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা, তাদের সাহস, তাদের দেশপ্রেম, তাদের বিশ্বাস, স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তায় তাদের নিমগ্নপ্রাণ, তাদের আত্মাহুতি, তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় জন্ম নিল এই নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ। সাড়ে-সাত-কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠুক আমাদের স্বাধীনতার সম্পদ। বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে-সাত-কোটি বীর বাঙালি ভাইবোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। যারা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। গণ-মানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক 'জয় বাংলা' 'জয় স্বাধীন বাংলাদেশ'।[৬]

আব্বুর সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি ছত্রেই ছিল সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনা স্বাধীনতার লক্ষ্যে ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জন্য। সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের

নিয়ন্ত্রণাধীন করে এবং সরকারের পক্ষ থেকে ভাতা ও নিয়োগপত্র প্রদান করে তাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছিল অত্যন্ত সুচারুভাবে। রক্তঝরা গণহত্যার শিকার একটি জাতির চরম সংকটপূর্ণ সময়ের দূরদর্শী নেতা আব্বুর সজাগ দৃষ্টি ছিল সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সেদিন বলেছিলেন, 'বিদেশি বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের কাছে যে অস্ত্র সাহায্য আমরা চাইছি তা আমরা চাইছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে একটি স্বাধীন দেশের মানুষ আর একটি স্বাধীন দেশের মানুষের জন্য। এই সাহায্য আমরা চাই শর্তহীনভাবে এবং আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রতীক হিসেবে, হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার এবং আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে, যে অধিকার মানব-জাতির শাশ্বত অধিকার। বহু বছরের সংগ্রাম ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য আমরা দিয়েছি তা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্র হওয়ার জন্য নয়। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন সার্বভৌম একটি শান্তিকামী দেশ হিসেবে রাষ্ট্র পরিবার গোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান আমাদের প্রাপ্য। এ অধিকার বাংলাদেশের সাড়ে-সাত-কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার।' আব্বুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, বিনয়, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, সততা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন চারিত্রিক গুণাবলির কারণেই তিনি ভারত সরকার ও ইন্দিরা গান্ধী প্রশাসনের শ্রদ্ধা, সম্মান ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১০ এপ্রিলের সেই নিশীথ রাতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনা আব্বুর ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি বিশ্লেষণ করার মতো বয়স আমার তখন ছিল না। কিন্তু তাঁর বক্তব্য থেকে একটি ব্যাপারই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে স্বাধীনতাযুদ্ধে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আম্মা গভীর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বললেন, 'আর চিন্তা নেই। তোমাদের আব্বু রয়েছেন স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃত্বে। জয় আমাদের হবেই।' মফিজ কাকু বাংলা ঘর থেকে ফিরে এসে উল্লসিত কণ্ঠে আম্মাকে অভিনন্দন জানালেন।

২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

কালুরঘাটে চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী বেলাল মোহাম্মদ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে মেজর জিয়াউর রহমানের (পরবর্তী সময়ে জেনারেল ও প্রেসিডেন্ট) ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাটি অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তিনিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। জিয়াউর রহমানের ঘোষণাটি সে সময় বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।

স্বাধীনতার এই ঘোষণাগুলো ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, আত্মদান, ৬-দফার জন্য সংগ্রাম, রক্তক্ষরণ, প্রথম জাতীয় সাধারণ নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের যুগান্তকারী ভাষণ ইত্যাদি বাঙালির আত্মাধিকারের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনাবলির মধ্য দিয়েই পুরো জাতি ধাপে ধাপে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল চূড়ান্ত স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতার ঘোষণাগুলো ছিল দুই দশকের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত মানসিক প্রস্তুতিরই একটি সফল উত্তরণ। কিন্তু তারপর ? স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত এই দামাল জাতিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি আইনানুগ জাতীয় সরকারের। সারা বিশ্বের সমর্থন লাভ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য ও সহযোগিতা আদায় এবং নবজাতক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের জন্যও জরুরি ছিল আইনগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের। ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করেছিল বিচ্ছিন্ন সংগ্রামকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় কাঠামোর মধ্য দিয়ে মূলধারায় প্রবাহিত করতে।

১০ এপ্রিলের পর থেকেই আমাদের পৃথিবীটি ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। পূর্ব দিগন্তে স্বাধীনতার যেই সূর্যটি উদীয়মান, সেই উদয়ের পথের নেতৃত্বে রয়েছেন আব্বু, আমাদের আর ভয় নেই।

১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে প্রথম বাংলাদেশের সরকারের মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে অনাড়ম্বর পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। আব্বুর সুযোগ্য সহযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আব্বু প্রধানমন্ত্রী, তাঁর তিন সহকর্মী ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী—অর্থমন্ত্রী; আবু হেনা এম. কামরুজ্জামান—স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী; এবং খন্দকার মোশতাক—পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। খন্দকার মোশতাক আসলে প্রধানমন্ত্রী পদের প্রত্যাশী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা হতে না পেরে তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হবে এই শর্তে তিনি সরকারে যোগ দেন।[৭]

১৭ এপ্রিল ইথারে আবারো ভেসে এল আব্বুর কণ্ঠস্বর, 'আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে তাঁরা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাওয়ার জন্য বহু কষ্ট করে, বহু দূর-দূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। ... পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য। ... আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট-বড় জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোনো শক্তি, ব্লক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না—আমরা আশা করি শুধু শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসঙ্কোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারো তাঁবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না।'[৮]

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর নামকরণ আব্বুরই করা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে যুদ্ধাবস্থায় সরকার যেখানে যাবে সেই স্থানের নাম হবে মুজিবনগর। পরবর্তীতে কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের ভবনটি মুজিবনগর নামে পরিচিত হয়।

মেহেরপুরের স্বাধীন বাংলাদেশের সেই প্রথম রাজধানীতেই কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন পাশের গ্রামের দশম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ বাকের আলী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আবদুল মান্নান। মেহেরপুরের এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমদ (পরবর্তী সময়ে ঢাকার পুলিশ প্রধান) এবং মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-এ-এলাহী চৌধুরী, রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেন। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী ও চিফ অব স্টাফ কর্নেল (অব.) আবদুর রবের নামও তিনি ঘোষণা করেন। আইনানুগ সরকারের মূলভিত্তি ও বাংলাদেশের সংবিধানের মূল উৎস স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি, যা ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম রচনা করেন, তা পাঠ করেন দিনাজপুর থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দলের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে 'আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে' উল্লিখিত হয়। প্রতিবছর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ঐ শপথ গ্রহণ দিবসেই প্রদান করা হয়। বিশ্বের আর একটি রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আইনানুগ সরকারের প্রতিষ্ঠা করে, সে দেশ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। বা থেকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান ও জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী। মুজিবনগর, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

২১ এপ্রিল কাঁধে ল্যাকটোজেন দুধের টিনের বোঝা বয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্রই বমি করে জ্ঞান হারালেন আমাদের হাসান ভাই (আবু আহসান)। চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে হাসান ভাইয়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হলো। যশোরের ছেলে, পুরনো ঢাকার যশোর বোর্ডিংয়ের মালিক, হাসান ভাই থাকতেন ১৭ নম্বর কারকুনবাড়ি লেনের খুব কাছেই ১৪ নম্বর কারকুন বাড়ি লেনে। আব্বু, ছোট কাকু, আমাদের চাচাতো ভাই দলিলউদ্দীন আহমদ (দলিল ভাই) ও আনার আপা ঐ ১৭ নম্বর বাড়িতে থাকতেন। ১৯৫৯ সালের ২৬ এপ্রিল আব্বু ও আম্মার বিয়ের পর আম্মা ঐ বাড়িতে প্রথম ওঠেন। প্রতিবেশী ও পারিবারিক বন্ধু হাসান ভাই আম্মাকে 'মামি' সম্বোধন করে এক মস্ত কেক দিয়ে বরণ করেন। সেই থেকে হাসান ভাই আমাদেরও বড় ভাই সমান। আমাদের শৈশবকাল থেকেই তাঁর সঙ্গে আমাদের আত্মার সম্পর্ক। সেই হাসান ভাইকেই আম্মা গোপনে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এক বছর তিন মাসের শিশু সোহেলের জন্য দুধ, ফ্যারেক্স, তালমিছরি ও ওষুধপত্র জোগাড় করে আনতে। গ্রামে এই প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধপত্রের প্রচণ্ড সংকট। নিরাপত্তার জন্য আম্মা তাঁকে রেলগাড়িতে আসতে নিষেধ করায় তিনি নদীপথে ও হাঁটাপথে ঐসব জিনিসপত্রের বোঝা নিয়ে বহু কষ্টে আমাদের মাঝে উপস্থিত হন। পথ অচেনা থাকায় ঐ ভারী বোঝা নিয়ে তাঁকে বাড়তি বেশ কয় মাইল ঘুরতেও হয়েছিল। হাসান ভাইয়ের মাধ্যমে শহরের খবরাখবর জানা হলো।

এরই মধ্যে ২৭ এপ্রিল দরদরিয়া পার্শ্ববর্তী শ্রীপুর বাজারে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করে। আব্বুর কাপাসিয়া মাইনর ইংরেজি স্কুলের শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস আকন্দের পুত্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক রুহুল আমিন ভাই (বর্তমানে ডক্টর রুহুল আমিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরপ্রাপ্ত) ও তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী রুবী

ভাবিও (উম্মে কুলসুম) সেদিন বিকেলেই তাঁর বড় ভাই ফারুক ভাই (বদরুজ্জামান)সহ কাপাসিয়া থেকে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। রুহুল আমিন ভাইয়ের বিয়েতে আমি তাঁর গাড়িতে চড়ে বরযাত্রী রূপে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। রুবী ভাবি তাঁর মিষ্টি স্বভাব দিয়ে আমাদের সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁরা আসার পর আমরা একত্রে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা সকলে সে রাতেই গ্রাম ত্যাগ করব। কালব্যাধি লিভার সিরোসিস রোগাক্রান্ত মফিজ কাকু পার্শ্ববর্তী দেওনা গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেবেন, কাকি ছেলেমেয়েসহ তাঁর বাবার বাড়ি হাতিরদিয়া রওনা হবেন এবং আমরা আপাতত ঢাকায় ফিরে যাব রুহুল আমিন ও হাসান ভাইদের সঙ্গে। গভীর রাতে চুপিসারে আমরা আমাদের প্রিয় দরদরিয়া গ্রাম ত্যাগ করলাম। নদীপথে ঢাকা শহরে ফিরে আম্মা প্রথমে গেলেন হাসান ভাইয়ের স্ত্রী জাহানারা ভাবির বাবার বাড়ি জোড়পুল লেনে। সেখানকার প্রতিবেশীদের মধ্যে আমাদের হঠাৎ উপস্থিতি সম্পর্কে কৌতূহলের উদ্রেক হওয়ায় রুহুল আমিন ভাই আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর শ্বশুরবাড়ি বাসাবোতে। ইতোমধ্যে আম্মা আওয়ামী লীগ নেতা হামিদ কাকুর সঙ্গে হাসান ভাইয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। হামিদ কাকু খবর পাঠালেন যে আম্মা যেন আমাদের সঙ্গে নিয়ে মুন্সিগঞ্জে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয়গ্রহণ করেন। সেখানে গেলে হামিদ কাকুর লঞ্চ আমাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে।

মুন্সিগঞ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার ফাঁকেই আমি রুবী ভাবির বাবা লুৎফুর রহমান কাকুকে জিজ্ঞাসা করলাম পথে পড়ার জন্য তাঁর লাইব্রেরি থেকে কোনো বই নিতে পারি কি না। জনাব লুৎফুর রহমান, যিনি নিজে ছিলেন বিদ্যান ও পণ্ডিত মানুষ, আমার বই পড়ার আগ্রহ দেখে খুশি ভরেই সম্মতি দিলেন। তাঁর লাইব্রেরি থেকে যে বইটা সেদিন তুলেছিলাম সেটির নাম ছিল টলস্টয়ের সেরা গল্প।

খবর পেয়ে আম্মা আমাদের সঙ্গে নিয়ে হামিদ কাকুর শ্বশুর বাড়িতে গেলেন। সেখানে একরাত কাটানোর পর তাঁর শ্যালক অনু মামা ও রুহুল আমিন ভাইসহ ছোট্ট একটি লঞ্চ আমাদের নিয়ে রওনা হলো পদ্মা নদীর তীরবর্তী বানরী গ্রামের উদ্দেশে। প্রাইভেট লঞ্চে একসঙ্গে এতগুলো তরুণের উপস্থিতিতে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে এ কারণে আম্মার পরামর্শ অনুযায়ী হাসান ভাই ও ফারুক ভাই শহরে ফিরে গেলেন।

অনু মামা লঞ্চ চালাচ্ছেন ও রুহুল আমিন ভাই তাঁকে সহায়তা করছেন। চারদিকে দিগন্ত-বিস্তারী পদ্মা নদী ও আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা। এরই মাঝে আমাদের লঞ্চ এগিয়ে চলছে। আমি ব্যাগ থেকে রাশিয়ার অমর কথাশিল্পী লিও টলস্টয়ের সেরাগল্পের বইটি খুলে ডুবে গেলাম অন্য জগতে। 'মানুষ বাঁচে কিসে' এই গল্পটির নায়ক দেবদূত মাইকেলকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল তিনটি মহা সত্যকে আবিষ্কার করার জন্য।

এক অতি দরিদ্র মুচি সাইমনের গৃহে আশ্রয় নেবার প্রথম দিনটিতেই শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত মাইকেল আবিষ্কার করেন প্রথম মহা সত্যকে। মানুষের মাঝে কী রয়েছে ? মানুষের মাঝে রয়েছে ভালোবাসা। অতি স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষও তার ভেতরে লুকায়িত ভালোবাসার স্পর্শে সোনার মানুষে পরিণত হতে পারে। দ্বিতীয় মহা সত্যটি তিনি আবিষ্কার করেন ছোট দুটি যমজ বালিকার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাতের মাধ্যমে। স্রষ্টার আদেশে তিনি পৃথিবীতে গিয়েছিলেন সদ্য জন্ম দেওয়া ঐ শিশু দুটির মায়ের জান কবচ করার জন্য। মাতৃহারা শিশু দুটিকে কে লালন-পালন করবে এই চিন্তার উদ্রেক হওয়ায় তিনি মায়ের জান কবচ না করেই স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। স্রষ্টা তাঁকে দেখান যে যিনি অতি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গেরও লালন-পালন করে থাকেন। তাঁর পক্ষে এই দুটি

শিশুর প্রতিপালনের ব্যবস্থা করাও অসম্ভব নয়। মাইকেল ফিরে আসেন পৃথিবীতে। সদ্য জন্ম দেওয়া যমজ কন্যার মা'র প্রাণ হরণ করে যখন স্বর্গের পথে রওনা হন তখন তাঁর বিশাল ডানা দুটি খসে পড়ে। আপনা-আপনিই আত্মা স্বর্গে চলে যায়। স্রষ্টার প্রথম আদেশ লঙ্ঘন করার জন্য এবং তাঁর মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে মাইকেলকে পৃথিবীতেই রয়ে যেতে হয় তিনটি মহা সত্যকে খুঁজে বের করার জন্য। ঐ সত্যগুলোকে জানার মধ্যেই তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হবে। দ্বিতীয় মহা সত্যটিকে খুঁজে পান ঐ যমজ বাচ্চা দুটিকে দেখে। মাতৃহারা বাচ্চা দুটির হাত ধরে তাদের জন্য নতুন জুতার অর্ডার দিতে এসেছিল তাদের পালক মা। তাঁর নিজ সন্তানের মৃত্যুতে ব্যাকুল ঐ মা গভীর স্নেহে বরণ করেন দুই শিশুকে। মেয়েদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা দেখে মাইকেল অনুধাবন করেন দ্বিতীয় মহা সত্যকে। মানুষ বাঁচে কিসে ? মানুষ বাঁচে ভালোবাসার স্পর্শে। তৃতীয় মহা সত্যটি তিনি খুঁজে পান এক আত্মগর্বে গর্বিত ধনী ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়ে। ঐ ব্যক্তি পার্টিতে যাওয়ার জন্য মূল্যবান চামড়ার এক জোড়া জুতার অর্ডার দিতে সাইমনের কাছে এসেছিলেন। মাইকেল সেই মুহূর্তে ঐ ধনী খদ্দেরের পেছনে দেখতে পেয়েছিলেন মৃত্যু-দূতের ছায়া। তৃতীয় মহা সত্যটির দ্বার এ ভাবেই উন্মোচিত হয়। মানুষ কী জানে না ? মানুষ জানে না তার মৃত্যু কখন হবে। অথচ সেই ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে কত পরিকল্পনা কত আস্ফালন ! তিনটি মহা সত্যের আলোকে আলোকিত মাইকেলের প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হয়। তিনি ফিরে যান স্বর্গে।

টলস্টয়ের অন্য গল্পটিও আমার মনকে নাড়া দেয়। গল্পটির নাম 'একজন মানুষের জন্য কতটুকু জমির প্রয়োজন।' গল্পটি এক ধনী, সম্পদ-লোভী মানুষকে কেন্দ্র করে। এই মানুষটির মধ্যে জমি-ক্রয়ের নেশা প্রবল ছিল। সূর্যোদয় হতে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সে যতটুকু জমি ভ্রমণ করবে তার সবটুকুই সে পাবে, বিক্রেতাদের এই প্রস্তাবে সে রাজি হয়ে যায় মহা স্ফূর্তিতে। অল্প জমি ভ্রমণ করে তার আশ মেটে না। আরও জমি লাভের আশায় সে ব্যগ্র পদচারণে, ঘর্মাক্ত কলেবরে, জমির সীমানাকে বৃদ্ধি করে। সূর্যাস্তের সময় সে বিশাল জমির মালিক বনে যায়। কিন্তু সম্পদ আর ভোগ করা হয়ে ওঠে না। জমির লোভে শরীরের সব শক্তি নিঃশেষিত এই মানুষটি হঠাৎই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বাস্তবিক, তার জন্য ততটুকু জমিরই প্রয়োজন ছিল যতটুকু দিয়ে তার শেষ শয্যা রচিত হয়েছিল।

গল্পের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসি বৃষ্টির প্রচণ্ড ঝাপটায় একাকার হয়ে। আকাশ আঁধার হয়ে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি নেমেছে। ঝড়বৃষ্টির দাপটে আমাদের লঞ্চ টলমল করে দুলছে। লঞ্চের খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকছে অবিরাম। কূল-কিনারাহীন পদ্মার ঢেউ ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। মনে হলো এই যাত্রায় পদ্মা নদীতেই আমাদের সলিল সমাধি ঘটবে। আমাদের লঞ্চটি একসময় দুলতে দুলতে জনমানবহীন পদ্মার এক চরে আটকে গেল। ঝড় থেমে যাওয়ার পর রুহুল আমিন ভাই এবার স্টিয়ারিং হুইল ধরে লঞ্চ চালকের আসন গ্রহণ করলেন। আর অনু মামা লাফ দিয়ে নেমে গেলেন পানিতে। রশির অভাবে আম্মার কিছু শাড়ি পেঁচিয়ে তা লঞ্চের সঙ্গে বেঁধে অনু মামা টানতে থাকলেন। উদ্দেশ্য, চরা থেকে লঞ্চকে পানিতে নামানো। আমরা সকলেই সাধ্য মতো সহায়তা করলাম লঞ্চটিকে চরামুক্ত করার জন্য। শেষ অবধি লঞ্চটি আবারো পানিতে ভাসল। বিজন সন্ধ্যায় আমরা উপস্থিত হলাম বানরী নামের অজানা গ্রামে। আমাদের আশ্রয়দাতা আওয়ামী লীগের সমর্থক এক অতি সজ্জন গৃহস্থ। সেই বাড়িতেই হামিদ কাকুও রয়েছেন পরিবারসহ। তাঁর দুই ছোট ছেলে বিপু ও অপু। একমাত্র কন্যা আমাদের সমবয়সী বন্ধু ইভাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি হলাম। হামিদ কাকু অতি উৎসাহে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করলেন।

দিনের বেলা ইভা, রিমি ও আমি চলে যেতাম পদ্মার তীরে। জোয়ারে সিক্ত নরম বালির মধ্যে আমরা লিখতাম 'জয় স্বাধীন বাংলাদেশ।' সারাদিন নদীর তীর ও ধানখেত, পাটখেত ও বনবাদাড়ে ঘুরে আমরা ঘরে ফিরতাম সাঁঝবেলা। চারদিকে তখন তক্ষক সাপের 'তক্কে তক্কে' ডাক শোনা যেত। বিশাল লেজওয়ালা কুমিরের মতো দেখতে একটি-দুটি তক্ষক সাপের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এই বানরী গ্রামেই।

বানরী গ্রামে কয়েক দিন থাকার পর আমাদের ক্ষণস্থায়ী এই ঠিকানা আবারো বদল হলো। এবার ঐ একই লঞ্চে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থানার রসুনিয়া গ্রামের উদ্দেশে। সেখানে আমাদের আশ্রয় দিলেন এক অতি সাহসী হিন্দু বিধবা। নাম রেণুকণা দে। তাঁর একমাত্র পুত্র অজয় ও কন্যা সবিতাসহ তিনি এক দালান বাড়িতে থাকেন। আমরা সেখানে পৌঁছবার পূর্বদিন তাঁদের প্রতিবেশী বাড়ির ১১ জনকে পাকিস্তানি বাহিনী দড়ি দিয়ে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। ওখানে যাওয়ার পর সন্ধ্যায় খবর এল সিরাজদিখান থানার প্রধান বাজারে পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্যাম্প স্থাপন করেছে।

এই খবর শোনার পর আমাদের আশ্রয়দাতারা তাঁদের ধর্মীয় বইপত্র ও সকল নিদর্শন মাটির নিচে পুঁতে ফেললেন। আমাদের নিরাপত্তার জন্য ঐ সাহসী নারী তাঁর পুত্রসহ গোয়াল ঘরে সারা রাত জেগে পাহারা দিলেন। এই আশঙ্কা ও উদ্বেগপূর্ণ রাতে আমাদের মনে পড়ল গৃহশিক্ষক ভবেশ (ভবেশ পাল) স্যারের কথা। তিনি বেঁচে আছেন তো ? লক্ষ্মীপূজার সময় তিনি রিমি ও আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ফেরার সময় তাঁর বাবা, মা আমাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন একরাশ তিল ও নারকেলের নাড়ু।

পরদিন সকালে একটি দুঃখজনক সংবাদে আমাদের মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। পদ্মা নদীর পাড়ের সেই ছায়াঘেরা শান্ত সবুজ বানরী গ্রামকে পাকিস্তানি বাহিনী পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। আমাদের আশ্রয়দাতা সেই অতি সজ্জন গৃহকর্তাকে গুলি করে হত্যা করেছে রক্তলোভী হায়েনার দল।

রসুনিয়া গ্রাম থেকে পালানোর মুহূর্তে শুনলাম এক অসম-সাহসী দেশপ্রেমিক তরুণের করুণ মৃত্যুর কাহিনি। সিরাজদিখান থানার বাজারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সৈন্যরা নিরীহ মানুষদের গুলি করে হত্যা করছিল। এই তরুণ মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে 'জয় বাংলা' বলে প্রতিবাদ করেছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা তাকে নদীর ঘাটে কোমর পর্যন্ত পানিতে নামিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছে 'জয় বাংলা না, বল জয় পাকিস্তান'। বেয়োনেটের আঘাতে তার শরীর লাল হয়ে উঠেছিল। পদ্মার পানিতে ধরেছিল আবিরের রং। মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ তার শেষ উত্তর 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে পদ্মার বুকে লুটিয়ে পড়েছিল। টলস্টয়ের গল্পটি চকিতেই মনে উদয় হলো। মানুষের মাঝে কী আছে ? ভালোবাসা। দেশপ্রেম তো ভালোবাসারই এক অমর প্রতীক। যার হৃদয়ে নেই ভালোবাসা সে তো অমানুষ মাত্র !

পরদিন রসুনিয়া গ্রাম থেকেও আমাদের পালাতে হলো। এরপর আরও কত গ্রাম যে আমাদের ঘুরতে হলো তার হিসাব নেই। মনে পড়ে, আমরা অজান্তেই আশ্রয় নিয়েছিলাম এক পাকিস্তান-সমর্থক দালালের বাড়িতে। ভোররাতে আম্মার ঘুম ভেঙে যায় পাশের ঘরে ফিসফিস শব্দে। সেই দালাল তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছিল হিন্দু-অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় আগুন ধরানোর। তাঁর কথাবার্তা আম্মা শুনে ফেলেন। সকাল হওয়ামাত্র আম্মা এক নৌকা ভাড়া করে আমাদের নিয়ে অন্যত্র চলে যান। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে গ্রামে অবস্থানও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। এই অবস্থায় আম্মা আমাদের সঙ্গে করে বুড়িগঙ্গা নদীপথে রওনা দিলেন ঢাকা শহরের পথে। পদ্মা থেকে বুড়িগঙ্গা জুড়ে ভেসে চলেছে কত শত মানুষের লাশ ! অধিকাংশ লাশই একসঙ্গে দড়িতে বাঁধা এবং অনেক লাশের স্তূপের ওপর চিল-শকুন বসে রয়েছে।

গানবোটে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের সুতীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে আপাদমস্তক বোরখার আড়ালে লুক্কায়িত আম্মার হাত ধরে আমরা লঞ্চঘাটে নামলাম। লঞ্চঘাট থেকে বেবিট্যাক্সি করে সোজা বড় মামুর ধানমণ্ডির ১৩/২-এর বাড়িতে। আমাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে সকলে যারপর নাই খুশি হলো। সমবয়সী মামাতো বোন শিরিন, নাসরিন ও ইয়াসমিনের কাছে আমরা উজাড় করে দিলাম গত দুইমাসের কাহিনি। আমাদের বড় মামাতো বোন, কলেজ ছাত্রী লাইলী আপা সংগোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন জেনে পুলকিত হলাম। কিন্তু সেখানে থাকা সম্ভব হলো না। বড় মামুর বাড়ির আশপাশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আস্তানা থাকায় সেখান থেকে আম্মা চলে গেলেন মগবাজারে আনার আপা ও সাঈদ ভাইয়ের বাড়িতে। তখন শহরজুড়ে সেনাবাহিনীর তৎপরতা। তার মধ্যেই সাঈদ ভাই তাঁর প্রতিরোধযুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর শোবার ঘরের খাটের নিচে লুক্কায়িত অস্ত্রশস্ত্র, ঔষধপত্র এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের নানাবিধ প্রচারপত্র তিনি সংগোপনে বিলি করেন মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে। পরবর্তী সময়ে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন এবং অলৌকিকভাবে রক্ষা পান। ছোট মামুর দুই মেয়ে মুন্নী আপা ও এরফানা আপাও দেশরক্ষার্থে সংগ্রাম পরিষদ থেকে ট্রেনিং নেন। উলানিয়ায় নানা বাড়ি থেকে মগবাজারে ফিরে আসার পর এরফানা আপা হন তাঁর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এক যোগাযোগ মাধ্যম। ছোট মামু ও মামির অজান্তে তিনি বুকশেলফের বইয়ের পেছনে অস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন। অপারেশনে যাবার আগে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে যেত। দেশ মুক্তির জন্য বাঙালি হৃদয় সেদিন একাত্ম। ঘরে ঘরেই চলছে প্রতিরোধ সংগ্রাম।

সাঈদ ভাইয়ের বাড়িতেই শ্রীপুরের আওয়ামী লীগ নেতা রহমত আলীর সঙ্গে আম্মার যোগাযোগ হলো হাসান ভাইয়ের মারফত। তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে কোলকাতায় গিয়েছিলেন। আব্বুর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। ২৫ মার্চ রাতে বাড়ি ছাড়ার পর থেকে আব্বু আমাদের কোনো সংবাদই জানতেন না। রহমত আলীকে তিনি বলেছিলেন যশোর বোর্ডিংয়ে হাসান ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই আমাদের সংবাদ জানা যাবে। যদি আমরা বেঁচে থাকি তা হবে সুখের বিষয় এবং যদি আমাদের মৃত্যু ঘটে তাহলে আব্বু সান্ত্বনা খুঁজবেন মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে। রহমত আলী ভাই আমাদের কাছে এলেন মুক্তির দূত হয়ে। ২১ মে তাঁর সঙ্গে আমরা রওনা দিলাম সীমান্তের পথে। সঙ্গে তাঁর শ্যালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.কম অনার্স বর্ষের ছাত্র রতন ভাই (শফিকুল ইসলাম তালুকদার)। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা আনার আপা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আমাদের বিদায় দিলেন। আবার কবে দেখা হবে কেউই জানে না।

রহমত আলী ভাইয়ের সঙ্গে এবারের যাত্রার অভিজ্ঞতা ছিল অন্যরকম। এবারে আর ঘূর্ণিপাকের মতো এ-গ্রাম ও-গ্রাম, এ-বাড়ি ও-বাড়ি আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো নয়, এবার আমাদের স্থির লক্ষ্য যে করেই হোক সীমান্ত পার হওয়া। রহমত আলী ভাই তাঁর চেনা পথেই আমাদের আগরতলায় নিয়ে গেলেন। পথে যেতে যেতে নানার কথা খুব মনে পড়ছিল। আমাদের ধানমণ্ডির বাড়িতে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প বসেছে। সেখানেই নানা গৃহবন্দি হিসেবে দিনযাপন করছেন। খুব ইচ্ছে করছিল এক নজর নানাকে দেখে যাই, কিন্তু মিলিটারির হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা পদে পদে। নানা ও আমাদের সবারই জীবনের ঝুঁকি, যদি একবার আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। ফারসি দর্শন ও কাব্যের রাজ্যে আমার প্রথম প্রবেশ নানার হাত ধরে। আমার ছয় বছর বয়সে তিনি আমার সামনে মেলে ধরেছিলেন শেখ সাদি, হাফিজ ও মওলানা জালালউদ্দীন রুমীর জগৎকে। যেন অতলান্তিকের গভীর হৃদয় থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন কোনো সমুজ্জ্বল মুক্তা, এমনি আনন্দে বিভোর হয়ে তিনি আমাকে আবৃত্তি শেখাতেন। আমার কচি কণ্ঠে উচ্চারিত হতো সাদির জীবনদর্শন—

কাফেলা রাফত হাস্ত
মা হাম মিরাভিম
মঞ্জিল দো রুয
ইন হাম বাস আস্ত

কাফেলা চলে গিয়েছে। আমাদেরও যেতে হবে। দু'দিনের এই ঘরে, এইটুকুই যথেষ্ট। মৃত্যুর আশঙ্কা ও সব অনিশ্চয়তাই বিলীন হয়ে যায় ঐ ব্যাপক জীবনদর্শনের সান্নিধ্যে এসে। গভীর প্রত্যয় নিয়ে শুরু হয় পথ চলা দু'দিনের এক ক্ষণস্থায়ী আবাসের সন্ধানে।

ডেমরা ঘাট, কাঁচপুর, বৈদ্যের বাজার হয়ে আমাদের লঞ্চ একসময় ভেড়ে এক নিটোল সুন্দর গ্রামে। কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত এই গ্রামটির নাম রামচন্দ্রপুর। নদীর তীরবর্তী এক তরুণ ওয়্যারলেস অফিসারের গৃহে আনার আপার রান্না করা খাবার আমরা ভাগাভাগি করে খেলাম। এই তরুণ অফিসার তাঁর ছোট্ট কেরোসিনের চুলায় বড়দের জন্য চায়ের পানি বসালেন। চা-পর্ব শেষ হতেই আমরা আবারো ছুটলাম। যাত্রাপথে দেখা হলো সিরাজউদ্দীন ওরফে তেজগাঁও থানার শিলু দারোগার সঙ্গে। তিনি ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মী এবং গোপনে আব্বুর কাছে নিয়ে আসতেন পাকিস্তান প্রশাসনের ভেতরের খবর। আমাদের দুই বোনকে তিনি চিনতেন। গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো পথের মধ্যে তিনি আমাদের আবিষ্কার করলেন এবং সানন্দে আমাদের গাইড রূপে দুর্গম যাত্রাপথের সঙ্গী হলেন।

ঐ এলাকার এক আওয়ামী লীগের এমএনএ'র বাড়িতে সন্ধ্যায় আশ্রয় নিলাম। কিন্তু মাঝরাতেই আম্মার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। তক্ষুনি ঐ গ্রাম ছাড়তে হবে। খবর এসেছে যে মিলিটারিরা খুব শিগগির আক্রমণ চালাবে। গাঢ় আঁধারে আমরা পথ পাড়ি দিলাম। আম্মার ভাঙা পা-জোড়া লাগলেও দ্রুত হাঁটার মতো শক্তি সেই পায়ে তখনো ফিরে আসেনি। তার পরও তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যত দ্রুত হাঁটা সম্ভব হেঁটে চললেন।

হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে আমার হাতে হাত রেখে বললেন, 'ভয় কোরো না, একমনে হামিম, হামিম পড়ে শরীরের চারপাশে ফুঁ দিয়ে দাও। কারো সাধ্যি নেই ক্ষতি করার।' আম্মা এত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটি বললেন যে আমি নির্ভয়ে কুরআনের এই রহস্যাবৃত শব্দটি পড়তে পড়তে সম্মুখে এগোতে থাকলাম। ঐ বাড়ির দুই মুক্তিযোদ্ধা তরুণ মোস্তফা ও মোশারফ ভাই সোহেল ও মিমিকে কাঁধে করে আমাদের নিয়ে গেলেন নদীর ঘাটে। এরপর নৌকা করে ভিন্ন এক গ্রামের বাজারে পৌঁছলাম খাবার কেনার জন্য। তক্ষুনি আমরা জানতে পারলাম যে রামচন্দ্রপুর গ্রামটি পদ্মাতীরের বানরী গ্রামের মতোই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। আরও পরে জানতে পেরেছিলাম যে রামচন্দ্রপুর গ্রামের অতিথিপরায়ণ সেই তরুণ ওয়্যারলেস অফিসারকেও পাকিস্তানি সেনা গুলি করে হত্যা করেছে।

সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার পথে আমাদের প্রথম বাধা ছিল সিঅ্যান্ডবি পুল। ঐ পুলের ওপর দিয়েই মিলিটারির জিপ যাতায়াত করে এবং অস্ত্রধারী সেনারা টহল দিতে থাকে। সেই পুলের নিচ দিয়েই আমাদের পার হতে হবে অতি সন্তর্পণে। কোনো কোনো কৃষক ডিঙি করে চলছে, আবার কোনো কৃষক প্রাণ হাতে করে কোমরপানিতে নেমে পুলের চারধার জুড়ে বাড়ন্ত সবুজ ধান ও পাটখেতের পরিচর্যা করছে। মাঝে মাঝে পুলের ওপর থেকে এলোপাতাড়ি গুলি চালানো হয়। তখন কৃষকরা পানির মধ্যে মাথা গুঁজে লুকানোর চেষ্টা করে। আমাদের কিছু দূরেই খেতের পাশ দিয়ে বেশ কয়টি লাশ ভেসে যেতে দেখলাম। এরই মধ্যে আমাদের ডিঙি ছেড়ে আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে কোমরপানিতে নেমে পড়লাম। সামনের দলে মাঝির সঙ্গে রিমি, আমি ও রতন ভাই। আম্মা, সোহেল, মিমিসহ পেছনের দলে। একসঙ্গে সবাই যাতে মারা না যাই সেই জন্য আম্মা এই ব্যবস্থা করেছেন। পুলের ঠিক নিচেই এক গর্তের মধ্যে রতন ভাই ও আমি পড়ে

গেলাম। আমরা কেউই সাঁতার জানি না, এবং গর্তের কারণে ওই জায়গায় পানি ছিল বেশ গভীর। ঢকঢক করে পানি গিলতে গিলতে আমরা ডুবতে লাগলাম। ক্ষণিকের মধ্যেই মনে হলো পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নয় এই পুলের নিচের পানির মধ্যেই আমাদের সলিল সমাধি ঘটবে। মাঝি আমাদের একটু পেছনে ছিল। সে এসে এই দুই অসাঁতারু শহুরুকে রক্ষা করল।

সিঅ্যান্ডবি পুল পার হওয়ার সময় আম্মা এক অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পান। এক সাদা দাড়িওয়ালা ও সাদা পোশাক পরিহিত জোতির্ময় বৃদ্ধ আম্মার মাথার ওপর হাত রেখে অভয় দিচ্ছেন। মুহূর্তের মধ্যেই আম্মার মনের ভেতরে জমে থাকা সব আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। এই একই বৃদ্ধকে তিনি দেখেছিলেন ২৫ মার্চের রাতে। পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন তাণ্ডবলীলা করে ধানমণ্ডির বাসা আক্রমণ করে তক্ষুনি আতিয়া কাকির পাশে দাঁড়ানো আম্মা ঐ জ্যোতির্ময় বৃদ্ধকে তাঁর মাথার ওপর ডান হাত রেখে অভয় দিতে দেখেন। দৃশ্যটি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের। তারপরই আম্মা গভীর প্রত্যয়ে আতিয়া কাকিকে বলেন, 'ভয় নেই আতিয়া, মিলিটারিরা আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।'

জীবনের বাঁকে বাঁকে সঞ্চিত এমন অলৌকিক ঘটনার পসরা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি সমুখে। আরও কিছু গ্রাম, আরও কিছু প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আমরা ধাবমান হই রেললাইনের দিকে।[৯]

রেললাইনটি হলো আমাদের সর্বশেষ প্রতিবন্ধক। এই বিভীষিকাময় রেললাইনের একটু দূরেই পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ও সেখানে প্রচণ্ড রকমের যুদ্ধ চলছে। রেললাইনের দিকে ধাবমান রিমি ও আমি হঠাৎই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম আমাদের দল থেকে। আমাদের সঙ্গে পোঁটলাপুঁটলি কাঁধে নিয়ে দৌড়াচ্ছে হাজার হাজার সহায়-সম্বলহীন, ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ। সন্তান-সম্ভবা এক কিশোরী প্রসব যাতনায় লুটিয়ে পড়ল পথের ধারে। আর্তনাদরত সেই কিশোরীর পাশে এসে দাঁড়াল আরেক নারী। কোলে তাঁর ক্রন্দনরত শিশু। তার মধ্যেও সে সন্তান সম্ভবা কিশোরীটিকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। স্রোতের মতো মানুষের ধাক্কায় আমি এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। ঐ দুই নারী পেছনে মিলিয়ে গেল। আমার আশপাশের মানুষের কণ্ঠ থেকে একটি চিৎকারই বারবার শুনতে পাচ্ছিলাম, 'বর্ডার, বর্ডার।'

মাথার ওপরে গনগনে সূর্য, নিচে হাজারো শরণার্থীর ভিড়ে আমরা ছুটছি বর্ডারের সন্ধানে। যেন বর্ডার পেরোলেই আমরা পৌঁছে যাব কোনো অলৌকিক শান্তির রাজ্যে। তৃষ্ণায় রিমি ও আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। দৌড়াতে দৌড়াতে পা যখন আর চলে না, মাথা ঝিমঝিম করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন বলল, 'ঐ দেখা যায় বর্ডার।' বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আমরা তাকালাম সবুজ ঘাসের জমিনে রাখা এক খণ্ড সাদা পাথরের দিকে। ঐ পাথরখণ্ডটির ওদিকে ভারতের শুরু। আমরা তখনো বাংলাদেশের সীমানায় দাঁড়িয়ে রয়েছি হতভম্বের মতো। বর্ডার বলতে উঁচু লোহার বিশাল কোনো গেট বা দেওয়ালের ছবি আমার মনে অঙ্কিত ছিল। তার বদলে কি না এই ছোট্ট পাথরখণ্ড ! ভারত ও বাংলাদেশের সীমানার চিহ্নরূপী এই ছোট্ট পাথরখণ্ডটি অতিক্রম করলেই আমরা পৌঁছে যাব ভারতে—নিরাপদ স্থানে। অথচ মনের মধ্যে স্ফীত হওয়া একরাশ অনুভূতির জোয়ারে প্লাবিত, আমার হৃদয়ের দৃষ্টিতে, সীমানার ঐ ক্ষুদ্র চিহ্নটিই ছিল এক অসীম প্রতিবন্ধক। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে হবে স্বেচ্ছায় নয়, প্রাণ রক্ষার্থে ! সেজন্যই বাংলাদেশের সীমানার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হলো আমার জীবন-প্রাণ সবই যেন রেখে গেলাম বাংলাদেশের মাটিতে। রিমি ও আমি অশ্রুর প্লাবনে সিক্ত হয়ে পার হলাম সীমানা। মনে মনে বললাম, 'বিদায়, প্রিয় বাংলাদেশ'। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। দিনটি ছিল ২৫ মে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। আগরতলা সীমান্তবর্তী এই জায়গাটির নাম বক্সনগর। এই বক্সনগরের প্রাইমারি স্কুলের সামনের এক বিশাল দিঘি থেকে রিমি ও আমি আঁজলা ভরে পানি খেলাম। আর একটু হেঁটে দেখি পোস্ট অফিসের পাশে একটি টিউবওয়েল।

সেখান থেকে আবারো পানি খেলাম। পিপাসা যেন মিটতেই চায় না। আরও কিছুদূর হাঁটার পর দেখি আম্মা এক বিশাল কাঁঠালগাছের নিচে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা দৌড়ে আম্মা, আমেনা, মিমি ও সোহেলের সঙ্গে মিলিত হলাম। আম্মার মাথাভর্তি জটা। ডানহাতের মুঠোয় তিনি বাংলাদেশের মাটি ধরে রেখেছেন। আমাদের সবার পরনে ছিন্নভিন্ন ময়লা কাপড় এবং সবাই দারুণ ক্ষুধার্ত। এক সদয় গৃহিণী আমাদের খৈ, গুড় ও ছাতু দিয়ে ভারতের মাটিতে আপ্যায়ন করলেন। আমাদের দলের কে একজন সোৎসাহে বলল, 'আর ভয় নেই। এখন আমরা ইন্ডিয়াতে পৌঁছে গেছি।' আমি আম্মার কানের কাছে মুখ নিয়ে বিস্ময় ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'আম্মা, ইন্ডিয়াতেও কি কাঁঠাল গাছ হয় ?' ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে নিদারুণ অজ্ঞ মেয়েটির কথা শুনে আম্মা ঐ অবস্থার মধ্যেও হেসে উঠলেন। ইন্ডিয়া বলতে নানা, মামা ও আম্মার মুখে কোলকাতার ছাত্রাবাস, বেকার হোস্টেল, ইসলামিয়া হোস্টেল, মানুষ-টানা রিকশা, গড়ের মাঠ, রাইটার্স বিল্ডিং ও ভীমনাগের সন্দেশের কথা বুঝতাম। তার মধ্যে আম ও কাঁঠালগাছের কোনো বিবরণ ছিল না। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে দেখি মাটি ও প্রকৃতির মধ্যে কী নিবিড় মিল! অমনটি যদি মানুষের মধ্যে পাওয়া যেত!

বক্সনগরের শরণার্থী শিবিরটি আম্মা আমাদের নিয়ে ঘুরে দেখলেন। কঙ্কালসার শিশুদের দুর্দশা দেখে চোখ বেয়ে পানি আপনিই ঝরতে লাগল। সহায়-সম্বলহীন ভিটে-মাটি-ছাড়া মানুষদের আম্মা আশ্বাস দিলেন। তাদের দুঃখের দিন অবসানের আর দেরি নেই। দেশ হানাদারমুক্ত হবেই। আগরতলা সার্কিট হাউসে দেখা হলো নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের এমএনএ সামসুজ্জোহা কাকু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে। তাঁর দুই মেয়ে নিগার আপা (নিগার সুলতানা) ও নার্গিসের (নার্গিস আক্তার) সঙ্গে ভাব হয়ে গেল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই।

সীমান্ত পার হওয়ার দু'দিন পর ২৭শে মে আমরা মালবাহী কার্গো বিমানে চড়ে কোলকাতার দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। সেখান থেকে বাংলাদেশ মিশনের হাইকমিশনার হোসেন আলী সাহেবের পার্ক-সার্কাসের বাসভবনে পৌঁছলাম পড়ন্ত বিকেলে। বাসভবনটির সঙ্গেই বাংলাদেশ মিশন। ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণের পরদিন ১৮ এপ্রিলে কোলকাতায় নিযুক্ত পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী তাঁর মিশনের সকল কর্মচারীসহ আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এর আগে ১৫ এপ্রিলে আব্বু গোপনে হোসেন আলীর সাথে দেখা করে তাঁকে বাংলাদেশের পক্ষে থাকতে রাজি করান। এ বিষয়ে মঈদুল হাসান লেখেন, 'হোসেন আলী এবং ডেপুটি হাইকমিশনে নিযুক্ত সব বাঙালি যাতে ১৮ এপ্রিল একযোগে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করেন তার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয় দু'দফা বৈঠকে।'[১০]

হোসেন আলী সাহেব, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কার্গো বিমানে করে কোলকাতা পৌঁছাতে আমাদের প্রায় নয় ঘণ্টা সময় লেগেছিল। সারা দিনের ভ্রমণের ধকলে ও অনাহারে বিধ্বস্ত আমরা গোসল ও খাওয়া-দাওয়া সারার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো আম্মা যেন ধাক্কা দিচ্ছেন। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো মিলিটারি বোধহয় আক্রমণ করতে আসছে। এক্ষুনি পালাতে হবে। কিন্তু না, এ তো বাংলাদেশ মিশন! ভাইবোনরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। আম্মা এপাশ-ওপাশ করছেন। আমি পা টিপে টিপে বারান্দায় বেরিয়ে পড়লাম। কেমন এক অস্থিরতায় ঘুম আর এল না। হোসেন আলী সাহেবের তরুণী কন্যা ও আমার সমবয়সী ছেলে জ্যাক জিজ্ঞেস করল 'গান শুনবে ?' আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তারা উৎসাহভরে রেকর্ডে শিল্পী অংশুমান রায়ের সেই হৃদয় আলোড়িত করা গানটি ছেড়ে দিল :

শোনো একটি মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি
প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি...
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।
বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের যে তার নেই কো শেষ
বাংলাদেশ।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় ও সমর দাসের সুরে, অংশুমান রায়ের এই গানটি প্রথম শুনি আমাদের দরদরিয়া গ্রামে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে। আকাশবাণী থেকে এই গানটি প্রচারিত হয়েছিল। পরদিন সন্ধ্যায় রিমির সঙ্গে বাংলাদেশ মিশনে ৭ মার্চের অগ্নিঝরা বক্তৃতা, এই গানটি আবারও শোনার ও শিল্পী অংশুমান রায়কে দেখারও সৌভাগ্য হয়।

গান শেষ হওয়ার পর রাতে আমি মিশনের বারান্দার সোফায় বসে ম্যাগাজিন পড়ছিলাম। একটি পত্রিকায় বেগম হোসেন আলীর সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। বগুড়া জেলার এই নম্রভাষী মহিলা স্বাধীনতাযুদ্ধের সপক্ষে বাংলাদেশ মিশনের সকলকে যেভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন ও তাঁর স্বামীকে সহায়তা করেছেন সেই বিষয়ের ওপর সাক্ষাৎকারটি। সেটা পড়ার সময় হঠাৎ দেখি বারান্দার দরজা দিয়ে হোসেন আলী সাহেবের সঙ্গে আব্বু প্রবেশ করছেন। আমি বিস্ময়ে ও আনন্দে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আব্বু এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত বুলালেন। হোসেন আলী সাহেব নিজেই গেলেন আম্মাকে আব্বুর আসার সংবাদটি জানাতে। এদিকে আব্বু আমাকে নিয়ে সোফায় বসে প্রথমেই জানতে চাইলেন আমাদের কাপাসিয়া এলাকার মানুষের তৎপরতা সম্বন্ধে। আব্বুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মনে হলো এক নিমেষেই আমি যেন এগারো থেকে একুশে পদার্পণ করেছি। আব্বুর সঙ্গে আমার জীবনের বিরল কয়েকটি মিনিটের একান্ত আলাপের বিষয়বস্তু ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণ, মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কেন্দ্র করে। আমি সোৎসাহে এক নিঃশ্বাসে গড়গড় করে বলে গেলাম আমাদের কাপাসিয়া থানা থেকে অসীম সাহসী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র নেওয়ার কাহিনি।

১০ এপ্রিল আব্বু তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়ে জাতীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ঠিক সেদিনই আমাদের এলাকার যুব-তরুণরা লড়াই করার জন্য কাপাসিয়া থানা থেকে অস্ত্র লুট করে আমাদের এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। একই দিনে ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনা কাকতালীয় হলেও এই অস্ত্র লুটের ঘটনাটির মধ্যে দিয়ে এলাকাভিত্তিক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। তরুণদের মধ্যে ব্যাপক আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটে। ইংরেজ আমলে বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের (১৮ এপ্রিল ১৯৩০) বিপুল সাড়া জাগানো কাহিনিটি শুনে মনে হতো যে স্বদেশ মুক্ত করার সংগ্রামে লুণ্ঠিত অস্ত্র তো বাস্তবিক উদ্ধারকৃত অস্ত্রই। একচল্লিশ বছর পর ঐ একই এপ্রিল মাসের এক ঘন সন্ধ্যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে স্বদেশ মুক্ত করার লক্ষ্যে কাপাসিয়া থানা থেকে অস্ত্র লুণ্ঠনকারী দুঃসাহসী যুব-তরুণদের মধ্যে ছিলেন ফজলুর রহমান, মাহমুদুল আলম খান বেনু, কামালউদ্দীন নাননু, কামাল মিয়া, নূরুল ইসলাম, শহীদুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ, নুরুন্নবী খসরু, বজলুর রশীদ মোল্লা, আব্দুল আউয়াল প্রমুখ। (মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের কাছ থেকে নামের তালিকা ও বাকি বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে)। অস্ত্র লুণ্ঠন করার পর তাঁরা শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে চরখামের স্কুলে অস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হামলা এড়াতে গিয়ে তাঁরা পরে ঐ স্থান ছেড়ে উত্তরখামেরে ক্যাম্পটি স্থাপন করেন। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন থাকা সম্ভবপর না হওয়ায় তাঁরা রায়দ ইউনিয়নের কপালেশ্বর

হাইস্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করেন। এই ক্যাম্পটিতে প্রচুর মুক্তিপাগল তরুণের সমাগম ঘটে এবং এখান থেকেই এমএনএ ফকির শাহাবুদ্দীনের (বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল) নেতৃত্বে তাঁরা উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য মে মাসের শেষে ভারত গমন করেন। একই সময়ে আমরাও সীমান্ত পার হই।

আব্বু খুব মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনছিলেন। সেদিন আমার খবরের ঝুলি থেকে শুধু ১০ এপ্রিলের অস্ত্র লুণ্ঠনের সংবাদটিই আব্বুকে বলতে পেরেছিলাম। একটু পর লম্বা বারান্দার ওপাশের গেস্টরুমের দরজা খুলে গেল হোসেন আলীর টোকায়। আব্বুও তক্ষুনি সোফা ছেড়ে গেস্টরুমের দরজার দিকে হাঁটা শুরু করলেন। তিনি রিমি এবং আমার মাথায় আবারও হাত বুলালেন। ঘুমন্ত মিমি ও সোহেলকে একনজর দেখলেন, তারপর আধাখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়েই আম্মার সঙ্গে সামান্য সময় কথা বললেন। যে আব্বুকে দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার এবং আমাদের এই দুই মাসের শিহরণ জাগানো অভিজ্ঞতাগুলো তাঁকে বলার জন্য আমরা অধীর, সেই আব্বু এলেন 'ক্ষণিকের অতিথি' হয়ে। কথাও বললেন, খুব সংক্ষিপ্ত আকারে। আম্মা সেই গভীর রাতের অভিজ্ঞতাকে আমার কাছে দেওয়া লিখিত এক সাক্ষাৎকারে (৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩) প্রকাশ করেছিলেন বহুকাল পর গভীর আবেগভরা হৃদয় দিয়ে। তাঁর ভাষায় 'আমার জীবন ও ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে মিলনের মুহূর্তে তাজউদ্দীনের নির্ভুল সিদ্ধান্তের অমোঘ ঘোষণা। গাঢ় ক্লান্তির ঘোরে প্রায় অসচেতন অবস্থায় প্রতিটা মুহূর্ত যেন কেটে যাচ্ছে। এই বুঝি এসে পড়লেন। রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় তিনি এসে পৌঁছালেন ঐ বাড়িতে। দরজায় টকটক টোকা দেওয়ার শব্দে ধড়মড়িয়ে দরজা খুলতেই দেখি হোসেন আলী। উদ্বিগ্ন স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি আসেন নাই ? কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি জবাব দিলেন, 'স্যার এসে গেছেন'। করিডোরের ওপাশে দৃষ্টি ফেলতেই দেখি তাজউদ্দীন আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। প্রায় এক ফিট দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি যেন হতভম্ব। অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি থমকে গেলেন। সেই মুখে কী দেখেছিলাম অমন গভীর রাতে! ফেলে আসা দু'মাসের ভয়ংকর ঘটনাবলির যে মর্মান্তিক বর্ণনা নিজ মুখে তাঁকে শোনাব বলে যে ছক প্রায় নিশ্চিতভাবে সজ্জিত ছিল মনে, বাস্তবতার অসাধারণ শক্তি দিয়ে নিমিষে তা যেন আড়াল করে দিল। যাকে ছোঁয়া যায় না। সে যে তখন মানুষ রূপের এক অসাধারণ মহামানব।

দুজনার দৃষ্টি বিনিময়ের সময়কালটা ছিল ১০-১৫ সেকেন্ড। অতি দ্রুত আর একটু কাছে সরে এসে বললেন, 'শোনো, আমি ৬-৭ মিনিট সময় হাতে নিয়ে এসেছি। এখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলছে। আমরা 'এক্সাইলে' (নির্বাসনে) সরকার গঠন করেছি। আমি এবং কেবিনেটের অন্য চারজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেছি যে দেশ পাকিস্তানি-সেনামুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আমরা কেউ ফ্যামিলির সঙ্গে থাকব না। আর একটা কথা, কালকেই এখান থেকে তোমাদের অন্য বাড়িতে সরিয়ে ফেলা হবে, কারণ এটা (সরকারি) অফিসারের বাসা' বলেই তিনি ঘড়ির দিকে দেখলেন। এই সময়কালটা ছিল ৫ থেকে ৬ মিনিট।

সেই মুহূর্তগুলোতে এমন গৌরবমণ্ডিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে আমি প্রাণভরে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে নয়, দারুণ শিহরণ জাগানো ঐকমত্য পোষণ করেছিলাম উদ্ভাসিত গভীর দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে। তিনি বুঝেছিলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন। সেই সময়কার ঐ মহান সিদ্ধান্ত হাজার বছরের যেন এক অমূল্য উপাদান। চলন্ত জীবনের কত ঐতিহাসিক ঘটনার উত্থানপতনের সঙ্গে বারংবার তাঁকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর পরিসরে। এ যে কত বড় অমূল্য সাধনার প্রাপ্তি!'

ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়া ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও দশকে ভালোবাসার কী অমূল্য আদর্শ রেখে গেলেন আব্বু। আর আম্মাই বা কত নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে একাত্ম করে দিলেন তাঁর জীবনসাথির মহৎ সংগ্রামের অনুচ্চারিত প্রেরণা হয়ে।

তারপর আমরা হোসেন আলী সাহেবের সরকারি বাসভবন ত্যাগ করে পার্ক স্ট্রিটে কোহিনুর ম্যানসনের চারতলা ফ্ল্যাটে উঠলাম। এই ফ্ল্যাটটিতে আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরবর্তীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অগ্রণী ও মজলুমদের নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব থাকতেন। তার একটি অংশে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। তাঁকে দাদু সম্বোধনের মাধ্যমে আমাদের ছোটদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়পর্ব শুরু হলো। তিনি আম্মার হাতের রান্নার খুবই ভক্ত হয়ে পড়লেন। আমাদের সঙ্গে মজার মজার গল্প করা ও ঝাল খাওয়ায় তাঁর জুড়ি ছিল না। আব্বুর নিবেদিত ও দূরদর্শী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

এই ফ্ল্যাটেই মিমি ও আমি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ি। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর স্টাফ মধুসূদন দত্ত আমাদের ঐ বিল্ডিংয়ের একজন ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। আমাদের নিরাপত্তার জন্য সে সময় সুকুমার চান্দ ও মোহন সিংহ নামে আরও দুজন নিরাপত্তা স্টাফ নিযুক্ত ছিল। সুকুমার চান্দ ছোট্ট সোহেলকে খুবই আদর করত এবং মোহন সিংহ নেপালের গুর্খাদের দুর্ধর্ষ লড়াইয়ের গল্প বলত। এক সপ্তাহ পরে আমরা সিআইটি রোডের (৩৯ ড. সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিউ) আটতলায় স্থানান্তরিত হই। বিল্ডিংঙের নাম চম্পা কোর্ট। মালিক আশু ঘোষ। মওলানা ভাসানীও একই দিন শিলংয়ে চলে যান। আমাদের ২৫ নম্বর ফ্ল্যাটের ঠিক উল্টো দিকের ২৭ নম্বর ফ্ল্যাটে খন্দকার মোশতাক আহমেদ তাঁর স্ত্রী ও পরিবারসহ থাকতেন। তাঁর পাশের ২৮ নম্বর ফ্লাটে থাকতেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাঁর পরিবার। ছয়তলায় পরিবারসহ থাকতেন এএইচএম কামরুজ্জামান। পাঁচতলায় ক্যাপ্টেন (অব.) এম. মনসুর আলী ও তাঁর পরিবার। কামরুজ্জামান সাহেবের মেয়ে রিয়া আপা ও মনসুর আলী সাহেবের একমাত্র মেয়ে সমবয়সী শিরিনের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। রিমি খেলত কামরুজ্জামান সাহেবের সবচেয়ে ছোট মেয়ে চুমকি ও নজরুল ইসলাম সাহেবের দুই মেয়ে রুপা ও লিপির সঙ্গে।

আমাদের এই ছোট্ট দুই রুমওয়ালা ফ্ল্যাটের পেছনের ব্যালকনিতে একদিন দাঁড়াতেই পাশের ফ্ল্যাটের এক ববকাটা ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে যায়। ওর ব্যালকনি থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে সে তার নামটি জানায়। তার ডাকনাম মিঠু। ভালো নাম নিবেদিতা পাল। ক্লাস থ্রির ছাত্রী সে। আমার চেয়ে প্রায় আড়াই বছরের ছোট মিঠুর সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায় বই বিনিময়ের মাধ্যমে। সেও বই পড়ার দারুণ ভক্ত। কদিন আগেই আম্মা, রতন ভাই ও রিমিসহ কলেজ স্ট্রিট থেকে একরাশ বই কিনে এনেছিলাম। সেই বইগুলোর মধ্যে ছিল দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প, বিদেশি গল্প চয়ন, ভূত পেত্নী-দৈত্য দানব, রাক্ষস-খোক্কস, শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প প্রভৃতি। ঐ বইগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের দাদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সহজ ভাষায় লেখা 'ছেলেদের মহাভারত', অবনীনন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'নালক'। রংচঙা ছবিওয়ালা চটি বইয়ের মধ্যে ছিল 'ভক্ত ধ্রুবের গল্প' ও 'ভক্ত প্রহল্লাদের গল্প'। বড় পরিসরের জীবনীর মধ্যে ছিল হজরত আব্দুল কাদির জিলানী, তাপসী রাবেয়া বসরী, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী। আম্মা কিনলেন শৈলেশ দে রচিত 'আমি সুভাষ বলছি'। ঐ বইগুলো আমার ক্ষুদ্র জগতের দুয়ার উন্মোচিত করে ও মনকে নাড়া দেয় বিপুলভাবে। 'নালক' বইটির মনোমুগ্ধকর ভাষা ও বিবরণ আমাকে এতই আপ্লুত করে যে আমি নিজে নিজেই ধ্যান অভ্যাস করার প্রচেষ্টা করি। পাঁচ বছরের মিমিকে বেছে নিই আমার ধ্যানের সহযোগী হিসেবে। চোখ বন্ধ করে মনে

মনে ভাবার চেষ্টা করি যে আমিও যেন সাধক ভিক্ষু নালকের মতো গৃহ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছি কোনো অজানায়। অথবা নালকের গুরু ধ্যানস্থ দেবল ঋষি, যিনি দিব্যদৃষ্টি মেলে সিদ্ধার্থ গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করবেন এই ঘটনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁরই মতো যেন দেখার চেষ্টা করি আমাদের মুক্তিযোদ্ধা বীরদের বিজয়; অথবা গৌতম বুদ্ধের মতোই যিনি ভরা পূর্ণিমার রাতে খুঁজে পেয়েছিলেন মানব মুক্তির পথ ধ্যানের গভীরে পৌঁছে, তাঁকেও অনুকরণের চেষ্টা করি পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে। তৃতীয় শ্রেণীতে হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর জীবনী পড়া হয়েছিল। তিনি হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় দিনের পর দিন কাটাতেন ধ্যান করে। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকাকালীন তিনি জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং প্রথম দৈববাণী 'ইকরা' বা 'পড়'র মাধ্যমে পশ্চাৎপদ আরব সমাজে সাম্য, সুবিচার ও শিক্ষার বৈপ্লবিক বার্তা ছড়িয়ে দেন। তাপসী রাবেয়া তাঁর ধ্যান ও একাগ্র প্রার্থনার বলে জয় করেছিলেন পার্থিব কামনা ও বাসনা। ক্ষমা করেছিলেন মানুষের নির্দয়তাকে। নৈকট্য লাভ করেছিলেন বিশ্ব প্রতিপালকের। ভক্ত প্রহল্লাদ তাঁর প্রার্থনা ও প্রেমের বলে বশীভূত করেছিলেন বিষধর সাপকে। ভক্ত ধ্রুব খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর পরম আরাধনার হরিকে। নরেন্দ্র তাঁর ধ্যান ও গভীর আত্মিক অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছিলেন সেবক ও সাধক স্বামী বিবেকানন্দতে। আমি ঐ বইগুলো পড়ে এতই অনুপ্রাণিত বোধ করি যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় গভীরভাবে প্রার্থনা ও নিয়মিত ধ্যান অভ্যাস দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়ক হবে। কলেজ স্ট্রিট থেকে কেনা নামাজ শিক্ষার বই থেকে আরও কিছু সুরা আম্মার সহায়তায় মুখস্থ করে আমি নামাজ পড়া শুরু করলাম এই প্রবাসের মাটিতেই। পাকিস্তান সরকার যে রাষ্ট্রকে মালাউন ও কাফেরের দেশ হিসেবে অভিহিত করত সেই ভারতের মাটিতেই এই শরণার্থী বাঙালি মুসলিম বালিকার ইসলামি তরিকায় শুরু হলো প্রার্থনা। চোখ বুজে বলতাম, 'হে আল্লাহ, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ী করো। আমাদের দেশকে স্বাধীন করো'। স্বদেশ মুক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসার এক গভীর যোগসূত্র গড়ে ওঠে এভাবেই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে আব্বু। মার্চ পাস্টে সালাম নিচ্ছেন

সদা প্রবাহমান জীবনের বাঁকে বাঁকে যে বিশেষ ঘটনাবলির সমাহার ঘটে থাকে তার পেছনেও থাকে সুনির্দিষ্ট কারণ। প্রতিটি ঘটনাই, তা যত দুঃখজনকই হোক না কেন, জীবনকে করে থাকে সমৃদ্ধ; চিন্তার রাজ্যকে করে বিস্তৃত। মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার পাদপিঠেই জন্ম নিয়ে

থাকে বিবর্তিত নতুন মানুষ। পরিত্যক্ত হয় পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি। '৭১ সালে পাকিস্তান সামরিক সরকারের লেলিয়ে দেওয়া তথাকথিত 'মুসলিম' হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে অল্প বয়সেই ঐ ধারণাটি মনে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে ধর্ম নিছক কোনো লেবেল নয়। কোনো বিশেষ ধর্মের লেবেল পরিধান করলেই সে ঐ ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে যায় না। ধর্মের ভিত্তি হলো সুকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে (rituals) বিভেদ হতে পারে; স্রষ্টা, পরকাল, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সম্পর্কে তত্ত্বগত (Theological) মতভেদ থাকতে পারে এবং সে বিষয়ে কে সঠিক সে বিচারের ভার একমাত্র স্রষ্টার। কিন্তু প্রতিটি ধর্মেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত মৌলিক (Core values) মূল্যবোধগুলো অভিন্ন। প্রতিটি ধর্মেই দয়া, দান, ক্ষমা, বিনয় ও ন্যায়পরায়ণতা চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং হিংসা, লোভ, অহঙ্কার, পরনিন্দা ও মিথ্যাকে পরিহার করতে বলা হয়েছে। এই মূল্যবোধগুলোর আন্তরিক চর্চার ওপরই নির্ভর করে ব্যক্তি ও সমাজের আত্মিক ও জাগতিক অগ্রগতি। এক অর্থে এই মানবিক মূল্যবোধগুলোই হলো ধর্মের হৃদয়। পাকিস্তান সরকার ও তাদের পাপকর্মের সঙ্গী তথাকথিত ইসলামপন্থী জামাতে ইসলামী, আলবদর, আল শামস প্রভৃতি দলগুলো নিরীহ নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা করে ইসলামসহ সকল ধর্মের মৌলিক ভিত্তির ওপরই প্রবল আঘাত হানে। লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা লক্ষাধিক বধূ, মাতা ও কন্যার মর্মভেদী আর্তনাদের মধ্যেই রচিত হয় ইসলামের মুখোশ পরিহিতদের কবর। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে পথের ভিখারি, অসহায় শিশু, রাস্তার ফেরিওয়ালা, রিকশাওয়ালা, কৃষক, মজুর, শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী পেশাজীবী কেউই সেদিন রক্ষা পায়নি। তথাকথিত একদল মুসলিমের হাতে আর একদল অসহায় ও নিরপরাধ মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নাগরিক প্রাণ হারায়। প্রাণ বাঁচাতে এক কোটি শরণার্থী আশ্রয় পায় পার্শ্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-অধ্যুষিত রাষ্ট্রে। সকল ধর্মের নির্যাস মানবতা জয়যুক্ত হয়। সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসও এই সাক্ষ্য দেয় যে মানুষের মানবতা কখনো একটি বিশেষ ধর্ম বা সংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। প্রাচীনকালে মক্কার নির্যাতিত মুসলিমদের সাদরে আশ্রয় দিয়েছিল আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) ন্যায়পরায়ণ খ্রিষ্টান রাজা নেগাস। মধ্যযুগে তুরস্কের মুসলিম সুলতান দ্বিতীয় বাইয়াজিদ রাজকীয় নৌবহর পাঠিয়ে স্পেনের বহু সংখ্যক ইহুদির প্রাণ রক্ষা করেছিল খ্রিষ্টীয় ক্যাথলিক শাসকদের ইনকুইজিশন থেকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৯১৫-১৭) তুর্কি সরকারের (Young Turks) গণহত্যা থেকে প্রাণ রক্ষার জন্য বহু আর্মেনীয় খ্রিষ্টান আশ্রয় পেয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র মিশর ও সিরিয়ায়। এমআইটি'র বিরল প্রতিভাবান, অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইহুদি বংশদ্ভূত নোম চমস্কি—যিনি নিজেকে কোনো বিশেষ ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন না—তাঁর কলম অবিরাম চলেছে সত্যের পক্ষে। সমগ্র লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বাস্তব চিত্রকে অকাট্য যুক্তির বলে তুলে ধরায় সাম্রাজ্যবাদ চালিত মূলধারার গণমাধ্যমে তাঁর স্থান না হওয়ার পরও তাঁর কলম বা বক্তব্য থেমে থাকেনি। তিনি ক্রমশই প্রিয় হয়ে উঠেছেন সত্য-সন্ধানী মানুষের কাছে। এ ধরনের বরেণ্য ব্যক্তিদের কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে এই পৃথিবীতে জ্ঞানের সাধনা, জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম ও মমতার উষ্ণতায় আত্মচরিত্র গড়ার প্রচেষ্টাই হতে পারে স্রষ্টার অন্যতম আরাধনা।

এভাবেই আমার জীবনে ১৯৭১ উদয় হয় মহাশিক্ষক রূপে। আমার সঞ্চয়ে সেদিন যে নানা-ধর্ম-জাতি ও সংস্কৃতির বইগুলো যুক্ত হয়েছিল তারও বোধহয় কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছিল। বহুযুগ পরে, আমার সুদীর্ঘ অভিবাসী জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে শান্তি শিক্ষা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (Interfaith dialogue) নারী উন্নয়ন ও মানবাধিকারের বিষয়গুলোই হয়ে উঠবে আমার প্রধান কার্যক্রম।

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী মিঠুর বাবা প্রশান্ত কুমার পাল, মা রাধা পাল, ছোট বোন সোমা ও দাদু আশুতোষ পাল নিয়ে তাঁদের ছিমছাম সংসার। সমবয়সী সোমার সঙ্গে মিমির বেশ ভাব হয়ে যায়। মিঠু হয় রিমি ও আমার বন্ধু। রাধা মাসিমার বাড়ি বিক্রমপুরের ভাগ্যকুলে। তিনি তাঁর দেশের মানুষদের সঙ্গে বিক্রমপুরের আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলতেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের গভীর সমর্থন ও আমাদের প্রতি তাঁদের আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার ফলে আমরা প্রায় একই পরিবারের মতো হয়ে যাই। সোহেলের জন্য মিঠুর বাবা—মেসোমশাই—প্রতিদিনই তাজা সন্দেশ নিয়ে আসতেন। যেদিনই আমি একটা নতুন বই পড়ে শেষ করতাম দৌড়ে চলে যেতাম দাদুর কাছে সেই বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে। দাদুর মধ্য দিয়ে নানার অভাব যেন অনেকটা পূরণ করতাম।

ছেলেদের মহাভারত বইটি ছিল বেশ বড় আকারের। বইটি আমি দিন-রাত পড়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললাম। পুরো বইটা সত্যিই শেষ করেছি কি না পরীক্ষা করার জন্য দাদু মহাভারতের মাঝখান থেকে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চরিত্রকে বের করে তার নাম জানতে চাইলেন, 'বলো তো ঘটৎকোচের (পাণ্ডব রাজপুত্র ভীমের বীরপুত্র) মায়ের নাম কী ?' আমি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলাম 'হিড়িম্বা'। দাদু খুব খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন। বই পড়া ছাড়াও আমাদের সেই দিনগুলোর প্রধান আকর্ষণ ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। এম. আর. আখতার মুকুলের কণ্ঠে তাঁর রচিত ব্যঙ্গাত্মক খবর 'চরমপত্র' শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। ভীষণ মজার মজার শব্দ ব্যবহার করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ইয়াহিয়া সরকারের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থার চিত্র খবরে তুলে ধরতেন। প্রিয় দেশাত্মবোধক গানগুলোর মধ্যে ছিল,

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল—কোরাস
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা—শিল্পী স্বপ্না রায়
একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি—কণ্ঠ ও সুর শিল্পী আপেল মাহমুদ
তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পারি দেবরে—আপেল মাহমুদ কোরাস
সোনায় মোড়ান বাংলা মোদের শ্মশান করেছে কে—শিল্পী মুকসুদ আলী সাঁই
সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহীদ স্মরণে—শিল্পী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
হায়রে কৃষাণ তোদের এ ছিন্ন দেহ দেখে যে মন মানে না—স্বপ্ন রায়

কোলকাতার বরেণ্য গীতিকার গোবিন্দ হালদার প্রথম তিনটি গান রচনা করেন। প্রথম দুটি গানে সুরারোপ করেন বাংলাদেশের নন্দিত সুরকার সমর দাস।

নানাবিধ প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের প্রাণশক্তিতে পরিণত হয় ঐ বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য নিবেদিত শিল্পী, কর্মী ও পরিচালকের কারণে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠানে প্রতিফলিত হতো প্রথম বাংলাদেশ সরকারের চিন্তাধারা। একটি স্বাধীন সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কী হতে পারে তা নিপুণভাবে উপস্থাপিত হতো আকর্ষণীয় এবং শিক্ষণীয় অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে দিয়ে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ২৬ মার্চ থেকে বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ প্রমুখের উদ্যোগে অনিয়মিতভাবে প্রচারিত হয়ে আসছিল। বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীর দিনে, ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ২য় পর্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অবস্থিত তার নিজস্ব ভবনে, অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটার ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামোসহ। প্রবাসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন আব্বু। 'টাঙ্গাইলের তৎকালীন এমএনএ বর্তমান আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল মান্নান বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে।'[১১]

পাকিস্তান সরকার সমানেই তখন প্রচার করে চলেছে যে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত সকলেই দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, কাফের, হিন্দু প্রভৃতি। বাঙালি মুসলিমদের সংগ্রাম যে পাকিস্তান সরকারের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নয় তার প্রমাণ হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত ও তার অনুবাদ প্রচারিত হয় আব্বুর পরামর্শে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যে ধর্মহীনতা নয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সকল ধর্মের প্রতিই সমান আচরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে তার সহজ নিদর্শনকে জনগণের কাছে তুলে ধরা হয় কুরআন, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত করে।

এর মধ্যে একদিন কামাল ভাই (শেখ কামাল) আম্মার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের ফ্ল্যাটে এলেন। তিনি তাঁদের ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে পালিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছেন। তিনি আম্মাকে জানালেন যে গৃহবন্দি থাকাকালে পাকিস্তানি অফিসারদের আলাপচারিতায় শুনেছেন যে আম্মাসহ আমাদের তিন ভাইবোনের নাম হত্যার তালিকায় রয়েছে। শুধু মিমির নামটি সেই তালিকায় নেই। সেনাবাহিনী আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সম্বন্ধে ভুল তথ্য পেয়ে থাকলেও এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে আব্বু ও তার পরিবারকে হত্যার মধ্যে দিয়ে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধকেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিল। কামাল ভাই দেখা করার পরে একদিন জামাল ভাইও (শেখ জামাল) তাঁর এক আত্মীয়র সাথে আমাদের ফ্ল্যাটে এলেন দেখা করতে। কিশোর জামাল ভাই পালিয়েছিলেন, কামাল ভাইয়ের আরও পরে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুজিব কাকুর পরিবারকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে স্থানান্তরিত করে ধানমণ্ডির পুরাতন ১৮ নম্বর রোডের যে ৬১৩ নম্বর বাড়িতে গৃহবন্দি করে রেখেছিল সেই বাসস্থান হতে।

আব্বুর মিলিটারি কর্মকর্তা মেজর নূরুল ইসলাম শিশুর (পরে মেজর জেনারেল) স্ত্রীও আম্মার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তাঁর দুই ফুটফুটে সুন্দর শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে আটক করেছিল। তিনি কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় পাকিস্ত ানি সেনাবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে ভারতে চলে আসেন। মুরশিদ খালু (অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ), নূরজাহান খালা (নূরজাহান মুরশিদ) ও তাঁদের দুই মেয়ে রুমা আপা (তাজিন মুরশিদ) ও নাইনু আপা (শারমিন মুরশিদ) প্রায়ই আম্মার কাছে আসতেন যুদ্ধের বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে। নাইনু আপা স্বাধীন বাংলা শিল্পী দলের সদস্য ছিলেন।

তাঁরা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণকে অনুপ্রাণিত করতেন। (তারেক মাসুদ পরিচালিত 'মুক্তির গান' প্রামাণ্যচিত্রে স্বাধীন বাংলা শিল্পী গোষ্ঠীর সঙ্গে নাইনু আপাও রয়েছেন।) নাইনু আপাকে মনে হতো কত সৌভাগ্যবান। তিনি বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারছেন। তাঁর সাহসিকতায় আমরা মুগ্ধ হতাম। মনে হতো, আমিও তাঁদের সংগীত দলে যোগ দিয়ে ফিরে যাই বাংলাদেশের বুকে।

আমাদের ফ্ল্যাটটি প্রায় দিনই নানা মানুষের আনাগোনায় মুখরিত থাকত। শুধু আব্বুরই দেখা পেতাম না। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যদের পক্ষে তাঁদের প্রতিজ্ঞা পালন সম্ভবপর না হলেও আব্বু তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি পারিবারিক জীবন যাপন করেননি। তিনি বলতেন 'যুদ্ধরত অবস্থায় যোদ্ধারা যদি পরিবারবিহীন অবস্থায় থাকতে পারে আমি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তা পারব না কেন?'[১২]

আব্বু মাঝে মাঝে আমাদের আটতলায় আসতেন এবং সোজা চলে যেতেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের ফ্ল্যাটে। তাঁর সঙ্গে মিটিং করতেন। একবার আব্বুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল

আমাদের ৮-তলার এলিভেটরের সামনে। তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে নিবিষ্ট মনে আলাপ করতে করতে এলিভেটরের দিকে এগোলেন। আমি ও রিমি তখন অধীর আগ্রহে কাছাকাছি দাঁড়ানো। তিনি আনমনে আমাদের দিকে একটুখানি হাত নেড়ে এলিভেটরে উঠলেন। ঘটাং ঘটাং শব্দ করে লোহার শিকওয়ালা পুরনো আমলের এলিভেটর নিচে নেমে গেল।

উত্তরবঙ্গ থেকে আগত একদল মুক্তিযোদ্ধার খাবার পরিবেশনের সময় তাদের একজন মারফত আম্মা একদিন জানলেন যে আব্বু অসুস্থ। আমরা আগাম খবর না দিয়ে ট্যাক্সি করে পরদিনই রওনা হলাম ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের উদ্দেশে। সাথে অধ্যাপিকা বদরুননেসা আহমেদ ও রতন ভাই। দৈবক্রমে সে দিনটি ছিল ১৯ আগস্ট। আমার ছোট বোন রিমির জন্মদিন।

৮ নম্বর থিয়েটার রোডে (বর্তমানে সেক্সপিয়র সরণি) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মূল কার্যালয়। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী 'মুজিবনগর'। মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র। বিশাল গাছের আড়ালে আংশিক ঢাকা পুরনো আমলের ভবনটিতে আমরা প্রবেশ করলাম প্রবল উৎসুক ভরা হৃদয়ে। সেখানে জানা-অজানা বহু মানুষের ভিড়। আম্মার সঙ্গে বারান্দা, হলঘর ও করিডোর অতিক্রম করে আব্বুর ঘরটিতে উঁকি দিয়ে দেখি তিনি ঘরে নেই। ঘরটি একাধারে আব্বুর অফিস, শয়নকক্ষ ও খাবারঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ঘরের মধ্যে নামমাত্র আসবাবপত্র। ঘরের একধারে একটি চিকন খাট বিছানো। অপর পাশে একটি টেবিলভর্তি একরাশ কাগজপত্র ও দুটি চেয়ার পাতা। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমের আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে 'খুচখুচ' ফিকে শব্দ ভেসে আসছে। আম্মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঁকি দিতেই দেখেন যে আব্বু বাথরুমের মেঝেতে বসে একটি শার্ট কাচছেন। আব্বুর পরনে লুঙ্গি ও সাদা হাফহাতা গেঞ্জি। আমাদের সাড়া পেয়ে আব্বু ফিরে তাকাতেই দেখা গেল যে তাঁর সাদা গেঞ্জির একাংশ রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ডায়বেটিসের রুগী আব্বুর বুকে একটি ফোড়া উঠেছে এবং তা ফেটে যাওয়ায় এই অবস্থা। তাঁর শরীরেও বেশ জ্বর। আম্মার উদ্বিগ্ন ও দুঃখকাতর চেহারার দিকে তিনি ছুড়ে দিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্মিত হাসি। যেন এমন কোনো ব্যাপারই নয় এমনি হালকা স্বরে বললেন, যে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির সঙ্গে তাঁর আগামীকাল একটা কর্মসূচি রয়েছে। তাঁর আর শার্ট নেই। সে জন্য বাদামি রঙের ফুলহাতা একমাত্র শার্টটিকে তিনি কেচে দিচ্ছেন যাতে শুকিয়ে পরদিন পরতে পারেন। আমরা সকলেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আব্বুর মুখের দিকে। মনে মনে ভাবলাম এ কোন বাবা ? এ বাবা যে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনেক উর্ধ্ব জগতের এক মানুষ। বাদামি রঙের ফুলহাতা ঐ একমাত্র শার্টটি পরেই তিনি রণাঙ্গন, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ও শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। এরপর আম্মা আব্বুর জন্য দুটি শার্ট কেনার ব্যবস্থা করলেন।

আব্বুর সাথে মার্কিন সিনেটর কেনেডি ও ব্রিটিশ এম. পি ডগলাসম্যানসহ বেশ কিছু বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের জায়গাটি ছিল, যশোরের বেনাপোল- সীমান্তের নিকটবর্তী, পশ্চিম বঙ্গের বনগা-হরিদাশপুর সীমান্তে। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা মাটিতে পুঁতে, বিদেশি প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকারগুলো হতো। আব্বুর সাথে যেতেন বি.এস.এফের ইনসপেক্টর সৌমেন চ্যাটার্জি ও সাব ইনসপেক্টর বীর নারায়ণ বোস।[১৩] এই সাক্ষাৎগুলোর মাধ্যমে আব্বু মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এম. পি ডগলাসম্যান যুক্তরাজ্যর হাউস অব কমনসে বাংলাদেশের পক্ষে যে জোরালো বক্তব্য রাখেন, তার অসাধারণ দিকটি ছিল এই যে বক্তব্যর যুক্তি ও তথ্যগুলোতে আব্বুর দেওয়া যুক্তি ও তথ্যরই প্রতিধ্বনি ছিল।[১৪] যুদ্ধের ঐ প্রতিকূল পরিবেশেও কোনো লিখিত নোটস ছাড়াই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পয়েন্টগুলো অত্যন্ত গুছিয়ে ও প্রাঞ্জল করে ডগলাসম্যানের কাছে

আব্বু উপস্থাপিত করেছিলেন। যার ফলে বাংলাদেশের পক্ষে এই ব্রিটিশ এম.পির আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন সম্ভবপর হয়।[১৫]

২৫ মার্চ রাতে আমাদের বাড়ি থেকে যাঁদের পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাঁদের সকলের ছাড়া পাওয়ার সংবাদ পেয়ে উৎফুল্ল হই। সেপ্টেম্বরে তাঁরা মুক্তি পান অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই। পাকিস্তানি বাহিনীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় তাঁরা বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান। ২৫ মার্চ রাতে যে দলটি তাঁদের বন্দী করে নিয়েছিল তারা যখন বদল হয়, তখন কোথা থেকে তাঁদের ধরে আনা হয়েছিল এই তথ্যটি নতুন দলের কাছে আর পৌঁছায়নি। যার ফলে তারা ছাড়া পান। আজিজ বাগমার প্রচণ্ড নির্যাতন ও দুর্দশা ভোগ করে মুক্তি পেলেন আরও পরে। সে অন্য এক ইতিহাস।

অক্টোবর মাস। এ মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রগতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্রতর হয়। এ মাসেই ঐ অবিস্মরণীয় মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ সাম্যের কবি, বিদ্রোহের কবি, নারী জাগরণ ও মানব মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শেরই এক জ্বলন্ত নিদর্শন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র আবৃত্তিকার কাজী সব্যসাচী ও কনিষ্ঠ পুত্র গিটারবাদক কাজী অনিরুদ্ধ আসতেন আম্মার সঙ্গে দেখা করতে। একদিন সন্ধ্যায় আম্মাসহ আমাদের সব্যসাচী নিয়ে গেলেন তাঁদের বাড়িতে কবির সাথে সাক্ষাৎ করাতে। যে কবির রচনা, কাব্য আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে, রক্তে দোলা দিয়েছে, নিঃশ্বাসে এনেছে মুক্তির ঝঙ্কার সেই কবির সঙ্গে দেখা হবে ! আনন্দে আমরা আত্মহারা। বাহুল্যবর্জিত এক সাধারণ সরকারি ফ্ল্যাটে কবি তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি ও নাতনিসহ থাকেন। তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি খাটের ওপর তিনি বসা নির্বাক হয়ে। শুনেছি কবি মানসিকভাবে অসুস্থ। কিন্তু এতখানি! আম্মা একরাশ ফুল নিয়ে গিয়েছিলেন, কবির হাতে তিনি তুলে দিলেন সেই ফুল। কিছু পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ল তাঁর খাটের ওপর। কবি ফ্যালফ্যাল করে আম্মার দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর টানা টানা উৎসুক চোখ দুটি যেন কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু বলা হলো না। আমাদের নিয়ে আসা একরাশ ফুলের মাঝে তিনি বসে রইলেন নির্বাক হয়ে। পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, নারী নিষ্পেষণ ও সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যাঁর অগ্নিঝরা কবিতা ও গান জুগিয়েছে বৈপ্লবিক প্রেরণা, সেই কবি ফুলের শয্যায় নীরব রইলেন।

এবারে কবির পাশে আম্মা বসে তাঁর দুটি হাত ধরে আমন্ত্রণ জানালেন স্বাধীন বাংলাদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য। আম্মা বললেন যে, মুক্তির কবি তাঁর পরিবারসহ আমন্ত্রিত মুক্ত বাংলাদেশে। আম্মার কথা শুনে কবি হঠাৎ হুম করে হুঙ্কার দিলেন। যেন তিনি গ্রহণ করেছেন সেই আমন্ত্রণ। ভেবে দেখুন, দেশ তখনো শত্রুমুক্ত হয়নি। তার পরও কতখানি প্রত্যয়ের সঙ্গে আম্মা আমন্ত্রণটি দিয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছবিসহ আম্মার সঙ্গে কবির সাক্ষাতের সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল।

আম্মার আমন্ত্রণটি একদিন বাস্তব রূপ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু, মোস্তফা সারোয়ার প্রমুখের উদ্যোগে কবি তাঁর পরিবারসহ ১৯৭২-এর ২৫ মে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন।

কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটিতেই রিমি ও আমার সমবয়সী কবির দুই নাতনি মিষ্টি ও খিলখিলের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। '৭১-এর প্রবাসজীবনের সেই দিনগুলো আমাদের অধিকাংশ সময় ঘরেই কাটত। এরই মধ্যে কবির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর বাড়িতে আমাদের দুজনের যাতায়াত শুরু হয়। সব্যসাচী মাঝে মাঝে মিষ্টি ও খিলখিলকে নিয়ে আসতেন আমাদের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটের সামনে লম্বা টানা করিডোরে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতাম। কখনো আমাদের রিকশায় করে নিয়ে যেতেন তাঁদের ক্রিস্টোফার রোডের সিআইটি বিল্ডিংয়ের ৪ নম্বর ফ্ল্যাটে। কবির পাশে

বসে 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটি গাইতাম। তিনি সুদূরে দৃষ্টি মেলে, তন্ময় হতেন। কখনো বা হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন। তাঁর হাতে কাগজ দিলে তিনি আনমনাভাবে তা ছিঁড়ে কুটিকুটি করতেন। মিষ্টি ও খিলখিলের মা কবির সার্বক্ষণিক সেবা-যত্ন করতেন। তাঁর জন্য নিজ হাতে খাবার রাঁধতেন। আমরা বেড়াতে গেলে খুব আপ্যায়ন করতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করতেন বাংলাদেশের কথা।

ঘরে ফিরে আমাদের সময় কাটত গতানুগতিকভাবে। কখনো স্কুলের বই-খাতা, যা আম্মা কলেজ স্ট্রিট থেকে কিনে দিয়েছিলেন, সেগুলোকে নিরুৎসাহ ভরে নাড়াচাড়া করে, গোগ্রাসে গল্পের বই পড়ে এবং বিপুল আগ্রহভরে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনে। আগেই উল্লেখ করেছি যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'নালক' গল্পটি আমাকে ধ্যানাভ্যাসে অনুপ্রাণিত করে। দেবল ঋষির বালক শিষ্য নালকের জীবনের মধ্যে দিয়েই গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়। গ্রাম্য কিশোরী সুজাতার হাতে করা পায়েশ খেয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ ধ্যানে বসলেন। পাশে নদী। ভরা পূর্ণিমার রাত। প্রাচীন মহীরুহের নিচে ধ্যানমগ্ন তিনি। অসত্য অন্ধকারের অধিবাসী মার, মরিয়া হয়ে আক্রমণ করল সিদ্ধার্থকে। ভয়, ছলনা ও প্রলোভন দিয়ে সে সিদ্ধার্থের ব্রত ভাঙাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সিদ্ধার্থ অনড়, অটল। সে ব্রত নিয়েছে সিদ্ধ না হয়ে, বুদ্ধ না হয়ে, সে তার ধ্যানাসন ত্যাগ করবে না। জয় হলো দৃঢ় সংকল্পের। সত্যের কাছে মার পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিপ্রাপ্ত হলেন। তিনি হলেন বুদ্ধ। সজাগ ও আলোকপ্রাপ্ত। পাঁচ বছরের ছোট বোন মিমি, যে ছিল আমার ধ্যানের সাথি, তার ওপর চলত আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মাঝে মাঝে ওকে ঘরে রেখে, বাইরের জানালা দিয়ে লক্ষ রাখতাম। ঠিক মতো ধ্যান করছে, না ফাঁকি দিচ্ছে তারই পরীক্ষা। ছোট মিমি একটু পরপরই চোখ পিটপিট করে তাকাত, একনাগাড়ে পাঁচ মিনিট সে যদি চোখ বন্ধ করত, তাকে তখন পুরস্কৃত করতাম মজার কোনো গল্প বলে। একমাত্র ছোট ভাই সোহেলকে নিয়ে চলত আমাদের নানা খেলা। সোহেলের দুই হাত ধরে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে ছড়া বলে নাচালে সে ভীষণ মজা পেত। ঘোড়া সেজে তাকে পিঠে চড়িয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতাম, বাইরের কোনো মানুষ দেখলেই সে আধো স্বরে মিষ্টি করে বলত, 'জয় বাংলা'।

তথ্যসূত্র

১. মঈদুল হাসানের বরাত দিয়ে তাজউদ্দীন আহমদের ভাষ্য। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, কথোপকথন, এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা (মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র গৃহীত যৌথ আলাপ ও সাক্ষাৎকার, অডিও ক্যাসেটে ধারণকৃত), ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ২৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৪. সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন 'বীরের এ রক্তস্রোত।' ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা ১৯৯১ পৃ. ১০১

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৬. তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, সম্পাদনা সিমিন হোসেন রিমি, ঢাকা প্রতিভাস, বৈশাখ ১৪০৭। পৃ. ১০১-১০৮। http://www.tajuddinahmad.com/resources/speech1.pdf

৭. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি। ঢাকা। কাগজ প্রকাশনা, ১৯৯১ পৃ.৪৮-৪৯

৮. তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, সম্পাদনা সিমিন হোসেন রিমি। ঢাকা। প্রতিভাস, বৈশাখ ১৪০৭। পৃ. ১০৯-১২১

http://www.tajuddinahmad.com/resources/speech2.pdf

৯. ১৯৭১ সালের স্মৃতি ও সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার পূর্ণ বিবরণ, সিমিন হোসেন রিমির লেখা 'আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে

১০. মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৬। পৃ. ১৮

১১. এইচ টি ইমাম, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, পৃ. ১৮২

১২. আমীর-উল ইসলাম । মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, ঢাকা। কাগজ প্রকাশনা, ১৯৯১। পৃ. ৭১

১৩. সুদীর্ঘ ২৬ বছর পরে আবারো যখন কোলকাতায় যাই, তখন গোলোক মজুমদারের বাসভবনে তাঁর সাথে '৭১-কে ঘিরে আলাপচারিতায় ও সাক্ষাৎকারের তিনি উল্লেখিত তথ্যটি দেন। আমার সাথে ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে আগ্রহী আইনের ছাত্রী সামিরা মেহরাজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। সল্টলেক সিটি। কোলকাতা। ভারত

১৪. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদের সাথে ডগলাসম্যানের সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে আমাকে তথ্যটি দেন। ২৮ জুন, ২০১৩। ঢাকা : বাংলাদেশ

১৫. প্রাগুক্ত

চতুর্থ পর্ব

The wound is the place
where the light enters you.

–Mowlana Jalaluddin Rumi

সেতুবন্ধন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন ছিল সম্পূর্ণভাবেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং পাকিস্তানের স্বৈরাচার সামরিক সরকারের বর্বর কর্মকাণ্ডের অন্ধ সমর্থক ও সহায়তাকারী। কিন্তু মার্কিন ডেমোক্র্যাট মেজরিটি কংগ্রেস ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল। কংগ্রেসম্যান কর্নেলিয়াস গ্যালাঘের (Gallagher) কংগ্রেসে প্রদত্ত তার বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টে (৩ আগস্ট, '৭১) বলেন, 'সন্ত্রাস সকল সময় মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। তা কখনোই তাদের বিশ্বস্ততা ও সহানুভূতিকে জয় করে না। তা শুধু স্বৈরাচার যার অধীনস্ত তাদের করা হয়েছে, তা বন্ধ করার জন্য এবং তাঁদের জীবন, তাঁদের সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য সংকল্পকে জোরদারই করে থাকে। সন্ত্রাস যতখানি পাশবিক হবে প্রতিরোধও ততখানি দৃঢ় হবে। পূর্ব পাকিস্তানে আজ সে ধরনেরই যুদ্ধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সামনে একটা নতুন ভিয়েতনাম ঘটতে যাচ্ছে; ...পাকিস্তান তার বর্তমান আকারে টিকতে পারবে না। তার কারণ আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। একটি বেপরোয়া সরকারের বর্বর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে আমরা মানুষ হিসেবে আমাদের মানবতাবাদী, মুক্ত এবং মুক্তিপ্রিয় ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করছি।'[১]

১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ দিবসে প্রদত্ত ভাষণে আব্বু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন রাষ্ট্রকে লালিতপালিত করছেন। দুনিয়ার কোনো জাতি এ নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক দুনিয়ার ছোট বড় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে এ নতুন জাতিকে। স্থান দিতে হবে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জে।'[২]

আব্বুর সেদিনের আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাধীনতার প্রশ্নে আপসহীন বক্তব্যের যেন সুস্পষ্ট আভাস দেখতে পাওয়া যায় কংগ্রেসে গ্যালাঘেরের প্রদত্ত উপরোক্ত রিপোর্টের ৫ অনুচ্ছেদে।

> The war of East Pakistani's Liberation and Independence may already be too far gone for a settlement short of independence through the processes of political conciliation and negotiation.

সিনেটের শরণার্থী-বিষয়ক সাব-কমিটির সভাপতি সিনেটর এডোওয়ার্ড কেনেডি একাত্তরের ২৬ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রদত্ত এক মর্মস্পর্শী ভাষণে অকাট্য তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর এই আন্তরিক ভাষণে তিনি

নিজ সরকারেরও কড়া সমালোচনা করেন যেটি ৮ সেপ্টেম্বর '৭১-এ কংগ্রেসের রেকর্ডভুক্ত হয়। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের নির্দেশে নিরস্ত্র ও নিরীহ বাঙালিদের ওপর যে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু হয়েছিল তার স্মৃতিকে সুপরিকল্পিতভাবেই বাংলাদেশের তরুণ মানস থেকে মুছে ফেলার প্রয়াস নিয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠী। বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি, স্বৈরাচারী, সামরিক ও একনায়কবাদী সরকার, ধর্মীয় ও কর্পোরেট মৌলবাদী শক্তির সহায়তাকারী যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া দম্ভপূর্ণ আচরণ, অমানবিক ও সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার প্রেক্ষিতে ও গণহত্যার দলিলরূপে কেনেডির সুদীর্ঘ বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে প্রাসঙ্গিক। (অনুবাদ লেখকের) :

> 'আমি জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞ, আমার এক সপ্তাহব্যাপী ভারতের শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা যার দৃশ্যকে আধুনিক কালের সবচেয়ে মর্মান্তিক মানব দুর্দশার ঢেউ হিসেবে বর্ণনা করা যায়, সে সম্বন্ধে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। [ওয়াশিংটন পোস্টের ২৯ জুলাই '৭১-এর রিপোর্টে আন্তর্জাতিক ত্রাণকমিটির প্রধান অ্যানজিয়ার বিডল ডিউকের (Angier Biddle Duke) ভবিষ্যদ্বাণী যাতে তিনি ঐ বছরের শেষ নাগাদ শরণার্থীদের সংখ্যা ১ কোটিতে পৌঁছবে বলে উল্লেখ করেন। – লেখক]
>
> ...এই পুরো দুঃখজনক ঘটনা পৃথিবী এখনো অনুধাবন করেনি। আমি আপনাদের বলতে পারি যে আপনারা নিজেরা সরাসরি ঘটনাটি না দেখা পর্যন্ত এর বিশালতাকে অনুধাবন করতে পারবেন না। ভারতে, পূর্ব বাংলার সীমান্তবর্তী পুরো এলাকা – পশ্চিমে কোলকাতা এবং পশ্চিম বাংলা থেকে উত্তরে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট এবং পূর্বে ত্রিপুরা প্রদেশের আগরতলার শরণার্থীদের এলাকাগুলো আমি পরিদর্শন করেছি। আমি ক্যাম্পে জড়ো হওয়া অগণিত শরণার্থীদের কথা শুনেছি। এরা খোলা মাঠ বা গণদালানের পেছনের অস্থায়ী আশ্রয়স্থলে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছিল অথবা মরিয়া হয়ে পালানোর জন্য দিনের পর দিন এমনকি সপ্তাহের পর সপ্তাহ তারা পশ্চিম বঙ্গের রাস্তার পথে হাঁটছিল। তাদের চেহারা ও তাদের কাহিনি এক লজ্জাজনক লোকগাথার মধ্যে খোদিত, যার ফলে বিশ্বজোড়া মানুষের নৈতিক চেতনাবোধ আপ্লুত হওয়াই উচিত।
>
> ...আপনারা শিশুদের দেখতে পাবেন, যাদের ছোট্ট হাড়গোড়ের ওপর তাদের চামড়া ঝুলে রয়েছে–তাদের মাথা তোলারও শক্তি নেই। এই সব শিশু আর কখনোই সুস্থ হবে না এই ভাবনায় তাদের অভিভাবকদের চোখে আপনারা হতাশাগ্রস্ত দৃষ্টি দেখবেন। সবচেয়ে কঠিন হলো মাত্র পূর্বরাতেই মৃত্যুবরণ করা শিশুর লাশ অবলোকন করা। ...তদুপরি সীমান্তবর্তী বহু ভারতীয় নাগরিকের গ্রামও পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর শেলের আক্রমণের মধ্যে পড়ে। ভারত সরকার যখন এই মানব দুর্দশার স্রোত তার সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখল সে তখন তার এলাকায় বেষ্টনী দিয়ে শরণার্থীদের প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারত। কিন্তু ভারতের চিরস্থায়ী কৃতিত্ব যে সে করুণার পথ বেছে নিয়েছে। শরণার্থীদের সাহায্য ও বান্দোবস্তের জন্য ভারত সরকার বিরাট প্রচেষ্টা নিয়েছে–যা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবে এবং স্মরণ করবে।...৩৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক ৫৫ বছর বয়সী বেসামরিক রেলওয়ে কর্মচারী এবং সে মুসলিম, ভরদুপুরে তার রেলরোডের স্টেশনের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের অর্থহীন আক্রমণের কথা আমাকে জানাল। সে বলল, 'আমি জানি না তারা কেন আমাকে গুলি করল। আমি কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত নই। আমি একজন রেলওয়ে ক্লার্ক মাত্র।'
>
> ...আরও দুঃখজনক হলো নির্দোষ ও অশিক্ষিত গ্রাম্য অধিবাসীদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। দুর্ভাগ্যক্রমে দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার বর্তমান চেহারা, অতীতের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তেমন ভিন্ন নয়। এই ভাবমূর্তিটি সেই আমেরিকার যে সামরিক নিষ্পেষণকে সমর্থন করে এবং সামরিক সন্ত্রাসে ইন্ধন জোগায়। এই ভাবমূর্তিটি সেই আমেরিকার যে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বেচ্ছাচারী সরকারের সঙ্গে মিল স্থাপন করে।
>
> ...আমেরিকানদের জন্য এই বিশাল মানব দুর্দশার কারণ জানার এখুনি সময়...পূর্ববাংলার জন্য ইস্যু প্রথম হতেই ছিল আত্মনির্ধারণ এবং গণতান্ত্রিক নীতিমালা।

পশ্চিম পাকিস্তানের বহু বছরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য,–দীর্ঘ সামরিক শাসন এবং নির্বাচনের অপূর্ণ প্রতিজ্ঞার পর–শেষ পর্যন্ত গত ৭ ডিসেম্বর অবাধ নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়।...এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ দল এবং তার নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এভাবেই জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বেসামরিক গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করার জন্য নতুন সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব পায়। কিন্তু তারপর যা ঘটল, তা বিলম্ব ও ধোঁকাবাজিরই নমুনা এবং সামরিক শাসনকে পুনরায় আহ্বান করা হলো। স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ছয় দফার প্রস্তাবটি নিয়ে শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে আপস-মীমাংসা মন্থর গতিতে চলতে থাকল এবং তার অবনতিও ঘটল–২৫ মার্চ রাতে সন্ত্রাস ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যার হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল।

...পূর্ব বাংলার এই অবস্থায় আমেরিকানদের বিশেষ করে মর্মপীড়া হওয়া উচিত। কারণ আমাদের সামরিক যন্ত্রপাতি আমাদের বন্দুক ও ট্যাংক এবং প্লেন, যা এক যুগের বেশি সময় ধরে প্রেরণ করা হচ্ছে তা নিদারুণ দুর্দশাকে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতেই সহায়তা করছে। আরও বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো যে আমাদের দেশের উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাদের নির্দেশেই সামরিক রসদগুলো চালান দেওয়া হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। আমেরিকার সামরিক রসদ নিয়ে পাকিস্তানি জাহাজ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে অবিরত আমেরিকার বন্দর ত্যাগ করছে। এই ব্যাপারগুলো খুবই লজ্জাকর ও দুঃখজনক। কেননা, এগুলোকে কলমের একটি সহজ খোঁচায় নিবৃত্ত করা যেত।

...আপনারা হয়তো বলবেন যে এটি আমাদের কোনো বিষয় নয় যে জড়াতে হবে। বিশ্বের দারোগাগিরি আমরা করতে পারি না। তা হয়তো সঠিক। কিন্তু শীতল সত্য হলো যে আমরা পূর্ব বাংলায় ইতোমধ্যেই জড়িয়ে গিয়েছি। আমাদের অস্ত্র জড়িয়ে গিয়েছে। আমাদের অর্থ – যা বিগত দুই দশক যাবৎ অর্থনৈতিক সাহায্য হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছে, তাও বিজড়িত। প্রশ্ন এটি নয় যে আমরা জড়াব কি না বরং কীভাবে জড়াব। এটি প্রশ্ন নয় যে, আমরা তহবিল হতে অর্থ ব্যয় করব কিনা, বরং আমরা কীভাবে ব্যয় করছি। আমরা কি আরও অস্ত্রের জোগান দিচ্ছি নাকি জনহিতকর কর্মসূচি যা শান্তি এবং প্রচণ্ড বিপদগ্রস্ত এলাকায় উপশম আনতে পারে তাতে বিনিয়োগ করছি।"[৩]

স্বাধীনতার জন্য পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ব্যাকুল বাসনাকে লক্ষ করে সত্য ও সমবেদনার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এই অনন্য বক্তব্যটির ইতি কেনেডি টেনেছিলেন বাঙালির গর্ব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিকাব্য হতে উদ্ধৃতি দিয়ে :

> 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
> জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর।'

জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রদত্ত কেনেডির এই ভাষণটি দীর্ঘ ৩৯ বছর পরও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। তাঁর বক্তব্যের একটি বিশেষ অনুচ্ছেদে আমার চোখ বারবারই ঠেকে গিয়েছে। কোনো ব্যক্তির নাম না উল্লেখ করলেও বাংলাদেশের দুর্যোগে মার্কিন সরকারের করণীয় কী, এ প্রসঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের এক কর্মকর্তার মন্তব্য তাঁর মনে এতখানিই রেখাপাত করে যে তিনি মন্তব্যটিকে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেন। কেনেডি বলেন, 'পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ যাঁদের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি এবং যাঁরা বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গ তাদের কণ্ঠে পরিহাস ব্যক্ত হয়েছে, এই নেতৃবৃন্দ আমেরিকায় আসবেন না সাহায্য চাওয়ার জন্য। একজন আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা এভাবে বললেন, 'বহু রাষ্ট্র এবং বহু মানুষ আমেরিকায় আসে বিলিয়ন ডলার চাওয়ার জন্য, যা দিয়ে আরও অস্ত্র, আরও রসদ সংগ্রহ করবে। আমরা বাঙালিরা শুধু এটুকুই চাই যে তোমরা কোনো কিছুই জোগান দিয়ো না। না অস্ত্র, না অর্থ, কোনো পক্ষকেই নয়—তোমরা যেন শুধু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করো।'

১৯৭১ সালে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, মুস্তফা সারওয়ার, ড. স্বদেশ বোস ও ড. এ. আর. মল্লিকসহ আরও কয়েকজন কেনেডির সঙ্গে কোলকাতায় সাক্ষাৎ করেছিলেন। কেনেডির বক্তৃতায় উল্লিখিত উক্তিটি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কে করেছিলেন জানার জন্য আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফোনে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে ঢাকায় কথা বলি (২৫ ডিসেম্বর, ২০০৬)। তিনি জানালেন যে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের প্রিন্সিপাল এড হিসেবে কেনেডির কাছে তিনিই এ উক্তিটি করেন। আমীর-উল ইসলাম বললেন, ওই উক্তিটি 'তাজউদ্দীন ভাইয়ের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম ছিল।'

একটি জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো আত্মমর্যাদা যার বিকাশ সম্ভবপর হতে পারে আত্মমর্যাদাশীল ন্যায়পরায়ণ সবল নেতৃত্বের গুণে। গণহত্যার শিকার যুদ্ধরত, হতদরিদ্র, সমস্যার ভারে জর্জরিত '৭১-এর বাংলাদেশ আশ্চর্য প্রত্যয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরেছিল বাংলাদেশের হৃদয়, যার পুরোটাই গৌরবমণ্ডিত আলোর আভায় ভরপুর।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও শাণিত বিবেকের প্রতিমূর্তি ঢাকার কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড, যিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশজন মার্কিন কূটনীতিকের স্বাক্ষরসহ পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অনৈতিক সমর্থনের তীব্র প্রতিবাদ করেন ও বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য মার্কিন প্রশাসনের কর্মপন্থার পরিবর্তন দাবি করে কড়া চিঠি পাঠিয়েছিলেন (৬ এপ্রিল ১৯৭১-এ আর্চার ব্লাডের পাঠানো টেলিগ্রামটি স্টেট ডিপার্টমেন্টে পৌঁছলে আরও নয় জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাতে স্বাক্ষর করেন)। এরপর তাঁকে নিক্সন ও কিসিঞ্জার শাস্তিস্বরূপ অবিলম্বে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠান। শুধু তাই নয় গণহত্যার এক পর্যায়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার, গণহত্যাকারী জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পাঠানো বার্তায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাঁর তথাকথিত কৌশলপূর্ণ ও কোমল আচরণের জন্য।[৪]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি যুক্তরাষ্ট্রকে আবিষ্কার করি নানা রঙে। অমানবিক আমেরিকা ও মানবিক আমেরিকা; উৎপীড়কের সহায়ক আমেরিকা ও আর্তের দুঃখে দরদি আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পর-বিরোধী আচরণের মধ্যে দিয়েই যেন মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধেও ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করে। সাদা ও কালোর সরল বিভাজন অতিক্রম করে শুরু হয় বর্ণালি রং খোঁজার পালা।

বাঙালির ন্যায়ভিত্তিক মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোও অনন্য ভূমিকা রাখে। জগৎবিখ্যাত সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশংকরের অনুরোধের প্রতি সম্মান ও সমর্থন জানিয়ে বিটলস-এর বিশ্ব নন্দিত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন বাংলাদেশের জন্য কনসার্টের আয়োজন করেন। ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের জনসমুদ্রে The Concert for Bangladesh নামের এই অভূতপূর্ব সংগীত অনুষ্ঠানটি ছিল আমেরিকার ইতিহাসের সর্ববৃহৎ চ্যারিটি কনসার্ট। নামীদামি সেলিব্রেটির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এই বিশাল কনসার্টটি ছিল পরবর্তীকালের ইথিওপিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি খ্যাতনামা চ্যারিটি কনসার্টগুলোর পথিকৃৎ। জর্জ হ্যারিসনের উপস্থাপনায় পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আলী আকবর খান, ওস্তাদ আল্লারাখা, শ্রীমতি কমলা চক্রবর্তী, বব ডিলান, বিলি প্রেস্টন, লিয়ন রাসেল, রিংগোস্টার, এরিক ক্ল্যাপটন প্রমুখ নিবেদিত শিল্পী এই কনসার্টে যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের বিমোহিত করেন। জর্জ হ্যারিসন তাঁর স্বপ্নিল চোখ মেলে আবেগ ভরা কণ্ঠে বাংলাদেশের জন্য গান গেয়ে লক্ষ-কোটি মুক্তিকামী বাঙালির হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন গড়ে নেন। জর্জ হ্যারিসনের কথা ও সুরে গাওয়া, 'বাংলাদেশ' গানটির মাধ্যমে মুক্তি সংগ্রামরত বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নিমেষেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

শিল্পীরা যখন তাঁদের জনপ্রিয়তাকে মানবাধিকার ও মানবিক কর্মকাণ্ডে নিবেদন করেন, তা কতখানি সার্থকতা লাভ করতে পারে তার প্রমাণ এই বাংলাদেশ কনসার্ট। এই কনসার্ট থেকে উপার্জিত আড়াই লাখ ডলার দান করা হয় জাতিসংঘের (UNICEF) শিশু তহবিলে – ভারতীয় শরণার্থী শিবিরে মরণাপন্ন ও রোগাক্রান্ত বাংলাদেশি শিশুদের কল্যাণে। বাংলাদেশ কনসার্টের সাফল্যে অণুপ্রাণিত হয়ে 'জর্জ হ্যারিসন ফান্ড ফর ইউনিসেফ' প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশি শিশুসহ বিশ্বের সকল শিশুদের সাহায্যার্থে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জোরগতিতে এগিয়ে চলছে অধিকাংশ মানুষের প্রাণঢালা সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। আমাদের ছোট ফ্ল্যাটটিতে মানুষ অবিরত আসছে নিত্যনতুন খবর নিয়ে। শুধু আব্বুর কাছ থেকেই কোনো খবর নেই। তাঁর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে সে সম্বন্ধেও আমরা অনিশ্চিত। এর মধ্যেই হঠাৎ আমাদের অবাক করে দিয়ে আব্বু উপস্থিত হলেন আমাদের দুই রুমের ছোট ফ্ল্যাটটিতে। উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে সৈয়দ নজরুলের সঙ্গে সভা শুরু হওয়ার বেশ আগেই তিনি চলে এলেন আমাদের কাছে। আমাদের শোবার খাটের ওপর জড়ো হয়ে বসে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলাম আব্বুর সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার কাহিনি। আমার ও রিমির কৌতূহলী প্রশ্নেরও তিনি উত্তর দিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা ভরা কণ্ঠে। শৈশবের প্রারম্ভে তাঁর কাছে শোনা রূপকথা ও লোককাহিনির চেয়েও আকর্ষণীয় মনে হলো তাঁর বিজয়ের পথে যাত্রার শিহরণ জাগানো কাহিনি। (এই বিবরণের কিছু অংশে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের বর্ণনা ও প্রাসঙ্গিক রেফারেন্স যোগ করা হয়েছে।) ২৫ মার্চ রাতে আম্মা বাগানের ঝোপের আড়াল থেকে দেখেছিলেন যে আব্বুকে নিয়ে গাড়িটি আমাদের বাড়ির সামনের সাতমসজিদ সড়কের ডানদিকে জিগাতলার দিকে ছুটে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একটা গাড়ি ঘুরে এসে আবার আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বাঁ দিকে লালমাটিয়ার দিকে সাঁ করে মিলিয়ে যায়। জিগাতলার কাছাকাছি ১৩ নম্বর সড়কে ড. কামাল হোসেন তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে নেমে পড়েছিলেন। পরে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে স্থানান্তরিত হন সুদীর্ঘ নয় মাস বন্দি থাকা অবস্থায় তাঁর ওপর পাকসেনারা প্রচণ্ড মানসিক নির্যাতন চালায়। আব্বু ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম লালমাটিয়ায় রেলওয়ের সাবেক চিফ ইঞ্জিনিয়ার গফুর সাহেবের বাড়িতে আশ্রয়গ্রহণ করেন। তাঁরা সেখানে আশ্রয় নেওয়ার ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। চারদিকে ব্রাশফায়ারের শব্দ এবং মানুষের মরণ আর্তনাদে কেঁপে কেঁপে ওঠে। মধ্যরাতের আকাশ ভরে যায় আগুন ও কালো ধোঁয়াতে। এইসময় আব্বু কেঁদে ফেলেন মুজিব কাকুর কথা ভেবে। তিনি বলেন, 'এবার দস্যুরা ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলা করছে।'[৫]

গফুর সাহেবের বাড়িতে যদি তল্লাশি শুরু হয় তখন আব্বু নিজেকে পরিচয় দেবেন গফুর সাহেবের ঠিকাদার মহম্মদ আলী হিসেবে। আমীর-উল ইসলাম হবেন গফুর সাহেবের ভাতিজা। নাম রহমত আলী। এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তটি নিয়ে তাঁরা প্রস্তুত হলেন বিপদের মোকাবিলায়। গফুর সাহেবের বাড়ির ছাদের ওপরে নিজেদের আড়াল করে তাঁরা দেখলেন তাণ্ডবলীলা। পরে তাঁরা অন্য বাড়িতে আত্মগোপন করার প্রাক্কালে পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে লালমাটিয়ার পানির ট্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরীকে প্রহৃত হতে দেখলেন। ট্যাংকের পানি সরবরাহ করানোর জন্য এই প্রহার। আব্বুদের আত্মগোপনের স্থানটি ছিল মোহাম্মদপুরের অবাঙালি বিহারি-অধ্যুষিত এলাকার কাছেই। তাঁরা মুখে রুমাল বাঁধা ও মাথায় উর্দি পরা বিহারিদের পার্শ্ববর্তী বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিতে দেখলেন। আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বস্তির নারী-পুরুষ ও শিশুরা তাদের ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ওপর চলল পাকিস্তানি সেনাদের অবিরাম ব্রাশফায়ার। অসহায় ও নিরপরাধ মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা প্রত্যক্ষ করে (পাকিস্তানি) সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ করে আব্বু সেদিন মন্তব্য করেছিলেন 'এরা হারবে।'

২৭ মার্চ সকালে কারফিউ তুলে নেওয়া হয় দেড় ঘণ্টার জন্য। এই সময় আব্বু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন যে সাতমসজিদ রোড পার হয়ে রায়ের বাজারের পথ দিয়ে শহর ত্যাগ করবেন। লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, মাথায় সাদা টুপি পরিহিত ও হাতে লোক দেখানো বাজারের থলির আড়ালে কোমরে গোঁজা পিস্তল আড়াল করে আব্বু চললেন গ্রামের উদ্দেশে। গফুর সাহেবের বাসায় অতিকায় রাইফেলটিকে ফেলে যেতে হয়। তিনি সেটি প্লাস্টিক মুড়ে মাটিতে পুঁতে রাখেন। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে তাঁর ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল আম্মাসহ বাড়ির সকলের খবর নেওয়ার। তারা কি বেঁচে রয়েছেন না সেনাবাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন! এই চিন্তাটা ব্যক্ত করার পর দুর্গম পথের সাথি আমীর-উল ইসলাম প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন। এই কাজটায় রয়েছে প্রচণ্ড ঝুঁকি। আব্বুও সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। এই মানবিক দুর্বলতাকে তিনি ঝেড়ে ফেললেন সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির স্বার্থে। বাংলার গ্রামেগঞ্জে ও পথের প্রতি বাঁকেই তাঁরা পেলেন মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা, আদর ও আপ্যায়ন। এরই মধ্যে বাবুবাজার পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল রুস্তমের সঙ্গে তাঁদের দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়। ঐ ফাঁড়িতে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ চালিয়ে ঘুমন্ত পুলিশ কনস্টেবলদের গুলি করে হত্যা করেছে। সে কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। রুস্তম আব্বুদের কাছে সে ঘটনা বর্ণনা করে।

ঢাকা ছেড়ে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথে ২৮ মার্চ রাতে পদ্মার তীরবর্তী গ্রাম আওরঙ্গবাদে* শুকুর মিয়া নামের আওয়ামী লীগের এক কর্মীর বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় নেন। এই বাড়ির সকলেই তাঁতের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেখানে তাঁরা গোসল করে রাতের খাবার খেতে বসবেন তখুনি রেডিওতে শুনতে পান সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা।** ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের ইংরেজিতে এবং পরদিন বাংলায় সম্প্রচারিত ঘোষণাটি আব্বুসহ সামরিক ও বেসামরিক সকল বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করে। পরদিন ভোরেই তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করেন। কখনো হেঁটে, কখনো খেয়া, নৌকা ও রিকশায় চড়ে তাঁরা পথ পাড়ি দিতে থাকেন। ফরিদপুর শহরে পৌঁছবার পূর্বে কিছু সময়ের জন্য তাঁদের ঘোড়াতেও চড়তে হয়। শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে তাঁরা ঘোড়া ছেড়ে দেন। যাতে চিহ্নিত না হয়ে পড়েন এ জন্যই তাঁরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এবারে রিকশাযোগে তাঁরা পৌঁছান আওয়ামী লীগের নেতা ও এমপি ইমামউদ্দিনের বাড়িতে। এমপি ইমামউদ্দিন সে সময় বাড়ি ছিলেন না। ঢাকার মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের কথা শুনে তিনি বাড়ি থেকে দূরে সরে স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্য বাঙালি পুলিশ ও ইপিআরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। বহু মানুষ সে সময় ফরিদপুর শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয়গ্রহণ করে। চারদিকের আতঙ্কপূর্ণ থমথমে পরিবেশের মধ্যে বাড়িতে একাকী অবস্থানকারী ইমামউদ্দিনের স্ত্রী হাসি তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সাহসিকতা, আতিথেয়তা ও তেজস্বী মনোভাব আবারো প্রমাণ করল যে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নারীর

---

* ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম লেখককে জানান যে (১৭, ২০ ও ২২ মে, ২০১৪) ওনার লেখা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বইটিতে (১৯৯১, পৃ. ২২) গ্রামটির নাম আগারগাঁও উল্লেখিত হলেও নামটি হবে আওরঙ্গবাদ।

** ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম লেখককে জানান যে (১৭, ২০ ও ২২ মে, ২০১৪) তাজউদ্দীন আহমদ ও তিনি ২৮ মার্চ রাতে মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণা বাংলায় শুনতে পান। ২৯ মার্চ কামারখালি ঘাটে তাঁরা আবারও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অন্য ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পান। ঘোষণায় শত্রুর দিকে নজর রাখতে বলা হচ্ছিল। পাকিস্তানি কমান্ডোরা এলাকায় ঢুকতে পারে এই সতর্কবাণী এবং তাদেরকে ধরিয়ে দেবার ঘোষণাও দেওয়া হচ্ছিল।

ভূমিকা অনন্য। ৩০ মার্চ সকাল ১০:৩০ এ তাঁরা ঝিনাইদহে পৌঁছলেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য আবদুল আজিজের বাড়িতে তাঁরা আশ্রয়গ্রহণ করলেন। এখানেই দেখা হলো মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা (স্বাধীনতার পরে ঢাকার পুলিশ সুপার) মাহবুবউদ্দিন আহমদের সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর স্থাপিত কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে তখন যশোর ও কুষ্টিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে সংবাদ বিনিময় হচ্ছিল। নড়াইলের এস.ডি.ও কামাল সিদ্দিকীও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আবদুল আজিজ আব্বুকে তাঁর একটি লুঙ্গি ব্যবহার করতে দেন। আব্বুর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিনি দাড়ি না কামাতে মনস্থির করেন। ভারতের মনোভাব সম্বন্ধে তখন তিনি নিশ্চিত নন। যদি ভারত মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন না করে তবে বাংলাদেশের মাটিতেই আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সেই চিন্তা করে খোঁচা খোঁচা দাড়িসহ কৃষকের বেশভূষায় তিনি রওনা দেন চুয়াডাঙ্গায়। চুয়াডাঙ্গায় পৌঁছে দেখা হয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডা. আসহাবুল হক, জাতীয় পরিষদের সদস্য আফজালুর রশীদ বাজ প্রমুখের সঙ্গে। চুয়াডাঙ্গায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ইপিআর-এর অসম সাহসী কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে তখন প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-এ-ইলাহী চৌধুরীও সর্বতোভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করছেন। সাধারণ মানুষরা অকাতরে তাদের খাবারদাবার ভাগ করছে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে। যশোর ও কুষ্টিয়ায় প্রতিরোধযোদ্ধাদের বিজয় ও পাকিস্তানি সেনাদের পলায়নে আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটেছে। এরই মধ্যে আব্বু ভেবে চলেছেন—তাঁর পরবর্তী পথের সন্ধান যেন একটু একটু করে উন্মোচিত হচ্ছে। উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই বিশাল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে খণ্ড যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা সম্ভব। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় অস্ত্র, পর্যাপ্ত রসদ ও উন্নত প্রশিক্ষণের। এই দুরূহ কাজটিকে বাস্তবায়নের পথ কী ? প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত কতখানি সহায়তা করবে ? ২৫ মার্চের গণহত্যার ক'দিন আগেই চল্লিশটি দেশের দূতাবাসের প্রতিনিধিরা আব্বুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।[৬] ৭ মার্চে মুজিব কাকুর ভাষণে স্বাধীনতা ও গেরিলাযুদ্ধের যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল তারই প্রেক্ষাপটে ভাবের আদান-প্রদান হয়েছিল। ৭ মার্চের দুই-একদিন পূর্বে মুজিব কাকুর নির্দেশে আব্বু ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার কে. সি. সেনগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের শাসকেরা যদি সত্যি সত্যি পূর্ব বাংলায় ধ্বংস তাণ্ডব শুরু করে তবে সে অবস্থায় ভারত সরকার আক্রান্ত কর্মীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান বা সম্ভাব্য প্রতিরোধ সংগ্রামে কোনো সাহায্য সহযোগিতা করবে কি না জানতে চাওয়া।[৭] এ বিষয়ে দিল্লির মনোভাব জানতে সেনগুপ্ত দিল্লিতে যান। ভারতের সাধারণ নির্বাচনে ব্যস্ততার কারণে উচ্চপর্যায় থেকে সংবাদ আনতে তাঁর কিছুটা সময় লেগে যায়। ঢাকায় আব্বুর সঙ্গে সেনগুপ্তের সাক্ষাৎ হয় ১৭ মার্চ। ঐ সাক্ষাতে সেনগুপ্ত সুস্পষ্ট উত্তর না দিলেও আশ্বাস দিয়েছিলেন ভারতের সহযোগিতার। লেখক মঈদুল হাসান এ সমন্ধে উল্লেখ করেন, 'এই বৈঠকে স্থির হয় তাজউদ্দীন শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শের পর সেনগুপ্তর সঙ্গে আবার মিলিত হবেন এবং সম্ভবত তখন তাজউদ্দীন সর্বশেষ পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতার প্রকার ও ধরন সম্পর্কে নির্দিষ্ট আলোচনা চালাতে সক্ষম হবেন। ২৪ মার্চে এই বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব এ বিষয়ে কোনো আলোকপাত করতে না পারায় এবং নির্ধারিত সময়ে তাজউদ্দীনকে অসহযোগ আন্দোলনসংক্রান্ত নির্দেশাবলি সংশোধনের মুসাবিদায় ব্যস্ত রাখায় সেনগুপ্তের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।'[৮]

৩০ মার্চ বেলা প্রায় ৩টা। সীমান্তের উদ্দেশে চলতে চলতে আব্বুর মাথায় জড়ো হচ্ছিল অজস্র চিন্তা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা প্রসঙ্গে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তৌফিক-এ-ইলাহী চৌধুরী ও মাহবুব উদ্দিন আহমেদকে ওপারে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত মনে হলো। আমরা দুই বোন সোৎসাহে প্রশ্ন করি, তারপর ? গৌরবদীপ্ত সময়ের যে ইতিহাস গল্পচ্ছলে আব্বু সেদিন বলে গিয়েছিলেন তাঁর দুই নাবালিকা কন্যার কাছে তারই বিবরণ পরে অনুরণিত হয় আমীর-উল ইসলামের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-কথায়। তিনি লিখলেন সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটির কথা এভাবে 'পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সীমান্ত পার হব না বলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য মর্যাদা নিয়েই আমরা ভারতে যাব। স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের গ্রহণ করলেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের আলোচনা সম্ভব।'[৯]

তৌফিক-এ-ইলাহী চৌধুরী ও মাহবুব উদ্দিন আহমেদ চলে গেলেন ওপারে। বলা যেতে পারে যে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন এই দুই দেশপ্রেমিক তরুণ। তাঁরা দায়িত্ব সহকারে আব্বুর সেই ঐতিহাসিক বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছিলেন ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের কাছে। কুষ্টিয়া জেলার জীবননগরের কাছে এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার সীমান্ত বর্তী ওই স্থানটির নাম টুঙ্গি। জায়গাটি প্রায় জনমানবহীন। সীমান্তের পাশে ঝোপ-জঙ্গল ও বড় বড় অশ্বত্থ, দেবদারুগাছ। তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শীর্ণকায় এক খাল। খালের ওপর একটি সেতু গোছের কালভার্ট। তার ওপরই বসার একটুখানি জায়গা। সেখানেই বসে অপেক্ষারত আব্বু ও তাঁর সঙ্গী। পড়ন্ত বেলা, সূর্য ডুবি ডুবি করছে। আব্বুর মনটায় নেমেছে বিষাদের ছায়া। আমীর-উল ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন তার বিষণ্ণতার কারণ। তিনি বললেন, যে তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। তাঁর হিন্দু সহপাঠীরা বলতেন, 'তোদের পাকিস্তান টিকবে না'। তিনি পাল্টা যুক্তি খাটিয়ে জোর দিয়ে বলতেন, 'অবশ্যই টিকবে'।[১০] তিনি আজ সেই তর্কে হেরে গেলেন। কিন্তু তাতে কী ? যে আকাশে সূর্যাস্ত হয়, সে আকাশেই তো উদিত হয় নতুন সূর্য। আব্বু মনে মনে আঁকলেন ভবিষ্যতের রূপরেখা। তিনি বললেন, 'পালিয়ে যাওয়ার পথে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা লাভের যে চেতনার উন্মেষ দেখে গিয়েছিলাম সেটাই আমাকে আমার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে অনিবার্য সুযোগ দিয়েছিল। জীবননগরের কাছে সীমান্তবর্তী টুঙ্গি নামক স্থানে একটি সেতুর নিচে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে আমি সেদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বার্থে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা হলো, একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম পরিচালনার জন্য কাজ শুরু করা।'[১১]

বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার সূর্যোদয় হবে বলেই আব্বুর কাছে ন্যস্ত হলো মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বভার। এর পরের ঘটনাগুলো ঘটল এমনভাবে যেন রোমহর্ষক উপন্যাসের নতুন কোনো পর্ব। তৌফিক ও মাহবুবের সঙ্গে দেখা হলো ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মহাপাত্রর। তৌফিক ও মাহবুবের কাছ থেকে পুরো ঘটনা জেনে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তারা তখনি সংবাদ প্রেরণ করেন তাঁদের বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান আইজি গোলক মজুমদারকে। এরপর সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় স্বাধীন রাষ্ট্রের এই দুই প্রতিনিধিকে পূর্ণ সম্মান সহকারে গার্ড অব অনার প্রদান করে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতীয় সীমান্ত চৌকিতে। সন্ধ্যা আটটার কাছাকাছি সময় গোলক মজুমদার গাড়ি করে কোলকাতা থেকে টুঙ্গিতে উপস্থিত হন। গোলক মজুমদার দুস্তর-মরুকান্তার পাড়ি দেওয়া স্বাধীনতার পথের দুই যাত্রীর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'তাঁদের পরনে ছিল ময়লা গেঞ্জি ও লুঙ্গি। ক্লান্ত মুখে চার-পাঁচ দিনের দাড়িগোঁফ ও পায়ে রাবারের ছেঁড়া চটি। একেবারে কৃষকের সাজ। অনাহারে-অর্ধাহারে শরীর দুর্বল। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ।'[১২] প্রথম সাক্ষাতেই আব্বু জানালেন যে, দেশের ভেতরে

প্রতিমুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতে আশ্রয় নিতে অনাগ্রহী। 'কেননা শেখ সাহেবের সুস্পষ্ট নির্দেশ যে ভারতই বাঙালির শেষ সম্বল। সুতরাং এমন কিছু যেন না করা হয় যাতে ভারত বিব্রত বোধ করে।'[১৩] গোলক মজুমদার বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। যোগ্য নেতার অভাবে গণবিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে যাবে এবং তিনি এলে ভারত কোনোভাবেই বিব্রত হবে না।'[১৪] তখন আব্বু আরও আলাপ-আলোচনা করে আমীর-উল ইসলামসহ জিপে করে তাঁর সঙ্গে কোলকাতা রওনা হন। তৌফিক ও মাহবুব ফিরে গেলেন কুষ্টিয়ায়, পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আরও একটি বড় অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে। গোলক মজুমদারের সঙ্গে আলাপের প্রাথমিক পর্যায়েই আব্বু ও আমীর-উল ইসলাম শরণার্থীদের আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের জন্য ভারত সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানান। গোলক মজুমদার জানান যে তাঁর পক্ষে ছোটখাটো কিছু অস্ত্র জোগাড় করা সম্ভবপর হলেও বড় পর্যায়ের সাহায্যের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন রয়েছে।[১৫] জিপ গাড়িটি সোজা গিয়ে থামল দমদম বিমানবন্দরে। প্রায় এইসময় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী প্রধান কে. এফ. রুস্তামজি দিল্লি থেকে বিমানে করে সেখানে এসে পৌঁছলেন। গোলক মজুমদার কোলকাতা রওনা হওয়ার পূর্বেই রুস্তামজির সঙ্গে যোগাযোগ করে আব্বুদের বর্তমান অবস্থা ও আবেদন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিলেন। এরপর রুস্তামজিসহ তাঁরা উঠলেন কালো অ্যাম্বাসেডর গাড়িতে। তাঁদের নেওয়া হলো একটা ছিমছাম সুন্দর বাড়িতে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের জন্য সংরক্ষিত এই বাড়িটির নাম 'আসাম ভবন'। তাঁদের কোনো পরিধেয় বস্ত্র না থাকায় রুস্তামজি সুটকেস খুলে তাঁর নিজের পোশাক তাঁদের পরতে দিলেন। গোসল করার পর ছয় ফুট লম্বা রুস্তামজির পায়জামা-পাঞ্জাবিতে তাঁদের বেমানান লাগলেও করার কিছুই ছিল না। প্রায় শেষরাতে সামান্য কিছু খেয়ে তাঁরা আলোচনায় বসলেন। পরদিন সকালে নিরাপত্তা অফিসার শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত হলেন। (মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টিতে শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন।) পরিচয়পর্বের পর তাঁর সহায়তায় আব্বু ও আমীর-উল ইসলামের জন্য প্রয়োজনীয় শার্ট-প্যান্ট, ব্যক্তিগত ব্যবহার সামগ্রী ও আব্বুর ডায়াবেটিসের ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে রুস্তামজি দিল্লিতে যোগাযোগ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আব্বুর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর আস্থাভাজন ছিলেন। এদিকে সেদিন আব্বুরা আবার ফিরে যান টুঙ্গির সীমান্তে। সেখানে বিএসএফ-এর সহায়তায় কিছু অস্ত্র মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর কাছে তুলে দেওয়া হয়। গোলক মজুমদার একটি এলএমজি আব্বুকে দেন। সেই এলএমজিটি আব্বু মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'আপনি সামলাবেন এটা'। তখুনি ইপিআর-এর সুবেদার মুজিবুর রহমানকে এলএমজি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সময় গোলক মজুমদার আব্বুকে উদ্দেশ করে ইংরেজিতে বলেন, 'you will win' (আবদুল আজিজ বাগমার, 'চিরবিজয়ের মহাপ্রস্থান', অনুলিখন)। ১ এপ্রিল রাত ১০টায় একটি মালবাহী সামরিক বিমানে আব্বু ও আমীর-উল ইসলাম , গোলক মজুমদার ও শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় সংগোপনে সকলের চোখ এড়িয়ে দিল্লির পথে রওনা হলেন। পুরনো AN12 রাশিয়ান বিমানটি প্রচণ্ড আওয়াজ ও কাঁপুনি তুলে ধীরগতিতে যখন দিল্লিতে পৌঁছল তখন ভোর হয় হয়।[১৬] সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখা হয় বাংলাদেশ থেকে আগত কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান, আবদুর রউফ, এম. আর. সিদ্দিকী, সিরাজুল হক প্রমুখের সঙ্গে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (RAW) তাঁদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে আগত রাজনীতিবিদদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং গোপনে আব্বুকে দেখিয়ে নিশ্চিত হন যে তিনিই মূল ব্যক্তি।[১৭]

৩ এপ্রিল রাত ১০টায় ১০ নম্বর সফদার জং রোডে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আব্বুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইন্দিরা গান্ধী সে সময়টিতে আব্বুর অপেক্ষায় বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। বাহুল্যবর্জিত স্টাডিরুমে তাঁদের আলাপচারিতা শুরু হয় এভাবে। ইন্দিরা গান্ধী প্রথমেই আব্বুকে প্রশ্ন করেন, 'শেখ মুজিব কেমন আছেন?' আব্বু উত্তর দেন, 'আমার যখন তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় তখন তিনি সব বিষয় পরিচালনা করছিলেন। তাঁর যে পরিকল্পনা ছিল সে মতোই আমাদের কাজ চলছে এবং হাইকমান্ড হিসেবে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যাঁর যেটা দায়িত্ব সেভাবে কাজ করছি এবং আমি আমার দায়িত্ব হিসেবে এখানে এসেছি।'[১৮] আব্বু এই আলোচনায় খুব পরিষ্কারভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে বললেন, 'এটা আমাদের যুদ্ধ। আমরা চাই ভারত এতে জড়াবে না। আমরা চাই না ভারত তার সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে আমাদের স্বাধীন করে দিক। এই স্বাধীনতার লড়াই আমাদের নিজেদের এবং আমরা এটা নিজেরাই করতে চাই। এই ক্ষেত্রে আমাদের যা দরকার হবে তা হচ্ছে, আমাদের মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার জন্য আপনার দেশের আশ্রয়, ট্রেনিংয়ের সবরকম সুবিধা এবং সে ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও অস্ত্র সরবরাহ। এ সব আমাদের জরুরি প্রয়োজন হবে। আর আমরা যে রকম পরিস্থিতি দেশে দেখে এসেছি তাতে মনে হয় যে দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রচুর শরণার্থী এ দেশে ঠাঁই নেবে। তাদের আশ্রয় এবং আহারের ব্যবস্থা ভারত সরকারকে করতে হবে। বহির্বিশ্বে আমাদের স্বাধীনতার কথা প্রচারের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখবেন এটা আমরা আশা করি।'[১৯] ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আন্তর্জাতিকীকরণ যাতে না ঘটে সে বিষয়ে আব্বু জোর দেন। নতুন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিমালাও ব্যাখ্যা করেন সাবলীলভাবে। তিনি জানান, 'আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হবে জোটনিরপেক্ষ। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়। বাংলার মানুষের সংগ্রাম মানবতার পক্ষে ও হিংস্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। সকল গণতন্ত্রকামী মানুষ ও সরকারের সহায়তা আমরা চাই।'[২০] আব্বু ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ধীশক্তি ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাষ্ট্রনায়কের মতোই। এ কারণেই আব্বু ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রশাসনের মধ্যে শ্রদ্ধা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারত সরকার সর্বাত্মকভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। দ্বিতীয় দফা বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী আব্বুকে জানান মুজিব কাকুর গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ, যা পাকিস্তান সরকার তখনো প্রচার করেনি। এই সংবাদ পেয়ে আব্বু বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যা কিছু করণীয় তা করতে শ্রীমতি গান্ধীকে অনুরোধ জানান। ইন্দিরা গান্ধী আশ্বাস দেন, 'তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।'[২১] ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাফল্যজনক সাক্ষাতের আলোকে ভারতসহ বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে তাকে পরিচালনার জন্য অবিলম্বে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এই চিন্তাটি কুষ্টিয়ার সীমান্তে অপেক্ষারত আব্বুর মাথায় প্রথমেই উদয় হয়েছিল। এখন প্রয়োজন যথাশীঘ্র তা বাস্তবে রূপ দেওয়া। সরকার গঠনের লক্ষ্যে আব্বু ও আমীর-উল ইসলাম আলোচনা করেন এম. আর. সিদ্দিকী, আব্দুর রউফ প্রমুখের সঙ্গে। ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ভাষাসৈনিক রফিকউদ্দিন ভূঁইয়াসহ আরও অনেকে চিঠির মাধ্যমে সরকার গঠনের পক্ষে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন। তাঁরা লিখলেন, 'যেন অবিলম্বে সরকার গঠন করা হয় এবং তাজউদ্দীন আহমদ যেন সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'[২২] আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো অসহযোগ আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মী শীর্ষস্থানীয় পাঁচজন নেতাসহ যে হাইকমান্ড গঠন করা হয়েছিল এবং যাঁরা ছায়া সরকারের কাজ করছিলেন, তাঁদের নিয়েই প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হবে। হাইকমান্ড নিয়ে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রথম কাজ হয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল

ইসলামসহ মন্ত্রিসভার বাকি সদস্যদের খুঁজে বের করা। দিল্লি থেকে কোলকাতায় পৌঁছে দেখা হয় মন্ত্রিসভার সদস্য এম. মনসুর. আলী ও আবু হেনা কামরুজ্জামানের সঙ্গে। তাঁরাসহ আওয়ামী লীগের প্রায় অর্ধশত এমএলএ, এমপি ও রাজনীতিক যাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে কোলকাতায় আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এম. মনসুর আলী ও আবু হেনা কামরুজ্জামান স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।[২৩] সরকার গঠনের ব্যাপারে আব্বুর বক্তব্যকে সকলেই মেনে নেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণটির খসড়া আব্বু, রেহমান সোবহান ও আমীর-উল ইসলাম মিলে তৈরি করেছিলেন।[২৪] দিল্লিতে রেকর্ড করা আব্বুর বক্তৃতাটি শিলিগুড়ির কোনো এক জঙ্গলের গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় ১০ এপ্রিল, বাংলাদেশ সময় রাত দশটায়।[২৫] সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় সংগ্রাম এবং বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে স্বাধীন বাংলা সরকার গঠনের কথা। সীমান্ত এলাকায় তাঁরা যাতে সহজে যাতায়াত করতে পারেন সে জন্য ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের একটি ছোট ডাকোটা প্লেনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই প্লেনে করেই ১১ এপ্রিল সকালে ময়মনসিংহের তুরা পাহাড়ের কাছে আব্বু, এম. মনসুর আলী ও আমীর-উল ইসলাম অবতরণ করলেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের সন্ধানে। বিএসএফ-এর সহায়তায় তাঁরা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আবদুল মান্নানের খোঁজ পেলেন। আব্বু ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম একান্তে আলাপ করলেন। আব্বু তাঁকে জানালেন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনসহ সব ঘটনা। সব শুনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম আব্বুসহ সকলকে অভিনন্দন জানালেন এবং সরকার গঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ মত দিলেন।[২৬] ডাকোটা প্লেনটি এবার উড়াল দিল আগরতলার পথে। সেখানে পৌঁছে খুঁজে পেলেন মন্ত্রিসভার অপর সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমদকে। ইতোমধ্যে কর্নেল ওসমানীসহ অনেক রাজনীতিবিদই সেখানে পৌঁছেছেন। আব্বু আলাপ করলেন কর্নেল ওসমানীর সঙ্গেও। প্রথাগত যুদ্ধের বিপরীতে জনযুদ্ধকে গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে সংগঠিত করার আহ্বান জানিয়ে তাঁর ওপর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। সেক্টর কমান্ডারদের নাম আব্বু ১০ এপ্রিলের ভাষণেই উল্লেখ করেছিলেন। সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে, মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে। বাংলাদেশের মাটিতেই হবে শপথগ্রহণ এই ছিল আব্বুর সিদ্ধান্ত। এভাবেই সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাঁধে ন্যস্ত হলো মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার গুরু দায়িত্ব। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ল মুক্ত আকাশে। আব্বু বললেন, 'পলাশীর এক আম্রকাননে বাংলা ও ভারতের স্বাধীনতার সূর্যাস্ত হয় ইংরেজদের হাতে, অপর এক আম্রকাননে উদিত হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্য।' আব্বুর গল্প বলা শেষ হলো। তিনি চলে গেলেন উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে। সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে সভা শুরু করলেন ঘড়ির কাঁটা ধরে। স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল অনন্য ঘটনাবলির প্রদীপরাশি গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রজ্বলিত করেছিলেন আমাদের কচি মন। তাঁর বলায় ছিল আশা ও নিশ্চিত বিজয়ের অনুরণন। তাঁর গল্পে অনুচ্চারিত ছিল স্বাধীনতাবিরোধীদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থান্বেষীদের অন্তর্কলহ ও কুটিলতার বিরুদ্ধে তাঁর অবিশ্রান্ত সংগ্রামের কথা। আপসহীন, চূড়ান্ত স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁকে পাড়ি দিতে হয়েছিল বহু চড়াই-উতরাই।

খন্দকার মোশতাক আহমেদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কৌশলে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পাকিস্তান ও মার্কিন সরকারের স্বার্থ রক্ষার কাজে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদটির প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহের কারণ এই কার্যকলাপ থেকেই অনুমান করা যায়। মুক্তিসংগ্রামকে ধ্বংস করে

কনফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করার জন্য তিনি সুচতুর চাল চালেন। মুক্তিযুদ্ধকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য তিনি একটি ভাবাবেগপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। 'স্বাধীনতা চাও, না মুজিবকে চাও ?' যদি স্বাধীনতা পেতে হয় তাহলে মুজিবকে পাবে না এবং মুজিবকে পেতে হলে স্বাধীনতাসংগ্রামকে বিসর্জন দিতে হবে। এই ছিল পৃষ্ঠপোষক মার্কিন সরকারের তরফ থেকে পেশ করা তাঁর যুক্তি। এর জবাবে আব্বু বলেছিলেন, 'স্বাধীনতাও চাই, মুজিবকেও চাই। স্বাধীনতা এলেই মুজিবকে পেতে পারি।'[২৭] মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে মোশতাকের গোপন আদান-প্রদান সম্পর্কে আব্বু অবহিত হওয়ার পর ষড়যন্ত্রের দোসর পররাষ্ট্রসচিব মাহবুব আলম চাষীসহ মোশতাককে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। সাংবাদিক লরেন্স লিফসুলজ (Lawrence Lifschultz) তাঁর 'Bangladesh: The Unfinished Revolution' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> The (U.S.) contacts were highly sensitive because...they bypassed the dominent leadership of the provisional government in person of the Prime Minister Tajuddin Ahmad. Tajuddin like nearly the entire rank and file of the Bangladesh Movement, was irrevocably commited to full independence of the country, after the massacre of 25th March and would breach no compromise on this issue. Therefore absolute descretion and secrecy was the key to splitting the Bengali leadership and supporting that faction which would compromise with Pakistan and not demand full independence. Some sources have suggested that the moment chosen was to be October, 1971, when Mustak, as Foreign Minister, was expected to arrive in New York to present the Bangladesh Case before the UN general assembly. Had he suddenly in New York, Unilaterally and without warning announced a compromise solution short of independence—a position that constituted a sell out and betrayal in the view of Tajuddin and the rest of the leadership—Mustak might at that stage have pulled off a full coup against the rest of Awami leadership back in Calcutta and the history of Bangladesh might have been very different.'[২৮]

লরেন্স লিফসুলজ মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে মোশতাকের গোপন যোগসাজশের কথা এবং কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই জাতিসংঘে যোগদান করে স্বাধীনতার বিপক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা ঘোষণার গোপন চক্রান্ত এবং তাঁর ঐ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপের বিপরীতে আব্বুর নেতৃত্বে প্রায় সকল বাঙালির পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে আপসহীন মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আব্বুর ওই আপসহীন মনোভাবেরই বাস্তব রূপ দেখতে পাই যখন মার্কিন প্রশাসনের সহায়তায় পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের লক্ষ্যে মোশতাকের জাতিসংঘে যোগদানের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় আব্বুর তড়িৎ ও দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে।[২৯] মোশতাকের পরিবর্তে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের আট সদস্যের প্রতিনিধি দলটি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন।[৩০]

স্বাধীনতার পর অব্যাহতিপ্রাপ্ত মাহবুব আলম চাষীর বদলে ২১ ডিসেম্বর আবুল ফতেহ পররাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মোশতাককেও ছাড়তে হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদটি। এর প্রতিশোধ মোশতাক পরবর্তী সময়ে নিয়েছিল বড় নির্মমভাবে। মোশতাকের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার স্বার্থে দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে অধিকাংশ সামরিক সিদ্ধান্ত আব্বু 'একক দায়িত্বে গ্রহণ করেন।'[৩১] মোশতাকের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটি স্বাধীনতাযুদ্ধের নাজুক পরিস্থিতিতে যাতে বিভাজন ও সংশয়ের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সে জন্য বিষয়টিকে সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়। একদিকে আব্বুকে যেমন প্রতিহত করতে হয়েছিল আন্তর্জাতিক চক্রান্ত তেমনি যুবনেতাদের অনাস্থা ও ষড়যন্ত্র এবং আওয়ামী লীগের একাংশের অন্ত র্কলহ ও কোন্দল। বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে যুবনেতারা স্বাধীন বাংলাদেশ তথা মুজিবনগর সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করে। তারা বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের পক্ষে জোর দেয়। আব্বু বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন জনের মতামত গ্রহণ করেন। এমনকি যোদ্ধাদেরও মতামত নেন। আলোচনার মাধ্যমে কোন্দলকারী ও অনাস্থা প্রদর্শনকারী দলটি ব্যতীত অধিকাংশ সকলের কাছেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আইনগত সরকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ভারত সরকারের কাছ থেকে অস্ত্রগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা পরিচিত হবে সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে।[৩২] সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে বিভিন্ন বিপ্লবী কাউন্সিল গড়ে ওঠাও অস্বাভাবিক কিছু নয়, যা স্বাধীনতাযুদ্ধকে করবে শতধা বিভক্ত। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনগত সরকারের পক্ষেই সম্ভব স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থনকারী সকলকেই দল মতনির্বিশেষে এক কাতারভুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে পরিচালনা করা এবং স্বীকৃতি ও সমর্থনের জন্যে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। সরকার গঠনের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তির বলে যখন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাবটি ভেস্তে যায় তখন বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপরিচালক রুস্তামজির প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (Research and Analytical Wing)-এর সহায়তায় শেখ মনির নেতৃত্বে গঠিত হয় মুজিব বাহিনী। মেজর জেনারেল সুজান সিং উবান নিয়োজিত হন মোটা ভাতা ও সুবিধাপ্রাপ্ত মুজিব বাহিনীকে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে। অন্যদিকে অপর্যাপ্ত অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও ভাতার সংকটের মধ্যে দিয়ে নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা দেশ মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত হন। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ ভারতীয় প্রশাসনকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তারা সরাসরি বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং একমাত্র তাদেরই অধিকার রয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করার। 'এক বাস্কে সকল ডিম না-রাখার' পক্ষপাতী ভারত সরকারও মুজিব বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গোপন রাখে।[৩৩] ব্যাপারটি বেশিদিন গোপন থাকে না। অগাস্টে আব্বু যখন দিল্লি সফর করেন, সেখানে তিনি 'র'-এর সাহায্যপুষ্ট 'মুজিব বাহিনীর' ক্রমবর্ধমান উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ ও সরকার-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এই স্বাধীনতাযুদ্ধকে বিভক্তকারী মারাত্মক সমস্যা সমাধানের জন্য পি.এন হাকসার (ইন্দিরা গান্ধীর মুখ্য সচিব) এবং 'র' প্রধান রামনাথ কাওয়ের সাহায্য চান। কিন্তু দুজনেই নীরব থাকেন।[৩৪] তাঁদের এই নীরবতায় আব্বু মনোবল না হারিয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' হিসেবে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন আদায়ের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকেন। সমগ্র জাতির মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে আব্বুর নিবেদিত কর্মপ্রয়াসের বিপরীতে অনুগত তরুণদের ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে গঠিত মুজিব বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। তাদের আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড ও ভিত্তিহীন অপপ্রচারণা তাঁদের ক্রমশই অপ্রিয় করে তোলে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নয়, বরং মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ইউনিট হয়

মুজিববাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।[৩৫] জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কাতার থেকে তারা এভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারত সরকারও তাদের প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।* একপর্যায়ে মুজিববাহিনীর শীর্ষস্থানীয় এক নেতা এতটাই হিংসাত্মক ও মরিয়া হয়ে ওঠে যে সে আব্বুকে হত্যারও প্রচেষ্টা চালায়।[৩৬] মোশতাক, মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ নেতাদের গঠিত উপদলগুলোও আব্বুর কর্মকাণ্ডে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করতে থাকে।[৩৭] তাদের সৃষ্ট অবিশ্বাস, অনাস্থা ও অপপ্রচারণা বালুর দুর্গের মতোই ধসে পড়তে থাকে আব্বুর সবল নেতৃত্বের কারণে। মাত্র নয়টি মাস তিনি ছিলেন জাতির নেতৃত্বে। অথচ ঐ নয়টি মাসেই তিনি সম্পন্ন করেছিলেন যেন এক যুগের কর্ম। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে সফল সরকার ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়ের এই প্রথম বাংলাদেশ সরকার। নেতৃত্বকে যদি এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা যায় তাহলে বলা যেতে পারে সুযোগ্য নেতা তিনিই, যিনি সবার মেধা ও দক্ষতাকে সুপরিকল্পিতভাবে দেশ ও দশের কাজে লাগাতে পারেন। নেতৃত্বের এই বিরল গুণটি আব্বুর ছিল। জাতির চরম দুর্দিনে ও জাতির পরিত্রাণে তাঁর প্রতিটি কর্মেই ছিল দেশপ্রেম, দূরদর্শিতা, ন্যায় ও সততার স্বাক্ষর। নিপুণ কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, পুনর্বাসন প্রভৃতি অঙ্গসংগঠনগুলো তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে কোনো সমস্যাই বাদ পড়েনি। স্বহস্তে লিখিত ১৩ এপ্রিলের মেমোতে উল্লেখ করেছেন সামরিক ও রাজনৈতিক সংগঠনকে শক্তিশালী করার কথা, যুবক্যাম্প সৃষ্টির কথা। নির্যাতিত বেসামরিক নাগরিকদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশের মুদ্রা ছাপানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়টিও তাঁর চোখ এড়ায়নি।[৩৮]

ঐ একই মাসের নোটে তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি আদায়ের বিষয়টিতে যেমন জোর দিয়েছেন, পরবর্তী ২ মে'র নোটে জাতির পিতার মুক্তি দাবি উল্লেখ করেছেন। যেন তিনি জানতেন যে বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও স্বাধীনতাযুদ্ধের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করবে তাঁর মুক্তি। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বিরোধী দলগুলোর ভূমিকাকেও তিনি খাটো করে দেখেননি। সরকার পরিচালনা ও দেশ মুক্তির সংগ্রামে তাদের পরামর্শ ও সহায়তা লাভের জন্য তাঁর নিজস্ব দলের একাংশের প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও আহ্বায়ক হিসেবে গঠন করেন মুক্তিযুদ্ধের মাইলফলক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি। মওলানা ভাসানী হন এই কমিটির সভাপতি। দেশের কল্যাণে, ভিন্ন জন ও মতকে ঐক্যবদ্ধ করে, একত্রে কাজ করার গণতান্ত্রিক মানসিকতা তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হয় চরম প্রতিকূল অবস্থাতেও। ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফফর), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস ও আওয়ামী লীগকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৮ সেপ্টেম্বর আমন্ত্রণ জানিয়ে স্বহস্তে যে পত্রটি তিনি লেখেন তার অপর বিশেষত্ব হলো তাতে সকাল ১০টার পাশে ব্র্যাকেটে বাংলাদেশ সময়ের উল্লেখ।[৩৯]

প্রবাসের মাটি থেকে পুরো মুক্তিযুদ্ধকে তিনি পরিচালনা করেছিলেন তাঁর ঘড়ির কাঁটায় বাংলাদেশের সময়কে অনুসরণ করে। বাংলাদেশ তাঁর অস্তিত্বে ছিল সদা বিরাজমান। বাংলাদেশকে তিনি ভালোবেসেছিলেন এক বিশাল হৃদয়ের মানবসত্তা হিসেবে। এই ভালোবাসা তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টিকে ম্লান করেনি। সে কারণে স্বাধীন রাষ্ট্রে অবাঙালিদের—যেমন বিহারি সম্প্রদায় যারা পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল—তাদের সমস্যা ভার লাঘবের কথাও উল্লিখিত হয় তার ২৮ অক্টোবরের নোটে।[৪০] ওদিকে ১৩ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের আগেই মন্ত্রিসভার সভায় রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে দালালদের বিচারের বিষয়টি গৃহীত হয়।[৪১]

---

* ইন্দিরা গান্ধীর অত্যন্ত আস্থাভাজন কূটনীতিক বাংলাদেশ-ভারত বিষয়ক সমন্বয়কারী দুর্গা প্রসাদ ধর (ডি.পি ধর) বাংলাদেশ সরকার বিরোধী মুজিব বাহিনীর তৎপরতা রোধে ব্যাপক অবদান রাখেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে কাউকে শাস্তি দেওয়া আব্বু সমর্থন করেননি। কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় অমানবিক ও বর্বরোচিত কার্যকলাপের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছে তাদের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সরকার কোনো পাইকারি ব্যবস্থা নেবে না। তবে যে সব দালাল স্বাধীনতা সংগ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং বাঙালি হত্যায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তা করেছে তাদের বিচার করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। দালাল-গোষ্ঠী 'বাঙালি বা অবাঙালি' যেই হোক না কেন, রেহাই পাবে না।'[৪২]

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জন্মলাভ করে। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে এর আদর্শগত ও আচরণগত পার্থক্য ব্যাপক। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম একটি রক্তক্ষয়ী ও বৈপ্লবিক মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ থেকে। এই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মূল কর্মকাণ্ড ও নীতিনির্ধারণী ক্ষমতা পাকিস্তানি কায়দায় কোনো সামরিক প্রশাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত নয়। বরং আইনানুগভাবে এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক বেসামরিক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের হাতে ন্যস্ত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন, সামরিক ও বেসামরিক উভয় অংশের মধ্যেই এনেছিলেন উদ্দীপনা ও বিরল ভারসাম্য।

ঐ নভেম্বর মাসেই এল রোজার ঈদ। আব্বু রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে তাদের ক্যাম্পে মিলিত হলেন। আমাদের ফ্ল্যাটে ঈদের দিন কোনো বিশেষ খাবারের আয়োজন হলো না। নতুন কাপড়ও জুটল না। শাক, ডাল, আলুভর্তা, ভাত খেয়ে ঈদ উদ্‌যাপিত হলো। আম্মা আমাদের বললেন যে, লাখ লাখ শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধার ভাগ্যে জোটেনি কোনো ঈদের আনন্দ। তাদের বেদনার ভাগীদার আমাদেরও হতে হবে।

দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবির ও রণাঙ্গন পরিদর্শনে আব্বু।
সামনে থেকে তৃতীয় ব্যক্তি ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। জুন/জুলাই, ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ঐতিহাসিক ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিটির ফলে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের স্বীকৃতি লাভের পথটি উন্মুক্ত হয়। ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো শক্তিশালী মিত্র। যে কারণে পাকিস্তান ও মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পথটি সহজতর হয়। আব্বু স্বীকৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের অনুরোধ জানিয়ে ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর প্রথম শ্রীমতি ইন্দিরাকে চিঠি লিখি। এরপর ২৩ নভেম্বর আর একখানা চিঠি দিই। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ঘোষিত যুদ্ধের ঠিক আগের দিন ২রা ডিসেম্বর ও পরের দিন ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। ৬ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় ভারতীয় পার্লামেন্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করার পর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আমাকে একখানা আনুষ্ঠানিক চিঠি দেন। ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেল সোয়া তিনটায় মুজিবনগরে সে চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছায়।'[৪৩]

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস (২৬ জানুয়ারি, ১৯৭২) উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথি রূপে আব্বু যখন নয়াদিল্লি সফরে যান, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর সাথে এই সাক্ষাৎটি হয়

আব্বুর সুদক্ষ নেতৃত্বের একটি বড় অর্জন হলো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভারতের স্বীকৃতি লাভ। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে মর্যাদাশীল চুক্তিটিও কিন্তু সম্পাদিত হয় ঐ একই সময়। আব্বু এ সম্পর্কে বলেন, 'বাংলাদেশ কারো ঘাঁটি হবে না। এমনকি যুদ্ধের দিনে সবচেয়ে বিপর্যয়ের সময়ে ভারতীয় বাহিনীকে বলেছি, শ্রীমতি গান্ধীকে বলেছি, বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে তুমি আমাদের দেশে যাবে। বন্ধু তখনি হবে যখন তুমি আমাদের স্বীকৃতি দেবে। তার আগে সার্বভৌমত্বের বন্ধুত্ব হয় না। ৬ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দিয়ে ভারতীয় বাহিনী আমাদের সঙ্গে এসেছিল। সেদিন—শুনে রাখুন আমার বন্ধুরা—কোনো গোপন চুক্তি ভারতের সঙ্গে হয়নি। একটাই চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তি প্রকাশ্য এবং কিছুটা লিখিত, কিছুটা অলিখিত। সেই নয় মাসে

সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আমি যুক্তভাবে স্বাক্ষর করেছিলাম। সেখানে লেখা ছিল আমাদের স্বীকৃতি দিয়ে সহায়ক বাহিনী– Supporting force হিসেবে তোমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করবে এবং যেদিন আমরা মনে করব আমাদের দেশে আর তোমাদের থাকার দরকার নেই সেদিন তোমরা চলে যাবে। সেই চুক্তি অনুসারে বঙ্গবন্ধু শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বললেন, ৩০ মার্চের মধ্যে তোমাদের বাহিনী উঠিয়ে নিয়ে যাবে, তখনই মিসেস গান্ধী ১৯৭২-এর ১৫ মার্চের মধ্যে সহায়ক বাহিনী উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।'[৪৪]

৬ ডিসেম্বর যেদিন ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল সেদিন আমাদের সবার হৃদয়ে বয়ে গেল বিপুল আনন্দের জোয়ার। আমাদের ছোট ফ্ল্যাটটি ভরে গেল ফুলে আর ফুলে। আব্বু আমাদের উল্টো দিকের কোনাকুনি ফ্ল্যাটে গেলেন সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে মন্ত্রিসভার সভা করতে। আব্বুর সঙ্গে আনন্দে উল্লসিত আরও অনেকে। সভা সেরে মাত্র আধঘণ্টার জন্যে আমাদের ফ্ল্যাটে এলেন। সোহেলকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। আনন্দে বিহ্বল আমরা দাঁড়ালাম আব্বু, আম্মার পাশে। আমাদের সবার হাতে ধরা ফুলের তোড়া। আব্বুর চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ। তিনি ফ্ল্যাট ভরা উল্লসিত মানুষজনের মধ্যে থেকে হঠাৎ করে ঢুকলেন আমাদের শোবার ঘরে। তার কিছুক্ষণ পরই ঝড়ের গতিতে বের হয়ে চলে গেলেন। বহু যুগ পর আম্মা আমার কাছে সেই বিশেষ দিনের একটি অজানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। আব্বু ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরই আম্মা ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি দেখেন আব্বু ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন। আম্মা, যিনি আব্বুকে গভীরভাবেই জানতেন, বুঝলেন যে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য কাঁদছেন। বাংলাদেশের জন্য এত বড় অর্জন, এই স্বীকৃতির দিন, অথচ তিনি পাশে নেই। আম্মাকে দেখে আব্বু কান্না থামালেন। তারপর কোনো এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আব্বু জানালার গরাদে হাত রাখলেন। তারপর আম্মা দেখলেন যে আব্বু আম্মার দিকে 'অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে' তাকিয়ে রয়েছেন। তারপর হঠাৎই আম্মাকে বললেন, 'শ্রীমাভো বন্দরনায়েক কি তুমি হবে ?' দু'বার কথাটি তিনি উচ্চারণ করলেন। আব্বুর হঠাৎ ঐ উক্তিটি সম্পর্কে আম্মা তাঁর মনের অবস্থা আমার কাছে এভাবে ব্যক্ত করলেন, 'ঐ মুহূর্তে আমি তাজউদ্দীনের ঐ তাল, লয়, পৃথিবীর বাস্তবতা বিচ্যুত, পৃথিবীর লাখো ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন মন্তব্যের কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। কথাটি বলেই তাজউদ্দীন দ্রুত গতিতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমি বেশ কয় মুহূর্ত নিঃসাড় হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবনার রাজ্যে ডুবে গেলাম। ঐ কথাটির অর্থ কী ?'[৪৫]

১৯৫৯ সালে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী সলোমান বন্দরনায়েক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এক চরমপন্থী ভিক্ষু-ধর্মযাজকের গুলিতে প্রাণ হারান। ১৯৬০ সালে তাঁর বিধবা স্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েক তাঁর স্বামীর শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম দলের নেতৃত্ব দেন এবং বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। শ্রীলঙ্কার ঐ রাজনৈতিক ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে আব্বুর ঐ মন্তব্যটির কী কোনো সম্পর্ক ছিল ? স্বীকৃতির ঐ আনন্দঘন পরিবেশ ছাড়িয়ে আব্বু কী দিব্যদৃষ্টি মেলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দুর্যোগ ও তাঁর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিকেই দেখতে পেয়েছিলেন ? আব্বুও চরমপন্থী ঘাতকদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। দেশের চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে আম্মা তাঁর স্বামীর তিলতিল করে গড়া দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন দুর্দান্ত সাহসিকতা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে। আমাদের বিদ্বৎ সমাজ সেই অনালোকিত ও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে একদিন তথ্য ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবেন এই আশা রাখি।

৭ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হলো। ১১ ডিসেম্বর মুক্ত স্বদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম জনসভায় যোগ দিতে আব্বু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, এম.আর আখতার মুকুল, ফণীভূষণ মজুমদার, জহির রায়হান, রওশন আলী, মোশাররফ হোসেন, তবিবুর রহমান

সরদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মুক্ত যশোরে গেলেন।* বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত জনতা, দেশি ও বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে যশোরের টাউন হল ময়দানের জনসভায় আব্বু বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প উল্লেখ করেন। ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল আব্বুর ঐ বক্তব্য ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না বরং তথাকথিত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে ধর্মের অপব্যবহারকে রোধ করার জন্যই তিনি ঐ ঘোষণা দেন। তাঁর ঐ ঘোষণার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় ১৯৭২ এর সংবিধানে যেখানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। তাঁর দূরদর্শী সেই চিন্তাধারার যৌক্তিকতা বর্তমান বাংলাদেশ ও বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষিতে আরও প্রাসঙ্গিক।

আব্বুর বন্ধুপ্রতিম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী যশোর আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা মশিউর রহমানকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। আব্বু উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে গেলেন ক্যান্টনমেন্টের সেই ঘরটিতে যেখানে তাঁকে পাশবিকভাবে হত্যা করা হয়। ঘরটিতে প্রবেশ করে তিনি ডুকরে কেঁদে ওঠেন। আব্বুর সাদা পাঞ্জাবি সিক্ত হয়ে যায় চোখের জলে। শত্রু-মুক্ত এই নবীন দেশটিকে শহীদের রক্তের উপযুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, সে কথা তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিজয়ের আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যেও আব্বুর অবয়বে বিরাজমান কোনো গভীর চিন্তা। পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু আনাচে-কানাচে তো ছড়িয়ে রয়েছে তাদেরই চর, নতুন মুখোশ পরে। সেই চিন্তাই কি আব্বু করছিলেন, একই সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার হাজারো পরিকল্পনা ? সেই দিনটির প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর টেক্সাস প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব-উর-রহমান জালাল ই-মেইলে অ্যাটাচ করে আমার কাছে পাঠালেন ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১-ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউয়ের প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদে মুক্ত যশোরের এক প্রাঙ্গণে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিহিত গভীর চিন্তায় মগ্ন আব্বুর ছবি। তাঁর সুগভীর দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। যেন তিনি দেখছেন ভবিষ্যৎকে। তাঁর পাশেই কালো আচকান, কালো পায়জামা ও কালো টুপি পরিহিত খন্দকার মোশতাক। সে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে দেখছে। মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকরা পেছনে দাঁড়ানো। সাদা ও কালো, ভবিষ্যৎ ও অতীত। খুবই অর্থবহ ঐ প্রচ্ছদটি, প্রচ্ছদটির শিরোনামটিও অর্থবহ। Bangladesh No Looking Back, (বাংলাদেশ পেছনে তাকিয়ে নেই) শুরু হয়েছে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা।

মোশতাকের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পর আব্বু তাঁকে চোখে চোখে রাখতেন। যশোরেও তিনি তাকে সতর্কতার সঙ্গে কাছে রেখেছিলেন যাতে সে নতুন ষড়যন্ত্র পাকাতে না পারে।

দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে আব্বুর দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। ১০ ডিসেম্বর তাঁর নেতৃত্বে যে সকল সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তারা যুদ্ধাপরাধ করেছেন, তাদেরকে বিচারের অধীনে আনার সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। ১৩ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে দালালদের বিচারের বিষয়টি মন্ত্রিসভায় আব্বুর উদ্যোগে গৃহীত হয় যা আগেই উল্লেখ করেছি। যেন তিনি জানতেন যে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই বিষবৃক্ষদের সমূলে উৎপাটিত না করলে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এক অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্য মুক্ত ও সবল সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

১১ ডিসেম্বর ভোর রাতে রিমিও রওয়ানা দিল মুক্ত যশোরের পথে। আম্মা আমাকে কয়েকবার ডাকলেন। আমি তখনো গভীর ঘুমে। আমার ঘুম না ভাঙায় তিনি আর ডাকলেন না।

---

* তথ্য সূত্র : রুকুনুউদ্দৌলাহ ["এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল শত্রুমুক্ত যশোরের সেই জনসভা]" পত্রিকাটি নাম ও তারিখ বিহীন। ভয়েস অব আমেরিকার সাবেক সংবাদ পাঠক মনসুর আলী এই লেখককে সংবাদের কাটিংটি দেন।

হয়তো তিনি আমাদের দু'বোনকে এক সঙ্গে ছাড়তে চাননি। রাস্তাটি তখনো নিরাপদ নয়। রিমি ছোট হলে কী হবে, ছোটবেলা থেকেই সে ধীরস্থির, কর্তব্যপরায়ণ ও প্রচণ্ড দায়িত্বশীল। দেশ, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তার প্রচণ্ড আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। মুক্ত যশোর যাওয়ার উৎসাহে সেই রাতে সে ভালো মতো ঘুমাতেই পারেনি। ভোরবেলা রিমি মিঠু-সোমাদের সঙ্গে যশোরের পথে রওনা দিল। মিঠুর বাবা, মেসোমশাই গাড়ি চালাচ্ছেন। সেই গাড়িতে মাসিমা, হাসান ভাইও আছেন। ওরা যশোরে গিয়ে দেখল চারদিকে বিপুল আনন্দ উচ্ছ্বাস। যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে ধীরগতিতে সারি সারি ট্রাক এগিয়ে চলেছে। শোকাহত এক বৃদ্ধা, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে যার পুত্র সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে, পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ করে কেঁদে কেঁদে যশোরের আঞ্চলিক ভাষায় বলছে – 'বাজান, একটারে নামায়ে দে, মেরে জান ঠান্ডা করি।' রাস্তার দু'পাশে দাঁড়ানো সারিবদ্ধ জনতা বন্দী পাকিস্তানি সেনাদের জুতো তুলে দেখাচ্ছে। বিজয়ের আনন্দ ও উল্লাসের মধ্যেও স্বজন ও বন্ধু হারানোর অপরিসীম বেদনার চিহ্ন মুক্ত যশোরের আনাচে-কানাচে।

যশোর মুক্ত হয়েছে। চারদিকে রব উঠেছে, 'চলো চলো ঢাকা চলো'—ঢাকাকে মুক্ত করতে হবে। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনী এগিয়ে চলেছে ঢাকার দিকে। উৎফুল্ল জনতা তাদের জানাচ্ছে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও স্বাগতম। ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পতন আসন্ন। আব্বু জেনারেল ওসমানীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন যেকোনো সময় ঢাকায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গন সফর করার জন্য ১১ ডিসেম্বর হতে কোলকাতার বাইরে ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর যেদিন ঢাকা মুক্ত হলো সেদিন তিনি সিলেটে ছিলেন। পাকিস্তান বাহিনী তার হেলিকপ্টারকে আক্রমণ করে ভূপাতিত করে। তিনি ও তার সহযাত্রীরা অলৌকিকভাবে রক্ষা পান।[৪৬] জেনারেল ওসমানী উপস্থিত না থাকতে পারার কারণে ওসমানীর পরিবর্তে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার (পরবর্তী সময়ে এয়ার ভাইস মার্শাল) গেলেন মুক্ত ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যেখানে সূচিত হতে যাচ্ছে শতাব্দীর এক ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। তিরানব্বই হাজার সেনাবাহিনীসহ পাকিস্তানি জেনারেল এ. কে. নিয়াজি আত্মসমর্পণ করলেন।

ঢাকা মুক্ত হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। বাংলাদেশ বিজয় লাভ করেছে। আমরা আনন্দে দিশেহারা। মুক্ত স্বদেশে ফিরে যাব সেই খুশিতে আমরা বিভোর। ২২ ডিসেম্বর আব্বু ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বিমানবন্দরে তাঁদের বিদায় দিতে এসেছিলেন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী-প্রধান খসরু রুস্তামজি, একই বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার আই.জি গোলোক মজুমদারসহ ভারতীয় প্রশাসনের অনেকে। বিমানবন্দরে আব্বুর সঙ্গে বিদায় করমর্দন করে রুস্তামজি বললেন, 'আশা করি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকবে।' আব্বু সামান্য রূঢ় স্বরে উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ, সমতা সহকারেই বন্ধুত্ব হতে পারে।' গোলক মজুমদার নম্রভাষী আব্বুর কাছ থেকে এই কঠোর উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

স্বাধীনতার ষোলো বছর পর বন্ধু মিম্মোকে নিয়ে যখন তাঁর সাথে কোলকাতায় তাঁর সল্টলেক সিটির বাসভবনে দেখা করতে যাই তখন মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে আলাপচারিতার সময় আব্বুর ঐ উক্তি সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, 'দেশের স্বার্থে তিনি রুস্তামজির মতো মহৎ-প্রাণ মানুষ—যিনি বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন—তাঁকেও ছেড়ে কথা বলেননি।'[৪৭]

নেতা, কর্মী ও জনসাধারণের প্রাণঢালা সংবর্ধনার মধ্যে দিয়ে মন্ত্রিসভার সদস্যরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঢাকার সচিবালয় প্রাঙ্গণে আব্বু যে বক্তব্য রাখলেন তার মধ্যে ব্যক্ত হলো বৈপ্লবিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন ও আহ্বান। তিনি বললেন, 'শহীদের রক্তে বাংলাদেশের সবুজ

মাটি লাল হয়েছে। শহীদের রক্তে উর্বর মাটিতে উৎপন্ন ফসল ভোগ করবে গরিব চাষি, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ। কোনো শোষক জালেম ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাংলাদেশকে শোষণ করতে পারবে না।

বাংলাদেশ একটি বিপ্লবী জাতি, যাঁরা প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে কাজ করে যেতে হবে এবং পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে সাম্যবাদী অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ কায়েম করা যখন সম্ভব হবে তখনই বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে।'[৪৮]

তিনি আরও বললেন, 'আমরা যেন এমন কোনো কাজ না করি যাতে মানুষ বলতে পারে পাকিস্তান ভালো ছিল।' প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল তাঁর প্রথম সরকারি কার্যক্রম। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গেলেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে। ২১ নম্বর ওয়ার্ডটি সংরক্ষিত ছিল আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। তিনি প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার কাছে গিয়ে তাঁদের খোঁজখবর নিলেন। ২৪ নম্বর বেডে শায়িত শ্রীপুর থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল মনসুর খান, প্লাস্টারে বাঁধা তাঁর ডান পা উঁচু করে রাখা। আব্বুর আত্মীয়, ময়মনসিংহের নিগুয়রীর আদি বাসিন্দা, কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র মনসুর শ্রীপুরে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ১৮ এপ্রিল পাকিস্তান বাহিনীর গুলি তাঁর ডান পায়ের মাংস ভেদ করে চলে যায়। অধিক রক্তক্ষরণে মরণাপন্ন তিনি, গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজনের সহায়তায় প্রাণে বেঁচে যান। ক্ষত না শুকাতেই আবারও যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। তিনি কসবা বর্ডার দিয়ে ভারতের আগরতলায় যান এবং সেখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসেন শ্রীপুরে। অব্যাহত রাখেন প্রতিরোধ সংগ্রাম। ১৩ ডিসেম্বর তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা শ্রীপুর মুক্ত করেন। সেদিনই পাকিস্তানি বোমারু বিমানের হামলায় তিনি আবারো আহত হন ঐ একই পায়ে। বোমার শলাকা তাঁর পায়ের হাড়ের গভীরে ঢুকে যায়। শেষ পর্যন্ত টিবিয়া বোনের চার ইঞ্চি কেটে ফেলতে হয়। দ্বিতীয়বারও তিনি প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয় এগারো মাস। এরই মধ্যে সদ্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তিত বিজয়ী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ হাসপাতালের বেডে। আত্মীয়তার বাইরে তাজউদ্দীন তাঁর এলাকার এই তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে স্নেহ করতেন। মনসুর প্রথমবার গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আব্বুর কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে তিনি গুলিতে নিহত হয়েছেন। তাই এতদিন পর হঠাৎ করেই তাঁকে হাসপাতালে দেখে আব্বু অভিভূত হয়ে পড়েন। আব্বু বলে ওঠেন, 'আমি শুনেছিলাম...' তারপরই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন।[৪৯]

আব্বুর স্নেহভাজন আত্মীয় মনসুর; আমাদের মনসুর ভাই। আব্বু তাঁর জন্য হাসপাতালে বিশেষ কোনো সুবিধার ব্যবস্থা করলেন না। মুক্তিযোদ্ধা সকলেই তাঁর সন্তান। সকলেরই প্রাপ্য একই সুযোগ ও সুবিধা, এই চিন্তার স্নিগ্ধতা তিনি ছড়িয়ে দিলেন সকল আহতের মধ্যে।

৩১ ডিসেম্বরে আম্মা, আমরা চার ভাইবোন, বন্ধু মিঠু, হাসান ভাই ও রতন ভাই ভারতীয় বিমানে করে ঢাকার তেজগাঁ বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। আমাদের বরণ করতে চেনা ও অচেনা বহু মানুষ বিমানবন্দরে উপস্থিত। অনেকেই আম্মা ও আমাদের গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

ধানমণ্ডির ২ নম্বর রোডের বাংলাদেশ রাইফেলসের হেডকোয়ার্টারের পাশেই বড় মামুর ভাড়া বাড়ি। ২৭ মার্চ সেই ঐতিহাসিক চিরকুট বহনকারী মুসা সাহেবের বাসার দোতলায় তিনি (১৩/২ এর বাসা ছেড়ে) ভাড়া নিয়েছেন। আমাদের দেখতে আত্মীয়স্বজন মানুষজনে সেই বাড়ি ভরপুর। আমরা সকলেই আদান-প্রদান করছি মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাসের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা। বড় মামু তাঁর বাসায় আশ্রয় দিয়েছেন পাঞ্জাবের অধিবাসী দুই সজ্জন অবাঙালি ব্যবসায়ীকে। ফারুক চাচা ও মহম্মদ আলী ভাই এই নামেই ছোটরা তাঁদের সম্বোধন করত। বড় মামুর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু আগে। যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবি সেনা, অধিকাংশ অবাঙালি বিহারি,

জামায়াতে ইসলামী, আল বদর, রাজাকার, আল শামস ইত্যাদি উগ্রপন্থী দলগুলো লাখ লাখ নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে ও মা-বোনকে ধর্ষণ করে। তাদের প্রতি তখন জনসাধারণের তুমুল ঘৃণা ও ক্ষোভ। বাংলাদেশ সরকার সে সময় বারবার নির্দেশ দিচ্ছে জনসাধারণ যেন প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। তারা যেন নিজ হাতে আইন না তুলে নেয়। অধিকাংশ বাঙালিই সেই নির্দেশ মান্য করে এবং ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে মানবিকতা ও সংযমের পরিচয় দেয়। তা সত্ত্বেও অনেক অবাঙালি ও পাকিস্তানপন্থী জনসাধারণের রোষানলে পড়ে জানমাল হারায়। গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল চক্রান্তকারীরা অবশ্য আত্মগোপন করে এবং জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আযমসহ ঐ দলের নেতারা পাকিস্তান বা অন্য কোনো দেশে পালিয়ে যায়। ঐ অস্থিরতার মধ্যেই ভীত-সন্ত্রস্ত ফারুক চাচা ও মহম্মাদ আলী ভাইকে বড় মামু নিজ গৃহে সাদরে আশ্রয় দেন। ওদিকে বিজয়ের মাত্র ক'দিন আগেই বড় মামু ও তাঁর পরিবার প্রাণে বেঁচে যান এক পাকিস্তানি সেনা অফিসারের বদান্যতায়। বিজয়ের চার মাস আগে বড় মামুর পাশের হিন্দু প্রতিবেশীর বাড়িটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দখল করে নেয় এবং সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করে। বাড়ির মালিক তার আগেই পরিবারসহ আত্মগোপন করেছেন। ক্যাম্প স্থাপনের পর ক্যাম্পের মেজর বোখারী নামের এই অফিসার বড় মামুর বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেন। তাঁর ব্যবহার খুব ভালো। তিনি জানান যে পরিবার থেকে এতদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর আর ভালো লাগছে না। ঘরের খাবার, ঘরোয়া পরিবেশ ইত্যাদি তিনি খুব মিস করছেন। অতিথিপরায়ণ, উদারচিত্ত বড় মামু তাঁকে প্রায়ই মধ্যাহ্নভোজ বা নৈশভোজে ডেকে নিতেন। অফিসার বড় মামির রান্নার খুব প্রশংসা করতেন এবং বড় মামুকে সম্বোধন করতেন 'ভাই' বলে। ১৩ ডিসেম্বর সকালে কারফিউ ওঠার পর বড় মামু বাজার নিয়ে ঘরে ফেরেন। তার কিছুক্ষণ পরই সেই অফিসার ঘরে ঢুকে বড় মামুকে নিভৃতে কিছু কথা বলে বেরিয়ে যান। বড় মামু মামিকে বলেন যে অতিসত্বর ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি যেন গাড়িতে ওঠেন। গোটা বাজার রান্নাঘরে যেখানে আছে তেমনই থাকুক। ঘটনা গুরুতর। গাড়িতে উঠে বড় মামু ঘটনা খুলে বলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে ঐ অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছিল বড় মামুর ওপর নজর রাখতে। তারা জানত যে জোহরা তাজউদ্দীন তাঁর বোন। বোনের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ রয়েছে কি না সে সম্বন্ধে তথ্য আদায়ের জন্য তিনি বড় মামুর সঙ্গে ভাব করেন। ক'মাস মেলামেশার পর বুঝতে পারেন যে বোনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নেই। ঘর-সংসারের দায়িত্ব পালনেই এই ব্যক্তি ব্যস্ত। এরই মধ্যে ব্যক্তিগতভাবেও বড় মামুকে তাঁর ভালো লেগে যায়। সেইদিন তিনি খবর পেয়েছেন যে আজ কিবরিয়া সাহেবের (বড় মামু) বাড়ির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে। সংকেতটি গুরুতর। তিনি যেহেতু তাঁকে ভাই সম্বোধন করেছেন সেই কারণে ভাই হিসেবে তিনি এসেছেন তাঁকে সতর্ক করতে। অবিলম্বে কিবরিয়া ভাই যেন পরিবারসহ গৃহ ত্যাগ করেন।

অফিসারের সতর্কবাণী অনুসারে বড় মামু তাঁর পরিবারকে নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন ধানমণ্ডি থেকে অনেক দূরে গোপীবাগে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা মুক্ত হওয়ার পর বিজয়ের আনন্দমুখর পরিবেশে ফিরে এলেন নিজ গৃহে। ফিরে এসে বাড়ির কেয়ারটেকারের কাছে শুনলেন যে তিনি গৃহত্যাগ করার পর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবাঙালি, বাঙালি রাজাকার ও পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি চালায়। তারা যে ট্রাকে করে এসেছিল সেই ট্রাকের মধ্যে কালো কাপড়ে চোখ ও মুখ বাঁধা বেশ কিছু তরুণ ও মধ্যবয়সীকেও সে দেখতে পায়। তাদের কারো কারো আচরণে মনে হয় যে তারা যেন পিতা ও পুত্র বা নিকট আত্মীয়। কুখ্যাত বদরবাহিনী বুদ্ধিজীবীদের অনেককে তো এভাবেই কালো কাপড়ে চোখমুখ বেঁধে হত্যা করে বিজয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত।

বড় মামু ও তাঁর পরিবারকে যে অফিসার বাঁচিয়েছিলেন তার খোঁজ বড় মামু স্বাধীনতার পর পান বহু কষ্টে। ঢাকা সেনানিবাসে তিনি ছিলেন অন্য যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে। বড় মামুকে দেখে তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। ভারতে এ P.O.W ক্যাম্পে না যাওয়া পর্যন্ত বড় মামু এই যুদ্ধবন্দির খোঁজখবর নিতেন। কখনো তিনি তাঁর জন্য নিয়ে যেতেন শীতের কাপড়, খাবারদাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

সীমা লঙ্ঘন, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মধ্যেও মানবিকতার স্পর্শ যেন নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। আবার একই মানবজাতির মধ্যে দানবীয় আচার ও আচরণ প্রত্যক্ষ করে আমার ঐ নবীন বয়সেই মনে প্রশ্ন উদিত হয় নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, হত্যা, গণহত্যা ও যুদ্ধের প্রকৃত কারণ কী ! প্রশ্নটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই পার হয়ে যায় জীবনের অনেকগুলো অধ্যায়। পৃথিবীর যাবতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন বলে যে অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, হত্যা, গণহত্যা, যুদ্ধ প্রভৃতি মানবতাবিরোধী আচরণের মূল কারণ হলো অহংবোধ (ego বা নাফস আল-আম্মারা) যা মানুষকে অজ্ঞ করে রাখে তার মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে। অহংবোধে আচ্ছন্ন মানুষ বিস্মৃত হয় যে তার পৃথিবীতে জন্মানোর মূল কারণ ও লক্ষ্য হলো উচ্চ-সত্যের (উচ্চ-সত্যকে অভিহিত করা হয় আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, গড এবং আদি আমেরিকানদের ভাষায় 'গ্রেট স্পিরিট' ইত্যাদি নানা নামে) সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। সংযোগ স্থাপনের মূল দুটি উপাদান হলো প্রেম ও জ্ঞান। যেকোনো সভ্য সমাজের প্রাণশক্তি হিসেবে ঐ দুটি উপাদানের প্রয়োগ যখন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় তখনই সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং বৃদ্ধি পায় অন্যায়-অবিচার, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, লোভ ও লালসা। (পরিশিষ্টে 'শান্তির সন্ধানে' প্রবন্ধে উল্লেখিত। পৃ. ২৫৭)।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সংঘটিত গণহত্যার কারণ খুঁজতে ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পার হয়ে যায় কয়েক যুগ। বসন্তের প্রভাত অজান্তেই মিলে যায় হেমন্তের সন্ধ্যায়।

তথ্যসূত্র

১. কংগ্রেশনাল রেকর্ড হাউস, অনুচ্ছেদ ৩ ও ৮, পৃ. ২৯১১৭, ২৯১১৮। বাংলাদেশ সম্পর্কে ১৯৭১ সালের কংগ্রেশনাল রেকর্ড http://www.tajuddinahmad.com/us-congressional-records এ উল্লেখিত হয়েছে
২. তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ১১৯-১২০
৩. কংগ্রেশনাল রেকর্ড-সিনেট, সেপ্টেম্বর ৮-১৯৭১, পৃ. ৩০৯৪৯-৩০৯৫০
৪. Christopher Hichens. The Trial of Henry Kissinger. New York : Verso, 2001, p.45-47
৫. আমীর-উল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, পৃ. ১৪
৬. দৈনিক বাংলা, ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭২। তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ২৮৮
৭. মঈদুল হাসান, মূলধারা ৭১, পৃ. ১০
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৯. আমীর-উল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, পৃ. ২৮-২৯
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
১১. দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ ও তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ২৯১
১২. তাজউদ্দীন আহমদ, আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ২৩৪
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
১৫. আমীর-উল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, পৃ. ২৯
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩
১৭. তাজউদ্দীন আহমদ, আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ৬৮
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২০. আমীর-উল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, পৃ. ৩৫
২১. তাজউদ্দীন আহমদ, আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ৬৯
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১, ৭৫
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
২৫. আমীর-উল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, পৃ. ৪৫
২৬. তাজউদ্দীন আহমদ, আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ৭৬
২৭. দৈনিক বাংলা, ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭২ ও তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ২৮৬
২৮. Lawrence Lifrchultz. Bangladesh: The Unfinished Revolution. London : Zed Press, 1979, p. 166
২৯. তাজউদ্দীন আহমদ, আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ১২২
৩০. ফজলুল বারী, একাত্তরের কোলকাতা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৪৩
৩১. মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১, পৃ. ১৫৯
৩২. তাজউদ্দীন আহমদ, আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ১২১
৩৩. আমীর-উল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, পৃ. ৬৬
৩৪. মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১, পৃ. ৮০
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২
৩৮. এইচ টি ইমাম, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, পৃ. ৩৪ এবং ওয়েস সাইট সূত্র http ://www.tajuddinahmad.com/resources/memo3_april 13.pdf. ওয়েব সাইটে আব্বুর স্বহস্তে লেখা নোট দেখুন
৩৯. http:// www.tajuddinahmad.com/resources/ltr1.pd
৪০. মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১ হতে উদ্ধৃত এবং ওয়েব সাইট সূত্রে উল্লেখিত http :// www.tajuddinahmad.com/resources/memo14_ oct28.pdf)
৪১. মঈদুল হাসান মূলধারা '৭১, পরিশিষ্টে
৪২. তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ১৭৬-১৭৭
৪৩. দৈনিক বাংলা, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বুধবার ও তাজউদ্দীন আহমদ ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ২৮৪
৪৪. ২৩ জানুয়ারি, ১৯৭৪, আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের সমাপনী অধিবেশনে প্রদত্ত আব্বুর ভাষণ। সূত্র : তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ৪১১-৪১২
৪৫. ৯ আগস্ট, ২০০৭, আমার ডায়েরি থেকে
৪৬. মঈদুল হাসান। মূলধারা '৭১। ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২ সংস্করণ, পৃ. ২১৩
৪৭. আমার ডায়েরি, ১ আগস্ট, ১৯৮৭; সল্ট লেক সিটি, কোলকাতা, ভারত
৪৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, বৃহস্পতিবার ও ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ১৭০
৪৯. আবুল মনসুর খানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নিউইয়র্ক, ৮ জানুয়ারি, ২০০৯

পঞ্চম পর্ব

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হবো শান্ত।

—কাজী নজরুল ইসলাম

সূর্য-বার্তা

এবারে ফিরে আসি আমার নবীন কৈশোরের সিংহদ্বারে। ১ জানুয়ারি ১৯৭২-এর দোরগোড়ায় ৩৫ নম্বর হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবনে সেইদিন আমরা উঠলাম। প্রাচীন অশ্বত্থ ও ছায়াঘেরা গাছপালায় ঢাকা হালকা হলুদ রঙের এই বাসভবন। স্পেন ও ম্যুরদেশের ঐতিহ্যবাহী হালকা হলুদ এঁটেল মাটির রঙে রাঙানো ব্রিটিশ যুগের এই বাসভবনটির এক ও দোতলাজুড়ে রয়েছে খোলা বারান্দা। নিচতলায় দোতলায় ওঠার সিঁড়ির বাঁ পাশে বসার ঘর, ডান পাশে খাবারঘর ও রান্নাঘর। এ ছাড়া পুরুষ আত্মীয়স্বজনের থাকার ঘর ও আব্বুর ব্যক্তিগত সহযোগীদের অফিস কক্ষ। জলছাদে ঢাকা গাড়ি বারান্দা ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকজুড়ে রয়েছে ফুলের বাগান, দূর্বাঘাসের গালিচায় ঢাকা প্রাঙ্গণ, দোলনা ও স্লাইড। উত্তরে আব্বুর গাড়ির চালক ও তাঁর পরিবার, অন্যান্য কর্মচারী যেমন সুইপার, পাচক, মালি ও তাঁদের পরিবারের বাসগৃহ। পশ্চিমে বাড়ির সামনের প্রধান গেটের পাশে নিরাপত্তা পুলিশদের থাকার ব্যবস্থা। দোতলায় বারান্দার মুখোমুখি যেখানে সিঁড়ি শেষ হলো ও তার বাঁ পাশের বড় ঘরটিকে প্রায়ই ব্যবহার করা হতো পরিবারের কমনরুম হিসেবে। ছোট্ট সোহেল ও মিমি ঐ ঘরে থাকত। কখনো কখনো আমরা চার ভাই-বোন একত্রে ঘুমাতাম। ঘরটির একপাশে বসার কিছু চেয়ার ও ছোট টেবিল পাতা। আম্মার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কখনো এই রুমটিতে বসে চা-নাস্তা খেতেন, কথাবার্তা বলতেন। আম্মার রেকর্ড প্লেয়ার, শাড়ি-কাপড় ও ব্যক্তিগত সামগ্রী এই ঘরটিতে থাকত। ঐ ঘরটির পাশে ছোট আরেকটি ঘর। কমনরুমের সঙ্গে লাগোয়া দরজা দিয়ে ঐ ছোট ঘরে প্রবেশ করা যেত। ওই ঘরটিতে আব্বু ও আম্মা থাকতেন। ঘরটিতে ছিল একটি মাঝারি আকারের আয়নাওয়ালা ড্রেসিং টেবিল, শোবার খাট, বুকশেলফ ও পড়ার টেবিল-চেয়ার। ঘরটির দ্বিতীয় দরজাটি দক্ষিণের বারান্দার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। দোতলার সিঁড়ির ডান পাশে কমনরুমের উল্টো দিকে ছিল আরও একটি বড় ঘর যার বেশ কিছু নামকরণ আমি করেছিলাম যেমন এমার্জেন্সি রুম, নিরাময় কেন্দ্র, সালিশ কেন্দ্র ইত্যাদি। এই রুমটির দুই পাশে বড় খাট পাতা। চেয়ার-টেবিলও রয়েছে। গ্রাম ও দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগী, দুস্থ অভাবী ও নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত পরিবারের জন্য এই ঘরটি সংরক্ষিত ছিল। রিমিও এই ঘরটিতে থাকত। ঐ ছোটবেলা থেকেই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা লাঘবের জন্য রিমির কর্মদ্যোগ ও আন্তরিকতা ছিল অতুলনীয়। নিরাময় কেন্দ্র—যার অপর নাম ছিল মধ্যের ঘর—তার সঙ্গের লাগোয়া দরজা দিয়ে পশ্চিমের ঘরটিতে প্রবেশ করা যেত। আব্বু-আম্মার ঘরের সমান আকারের এই ছোট ঘরটিতে থাকতেন আমাদের নানা। বিষয়-সম্পত্তির প্রতি সদা নির্মোহ দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির এই বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ, তাঁর জমিজমা যা ছিল তার সবটুকুই ভাগ করে দেন পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে। অবসর জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি অতিবাহিত করেন তাঁর ছোট ছেলে—আমাদের ছোট মামু—সৈয়দ গোলাম মাওলা ও ছোট মেয়ে লিলি, আমাদের আম্মার সঙ্গে। নিরাময় কেন্দ্র মধ্যের ঘরের উত্তর দিকের

ঘরটিতে আমি থাকতাম। ঐ ঘরটিও ছিল নিরাময় কেন্দ্র বা এমার্জেন্সি রুমেরই অপর এক্সটেনশন, অর্থাৎ রোগশোক তাপে ক্লিষ্ট অতিথিদের স্থান সঙ্কুলান না হলে তাঁরা এ ঘরটিও ব্যবহার করতেন। আমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যেত বাড়ির পেছনের একাংশ। কর্মচারীদের বাসগৃহ ও প্রাচীন মহীরুহের ছায়াঘন সুগম্ভীর উপস্থিতি।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমাদের স্কুল খুলল। প্রায় দশ-মাস পর সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা। সবার মধ্যে সে কী আনন্দ ও উল্লাস ! সকলেই আমরা সোৎসাহে মুক্তিযুদ্ধের নয়-মাসের স্মৃতিচারণা করছি। আমার কিছু সহপাঠী ভারত-পাকিস্তান বিমানযুদ্ধের বর্ণনা দিল। ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নিজ হাতে গড়া বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে তাঁরা বাংলাদেশের মিত্রবাহিনী ভারতীয় মিগের অন্তরীক্ষ অভিযানকে জানিয়েছে সাদর অভ্যর্থনা। পাকিস্তানি বিমান ভূপতিত হওয়ায় তাঁরা উল্লসিত হয়ে চারদিক সরগরম করেছে। বিমানযুদ্ধের বর্ণনা শুনে মনে হলো—ইশ আমিও যদি সেদিন ওদের সঙ্গে থাকতাম !

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি জনগণ-মন-নন্দিত বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন। আনন্দে আত্মহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল চারদিকে। তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে একনজর দেখার জন্য তাঁরা ব্যাকুল। নেতা-কর্মী পরিবৃত বঙ্গবন্ধু উঠলেন খোলা ট্রাকে। লক্ষ লক্ষ জনতার প্রাণঢালা অভিনন্দনের মাঝ দিয়ে ট্রাকটি ধীর গতিতে চলল রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে যার নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। ভবিষ্যতে এর সাথে হয়তো স্বাধীনতা পার্ক নামকরণ যুক্ত হবে) উদ্দেশে। সেখানে তিনি ভাষণ দেবেন। মুজিব কাকুর পাশেই আনন্দে উদ্বেলিত আব্বু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হঠাৎ মুজিব কাকু আব্বুর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললেন, 'তাজউদ্দীন, আমি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হব !'[১]

মুজিব কাকুর স্বদেশ প্রত্যার্তনের আবেগময় আনন্দঘন দিনটি। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২

১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আম্মাসহ আমরা বঙ্গভবনে গেলাম। নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আব্বু মুজিব কাকুর কাছে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার সমর্পণ করলেন। উদ্দীপ্ত ঝলমলে হাসিভরা মুখে আব্বু বললেন, 'আজ আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। নেতার অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত থেকে দেশকে স্বাধীন করেছি। আবার নেতাকে মুক্ত করে তাঁরই হাতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার তুলে দিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। অন্তত ইতিহাসের পাতার এককোনায় আমার নামটা লেখা থাকবে।'[২] আম্মার পাশে বসে আব্বুর হাসিভরা গৌরবদীপ্ত মুখ, মুজিব কাকুর আত্মপ্রত্যয়ী অভিব্যক্তি ও চারদিকের আনন্দঘন পরিবেশ দেখে সেদিন মনে হয়েছিল আর শঙ্কা নেই। বাংলাদেশের সুদিন বুঝি ফিরে এল।

স্কুল থেকে ফিরে আমাদের সময় কেটে যেত খেলা আর খেলায়। আমাদের বাড়ির পেছনের কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের অনেকে আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিত। খেলার সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে তুখোড় ছিল শাহনাজ, আমারই সমবয়সী। ওর বাবা দিনাজপুরের সাঁওতাল অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, নাম মংলু। আমরা ডাকতাম মংলু ভাই বলে। দোহারা গড়ন, এক মাথা কোঁকড়া চুল, নিকষ কালো রঙের, পেশিবহুল, পেটানো শরীর, মুখ ভরা বিনম্র হাসি—এই হলো মংলু ভাই। আমার নানিবাড়ি দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে কাটিয়েছেন জীবনের বেশ কিছু বছর। পরবর্তী সময়ে বিআরটিসি বাসের মেকানিক হিসেবে চাকরি নেন ঢাকা শহরে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বস্বান্ত মংলু ভাই আব্বুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর শরণাপন্ন হন। মগবাজারে মেজ মামু ও ছোট মামুর পাশাপাশি বাড়ি। নানা তখন ছোট মামুর বাড়িতে অবস্থান করছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপেক্ষাকৃত ভদ্র প্রথম দলটি চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় যে দলটি আসে তারা নানার সাথে রুক্ষ আচরণ শুরু করে, এরই মধ্যে নানা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে ভর্তির কারণ দেখিয়ে আমাদের বাসা ত্যাগ করেন। পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের পর তিনি ছোট মামুর বাসায় চলে যান। আব্বু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আরও জনাপাঁচেক সহকর্মীসহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সন্ধ্যায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ছোট মামু পরিবারসহ মামির বাড়ি বরিশালের উলানিয়া থেকে ঢাকায় ফেরত এসেছেন। মাস খানেক আগে ঘরের সব আসবাবপত্র, এমনকি সিলিং ফ্যান পর্যন্ত, তাঁদের অবর্তমানে লুটপাট হয়ে যায়। আব্বুদের জন্য বারান্দায় পাটি পেতে দেওয়া হলো। ছোট মামি মুড়ি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সেখানেই মংলু ভাই দেখা করলেন আব্বুর সঙ্গে। চার নাবালক সন্তান, এক অন্তঃসত্ত্বা কন্যা, নাতনি ও স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব মংলু ভাইয়ের কাঁধে অথচ তিনি তখন সর্বস্বান্ত। মেয়ের জামাইও নিখোঁজ। পাড়ার মাস্তানরা বিজয় দিনের সন্ধ্যায় তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। দিশেহারা মংলু ভাইকে আব্বু সান্ত্বনা দিলেন। আব্বুর উদ্যোগে পরিবারসহ তাঁদের জন্য হেয়ার রোডের বাসভবনে কর্মচারীদের এলাকায় বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত দুই বছরের বেশি মংলু ভাই ও তাঁর পরিবার সেখানেই বসবাস করতেন।

খেলতে খেলতে প্রায়ই চলে যেতাম কর্মচারীদের এলাকায়। আব্বুর সরকারি গাড়ির ড্রাইভারের বউটি ছিল ফুটফুটে সুন্দরী, কিন্তু দারুণ মুখরা। আমাকে দেখলেই গলার স্বর নামিয়ে ফেলত এবং গুনগুন করে সুইপারের বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া চালিয়ে যেত। মংলু ভাইয়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা দুটি ঘর পরিপাটি করে রাখা, ছোট উঠানে লাকড়ির চুলা। শাহনাজের মা মরিয়ম বিবি মুর্শিদাবাদের মেয়ে, আমরা সম্বোধন করতাম ভাবি বলে। একহারা গড়ন, গৌরবর্ণের মুখটি জুড়ে মমতার হাসি। ভাবির রান্নার হাত ছিল দারুণ। বিশেষ করে তাঁর হাতের খাসির মগজ ভুনা পছন্দ করতাম বলে প্রায়ই তিনি সেটা আমার জন্য রেঁধে রাখতেন। ওখানে গেলে দেখা হয়ে যেত হুসনা আপার সঙ্গে, শাহনাজের বড় বোন। ছিপছিপে গড়ন, দুধে-আলতাবরণ, টানা টানা

চোখ। কোমরে তাঁর লুটিয়ে পড়ত মেঘবর্ণের একরাশ ঘন চুল, বয়স বড়জোর একুশ। ঘরের জানালা দিয়ে উদাস নয়নে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ঝরনাধারার মতো তাঁর চোখ বেয়ে পড়ত জল। ফকরে আলমকে তিনি তখনো খুঁজছেন।

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে হুসনা আপার সঙ্গে ইস্পাহানি কোম্পানির গাড়ির ড্রাইভার অবাঙালি ফকরে আলমের বিয়ে হয়। সোহেলকে নিয়ে সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা আম্মা ও আমরা তিন বোন সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। সে সময়ের জনপ্রিয় ছায়াছবি 'সাতভাই চম্পায়' নায়িকা কবরীর এক সখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হুসনা আপা অনেকের নজর কেড়েছিলেন। বিয়ের পর তাঁর অভিনয়ে ছেদ পড়ে। ঘর-সংসার নিয়ে হুসনা আপা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রথম কন্যাসন্তান সাহানার জন্মের পর শিশু সাহানা ও ফকরে আলমসহ আমাদের বাসায় বেড়াতে আসেন। সঙ্গে বাক্সভড়া মিষ্টি। সেই নম্রভাষী, নির্বিরোধী ফকরে আলমকে তাঁদের মগবাজারের ইস্পাহানির কোয়ার্টার থেকে বিজয় দিবসের দিন সন্ধ্যা ৬টায় মুক্তিযোদ্ধা নামধারী পাড়ার কিছু মাস্তান যুবক অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে যায়। তাঁর অপরাধ, তিনি অবাঙালি-বিহারি। পুত্র-সন্তান শাহ আলমকে (বাফিল) নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা হুসনা আপা অনুনয় করে বলে, 'আমি বাঙালি। ফকরে আলম নির্বিরোধী মানুষ। তাঁকে মারবেন না।'[৩] অস্ত্রধারীরা আশ্বাস দেয়, 'আমরা আলমকে মারব না। ছেড়ে দেব।'

রাত ২টায় ঐ মাস্তান দলের একজন ফোন করে জানায় তারা ফকরে আলমকে মধ্যরাতে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে মগবাজার শাহ সাহেব বাড়ির মাজারের কাছ থেকে অন্য দল তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। পরদিন দ্বিতীয় দলের অপর এক ব্যক্তি ফোন করে জানাল যে ফকরে আলমকে হত্যা করে তার লাশ খালে ফেলা দেওয়া হয়েছে। ফকরে আলমের মা কেঁদে বললেন, 'অন্তত লাশটিকে তো ফেরত দিতে পারত।' উড়ো খবর, বিশ্বাস করতে হুসনা আপার মন চাইল না। আশা নিরাশার মধ্যে দিন পার হতে লাগল। ফকরে আলম আর ফিরে এল না। হুসনা আপারও অপেক্ষার শেষ হলো না।

১৭ জানুয়ারি ১৯৭২। বহু দর্শনার্থীর ভিড় ঠেলে হুসনা আপা হেয়ার রোডের বাড়ির নিচতলার ঘরে ঢুকলেন। আব্বু তখন অর্থসচিব মতিউল ইসলামের সঙ্গে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত নবজাত রাষ্ট্রের অর্থনীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসেছেন। এরই মধ্যে হুসনা আপার বিলাপে আলোচনা বন্ধ করতে হলো।[৪] তিনি কাঁদতে কাঁদতে আব্বুকে অনুরোধ করলেন ফকরে আলমকে উদ্ধারের জন্য। আব্বু সেই মুহূর্তেই আইজি-কে ফোন করে বিষয়টি অবহিত করলেন। ফকরে আলমের ছবি দিয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলখানায় খোঁজ লাগালেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শনের সময় ব্যক্তিগতভাবে আব্বু নিজেও ফকরে আলমের খোঁজ করলেন। সবই বৃথা। আব্বু একদিন ডেকে পাঠালেন হুসনা আপাকে। তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, 'মা, ধৈর্য ধরো। ও বেঁচে নেই।'

ঐ ঘটনার বছর খানেক পর ফকরে আলমের মা শামসুন্নিসা এলেন আম্মার সঙ্গে দেখা করতে, সঙ্গে হুসনা আপা। দোতলার পারিবারিক কমনরুমে আমি তাঁদের বসালাম। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল ফকরে আলম। শৈশবে পিতৃহারা শিশুপুত্রকে এই মা বহু কষ্টে বড় করেছিলেন। আম্মা তাঁর হাত ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। শোকাহত মা এক হৃদয় নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমার ছেলে অসময়ে চলে গেল সেটি আল্লাহর ইচ্ছা। বাংলাদেশের বুকে তাঁকে রেখে গেলাম।' ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি, হুসনা আপা ও দুই নাতিনাতনিসহ করাচিতে আত্মীয়স্বজনের কাছে চলে যান।

স্বাধীন দেশের মাটিতে ২৯ ফেব্রুয়ারি আমার ১২তম জন্মদিন পালিত হলো। লিপ-ইয়ারে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে ঐ দিনটিকে আমার তৃতীয় জন্মদিন হিসেবেও ধরা যেতে পারে। জন্মদিন,

ভরা পূর্ণিমার রাতে গানের জলসা, গহিন বনে চড়ুইভাতি, দৌড় ও সাঁতার প্রতিযোগিতা, এ ধরনের আনন্দময় উৎসবগুলো পালিত ও আয়োজিত হতো আম্মার উৎসাহে। আম্মার উৎসাহে আব্বু বাধা দিতেন না, কিন্তু নিজেকে সযতনে আড়াল করে রাখতেন লাজুক কিশোরের মতো। আব্বুর প্রতিটা মুহূর্তই যেন নিবেদিত ছিল দেশের কল্যাণে। কখনো কখনো যখন তিনি উপস্থিত হতেন আমাদের আনন্দ উৎসবে, তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত এক চিলতে লাজুক হাসি। তাঁর চোখের দ্যুতিতে সামান্য বিস্ময়। আমার জন্মদিনের সন্ধ্যায় তিনি সারাদিনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি তখন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সরব উপস্থিতিতে গমগম করছে। অতি উৎসাহী কিছু তরুণ আত্মীয় দক্ষিণের বারান্দায় ব্যান্ডের তালে তালে সোৎসাহে গাইছে 'ওরে সালেকা, ওরে মালেকা, ওরে ফুলবানু...'। আযম খানের ওই গানটি তখন খুবই জনপ্রিয়। এরই মধ্যে শাড়ি পরা খোপা বাঁধা আমাকে দেখে আব্বু অবাক হয়ে গেলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন। তারপর নিভৃতে ঘরে ডেকে নিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর প্রিয়তমা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের দুরবস্থা। বললেন, সংবরণ-সংযমের কথা এমনভাবে যেন আমাকে একাকী লক্ষ্য করে নয়, তাঁর মধ্যে শরিক তিনি নিজেও। তাঁর কিশোরী কন্যাকে বিনম্রভাবে উপদেশ দিলেন উপদেশ না দেওয়ার ছলে। একটু পর আমি ফিরে গেলাম ব্যান্ডের কাছে। আমার অনুরোধে ব্যান্ডের বাজনা থেমে গেল।

আমাদের যুগে জন্মদিনের প্রধান উপহার ছিল বই। তরুণ রাজনীতিক আ. স. ম. আবদুর রব তাঁর উপহার দেওয়া সুকান্ত সমগ্রের পাতায় লিখলেন, 'রিপি, আমি বাংলাদেশে পৃথিবী দেখতে চাই। তোমরা তা বাস্তবে দেখ।' রবিঠাকুরের গল্পগুচ্ছের পাতায় লিখলেন, 'রিপি, আজ তোমার জন্মদিন। কারো মৃত্যু দিন। বড় হয়ে মনে রেখো'। উপহার-স্বরূপ আরও পেলাম রবিঠাকুরের 'সঞ্চয়িতা'। উপহারদাতা অপর তরুণ নেতা নূর-এ-আলম সিদ্দিকী। কাজী নজরুল ইসলামের 'সঞ্চিতা', মীর মোশাররফ হোসেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কারবালার প্রান্তর' বইগুলোও ছিল উপহারের সারিতে। সুকান্তের বিদ্রোহের কবিতা এতই ভালো লেগে গেল যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে জন্মদিনের রাতেই লিখে ফেললাম এক চিঠি। অনন্ত লোকের অধিবাসীর কাছে লেখা সেই আমার প্রথম চিঠি। তাঁর ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে যখন জানলাম যে মাত্র একুশ বছর বয়সেই বাংলা কাব্যের এই প্রতিভাবান তরুণের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে, তখন আমি কেঁদেই খুন।

জ্বরের কারণে স্কুল কামাইয়ের দিনগুলোতে একনাগাড়ে পড়ে শেষ করলাম 'কারবালার প্রান্তরে'। উপন্যাসের গাঁথুনি ও সাবলীলতা মন ছুঁয়ে গেল। নানার ঘরে ইমাম গাজ্জালি ও শেখ সাদির দর্শন ও কাব্য শোনার ফাঁকে ফাঁকে শুরু করলাম রবিঠাকুরের গল্পগুচ্ছ পড়া। এক ঝড়ের রাতে বিদ্যুৎ চলে গেল। আমি দৌড়ে গেলাম নানার ঘরে। মোমবাতির মৃদু আলোর কম্পন শরীরে মেখে শেষ করলাম রবিঠাকুরের 'নষ্টনীড়' প্রেমের গল্পটি। আব্বুর ঘরের সামনের অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি বারান্দাটি বেছে নিলাম কবিতা পড়ার জন্য। সঞ্চয়িতার 'বধূ' কবিতাটি পড়লাম বারবার। অজান্তেই মুখস্থ হয়ে গেল পুরো কবিতা।

> বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।
> পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
> কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল
> কোথা সে বাঁধা ঘাট অশ্বত্থ তল।

এরই মধ্যে পুনরায় গান শেখা শুরু হলো মূলত আম্মার উৎসাহে। ১৯৭০ সালে রিমি ও আমার হারমোনিয়ামে হাতেখড়ি। আমাদের গানের প্রথম শিক্ষক ছিলেন আবু সাঈদ স্যার ও নাচের প্রথম শিক্ষক আসাদ স্যার ও শারমিন আপা।

১৯৬৭ সালে আম্মা, রিমি ও আমাকে নাচের স্কুলে ভর্তি করে দেন। ১৯৬৮-তে রিমি, আমি, সীমা ও পপি টিভিতে ছোটদের দলীয় কথক নৃত্যে প্রথম পুরস্কার পাই। গওহর জামিল ছিলেন বিচারক। শিল্পী নাশিদ কামাল (ইভু) আমাদের নাম ঘোষণা করেছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান টেলিভিশনের একমাত্র মহিলা স্টাফ, অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা মাসুমা খাতুন ছিলেন ছোটদের অনুষ্ঠানের হোস্ট। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসতেই তিনি আমাদের জড়িয়ে ধরে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ছোটদের প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহ, সহানুভূতি ও প্রেরণার কারণে তিনি ছোটদের মধ্যেও ছিলেন বিশেষ জনপ্রিয়।

এবারে আবু সাঈদ স্যারের উৎসাহে তাঁর অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের টিভিতে রিমি ও আমি গাইলাম বসন্তবরণের গান। সাকিনা সারওয়ার ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের প্রযোজক। ছুটির দিনে পালা করে আমরা হারমোনিয়ামে তুলতাম ভৈরবী-পূরবী রাগের ঝঙ্কার। পরবর্তী শিক্ষক পি. সি গোমেজ শেখালেন আরও কিছু হিন্দুস্থানি রাগ-রাগিণী এবং আমাদের প্রিয় বেশ কিছু রবীন্দ্রসংগীত। আব্বুর ঘরের সামনের বারান্দাটি আমার খুব পছন্দের ছিল। ঐ বারান্দা থেকে দেখা যেত প্রাচীন গাছপালায় ঘেরা আমাদের খেলার মাঠ, দোলনা, স্লাইড, ব্যাডমিন্টনের কোর্ট ও অজস্র ফুলের সমারোহ। আগ্রহ ভরে আম্মাকে একদিন হারমোনিয়ামে সদ্য তোলা 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গানটি গেয়ে শোনালাম। আম্মা তন্ময় হয়ে গানটি শুনলেন। তখন ঘন সন্ধ্যা, আব্বু অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছেন। আম্মার নির্দেশে আবারও আব্বুকে গানটি গেয়ে শোনালাম। আব্বু দাঁড়িয়ে গানটি শুনলেন। তারপর মিষ্টি হেসে বললেন, 'মনে হয় সেদিনের কথা—রিপি মাত্র কথা বলতে শিখেছে, অন্ধকারকে বলত 'বন্ধকার' আর সে কি না আজ গান গেয়ে শোনাচ্ছে !' আব্বুর স্মৃতিচারণ আর বেশি দূর এগুলো না। পিএ খবর দিল, নিচে বেশ কিছু দর্শনার্থী আব্বুর সাক্ষাৎপ্রার্থী।

আব্বুর সবচেয়ে ছোট বোন, আমাদের বুলবুল ফুফুর বড় মেয়ে রেখা আপা প্রায় সবধরনের খেলাতেই ছিলেন সমান পারদর্শী। সাইকেল চালানোতে ছিলেন বিশেষ পটু। তিনি যত্নের সঙ্গে রিমি ও আমাকে সাইকেল চালানো শেখালেন। ছোট কোনো লেডিজ বাইক নয়, একেবারে বড়দের উঁচু কালো রডওয়ালা সাইকেল। বারবার আছাড় খেতে খেতে যখন সাইকেল চালানো অভ্যাস করছি তখন হঠাৎই আব্বু আমাকে দেখে ফেললেন। সঙ্গে কালীগঞ্জ থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সাংসদ ময়েজউদ্দিন আহমেদ (১৯৮৫ সালে রাজনৈতিক মিছিলে এরশাদ দলের সন্ত্রাসীর ছুরিকাঘাতে নিহত) ও সাভারের সাংসদ আনোয়ার জং সাহেব। তাঁদের বিদায় দিতে আব্বু নিচতলার অফিসকক্ষ থেকে গাড়ি বারান্দায় এসেছেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আমাকে সাইকেল চালাতে দেখে ময়েজউদ্দিন সাহেব আগ্রহ ভরে এগিয়ে এসে বললেন, 'মা, তোমার সাইকেলটা একটু চালাতে পারি ?' আমি সোৎসাহে মাথা নাড়তেই তিনি সাইকেল চালানো শুরু করলেন। বললেন, বর্তমানে প্র্যাকটিস নেই কিন্তু একসময় খুব চালাতেন। এরপর আনোয়ার জং সাহেবের সাইকেল চালানোর পালা। নিমেষেই তাঁরা যেন ফিরে গেলেন তাঁদের কৈশোরে। রোমন্থন করতে লাগলেন তাঁদের নবীন বয়সের স্মৃতি। আব্বু বললেন, কলেজ জীবনে সাইকেল চালিয়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে যেতেন রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালাতে। এর কিছুদিন পর আব্বু সত্যি সত্যিই নিজের জন্য একটি সাইকেল কিনে ফেললেন এবং নিরাপত্তা অফিসারদের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে যেতেন বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি তাঁতিবাজারে আমার খালার বাড়ি পর্যন্ত। আব্বু কোনো কৃত্রিম জীবনব্যবস্থা পছন্দ করতেন না। সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে তিনি খুঁজে পেতেন মুক্তির স্বাদ।

ব্যাডমিন্টন কোর্টে আম্মার সঙ্গে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলতাম। সময় পেলে আব্বুও খেলায় যোগ দিতেন। আম্মা মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতেন। আম্মার

দ্রুতগতির সঙ্গে আমরা তাল মেলাতে পারতাম না। আমাকে সাত মাসের পেটে নিয়ে আম্মা দরদরিয়া গ্রামে আত্মীয়স্বজনকে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় সবার আগে ফিনিশ লাইন অতিক্রম করে জিতলেন বটে কিন্তু গতি রোধ করতে না পেরে সামনের খাড়া পুকুরপাড় থেকে সোজা নিচে পড়ে গেলেন। পড়তে পড়তে আম্মা তাৎক্ষণিকভাবে দুটো হাঁটু একত্র করে বুকের কাছে নিয়ে ঝুপ করে পড়লেন পুকুরপাড়ের নরম কাদার ওপর। সেখান থেকে এক সাঁতারে গিয়ে উঠলেন পুকুরের অপর পাড়ে। এই হলেন আম্মা ! দুরন্ত দুঃসাহসী। আর আমি যে অলৌকিকভাবে পরম করুণাময়ের কৃপায় বেঁচে গেলাম সেটিও মহাভাগ্য।

আম্মা শত ব্যস্ততার মধ্যেও শুরু করলেন লেখা। মুক্তিযুদ্ধের জানা-অজানা বহু ঐতিহাসিক ঘটনার বুনন দিয়ে সৃষ্ট এই স্মৃতিকথার নাম ছিল 'উদয়ের পথে'। ধারাবাহিকভাবে লেখাটি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। আম্মার চমৎকার লেখার হাত এবং স্মৃতিকথার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার কারণে 'উদয়ের পথে' জনপ্রিয়তা লাভ করে। আমার সহপাঠীরাও লেখাটি মনোযোগের সঙ্গে পড়ত। এক বছরের উর্ধ্ব সময় পর্যন্ত লেখাটি প্রকাশ হওয়ায় আম্মা পত্রিকার জন্য লেখা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। স্মৃতিকথায় মুজিব কাকুকে কেন্দ্র করে কিছু ঘটনা ব্যক্ত করায় মুজিব কাকু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পত্রিকার সম্পাদককেও তিনি তার অসন্তুষ্টির কথা জানান। আব্বু সে সময় একটি মন্তব্য করেন যে সমকালীন সময়ে ইতিহাস না-লেখাই শ্রেয়, তাতে জীবিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে।

১৯৭১-এ ভারত ও বাংলাদেশের চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭২-এর ১৫ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার হয়। আব্বুর উদ্যোগে সূচিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চুক্তি এবং সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে ঐ চুক্তির প্রতি ভারতীয় সরকারের শ্রদ্ধা প্রদর্শন সারা বিশ্বের জন্যই ছিল গৌরবোজ্জ্বল এক বিরল দৃষ্টান্ত।

কাঁচা আমের মৌসুমে আমরা দরদরিয়া গ্রামে গেলাম আব্বু ও আম্মার সঙ্গে। আমাদের নিয়ে হেলিকপ্টারটি অবতরণ করল দরদরিয়া প্রাইমারি স্কুলের খেলার মাঠে। আমাদের বরণ করতে এসেছে অগণিত মানুষ। হেলিকপ্টার থেকে নামতেই রিমি, আমি দৌড়ে গেলাম বাড়ির দিকে। পশ্চিমের কোঠাবাড়ি, যেখানে আব্বুর জন্ম, হানাদার বাহিনী সেটা পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের প্রপিতামহের সময়ের গজারি কাঠ ও এঁটেল লাল মাটির মিলনে গঠিত কাঠের বারন্দা দিয়ে ঘেরা এই দোতলা বাড়িটির জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কঙ্কাল পোড়ামাটি। মানুষজন আগ্রহভরে বললেন যে, দেশ স্বাধীন হয়েছে এখন আর চিন্তা নেই। ঐ পোড়া-ভিটায় আবারো বাড়ি উঠবে। আব্বু উত্তর দিলেন, যত দিন বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা না হবে তত দিন ঐ ভিটায় বাড়ি উঠবে না। (আব্বু বেঁচে থাকতে ঐ ভিটায় বাড়ি ওঠেনি। মফিজ কাকুর পরিবার বহু পরে একটি সাধারণ ঘর তুলেছিলেন।)

এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে আব্বু বললেন যে, তিনি তো শুধু তাঁর এলাকার মন্ত্রী নন, তিনি সারা বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী। উন্নয়ন শুরু করতে হবে সারা বাংলাদেশেই, সমানভাবে। তাঁর এলাকাকে প্রাধান্য দিলে তা হবে স্বার্থপরের মতো কাজ। এ প্রসঙ্গে আব্বু এক সহজ সুন্দর উদাহরণ টানলেন। বললেন, আমাদের দেশের রীতি হলো মেহমানকে আদর-যত্ন করে ভালো ভালো খাবার খাইয়ে তারপর যা থাকে নিজেরা ভাগ করে খাওয়া। সুতরাং এলাকাবাসীকেও চিন্তা করতে হবে সামগ্রিকভাবে। সারা বাংলাদেশকে আদর-যত্ন করে গড়ার কথা ভাবনায় রাখতে হবে। আমরা একনিষ্ঠভাবে আব্বুর কথা শুনছি, হৃদয়ে গেঁথে নিচ্ছি তাঁর প্রতিটি কথা। প্রত্যক্ষ করছি তাঁর কাজের মাঝে কথার অসামান্য প্রতিফলনকে।

আব্বু দরদরিয়ার আশপাশের বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিদর্শনে গেলেন। তিনি হেঁটে রওনা দিয়েছেন। আমি আব্বুকে বললাম, 'আমিও যেতে চাই।' আব্বু খুশি মনে সায় দিয়ে বললেন, 'অনেক দূর হাঁটতে হবে, পারবি হাঁটতে ?' আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললাম, 'পারব'। আমার জামার পেছনের বোতাম ছেঁড়া ছিল। আমি দৌড়ে দক্ষিণের কোঠায় বসা আম্মার কাছে একটা সেফটিপিন চাইলাম। আম্মা ব্যাগ থেকে সেফটিপিন বের করে আমার এই অতি ব্যবহৃত জামায় গেঁথে বললেন, 'আব্বুর মেয়ে হয়েছ আব্বুর মতোই। জামাকাপড়ের দিকে খেয়াল নেই।' আম্মার কথা শেষ না হতেই আমি দৌড়ে গেলাম আব্বুর দলটিকে ধরতে। আব্বু তখন ঘন গজারিবনের পাশে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের আইলের ওপর দিয়ে রওনা দিয়েছেন এলাকা পরিদর্শনে।

আব্বুর স্মরণশক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি এলাকাবাসীর প্রায় সকলের নাম-ধাম এবং হাঁড়ির খবর রাখতেন। প্রতিটি গাছপালা, লতাগুল্মের সাথেও ছিল তাঁর নিবিড় পরিচয়।

এরপর আব্বুর সফরসঙ্গী হলাম ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে। নভেম্বরে আম্মা ও সব ভাইবোনসহ আব্বুর সঙ্গে চট্টগ্রামের কক্সবাজার, রাঙামাটিসহ আশপাশের এলাকাগুলো ঘুরলাম। এটি ছিল আব্বুর সাংগঠনিক সফরসহ প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মেলনে যোগদান এবং আমাদের (সব ভাইবোনের) প্রথম সমুদ্র দেখার অভিজ্ঞতা। আব্বু কাজে চলে যেতেন এবং আমরা সারাদিন ও সন্ধ্যা পর্যন্ত সমুদ্রসৈকতে ঝিনুক কুড়াতাম। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে লুটোপুটি খেলতাম। দু'বছর দশ মাসের ছোট্ট সোহেলকে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লাম সার্কিট হাউসের (যেখানে আমরা অবস্থান করছিলাম) আশপাশের টিলাময় অঞ্চলগুলো ঘুরে দেখার জন্য। ছোট ছোট টিলায় গড়া পাহাড়ি অঞ্চল, তার মধ্যে দিয়ে মেঠো পথ। সোহেলের হাত ধরে আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়ে একটু একটু করে উঁচুতে উঠছি। নিচু হয়ে উড়ে যাওয়া বিশাল ডানার গাংচিল দেখে সোহেল উৎফুল্ল। জনশূন্য এই পাহাড়ি পথে মাঝে মাঝে ঘাস-ফড়িংয়ের আনাগোনায় মৃদু গুঞ্জন উঠছে। এরই মধ্য উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসা এক ব্যক্তি আমাদের দুই ভাই-বোনকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। পরনে লুঙ্গি, মাথায় টুপি, গাল ভরা কাঁচাপাকা দাড়ি। আমাদের নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলেন। বাংলাদেশের রীতি অনুযায়ী তাঁর জিজ্ঞাসা কার ছেলেমেয়ে, কোথায় বাড়ি, কেন এখানে এসেছি পর্যন্ত গড়াল। আব্বুর নাম শুনতেই তিনি যেন আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলেন। অনুনয় করলেন তাঁর বাড়িতে যেন দু'দণ্ড বসে যাই। বেশি দূরে না, এই কাছেই বাড়ি। গ্রামের মানুষের 'কাছে' কম করেও মাইল খানেকের হাঁটাপথ। সূর্য তখন একটু একটু করে মধ্যগগনে প্রবেশ করেছে। সোহেলকে তিনি কোলে তুলতে চাইলেন। কিন্তু সোহেল কিছুতেই যাবে না। অগত্যা সোহেলকে কাঁধে নিয়ে আমি রওনা দিলাম আগন্তুকের সঙ্গে। সোহেল ও আমি যেদিকে হাঁটা দিয়েছিলাম তিনি তাঁর গন্তব্য বদলে সেদিকেই হাঁটা দিলেন।

চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। অতি সাধারণ শন ও মাটির বাড়ি। আমাদের যত্ন করে বারান্দায় রাখা পিঁড়িতে বসতে দিলেন। এরপর চিৎকার করে সারা বাড়ি ও আশপাশের বাড়ির লোকজনকে একত্র করে ফেললেন। সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেন আমরা সদ্য মঙ্গলগ্রহ থেকে আবির্ভূত হয়েছি। গাছের ডালপালা দিয়ে বানানো বেড়ার সঙ্গে বাঁধা এক দুধেলা ছাগল। সেও ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওকে দেখে 'শিমির' কথা মনে হলো। গত বছর আমাদের দরদরিয়ার বাসস্থান পুড়িয়ে দেওয়ার পর আমার পালিত 'শিমি' নামের ছাগলটি জবাই করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ভূরিভোজন সারে।

নিমন্ত্রণকর্তা লাকড়ির চুলায় জ্বাল দেওয়া ছাগলের গরম দুধ ও মুড়ি দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। ছাগলের দুধ সোহেলের মুখের কাছে ধরতেই সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। ছাগলের দুধের কড়া গন্ধের সঙ্গে সে অভ্যস্ত নয়। গৃহকর্তা দুঃখ পাবেন বলে ছাগলের দুধে

দু'চুমুক দিয়ে মুড়ি খাওয়া শুরু করলাম। তিনি হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে আমাদের দেখিয়ে আশপাশে জড়ো হওয়া লোকজনকে আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, 'এনারা আমাদের মেজবান হয়েছেন। আমার বড় ভাগ্য।' বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কত কম চাহিদা, কত অল্পতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। অতিথিপরায়ণতাতেও তাঁদের তুলনা হয় না। সেই সময়টাও অপেক্ষাকৃতভাবে কত সহজ স্বাভাবিক ছিল ! অনায়াসেই কেমন বিশ্বাস করে আমরা ছোট দুটি ভাইবোন চলে গেলাম এক অপরিচিতের সঙ্গে !

কক্সবাজারে আব্বুর কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা হেলিকপ্টারে করে রাঙামাটিতে পৌঁছলাম। খরস্রোতা নদী ও উঁচু উঁচু পাহাড়ের আলিঙ্গনে ঘেরা রাঙামাটির অপূর্ব সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শামসুল আলমের মেয়ে ইয়াসমিনের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল। তাঁর মাধ্যমে উপজাতি মেয়েদের সঙ্গেও ভাব হলো। পূরবী মুৎসুদ্দী নামের এক উপজাতি মেয়ের সাথে বেশ ক'বছর চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। রাঙামাটি গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা আব্বুকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দিল। উপজাতিদের বাঁশ-নৃত্য দেখার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রতিটি সভাতেই আব্বুর মূল বক্তব্য ছিল একতাবদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার আহ্বান। লক্ষ করতাম শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর বিশেষ মমতা। কচিকাঁচার মেলা, স্কাউট সম্মেলন, শিশুদের চিত্রকলার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলোতে তিনি যেতেন বিশেষ আগ্রহ সহকারে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের গুরুদায়িত্ব পালনের মধ্যেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল তারুণ্যের সুষ্ঠু বিকাশে। তিনি বলতেন, 'স্বাধীন দেশের মানুষের মতোই এ দেশের শিশুরাও চিন্তার স্বাধীনতা পাবে। আমাদের বড়দেরই শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।... কেবল ছোটরাই যে বড়দের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে তা নয়, ছোটদের কাছ থেকেও বড়দের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে।'[৫]

প্রাথমিক শিক্ষকদের জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে আব্বু বলেন, 'রাষ্ট্রের জাতি গঠনে প্রাথমিক শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সন্তানের পিতাই কেবল একক পিতৃত্বের দাবীদার হতে পারেন না। একটি শিশুকে যিনি প্রাথমিক জ্ঞান, শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলেন তাঁর দান কোনো অংশেই কম নয়।'[৬]

কক্সবাজার, ঢাকা মুন্সিগঞ্জসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি জোর গলায় বক্তব্য রেখেছিলেন গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। শিক্ষা কী তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলতেন, 'পারিপার্শ্বিকতাকে উপলব্ধি করার নামই হলো শিক্ষা।'[৭] শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে নৈতিক চরিত্র গঠনের বিষয়টিও তিনি ছাত্রছাত্রীদের মনে করিয়ে দিতেন।[৮]

আব্বুর সঙ্গে আমরা যাচ্ছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে এসে। ১৯৭২ সালে আমি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার কচিকাঁচার আসরের সদস্য হলাম। সদস্য সংখ্যা ৪০২৭৪। বিজয় দিবস সংখ্যার জন্য একটি লেখা পাঠালাম। নাম 'মা'। সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর মা'র কাহিনি। লেখাটি কোনো কপি ছাড়াই সরাসরি পোস্টে পাঠিয়ে দিলাম কচিকাঁচার আসরের শ্রদ্ধাভাজন পরিচালক রোকনুজ্জামান খান ওরফে দাদাভাই বরাবর। লেখাটি ছাপা হবে কি না সে বিষয়ে ছিল সংশয়। একদিন 'মা' যখন প্রকাশিত হলো তখন আমার আনন্দ দেখে কে ! পত্রিকায় প্রকাশিত আমার জীবনের প্রথম গল্প সেটি। আব্বু অফিস থেকে ঘরে ফেরার পর আম্মা লেখাটি দেখালেন। আব্বু খুব খুশি হয়ে তাঁর অভ্যেস মতো মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বললেন, এই সেদিনের রিপি, কবে লেখিকা হয়ে গেল ! আব্বুর বন্ধু আরহাম সিদ্দিকী কাকু সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আম্মাকে লক্ষ্য করে হেসে বললেন, 'হবে না কেন। মা-ও যে লেখিকা !' আম্মার লেখা 'উদয়ের পথে' তখন ধারাবাহিকভাবে দৈনিক বাংলায় বের হচ্ছে।

ঐ একই বছর আমার সহপাঠী সুলতানা বেগম (মুন্নী) পরিবারসহ সিলেটে চলে যায়। ক্লাসের সবাই মিলে আমরা ওর জন্যে এক ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করি। কোনো কারণে অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয় স্কুলের দিন। স্থান আমাদের হেয়ার রোডের বাসভবন। গাছের নিচে পিকনিক, গান, কবিতার মধ্য দিয়ে পুরোদিন আমাদের আনন্দে কেটে যায়। ওদিকে ক্লাস নিতে গিয়ে খালেক স্যার ও মণীষাদির চক্ষু স্থির। প্রায় চল্লিশজন ছাত্রীর মধ্যে থেকে হাতেগোনা দুই-তিনজন মাত্র উপস্থিত। বাকি সবাই মুন্নীর ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে।

প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঠিক একবছর পূর্তির দিন (১০ এপ্রিল, ১৯৭২) জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার সদস্য, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত বেগম নূরজাহান মুরশিদ প্রশ্ন করেন, 'মাননীয় সভাপতি সাহেব, গত ২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন সে-সম্বন্ধে আমি জানতে চাই।' বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের এক অংশে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে সেদিন বলেন, 'আমি ওয়ারলেসে চট্টগ্রামে জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এই খবর প্রত্যেককে পৌঁছিয়ে দেওয়া হোক যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে। সেজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে আত্মসচেতন হতে হবে। দেশবাসী জানে একই তারিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এটা হাওয়ার ওপর থেকে হয় নাই। যদি কোনো নির্দেশ না থাকত তবে কেমন করে একই সময়ে, একই মুহূর্তে সব জায়গায় সংগ্রাম শুরু হলো ?'[৯]

বন্ধবন্ধু ২৫ মার্চ গত ২৬ মার্চের শুরুতে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও পরবর্তীতে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক কে তা নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণাটি তার দলের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে যারা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী তাদেরকে দিয়ে না যাওয়াতে যে ফাঁক সৃষ্টি হয় তারই ফলে এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যর অন্বেষার চাইতে, ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য পায়। বিএনপি সরকার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক হিসেবে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। যদিও জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকতে এই দাবি করেননি। ২০০৯ সালে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায়ে (রিট পিটিশন নং ২৫৭৭/২০০৯/ড. এম এ সালাম বনাম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব ও অন্যান্য) স্বীকৃত হয় যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা তৎকালীন ইপিআরের ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলি প্রিন্টারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সব জায়গায় প্রচারিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে জড়িত বা সে সম্পর্কে যারা আলোকপাত করতে পারবেন তাদের অনেকে বেঁচে নেই বা ইতিহাসে তাদের স্থান হয়নি। তার দলের নেতৃবৃন্দ ওনাকে স্বাধীনতা ঘোষণায় রাজি করাতে না পারলেও বঙ্গবন্ধু যে গোপনে স্বাধীনতার ঘোষণায় প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তার প্রমাণ হলো শহীদ ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হককে তিনি ট্রান্সসমিটার যোগাড় করতে বলেছিলেন। (ট্রান্সমিটার বানানোয় পারদর্শিতার জন্য পাকিস্তান সরকার ওনাকে তমঘা-এ-ইমতিয়াজ খেতাবে ভূষিত করে।) বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি খুলনা থেকে ট্রান্সমিটার এনেছিলেন এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের কাছে সে বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন ২৫ মার্চ, মধ্যাহ্নে।[১০] পাকিস্তান আর্মি ২৯ মার্চ সকালে নূরুল হককে তাঁর মহাখালির ওয়্যারলেস কলোনির বাস ভবন হতে চিরতরে তুলে নিয়ে যায়। তারা তাঁর পুরো বাড়ি সার্চ করে ট্রান্সমিটারের সন্ধানে।[১১] ওদিকে ২৫ মার্চ রাত ১২ টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন আসে। ফোন কলটি রিসিভ করেন তাঁর পার্সনাল এইড হাজী গোলাম মোরশেদ। (বঙ্গবন্ধুর সাথে সে রাতে তিনিও গ্রেফতার হন এবং পাকিস্তান আর্মি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়।) ফোন কলটি ছিল এরূপ 'আমি বলদা

গার্ডেন থেকে বলছি। মেসেজ পাঠানো হয়ে গিয়েছে, মেশিন নিয়ে কী করব ?' বঙ্গবন্ধু হাজী গোলাম মোরশেদের মাধ্যমে উত্তর দিলেন 'মেশিনটা ভেঙে পালিয়ে যেতে বল।'[১২]

সে রাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি সম্পর্কে প্রথম বইয়ে প্রকাশ করেন লন্ডনভিত্তিক দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ ও সানডে টেলিগ্রাফের সাউথ এশিয়ান করেসপনডেন্ট, নিবেদিত সাংবাদিক ডেভিড লোসাক। সে সময়ের বহুল প্রশংসিত তথ্য বহুল Pakistan Crisis বইটি তিনি সমাপ্ত করেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ১৯৭১ এ। তিনি উল্লেখ করেন যে "শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠ কোন এক গুপ্ত রেডিও হতে ইথার তরঙ্গে পাকিস্তান রেডিওর কাছাকাছি প্রচারিত হয়েছিল।" স্বাধীনতার ঘোষণাটি, যাতে তিনি বাংলাদেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রূপে উল্লেখ করেন, তা আগেই রেকর্ড করা ছিল বলে সাংবাদিক লোসাক মনে করেন।[১৩] ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম আমার কাছে উল্লেখ করেছিলেন (২৫ ও ২৬ এপ্রিল, ২০১৪) যে বঙ্গবন্ধুর মতোই ভরাট গলার অধিকারী ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হক হয়তো বঙ্গবন্ধুর হয়ে রেডিওতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, যা অসম্ভব নয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন জনসংযোগ অফিসার মেজর সিদ্দিক সালিক তার বহুল আলোচিত Witness to Surrender বই এ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারণা সম্পর্কে উল্লেখিত ডেভিড লোসাকের বইটি হতে উদ্ধৃতি দেন। প্রচারণাটি তিনি নিজে শোনেননি বলে উল্লেখ করেন।[১৪] (যদিও বাংলাদেশের কোনো কোনো সূত্রে তিনি নিজে প্রচারণাটি শুনেছেন বলে উল্লেখ করা হয়।) টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টরের মাধ্যমে ইংরেজিতে রচিত ঘোষণাটি বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। (ওয়্যারলেসে ব্রডকাস্ট ঐ লিখিত ঘোষণায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ উল্লেখিত ছিল না।) টেলি প্রিন্টারের পাওয়া ঘোষণার ভিত্তিতে, বাংলায় অনুবাদ করে চট্টগ্রাম বেতার হতে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা আবদুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ২৬ মার্চ দুপুরে। দুপুরের প্রথম ঘোষণার পর চট্টগ্রামের কালুরঘাটে বেলাল মোহাম্মদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে প্রথম ঘোষণাটি করেন "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে বলছি।" তারপর ঐ একই সন্ধ্যায় আবদুল হান্নান কালুর ঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বহস্তে লিখিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।[১৫] ২৭ মার্চ বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।[১৬]

সকলেই বঙ্গবন্ধুর পক্ষ হতেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কারণ বঙ্গবন্ধু ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা ও স্বাধীনতার প্রেরণা। ওয়্যারলেস মারফত যে তিনি সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তা পাঠান তাও উল্লেখিত তথ্য হতে জানা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো তিনি কেন দলের নেতৃবৃন্দের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে রাজি হননি।

তিনি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে জানালেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র অথচ তার পরেই তার দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে ঘোষণা সম্পর্কে পূর্বাভাস পর্যন্ত দিলেন না, তাকে এ সম্পর্কে কোনো কিছু জানালেন না। টেপ রেকর্ডারেও কোনো নির্দেশ দিতে রাজি হলেন না। আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবার আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেশবাসী ও বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে দেবার কথা ছিল এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাতে তিনি সাড়া দিলেন না। ২৫ মার্চ রাতে তাঁর বাসভবনে তাজউদ্দীন আহমদ যে লিখিত স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়াটি নিয়ে আসেন তাতেও স্বাক্ষর দানে অপরাগতা জানালেন রাষ্ট্রদ্রোহিতা এড়ানোর জন্য। ব্যাপারটি বিস্ময়কর। অথচ সে রাতে পাকিস্তান বাহিনী যে ক্র্যাক ডাউন করবে তা তিনি জানতেন। চারদিক থেকেই তখন সে সম্পর্কে খবর আসছিল। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলে পরে এই আশঙ্কা প্রায় সকলেই করছিল। ওনাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বা স্বাধীনতা ঘোষণায় রাজি করাতে না

পেরে তাজউদ্দীন আহমদ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তে ও ভগ্ন মনে বাড়ি ফিরেন। মুজিব ভাই ছাড়া তিনিও ঘর থেকে বের হবেন না একথা বলে তিনি সে রাতে বাসায় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম জোর না করলে এবং তাকে সে রাতে উঠিয়ে না নিলে তাজউদ্দীন আহমদ বন্দী হতেন বা খুব সম্ভব তাঁর প্রাণনাশ হতো এবং সুযোগ্য নেতৃত্বর অভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঠেলে দেওয়া হতো এক অনিশ্চিত, দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে। সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। উল্লেখ্য, গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল পরিকল্পক মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর লেখা বই How Pakistan Got Divided-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়েব সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে যে এই চরম বাঙালি ও হিন্দু বিদ্বেষী যুদ্ধাপরাধী জেনারেল বঙ্গবন্ধুর যতটা না সমালোচক ছিলেন, তার চাইতেও কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন তাজউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে। তিনি ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদের প্রধান শত্রু।[১৭] তাজউদ্দীন আহমদ সে রাতে ধরা পড়লে, তাঁকে যে বঙ্গবন্ধুর মতো বাঁচিয়ে রাখা হতো না, তা বলা বাহুল্য।

বঙ্গবন্ধু কেন তার সহকর্মীদের প্রবল অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাতে বাড়িতে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তার কারণ হতে পারে যে তিনি নিজেকে একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ফেলতে চাননি। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের মতে তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়ে যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথ বেছে নিতে যাচ্ছিলেন তার ফলাফল ছিল অনিশ্চিত। তিনি পলায়ন করলে ওনাকে দেশদ্রোহিতার আখ্যা দেওয়া হতো যা তিনি এড়াতে চাচ্ছিলেন। অন্য দিকে তিনি জানতেন যে তিনি "বন্দী হবার পরেও স্বাধীনতার জন্য নেগশিয়েটেড সেটেলমেন্ট করা সম্ভব" এমন কথা তিনি হয়তো চিন্তা করছিলেন।[১৮]

১৯৬২ সালে তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা নিয়ে গোপনে ভারতে গিয়েছিলেন জানা যায় (পরিশিষ্টে হাজী গোলাম মোরশেদের বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া পদত্যাগপত্রের একটি অংশের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত। পৃ. ২২১) কিন্তু তদানীন্তন ভারত সরকারের থেকে সাড়া না পাওয়াতে তিনি হয়তো নিজে ও পথে আর যেতে চাননি। যদিও ১৯৬২-র প্রেক্ষিত ও ১৯৭১-এর প্রেক্ষিত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময় ভারত সরকারের সহযোগিতা গ্রহণ প্রতীয়মান হতো বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশদ্রোহীতামূলক কর্মকাণ্ড রূপে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সময়টা পরিপক্ব তখনো হয়নি। কিন্তু ১৯৭১ এ গণভোটে ল্যান্ড স্লাইড বিজয়ী আওয়ামী লীগ ও বাঙালির একছত্র নেতা বঙ্গবন্ধু বিপুল জনপ্রিয়তার শিখরে। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য, নির্যাতন, ও গণরায়ের প্রতি অবজ্ঞা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে স্বাধিকার হতে স্বাধীনতার আন্দোলনে। ঐ প্রেক্ষিতে ভারতের সহায়তা কামনা হতো এক স্বাধীনতাকামী জাতির প্রতিনিধি হিসেবে। তারপরও তিনি হয়তো নিজেকে কোনো অনিশ্চিত সম্ভাবনার দিকে নিতে চাননি। তিনি হয়তো কোনো বিকল্প দুয়ার খোলা রাখতে চেয়েছিলেন। আর একটা ব্যাপার অনেকে বলে থাকেন, তা হলো পাকিস্তান সরকার তাঁকে বন্দী করার পর তিনি যতবারই মুক্তি পেয়েছেন তাঁর জনপ্রিয়তা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৯] ওই ব্যাপারটাও ফ্যাক্টর হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু কেন গোপনে দলের বাইরে এবং তাঁর নিকটতম এবং আস্থাভাজন সহকর্মীদের এড়িয়ে ভিন্ন মাধ্যম দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠালেন তার অন্য কারণ হতে পারে যে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সরাসরি কোনো সংযোগ রাখতে চাননি। ২৫ মার্চের পাঁচ-ছয় দিন আগে ঢাকাস্থ মার্কিন কনস্যুলেটের কর্মকর্তা মিস্টার ব্রুট (পদ মর্যাদায় তৃতীয়) ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ করে জানান যে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি তার ব্যক্তিগত সহানুভূতি থাকলেও স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা সিআইএ'র মানচিত্রে বাংলাদেশ বলে কিছু নেই। ধারণা করা যেতে পারে যে একই মেসেজ উচ্চ পর্যায় হতে বঙ্গবন্ধুকে জানান হয়েছিল।[২০]

৭ মার্চ সকালে তাঁর সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড দেখা করে ওয়াশিংটনের বার্তা পৌঁছে দেন যে তারা কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সমর্থন করবে না।[২১] তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল প্রয়াত খাদিম হুসাইন রাজা বঙ্গবন্ধুকে হুঁশিয়ারি বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে তিনি যদি ৭ মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, রাজা আর্মি নিয়ে শক্ত হাতে তা দমন করবেন এবং প্রয়োজন হলে ঢাকা শহর গুঁড়িয়ে দেবেন।[২২] বঙ্গবন্ধুকে সেসব বিষয়ও বিবেচনা করতে হচ্ছিল। তিনি যদি ধরা না দেন তাঁকে খুঁজতে যেয়ে আরও হত্যাযজ্ঞ হবে সে কথাও তিনি তার সহকর্মীদের বলেছিলেন। আবার ওনাকে হয়তো এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তিনি ধরা দিলে ওনাকে এবং তাঁর পরিবারকে হত্যা করা হবে না। ১৮ মার্চে যখন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশে গণহত্যার নীল নকশা অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পনা তৈরি করেন তখন তাতে উল্লেখ ছিল 'শেখ মুজিবকে জীবন্ত গ্রেফতার' করার।[২৩] উদ্ভূত এসকল জটিল পরিস্থিতির আলোকে ধরা যেতে পারে যে স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে বঙ্গবন্ধু সরাসরি সংযোগ না রেখে ভিন্ন মাধ্যমে স্বাধীনতার বার্তা প্রেরণ ও ধরা দেওয়া শ্রেয় মনে করেছিলেন। (স্বাধীনতা ঘোষণা যথেষ্ট নয় যদি না তার সাথে যুক্ত হয় দেশ স্বাধীন করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।) কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ সহচর, দূরদর্শী তাজউদ্দীন আহমদ যেন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে বঙ্গবন্ধু তার অবর্তমানে কার ওপর নেতৃত্বভার পড়বে এবং কে হবে 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' একথা যেহেতু আগে ভাগে কাউকে বলেননি এবং এ ব্যাপারে তার দলকে নির্দেশ দেননি, সেহেতু মুজিববিহীন স্বাধীনতাযুদ্ধে অন্য কারো নেতৃত্ব দানে আসবে প্রচণ্ড বাধা। সকলেই যার যার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করবে। এর ফলে জাতীয় ঐক্য হবে বিনষ্ট এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ ধাবিত হবে জটিলতর পরিস্থিতির দিকে। দেশকে স্বাধীনতাযুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়ে নেতা ধরা দিয়েছেন এমন নজির ইতিহাসে নেই সে কথাও তিনি সেই ২৫ মার্চ রাতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। রাজনীতি ও মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সুগভীর ওয়াকিবহাল তাজউদ্দীন আহমদের যুক্তি ও আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভগ্নী পুত্র শেখ ফজলুল হক মনি ও তার সহযোগী যুব দলটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থে গড়ে তোলে মুজিব বাহিনী। (লক্ষণীয় ব্যাপার হলো যে বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামাল কিন্তু মুজিব বাহিনীতে যোগদান করেননি। তিনি প্রথম বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত মুক্তিবাহিনীতে যোগ দান করে ট্রেনিং নিয়েছিলেন।) শুরু হয় আত্মঘাতী সংঘর্ষ।

বঙ্গবন্ধুর ধরা দেওয়া, অনুপস্থিতি ও দিক নির্দেশনা না দিয়ে যাবার কারণে যে বিভাজন ঘটে তা হতেই কোলকাতায় সৃষ্টি হয় নিজ নিজ স্বার্থরক্ষাকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদল এবং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে ধ্বংস করার নানা ষড়যন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধর হালধারী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে হত্যা করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু যুব দলকে বিশেষ কিছু নির্দেশ গোপনে দিয়েছিলেন কিন্তু সে সমন্ধে হাই কমান্ড নামে পরিচিত তার দলের ছায়া সরকারের সাথে আলোচনা করেননি; বা তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের জানাননি। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এ সম্বন্ধে বলেন যে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তাঁরা যখন কোলকাতায় পৌঁছলেন তখন তাজউদ্দীন আহমদ ওনাকে বলেছিলেন যে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে তাজউদ্দীন আহমদ যখন বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর ঘরে ঢুকছেন তখন তিনি শুনতে পান যে বঙ্গবন্ধু যুব-ছাত্র নেতা শেখ মনি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ প্রমুখকে (আব্দুর রাজ্জাকও এই প্ল্যানের সাথে জড়িত ছিলেন) বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন। সে সময় তাঁর কানে আসে যে বঙ্গবন্ধু বলছেন, '১০ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে' আর একজনের নাম উল্লেখ করা হয় 'চিত্ত সুতার।' কোলকাতায় পৌঁছে তাঁরা ভবানীপুরে ঐ বাড়ি খুঁজে পেলেও চিত্ত সুতার নামে কোনো

ব্যক্তি ওখানে থাকেন না বলে জানানো হয়। ঐ ব্যক্তি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর মাধ্যম হিসেবে কোলকাতায় কাজ করতেন।[২৪] ১৯৮৭ সালে যখন কোলকাতায় ভারতীয় নিরাপত্তা অফিসার শরদিন্দু চট্টপাধ্যায়ের সাথে আমার দেখা হয় তখন তিনি জানান যে উনিও তাজউদ্দীন আহমদের সাথে ঐ বাসায় চিত্ত সুতারের খোঁজ করেছিলেন।[২৫] পরে তাঁরা জানতে পারেন যে ছদ্মনাম ধারণ করে চিত্ত সুতার ঐ বাসায় থাকতেন। বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বিতর্কিত রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন সুতার যুদ্ধের প্রারম্ভে কোলকাতায় চলে যান। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর মাধ্যম হিসেবে পরিচিত চিত্ত সুতার ও শেখ মনি পরিচালিত যুব দলটি সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় একতার প্রতীক গণপ্রজাতন্ত্রী প্রথম বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 'র' এর সহায়তায় এবং বাংলাদেশ সরকারের অজান্তে গড়ে তোলা হয় 'মুজিব বাহিনী'। মঈদুল হাসান এ সম্পর্কে লেখেন 'বস্তুত এই বাহিনীর সদস্য ভুক্তির জন্য সর্বাধিনায়ক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার অনুপস্থিতিতে শেখ ফজলুল হক মনি'র প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেই শপথনামা পাঠ করা হতো।'[২৬] শেখ মনির দাবি ছিল যে 'একমাত্র তারাই সশস্ত্র বাহিনী গঠনের ব্যাপারে শেখ মুজিব কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি'।[২৭] 'র' এর চ্যানেল ব্যবহার করে গোপনে যুব দলটিকে সশস্ত্র বাহিনী গঠনের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা হতে বুঝা যায় যে তিনি পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সমঝোতার কোনো বিকল্প রাস্তা খোলা রাখতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন "বঙ্গবন্ধু হয়ত চেয়েছিলেন একটা সো কলড স্ট্রাগল হবে এবং তার ভিত্তিতে নেগশিয়েশন হবে।[২৮] সরকার গঠন হলে তো আর সেই রাস্তা খোলা থাকে না। বিপরীতে আপসহীন ও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে সুদৃঢ় তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ সরকার গঠন করে স্বাধীনতাকামী জাতির প্রত্যাশা পূর্ণ করেছিলেন। তিনি পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত খন্দকার মোশতাকের কনফেডারেশন গঠনের ষড়যন্ত্রও বানচাল করে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে কোনো রাষ্ট্র বা দলের নীতি নির্ধারণ বা কার্য পরিচালনায় অন্য রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপ অশুভ। তাজউদ্দীন আহমদ সে বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাযুদ্ধে শারীরিকভাবে উপস্থিত না থাকায় এবং গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে দলকে স্বাধীনতা ঘোষণা, সরকার গঠন, স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনা ও তাঁর অবর্তমানে নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না দিয়ে যাওয়ায় যে মারাত্মক ফাঁক ও অস্পষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার অশুভ জের চলতে থাকে স্বাধীনতাযুদ্ধে জয় লাভ ও তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরও। ১৯৭২ এর প্রারম্ভে, বিজিত বাংলাদেশের নতুন লগ্নে, ভবিষ্যতের অশনি সংকেত খুব কম মানুষই সেদিন শুনতে পেয়েছিল।

আমার স্মৃতিতে ১৯৭২ সালের একটি স্মরণীয় দিন ছিল কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাংলাদেশে আগমনের দিনটি। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে কবি সপরিবারে ২৫ মে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন। মিষ্টি ও খিলখিল ভর্তি হয় আমাদের ধানমণ্ডি সরকারি স্কুলে। ওদের পরিবারের জন্য সরকার থেকে ধানমণ্ডিতে বরাদ্দ করা হয় সুন্দর খোলামেলা দোতলা বাড়ি। স্কুল ছুটির পর আমরা ওদের মাঝে মাঝে গাড়ি করে পৌঁছে দিতাম। কবিকে দেখবার জন্য ওদের বাড়ি সর্বদাই থাকত লোকে লোকারণ্য। কবি-পরিবারকে আম্মা এক সন্ধ্যায় দাওয়াত করলেন। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র কাজী সব্যসাচী, কনিষ্ঠপুত্র গিটারবাদক কাজী অনিরুদ্ধ, দুই পুত্রবধূ এবং কবির নাতি-নাতনিরা আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলেন। কবি অসুস্থতার কারণে আসতে পারলেন না। কবি'র পরিবারের সাথে আমন্ত্রিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট লেখক প্রবোধ কুমার স্যানাল ও মনোজ বসু। তাঁদের লেখা বই উপহারস্বরূপ আমাদের হাতে তুলে দিলেন। মনোজ বসু আমাকে উপহার দেওয়া বইটিতে সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন, 'হাতের লেখার দাম কতটুকু, মনের মাঝে সব লেখাই রয়ে গেল।'

আমার গল্প, গান, কবিতার রাজ্যে নানা সংযোজন করলেন নাটক। সেক্সপিয়ারের রিচার্ড দ্য সেকেন্ড ড্রামার একটি অংশ আমাকে দিয়ে মুখস্থ করালেন। ব্রিটিশ রাজের আমলে ছাত্রাবস্থায় কোলকাতার বেকার হোস্টেলে থাকার সময় রিচার্ড দ্য সেকেন্ড ড্রামায় বলিং ব্রুক চরিত্রে নানা অভিনয় করেন। আমি মুখস্থ করলাম বলিং ব্রুক ও জন অফ গন্টের কথোপকথনের অংশটি। রাজার আদেশে বলিং ব্রুক নির্বাসনে যাওয়ার প্রাক্কালে জন অফ গন্টের সঙ্গে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সংলাপ। উনআশি বছরের বর্ষীয়ান নানা আমার সঙ্গে নাটকের সংলাপ বলতে বলতে যেন ফিরে যেতেন তাঁর তারুণ্যে। হয়ে যেতেন বলিং ব্রুক বা তেজস্বী কোনো যোদ্ধা। আমার নবীন কৈশোরে যখন উন্মেলিত হচ্ছে নতুন স্বপ্ন, নতুন জগৎ ও জিজ্ঞাসা, আব্বু তখন মহাব্যস্ত স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় স্বপ্ন, সাম্যবাদী ন্যায়বিচার-ভিত্তিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার সংগ্রামে। ঐ সংগ্রামে আব্বু ক্রমশই একা হয়ে পড়েছিলেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর মুজিব কাকু কখনোই আব্বুর কাছে জানতে চাননি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ঘটনাবলি। আব্বু বেশ কয়েকবার বলার চেষ্টা করলেও মুজিব কাকু কখনই শুনতে চাননি যে তাঁর অবর্তমানে আব্বু কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন; তাঁকে কী ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল; কারা ছিল স্বাধীনতার শত্রু, কারা মিত্র। রহস্যজনকভাবেই বিষয়টি জানতে চাওয়া সম্পর্কে তিনি নীরবতা পালন করেছেন। মুজিব কাকুর উদাসীনতায় আব্বু হয়েছেন আহত, মর্মাহত ,তবু হাল ছাড়েননি। অবিরাম চেষ্টা করেছেন মুজিব কাকুকে সামনে রেখেই নবজাত বাংলাদেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের মতোই হানাদারমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশেও আব্বু সৃষ্টি করেছেন ন্যায়বিচার, ত্যাগ, সততা, সংযম ও সুদক্ষ নেতৃত্বের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। দেশ ও জাতির কল্যাণে তিনি বিলীন করেছেন ব্যক্তিস্বার্থ বা অন্ধ ক্ষোভ। '৭১-এর মার্চ মাসের এক কালো রাতে আশ্রয়প্রার্থী আম্মাকে, তাঁর শিশুপুত্র ও কন্যাসহ কারফিউয়ের মধ্যে ঘর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন যে আয়কর কর্মকর্তা তাঁর পদোন্নতির অনুমোদন আব্বু করেছেন হাসিমুখে। আম্মাকেও বিষয়টি অবহিত করেছেন নির্দ্বিধায়। যোগ্য জীবনসঙ্গীর মতোই আম্মাও সেই সিদ্ধান্তে সহমত জ্ঞাপন করেছেন। অনুমোদনের ফাইলে আব্বু তাঁর শিশিরবিন্দুর মতো হস্তাক্ষরে লিখেছেন, 'আমি তাঁর এসিআর-গুলো দেখলাম। চাকরিজীবনের রেকর্ড অনুযায়ী তাঁর পদোন্নতি পাওয়া উচিত। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বিতর্কিত ভূমিকা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কারো প্রতি সন্দেহবশত কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে বলে আমি মনে করি না। যদি তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকে তবে তা আলাদাভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ এখানে দেখানো হয়নি বা কোনো প্রমাণও নেই, তাই আমি বিষয়টিকে বিবেচনার মধ্যে না এনে তাঁর এই পদোন্নতি অনুমোদন করলাম।'[২৯]

আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আব্বু চেয়েছিলেন যে যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তান সেনাদের বিচার হোক আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে। যুদ্ধাপরাধী যদি বাঙালি হয়ে থাকে তাহলে তাকে নাগরিকত্ব থেকে বিচ্যুত না করে তার বিচার যেন হয় দেশের মাটিতে ও বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী। পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনকারী এ. জেড. এম শামসুল আলম—যিনি ছয় দফা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচুর লেখালেখি করেছিলেন—ওয়াশিংটনে ট্রেনিংয়ে থাকার সময় তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়। অনুতপ্ত ঐ ব্যক্তি দেশে তাঁর পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত এই মর্মে আবেদন করেছিলেন। শামসুল আলমের বাংলাদেশ-বিরোধী কার্যকলাপে প্রচণ্ড ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও আব্বু তাঁর নাগরিকত্ব বহাল রেখে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেন। তারপর রাষ্ট্র যদি মনে করে তাঁর বিচার করা উচিত তাহলে তাঁর বিচার হবে এই মত প্রকাশ করেন। বিষয়টিকে তিনি সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নানের বরাত দিয়ে মুজিব কাকুর কাছে উত্থাপন

করেন। ক'দিন পর মুজিব কাকু আব্বুকে তাঁর অফিসে ফোন করেন—বিষয়, শামসুল আলমের নাগরিকত্ব বাতিল সম্পর্কে আব্বুর মতামত। আব্বু মুজিব কাকুকে বলেন, 'মুজিব ভাই, এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা বলার ছিল। আজকে শামসুল আলমের দরখাস্তের কারণে বলার সুযোগ হলো। প্রথম কথা, আমাদের কোনো অধিকার নেই যে মানুষটা বাংলাদেশে জন্মেছে তাকে দেশের নাগরিকত্ব থেকে বহিষ্কার করার। এটা অন্যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অন্যায় সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা উচিত। দ্বিতীয় কথা, আমি শামসুল আলমের দরখাস্ত পাঠিয়েছি যেটা এখন আপনার কাছে আছে। সেটা দেখেন এবং সে যে অন্যায় করেছে এই কারণে তাকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে দেশের আইন অনুযায়ী বিচার করার ব্যবস্থা করেন।'[৩০] আব্বুর যুক্তি ছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়নি। জার্মান নাগরিক হিসেবেই তাদের সমুচিত বিচার হয়েছে।

মুজিব কাকুকে তিনি বললেন, 'গোলাম আযমকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এইসব লোক বিদেশে থাকলে তাদের শাস্তি তো হলো না, এই দেশের মানুষ তো জানতেই পারল না যে তারা কী জঘন্য অপরাধ করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়। সুতরাং দেশে তাদের আসতে হবে। দেশে ফিরে আসার পর তাদের বিচার করতে হবে। এবং বিচারে যে শাস্তি হবে সেই শাস্তি তাদের দেওয়া হবে। যদি কেউ বেকসুর খালাস পায় সেটা সে পাবে।'[৩১]

ব্যক্তিগত ক্ষোভ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে আইনের শাসনের প্রতি আব্বুর গভীর শ্রদ্ধা এবং নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের প্রয়োগ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আব্বুকে এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। ঐ একই কারণে তাঁকে পদে পদে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। বাধা এসেছিল মূলত তাঁর নিজ দলের উচ্চপর্যায়ের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকেই। তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপ নবজাত বাংলাদেশের প্রগতির পথে হয়ে দাঁড়িয়েছিল পর্বতসমান অন্তরায়।

১৯৭২ সালের শুরুতে সারা বাংলাদেশে শিশু-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। আম্মা তখন মহিলা পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট, বেগম সুফিয়া কামাল প্রেসিডেন্ট। নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত অরাজনৈতিক বেসরকারি সংগঠন মহিলা পরিষদ ঐ জাতীয় সংকট উত্তরণের জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয়। আম্মার নেতৃত্বে নারীদের মিছিল সরাসরি মিন্টু রোডে অবস্থিত গণভবনে মুজিব কাকুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। শিশুখাদ্যের সংকট সমাধানের জন্য তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারকলিপি। আম্মাকে ঐ ভূমিকায় দেখে মুজিব কাকু মোটেও প্রীত হলেন না। আম্মা আশ্বাস দিলেন যে তিনি ও তাঁর সংগঠন সরকারকে বিব্রত করার জন্য আসেনি বরং সংকট নিরসনের জন্য সরকারকে সহায়তা করতেই প্রস্তুত। ঐ ঘটনার পর মুজিব কাকু আম্মাকে মহিলা আওয়ামী লীগের সদস্য হওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠান।[৩২] প্রস্তাব পাবার পর আম্মা আব্বুকে বললেন 'মুজিব ভাই আমাকে মহিলা আওয়ামী লীগে যোগ দিতে বলছেন, তুমি কী বল ?' আব্বু বললেন, 'এটা তোমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে তুমি যা ভালো মনে করবে সেটাই কর।' আম্মা চিন্তা ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত মহিলা আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন।

আম্মাকে মহিলা আওয়ামী লীগে যোগদানের নির্দেশ দিয়ে মুজিব কাকু অজান্তেই তাঁর দলকে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে মুজিব কাকু, তাঁর পরিবার এবং আব্বুসহ চার জাতীয় নেতৃবৃন্দের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগে যখন চরম নেতৃত্বশূন্যতা দেখা দেয় তখন আওয়ামী লীগের আহ্বায়িকা হিসেবে নেতৃত্বদানের জন্য দল সর্বসম্মতিক্রমে (এপ্রিল, ১৯৭৭) আম্মাকে মনোনীত করে। মহিলা আওয়ামী লীগের সদস্য হওয়ার কারণেই দলীয় বিধি অনুযায়ী আম্মার ওপর নেতৃত্বভার অর্পণ করা দলের পক্ষে সম্ভবপর হয়।

১৯৭২-এর আগস্ট মাসে আম্মা ও ড. ফওজিয়া মোসলেম মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে মঙ্গোলিয়া গেলেন আফ্রিকা ও এশিয়ার সংহতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত Afro Asian Peoples' Solidarity Organization (AAPSO)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করতে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং মহিলা পরিষদের মতো বেসরকারি ও অরাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে আম্মা অব্যাহত রেখেছিলেন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড।

একই বছরে মহিলা পরিষদের উদ্যোগে এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনকে সার্থক করতে আম্মা, সুফিয়া খালা (কবি সুফিয়া কামাল, মহিলা পরিষদের সভানেত্রী), মালেকা খালা (মালেকা বেগম, একসময় তিনি মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন), আয়েশা খালা (আয়েশা খানম, বর্তমানে মহিলা পরিষদের সভানেত্রী) প্রমুখ মহা ব্যস্ত। সে সময় মালেকা খালা ও আয়েশা খালার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো আমাদের বাড়িতে। সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিদেশ থেকেও বহু নারীনেত্রী বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের অনেকের জন্য থাকার বন্দোবস্ত করা হয় হোটেল পূর্বাণীতে। মালেকা খালা আমাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে যেতেন অতিথিদের খোঁজ-খবর নিতে, তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানতে। সম্মেলন শেষে বিদেশি অতিথিদের জন্য লঞ্চে নদী ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের অবাক করে দিয়ে এলেনা নামের এক বিদেশি অতিথি চমৎকার বাংলায় আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। অধ্যাপিকা এলেনা ব্রজালিনা জানালেন শান্তিনিকেতনে তিনি বেশ ক'বছর ছিলেন এবং বিশ্বভারতী থেকে বাংলা সাহিত্যে ডিগ্রি করেছেন। তিনি বললেন, যে বাংলাদেশের জন্ম বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করবে। নারীর ভাগ্য উন্নয়ন, মুক্তি প্রসঙ্গেও আলোচনা অব্যাহত রইল। সম্মেলনে দেশি-বিদেশি অভ্যাগতদের কথা শুনে মনে হলো যে নারী, সে যে রাষ্ট্রেরই হোক না কেন, শুধু নারী হয়ে জন্মানোর কারণেই তাঁরা কোনো-না-কোনোভাবে বৈষম্যের শিকার।

দেখতে দেখতে ১৯৭৩ এসে গেল। স্বাধীনতা লাভের পরপরই যে সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয়েছিল তা এত দিনে সমাপ্ত হয়েছে। সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য হিসেবে আব্বু ও তাঁর সহকর্মীরা জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। এ কারণেই মাত্র এক বছরের মধ্যেই জাতিকে একটি সংবিধান দেওয়া আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয়। নতুন সংবিধানের আলোকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মার্চ মাসে। স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা তখনো ব্যাপক। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলেও দলের কিছু নেতা নির্বাচনে কারচুপি করে জিতেছে এ খবর কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বড়দের আলোচনা থেকেও সে খবর শুনতে পাই। সিলেটের কয়েকটি আসনে কারচুপি এবং কুমিল্লায় খন্দকার মোশতাক চুরি করে জিতেছে এই খবরগুলো রাজনৈতিক মহলে তখন অজানা ছিল না। দলীয় নেতাদের কিছু অংশের এ ধরনের অনৈতিক আচরণ আব্বুর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। আত্মসমালোচনার মাধ্যমেই আসতে পারে আত্মশুদ্ধি এই নীতিতে বিশ্বাসী আব্বু ক্রমশই একাকী হয়ে পড়েন।

১৯৭৩-এর একটি স্মরণীয় দিন ছিল ১৭ এপ্রিল। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আব্বু ও আম্মার সঙ্গে আমরা চার ভাইবোন হেলিকপ্টার যোগে ১৬ এপ্রিল কুষ্টিয়ায় পৌঁছাই। সেদিন বিকেলেই আব্বু কুষ্টিয়ার বাড়াদিতে মহিলা কল্যাণ সমিতির নিজস্ব গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। মহিলা সমিতিটি তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল নিবেদিত সমাজকর্মী এবং মুক্তিযোদ্ধা সেলিনা হামিদ ও তাঁর স্বামী হামিদ সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়।

১৭ এপ্রিল আমরা জিপ ও মাইক্রোবাস করে রওনা দিই ঐতিহাসিক মুজিবনগরের উদ্দেশে। মেহেরপুর থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায় অবস্থিত ছায়া-স্নিগ্ধ ঘন সবুজ আম্রকানন। ওই স্থানটির নামকরণ আব্বু করেছিলেন 'মুজিবনগর'—বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। আব্বুর মুখে শোনা সেই মুজিবনগর আমার মানসপটে যেন এক রূপকথার রাজপুরী যেখানে উদিত হয়েছিল স্বাধীনতার সূর্য। তার দেখা পাব ভেবে আমার মন আনন্দে বিহ্বল। রিমি ও আমি কিচিরমিচির করে আমাদের আনন্দ প্রকাশ করছি। আমাদের সফরসঙ্গী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সংস্থাপন সচিব নুরুল কাদের খানের হাতে একটি মোটা ইংরেজি বই। সকলের উচ্ছ্বসিত কথাবার্তার মধ্যেও নিবিষ্টভাবে তিনি বই পড়ছেন। দেখে ভালো লাগল। তাঁর স্ত্রী তারিন কাকির সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেল। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা আমীরও (লীলা কাকি) আমাদের সঙ্গে এসেছেন। তাঁরাও গল্প করছেন। স্মৃতিচারণা করছেন '৭১-এর।

ঘন সবুজ আম্রকাননের অব্যক্ত সম্ভাষণ যেন সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আজকের এই বিশেষ দিনটিতে এমনি কথা মনে উদিত হলো মুজিবনগরে পৌঁছে। শত মানুষের সরব উপস্থিতিতে মুখরিত আম্রকাননে মঞ্চ করা হয়েছে। আব্বু ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম (তখন তিনি শিল্পমন্ত্রী) মঞ্চের পাটাতনে পাশাপাশি বসেছেন। সভায় উপস্থিত প্রথম মন্ত্রিসভার প্রায় সকল সদস্য। যাঁর নামে মুজিবনগর সেই মুজিব কাকুই অনুপস্থিত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সভায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঘটনাবলি জানতে চাওয়া সম্বন্ধে তিনি যেমন রহস্যজনকভাবে নীরবতা পালন করেছেন, তেমনই দুঃখজনকভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন মুজিবনগরকে। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কখনোই স্বাধীনতার ঐ গৌরবদীপ্ত স্থানটিতে যাননি। যেন তাঁর মনের অভিধানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগরের কোনো অস্তিত্বই নেই। পাকিস্তানি জঙ্গি হামলা ও বোমা বর্ষণ থেকে দূরে এবং নিরাপত্তার খাতিরে কোলকাতার তৎকালীন ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়েছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কার্যালয় এবং রাজধানী মুজিবনগর। আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য কূটনৈতিক আদান-প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, দেশরক্ষার নীতি প্রণয়ন, প্রয়োগ, স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, সমাজ-কল্যাণ প্রভৃতি অঙ্গসংগঠনগুলো গড়ে তোলাসহ সমগ্র স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল এই ৮ নম্বর থিয়েটার রোড থেকেই। আব্বু এই কার্যালয়েই দিবানিশি যাপন করেছেন এবং একাগ্র সাধনায় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় সরকার বেশ ক'বারই জানতে চেয়েছিল যে বাংলাদেশ সরকার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডকে সংরক্ষণ করবে কি না (ভবনটি তখনো ভারতীয় সরকারের মালিকানায় ছিল।) কিন্তু এ বিষয়ে মুজিব কাকুর অনাগ্রহ, অনীহা ও নিরুত্তাপ মনোভাবের কারণে বাংলাদেশের গৌরবময় সেই ঐতিহাসিক স্থানটি আর সংরক্ষিত হয়নি। বহুকাল পরে ১৯৮৭ সালে শিশুপুত্র তাজ ও মিম্মোকে সঙ্গে করে আবারো প্রবেশ করেছি ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে, তথা মুজিবনগরে। প্রাচীন গাছের প্রহরায় আংশিকভাবে ঢাকা প্রথম বাংলাদেশ সরকারের প্রাণকেন্দ্র এই পুরাতন ভবনটি তত দিনে পরিণত হয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অরবিন্দ আশ্রমে। সড়কটির নামও বদলে গিয়েছে। নতুন নাম সেক্সপিয়ার সরণি। অরবিন্দ আশ্রমের একজন বর্ষীয়ান পরিচালক আমার পরিচয় পেয়ে অতি সমাদরে পুরো ভবনটিই আমাদের ঘুরে দেখালেন। আব্বুর ব্যবহৃত অফিসকক্ষে প্রবেশ করে অপরিচিত জিনিসপত্র, ফার্নিচারের ভেতরেই যেন আমি খুঁজতে থাকলাম এক পরম পরিচিত মানুষের স্পর্শ। যেন সময়কে বন্দী করে আমি প্রবেশ করলাম এক অনন্য ইতিহাসের মর্মস্থলে।
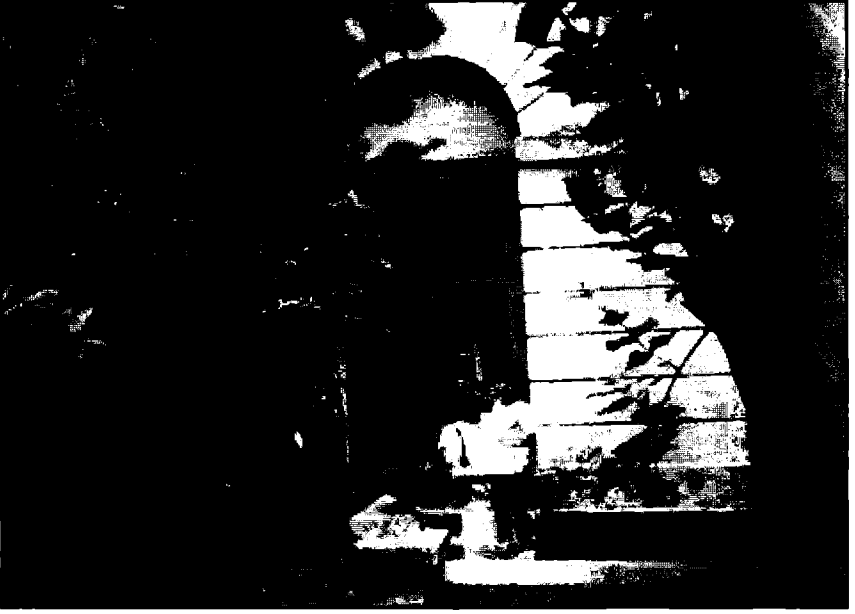
তাজকে কোলে নিয়ে ৮ নম্বর থিয়েটার রোড (বর্তমান সেকসপিয়ার সরণী) ভবনের সামনে। কোলকাতা। জুলাই ১৯৮৭

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ৮ নম্বর থিয়েটার রোডকে জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষণ করা যেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসি রাজনীতিবিদ ও সামরিক নেতা চার্লস দ্যাগল (পরবর্তী সময়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট) পার্শ্ববর্তী দেশ ইংল্যান্ডে আশ্রয়গ্রহণ করে নাৎসি জার্মানির অবরোধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। লন্ডন থেকে প্রায় ছত্রিশ মাইল দূরবর্তী ঐতিহ্যবাহী শহর বার্ক হ্যামস্টেড, যেখানে তিনি ফরাসি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছিলেন, তা এখনো দ্যাগলের স্মৃতিকে ধরে রেখেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপ্লবী চিন্তাবিদ ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির সুগভীর বিশ্লেষক কার্ল মার্কস তাঁর নির্বাসনকালীন সময়ে লন্ডনে যে বাড়িটিতে সপরিবারে কিছুকাল ছিলেন সেই ২৮ নম্বর ডিন স্ট্রিটের বাড়ির দোরগোড়ার ফলকে উল্লিখিত রয়েছে যে কার্ল মার্কস ১৮৫১-৫৬ সাল পর্যন্ত এই বাড়িটিতে বসবাস করতেন।

নিজ দেশের স্বর্ণসন্তানদের প্রাপ্য মর্যাদা না দিয়ে এবং নিজ জাতির স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসকে অবহেলা ও খণ্ডিত করে আমরা বহির্বিশ্বের সামনেও হয়ে গেছি ম্লান ও সঙ্কুচিত। ৮ নম্বর থিয়েটার রোড সংরক্ষিত যেমন হয়নি আমাদের নেতৃত্বের মানসিক দৈন্যতার কারণে, তেমনি স্বাধীনতার পরপরই আব্বুর পরিকল্পনা অনুযায়ী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও গড়ে ওঠেনি মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে যদি স্বাধীনতাযুদ্ধের পরপরই বিজয়ী বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সংরক্ষিত করা হতো তাহলে আজ দেশে স্বাধীনতা-বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত না। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের সরকারের পক্ষে যতখানি সম্ভব আমাদের ইতিহাসকে জাতীয় পর্যায়ে সংরক্ষিত করা, বেসরকারিভাবে জাতীয় পর্যায়ে তা করা কঠিন কাজ। (বেসরকারি উদ্যোগে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ)। দুর্ভাগ্য যে, ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে বাংলাদেশ সরকার জাতির প্রতিনিধিত্ব করেনি, প্রতিনিধিত্ব করেছে দলের এবং সেই দলেরই ব্যক্তিবিশেষকে। পছন্দ না হলে নিজ দলের

ইতিহাস-চিহ্নিত মানুষদের বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। এ ভাবেই আমরা একসময় পরিণত হয়েছি ইতিহাস বিস্মৃত ও পথভ্রষ্ট জাতিতে। (দেরিতে হলেও ২০১১-র ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ প্রকল্পের অংশবিশেষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ভূগর্ভস্থ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আশা করি এই জাদুঘর ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে অখণ্ডিত, অবিকৃত ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকে সংরক্ষণ করবে)।

সেদিন সেই ১৯৭৩-এর বৈশাখের অপরাহ্নে মুজিবনগর আম্রকাননের মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট আমার কিশোর হৃদয়ে স্থান পায়নি হৃদয়-বিদারক কোনো ভাবনা। আমি সেই স্বর্ণালি সময়ে ইতিহাসকে স্পর্শ করেছি ইতিহাস-প্রমাণ মানুষদের সান্নিধ্যে এসে। ইতিহাসকে সংরক্ষিত করেছি হৃদয়ের মণিকোঠায়। সেদিনের ভাষণে আব্বু বলেছিলেন যে স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা আরও কঠিন কাজ। বিদেশি সাহায্য-মুক্ত, স্বনির্ভর অর্থনীতির মাধ্যমেই সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব।[৩৩]

সেই ১৭ এপ্রিল রাতের স্মৃতিটি ছিল বড় মনোমুগ্ধকর। লোক-কবি লালন শাহর ১৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভা ও গানের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় ছেউরিয়া গ্রামে। লালন লোক-সাহিত্য একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আব্বু প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন এবং বলেন যে লালন শাহ ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক-কবি। আলোচনা ও বক্তব্য শেষ হওয়ার পর শুরু হলো লোকগীতির অনুষ্ঠান। একতারা ও দোতারা বাজিয়ে শিল্পীরা লোকগীতি পরিবেশন করলেন। মঞ্চের পাটাতনে আব্বু পরিবারসহ বসে তন্ময় হয়ে গান শুনছেন। আব্বুর কাছাকাছি আমি বসে রয়েছি। পুরো পরিবার একত্র হয়ে 'নিশিরাত এমন মরমিয়া' গান শোনার বিরল সৌভাগ্যে মন আত্মহারা। জাতি, ধর্ম, শ্রেণী ও গোত্রের গণ্ডি পেরিয়ে যে লালন আলিঙ্গন করেছেন বিশ্বমানবতাকে, তাঁরই সংগীতের মূর্ছনায় হৃদয় উদ্ভাসিত। একতারার মৃদু স্পন্দন তুলে বাউল-গায়ক চোখ বুজে লালন শাহর গান গাইছেন 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে ... লালন কয় জাতের মাথা বিকাইছি সাধ বাজারে।'

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ মুজিবনগর সরকারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর পরপরই চলে গিয়েছিলেন। আব্বু বাড়তি একদিন থেকে গিয়েছিলেন কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য। ১৮ এপ্রিল সকালে আব্বু লোকসাহিত্য একাডেমির উদ্বোধন করেন। গতকালের মতো এই সকালেও লোকে লোকারণ্য। দূর-দূরান্ত থেকে কত মানুষজন এসেছে। পরম আগ্রহে তাঁরা অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন। দর্শকের সারিতে আব্বু ও আম্মার পাশে বসে আমরা জানছি নতুন তথ্য। বাঙালি সংস্কৃতির বলিষ্ঠ বিকাশে লোক-সাহিত্যের অবদান সম্পর্কে আমরা শুনছি বক্তাদের বিভিন্ন আলোচনায়। বক্তব্যের ফাঁকে এক গায়ক হারমোনিয়ামে স্বাধীন বাংলা বেতারের গান ধরলেন—

> সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের শ্মশান করেছে কে ?
> কে, কে কে...
> ইয়াহিয়া তোমায় আসামির মতো জবাব দিতে হবে
> ভুট্টো তোমায় আসামির মতো জবাব দিতে হবে ...

রবিঠাকুরের অমর কাব্য 'সোনার তরীর' জন্মস্থান শিলাইদহ ছিল আমাদের সফরের অন্যতম এবং শেষ আকর্ষণ। ফাল্গুনের মৃদুমন্দ হাওয়ায় দোল-খাওয়া তরণীর মধ্যে বসে বিশ্বকবি রচনা করেছিলেন এমন এক কবিতা, এমনি ভাবনায় আমরা যেন কিছু মুহূর্তের জন্য হারিয়ে

গেলাম। তার পরই সফর শেষে ফিরে গেলাম ঢাকা শহরে। আব্বু আবারো যেন হারিয়ে গেলেন আকাশ-প্রমাণ কর্মব্যস্ততার মাঝে।

লিভার সিরোসিস রোগাক্রান্ত মফিজ কাকুর শরীর দিনে দিনে খারাপ হচ্ছিল। পিজি হাসপাতালে ওনাকে ভর্তি করে চিকিৎসা চালানো হলো অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। ঢাকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী মফিজ কাকুকে নিয়ে আগস্টে আম্মা লন্ডনে গেলেন চিকিৎসার জন্য। সাথে ছোট মিমি ও সোহেলকে নিলেন। আব্বুর সাথে বাসায় তখন শুধু রিমি আর আমি। সে সময় আমি ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' গল্প পড়া শেষ করে স্কুলের বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা 'দিল্লীর বুকে দস্যু বনহুর' পড়া শুরু করলাম। একদিন অফিস থেকে ফিরে আব্বু আমার খোঁজ নিতে ঘরে ঢুকলেন। পড়ার টেবিলে আমি দস্যু বনহুর পড়ায় মগ্ন। আব্বু আমাকে পড়ার বই ফেলে এই বই পড়তে দেখে ফেলেছেন ! আমার তখন 'ধরণী দ্বিধা হও' এই অবস্থা। আব্বু বইটির শিরোনামে এক ঝলক চোখ বুলালেন। স্মিত হাসলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তথ্যসূত্র

১. আলোকের অনন্তধারা। ঢাকা : প্রতিভাস, ২০০৬, পৃ. ১৩০
২. এম. আর আখতার মুকুল। আমি বিজয় দেখেছি। ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, বাংলা ১৩৯১, ইং ১৯৮৪, পৃ. ১২৮
৩. হুসনা বেগমের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র হতে পাকিস্তানের করাচিতে আমার টেলিফোন সাক্ষাৎকার। ২২ জানুয়ারি ২০০৯। ১৬ এপ্রিল ২০০৯ হুসনা বেগম পরলোক গমন করেন
৪. তাজউদ্দীন আহমদ, আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ২৭০
৫. কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা আয়োজিত শিশুদের চিত্রকলার উদ্বোধন করে আব্বু ওই বক্তব্য রাখেন। ৩১ মার্চ, ১৯৭২, দৈনিক বাংলা
৬. ১৫ মে, ১৯৭২, দৈনিক ইত্তেফাক
৭. সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুলের ৭৫ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দান কালে আব্বু ওই বক্তব্য রাখেন। ১ এপ্রিল, ১৯৭৪। দৈনিক বাংলা
৮. ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২, দৈনিক ইত্তেফাক
৯. স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব। সংসদীয় বিবরণী। ১০ এপ্রিল, ১৯৭২
১০. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের টেলিফোন সাক্ষাৎকার। ৫ ও ৬ জুলাই, ২০১২। ঢাকা, বাংলাদেশ। পরিশিষ্টে পূর্ণ সাক্ষাৎকারে উল্লেখিত। পৃ. ২৫৩
১১. শহীদ প্রকৌশলী নূরুল হকের স্ত্রী নাসরিন বানু ও কন্যা হাসু আপার ভিডিও সাক্ষাৎকার। ৮ জুলাই, ২০১২। ঢাকা, বাংলাদেশ। পরিশিষ্টে পূর্ণ সাক্ষাৎকরে উল্লেখিত। পৃ. ২৩০
১২. হাজী গোলাম মোরশেদের ভিডিও সাক্ষাৎকার। ৬ জুলাই, ২০১২। ঢাকা, বাংলাদেশ। পরিশিষ্টে পূর্ণ সাক্ষাৎকারে উল্লেখিত। পৃ. ২০৮
১৩. David Loshak. Pakistan Crisis. London : Morrision and Gibb Limited, 1971, P. 89
১৪. Siddiq Salik. Witness to Surrender. Dhaka : The University Press Limited (by arrangement with Oxford University Press, Karachi), 1997, P. 75

১৫. বেলাল মোহাম্মদ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৩৪
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১৭. bd71.blogspot.com/2007/12/top-Pakistani-Criminals-major.html?m=1
১৮. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকার। ৫ ও ৬ জুলাই, ২০১২
১৯. কামাল হোসেন। তাজউদ্দীন আহমদ : বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর। ঢাকা : অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ২৫২
২০. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকার। ৫ ও ৬ জুলাই, ২০১২
২১. Siddiq Salik. Witness to Surrender. P. 52
২২. Major General (retd.) Khadim Hussain Raja. A Stranger in My Own Country:East Pakisan, 1969-1971. Karachi : Oxford University Press, p.61. Website source http://www.scribed.com/doc/103930881/stranger-in-my-country)
২৩. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৯
২৪. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকার। তাজউদ্দীন আহমদ আলোকের অনন্ত ধারা পৃ. ৬৭
২৫. আমার ডায়েরি : বন্ধু মিম্মোকে সাথে নিয়ে শরদিন্দু চট্টপাধ্যায়ের বাসভবনে সাক্ষাৎ ও ১৯৭১ এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে আলাপচারিতা। ৩১ জুলাই, ১৯৮৭
২৬. মঈদুল হাসান। মূলধারা '৭১। পৃ. ৭৭
২৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৯
২৮. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকার। ৫ ও ৬ জুলাই, ২০১২। পরিশিষ্ট নং ২৫৩
২৯. তাজউদ্দীন আহমদ, আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ১৫৭
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৩২. আম্মার সাথে ভিডিওতে ধারণকৃত আমার সাক্ষাৎকার। ৩০ জানুয়ারি, ২০০৮
৩৩. ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৩ বুধবার, দৈনিক বাংলা

ষষ্ঠ পর্ব

A man can be destroyed but not defeated.

—Ernest Hemingway

ঘরে ফেরা

'সত্যই শক্তি। সত্য তার আপন বলেই বলীয়ান।' এই নীতির একনিষ্ঠ অনুসারী আব্বু লড়ছেন একাকী। ১৯৭৩ সালও শেষ হতে চলল। এরই মধ্যে আমার খুব আগ্রহ জন্মাল শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করার। বাংলাদেশের বেশকিছু শিল্পী তখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন সংগীতের ওপর লেখাপড়ার জন্য। অনেকের কাছেই তখন শান্তিনিকেতনের কথা শুনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে বিশ্বভারতী বিশ্বদৃষ্টি ও উদার চেতনাসম্পন্ন সৃষ্টিশীল মানুষের জন্ম দেবে। প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে শিক্ষার্থীরা সৃষ্টি করবে নতুন তাল, লয়, ছন্দ; রচনা করবে যুগান্তকারী দর্শন, শিল্প ও কাব্য।

সেই শান্তিনিকেতনের স্কুলে ভর্তি হব এই ইচ্ছার কথা আম্মাকে জানালাম। আম্মা আমাকে উৎসাহ দিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে ভর্তির ফরমও আনা হলো। আম্মা শান্তিনিকেতনে আমার ভর্তির ব্যাপারে আব্বুকে জানালেন। একদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সকালে আব্বু আমাকে ডাকলেন। আব্বুর ঘরের সামনের বারান্দায় রাখা চেয়ারে পিতা ও কন্যা মুখোমুখি বসলাম। আম্মাও আব্বুর পাশে বসা। আব্বু স্মিত হেসে বললেন, 'আমি শুনলাম তুমি শান্তিনিকেতনে পড়তে যেতে চাও?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আব্বু।' আব্বু বললেন, 'খুব ভালো কথা। শান্তি নিকেতনে তো অনেক নামকরা মানুষেরা লেখাপড়া করেছেন। এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।' আব্বুর কথা শুনে আমি মনে মনে আশ্বস্ত হলাম। এবার আব্বু সেই মিষ্টি হাসিমাখা কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো আমি তো তোমাকে শান্তি নিকেতনে পাঠাতে পারব না। দেশে এখন দুরাবস্থা চলছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ভালো না। এই সময় আমার মেয়ে ভারতে পড়তে যাবে, ব্যাপারটা ঠিক হবে না।' আব্বুর কথা শুনে আমি মনে মনে আহত হলেও আমি জানতাম যে তাঁর কথার পেছনে যুক্তি রয়েছে। আমার শান্তি নিকেতনে পড়তে যাওয়ার বিষয়টা সেখানেই ইতি হলো।

আম্মা খুব সুন্দর সেলাই করতে পারতেন। আমার আবদার অনুযায়ী তিনি একদিন আমার ইংরেজি রূপকথার বইয়ের 'Beauty and the Beast' গল্পের বিউটির পোশাকের আদলে একটি লম্বা সুতির ফুল-ফুল ছাপওয়ালা ম্যাক্সি বানিয়ে দিলেন। সে সময় ঢাকায় ম্যাক্সি পরার চল হয়নি। আব্বু আমাকে ম্যাক্সি পরা দেখে হেসে ফেললেন, বললেন, 'এ যে দেখি পাগলনি বুবুর আলখাল্লা।' আব্বুর সবচেয়ে বড় বোন গোলাবুন্নেসা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতেন। খুব অল্প বয়সে তিনি স্বামীকে হারান এবং শিশুকন্যা রাবেয়া খাতুন ও শিশুপুত্র রকিবউদ্দীনকে একাকী মানুষ করেন। কন্যা ও পুত্রের বিয়ের পর তাঁদের নামে সব বিষয়-সম্পত্তি লিখে দিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক জগতে চলে যান। গজারিবনের মধ্যে লতাপাতার আচ্ছাদনে ঘেরা একটি স্থানে মাটির ঘর বানিয়ে তিনি সেখানে জিকির ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। পরনে লম্বা আলখাল্লা ও হাতে তসবি। মাঝে-মাঝে মাসের পর মাস কারো সঙ্গে কথা না বলে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। খাবারও খেতেন যৎসামান্য—দুধ, ফল বা পানি। তাঁর ভাইবোনেরা ও গ্রামের

মানুষজন তাঁকে ডাকত পাগলনি বুবু বলে। আম্মা আমাদের শিখিয়েছিলেন 'দরবেশ ফুফু' বলে সম্বোধন করতে। ছোটবেলায় দরদরিয়ায় বেড়াতে গেলে কখনো-সখনো গহিন বনের ভেতরে দরবেশ ফুফুর সাক্ষাৎ পেতাম। তিনি মাটির চুলায় গুড়ের ক্ষীর রেঁধে আমাদের আপ্যায়ন করতেন। একবার আমাদের ধানমণ্ডির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। ফজরের নামাজ পড়ে তিনি আমাদের বাগানে পায়চারি করতেন। বাগানের ফুল তুলে মালা গেঁথে আমাদেরকে উপহার দিতেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ সজাগ, যেন আমাদের অন্তরটা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা জিজ্ঞেস করতাম, 'দরবেশ ফুফু, আপনার একা থাকতে ভয় করে না ?' তিনি বলতেন, 'একা কোথায় ? আল্লাহ সর্বদা সব জায়গায় বিরাজমান।' আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'দরবেশ ফুফু, আপনার জঙ্গলে থাকতে ভয় করে না, যদি সাপ বা বাঘ আপনাকে কামড় দেয় ?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আল্লাহর জীবকে ভালোবাসলে ওরা ক্ষতি করে না।'

প্রকৃতি ও জীবজগতের সঙ্গে মানুষের যে একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, জীবপ্রেম যে আরাধনার অংশ, সেই চিন্তার বীজ তিনি আমার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আলখাল্লাধারী দরবেশ ফুফু ছিলেন আমাদের জন্য রহস্য ও বিস্ময়। ১৯৭০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

যা-ই হোক, আমার ম্যাক্সি সম্বন্ধে আব্বুর মন্তব্য শুনে বুঝলাম যে এই পোশাক আব্বুর পছন্দ হয়েছে। নানার কাছে ম্যাক্সি পরে যেতে তিনি খুব প্রীত হয়ে বললেন, 'এ যে দেখি বাগদাদি জিলবাব !' (লম্বা আরবি পোশাক)। নানার পূর্বপুরুষ সুফি সাধক সৈয়দ আহমেদ তানুরি বাগদাদ থেকে এই উপমহাদেশে আসেন দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহর আমলে। সুতরাং দেখা গেল যে রূপকথার রাজ্য পেরিয়ে আমার ফুলছাপা ম্যাক্সি ধারণ করেছে আমার পিতৃ ও মাতৃকূল উভয় বংশেরই ঐতিহ্যকে।

আর একদিন শাড়ি পরে আব্বুর সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দোতলার বারান্দায় বসা আব্বু চমকে গিয়ে আম্মাকে বললেন, 'এই মেয়েটি কে ? ও রিপি নাকি ?' আম্মা হেসে বললেন, 'ও আমাদের রিপি।' আব্বু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ও কবে বড় হয়ে গেল ? ওর সঙ্গে যে আমার পরিচয়ই হলো না !'

কাকে কী ধরনের দায়িত্ব দিতে হবে এবং কে কোন কাজটি ভালো পারবে সে ব্যাপারে আব্বু ছিলেন পারদর্শী। অনেক কাজ, যা ছোটদের কাছে দিতে অনেকেই ভরসা করবে না, আব্বু তা অনায়াসেই আমাদের মতো ছোটদের করতে দিতেন। ১৯৭৪ সালের ২০ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের সমাপনী অধিবেশনে আব্বু আড়াই ঘণ্টা এক অসাধারণ বক্তব্য রাখেন। আওয়ামী লীগেরই কোনো এক সদস্য বক্তব্যটি টেপ রেকর্ডারে ধারণ করেন। ধারণকৃত সেই টেপ থেকে কপি করার দায়িত্ব আব্বু দিলেন আমার দেড়-বছরের ছোট বোন বারো বছরের রিমিকে। রিমি তার নিজস্ব খালি ক্যাসেট ও আব্বুর দেওয়া টেপ রেকর্ডার নিয়ে প্রথমে সার্কিট হাউস রোডের (কাকরাইলের পাশে) আওয়ামী লীগ অফিসে যায়। যিনি টেপ করেছিলেন সেই ভদ্রলোককে রিমি খুঁজে বের করে। তিনি রিমিকে জানান, কে যেন টেপটি নিয়ে গিয়েছে, তাঁর কাছে আর কোনো কপি নেই। এরপর রিমি বাসায় ফেরার পর আব্বু কয়েক জায়গায় ফোন করে জানতে পারলেন যে বাংলাদেশ বেতারও আব্বুর ভাষণটি টেপ করেছে। আব্বুর নির্দেশ মতো রিমি এবার গেল বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রে। তখন বেতার কেন্দ্র ছিল শাহবাগে। সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা বসে আব্বুর পুরো বক্তব্যটি সে টেপে ধারণ করে বাড়ি ফেরে। রিমি আব্বুর বক্তৃতাটা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে বেশ উৎসাহ ভরে আলোচনা করে। এরপর অনুলিখনের দায়িত্বে আব্বু এবার আমাকে জড়ালেন। আজিজ কাকু, তাঁর এক সহকর্মী ও আমি একত্রে শুরু করলাম অনুলিখনের কাজ।

নদের সাথে হেয়ার রোডের বাসভবনে। মে, ১৯৭৪

আব্বুর ভাষণ আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি আর লিখছি। সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ভাষণ আজও কত অকাট্য সত্য। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'সকলেই বলে চোর, চোর, চোর; তবে চুরিটা করে কে ? কে তারা ? আমি তো এ পর্যন্ত শুনলাম না বিগত দু'বছরে যে, কোনো কর্মী এসে খাস করে বলেছে যে আমার চাচা ঐ রিলিফের চাল চুরি করে। এমন তো কেউ বলেনি। ঐ পল্টন ময়দানে বক্তৃতা করে দুর্নীতি ধরে ফেলতে হবে আর ধরা পড়লে বাড়িতে এসে বলে তাজউদ্দীন ভাই আমার খালু ধরা পড়েছে, ওরে ছেড়ে দেন। আমি বলি, তুমি না বক্তৃতা করে এলে ? তখন সে উত্তর দেয় বক্তৃতা করেছি সংগঠনের জন্য, আমার খালুকে বাঁচান। এই হলো বাংলাদেশের অবস্থা। সামাজিক বয়কটই বা কোথায় ? দুর্নীতি যারা করে তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট করতে হবে।'

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'যুবকদের সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুকে কিছু বলে যাই। কৈশোর থেকে যৌবনে যে পা দেয় তার জন্য কী ব্যবস্থা ? আগের লোকসংখ্যার জন্য ঢাকায় যে স্কুল-কলেজ ছিল, ব্যায়ামাগার ছিল, বর্তমানে তা কি বাড়ছে না কমছে ? মতিঝিল, দিলকুশা এলাকায় জিপিও হয়েছে। ঐ পুরো এলাকা তো খালি ছিল। ছোটবেলায় আমরা ওখানে খেলাধুলা করেছি। এক-

একটা স্কুলের জন্য এক-একটা খেলার মাঠ ছিল। কলেজগুলোরও নিজস্ব মাঠ ছিল। বর্তমানে লোক বেড়েছে, সন্তান-সন্ততি বেড়েছে, খালি জায়গায় ইমারত হয়েছে, বাড়িঘর হয়েছে, মানুষের তুলনায় যেখানে মাঠঘাট বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সেখানে কমে গেছে। আগে কলেজগুলোতে যে বিল্ডিং ছিল সেখানে ৫০ জনের বসার স্থান ছিল। এখনো ঐ ৫০ জনেরই স্থান আছে অথচ ছাত্রসংখ্যা ৫০ জনের জায়গায় এক হাজার হয়েছে। যুবকদের পড়াশোনার সঙ্গে মন ও মননশীলতা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। পাঠাগারের সংখ্যা ও আয়তন বাড়াতে হবে। খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি ঢাকা শহরের কথা বলছি, সঙ্গে সঙ্গে সব জেলা ও মহকুমা সদর দপ্তর এবং অন্যান্য ঘনবসতি এলাকায় পাঠাগার ও খেলার মাঠ গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধু আপনি হুকুম দিয়ে দিন, ঢাকায় এক মাইল লম্বা আধমাইল প্রশস্ত একটা জায়গা নিয়ে ছেলেদের খেলাধুলার ব্যবস্থা করে দিন। নিষ্কলুষ আনন্দ লাভের সুযোগ করে দিন। তা নাহলে এরা ফুটপাতে ঘুরে বেড়াবে। ঘুরে বেড়ালে সাধারণত কী হতে পারে ? চিন্তা করে দেখুন। হাত শুধু পকেটেই যাবে না, নানান দিকে যাবে। কাজেই যুবকদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন ভবিষ্যতে সোনার বাংলার যুবক হিসেবে তারা গড়ে ওঠে।'[১]

১৯৭৪ সালে আমার মনের একটি আশা পূর্ণ হলো। বছরের শুরুতে, ফেব্রুয়ারি মাসে, আইজি গোলক মজুমদারের ছোট মেয়ে বাসন্তীদির বিয়ে উপলক্ষে আমাদের শান্তিনিকেতনও দেখা হয়ে গেল। তাঁর বিয়ে হয়েছিল কোলকাতায় এবং বউভাত হয় আসানসোলে। আম্মা এবং আমরা চার ভাইবোন সেই বিয়ে ও বউভাত দুটো অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলাম। ১৯৭২ সালের ২৭ মে গোলক বাবুর বড় মেয়ে জয়ন্তীদির বিয়েতেও আমরা শরিক হয়েছিলাম। সে সময় তাঁর স্ত্রী অঞ্জলী মজুমদার জীবিত ছিলেন এবং তিনি আমাদের খুব যত্ন-আত্তি করেছিলেন। এবারও যত্নের কমতি হলো না কিন্তু তাঁর স্নেহমাখা উপস্থিতির অভাব আমরা সকলেই বোধ করলাম। গোলকবাবু ও আম্মা অনেকক্ষণ তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিচারণা করলেন। বউভাতের পর গোলক মজুমদার আমাদের শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই প্রথম দেখলাম যে শাড়ি পরেই অনেক ছাত্রী স্বচ্ছন্দে সাইকেল চালিয়ে যাতায়াত করছে এবং গাছের নিচে ক্লাস দেওয়া হচ্ছে। আর্কাইভে সংরক্ষিত রবিঠাকুরের চিঠিপত্র পড়ার সৌভাগ্য, লাল সুরকি-ঢালা পথ এবং শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ দেখে আমরা মুগ্ধ। রিমি ও আমি কৌতূহলভরে নানারকম প্রশ্ন করলাম। আমরা একদিন নিজেরাই শান্তিনিকেতনে আবারো বেড়াতে আসব এমন কথাও আমরা দুই বোন বলাবলি করলাম।

দুর্গাপুর ও আসানসোলের রেস্ট হাউসে থাকাকালে ওখানকার তেল শোধনাগার ও কয়লাখনিতে কর্মরত কিছু রাশিয়ান/রুশ পরিবারের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হলো। আমি আমার প্রাথমিক রুশ ভাষা প্রয়োগ করে দুই-তিনজন রাশিয়ান মহিলার সঙ্গেও বন্ধুত্ব করে ফেললাম। কবি পুশকিনের রুশ লোকগাথার প্রেম নিয়ে রচিত তেজোদীপ্ত কবিতা ও লেখক টলস্টয়ের হৃদয়-জাগরণকারী সাহিত্যসম্ভার আমাকে রুশ ভাষা শিখতে অনুপ্রাণিত করে। বাড়িতেই স্বচেষ্টায় শুরু হয় অক্ষরজ্ঞান লাভ ও রুশ ভাষায় লেখাপড়া। 'ছোটদের টলস্টয়' নামে আমার একটি প্রবন্ধ দৈনিক *পূর্বদেশের* 'চাঁদের হাট'-এর পাতায় সে সময় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৭৪ সালের ১৯ মে আব্বুর প্রয়াত বড় ভাই ওয়াজিউদ্দীন আহমদের পুত্র আমাদের চাচাতো ভাই দলিলউদ্দীন আহমদের বিয়ে হলো। প্রকৌশলী দলিল ভাই চাকরির সুবাদে থাকতেন টঙ্গিতে। আমাদের বাড়িতেই গায়ে হলুদসহ তাঁর বিয়ের বিভিন্ন আয়োজন হলো। বিয়েতে বাহুল্য একেবারেই ছিল না, ছিল অফুরন্ত আনন্দ। আব্বুর স্নেহছায়ায় যার ছাত্রজীবনের অনেকগুলো সময় কেটেছে, সেই দলিল ভাইয়ের বউভাতের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো ব্যতিক্রমধর্মী

চা-চক্রের মধ্য দিয়ে। আব্বু অনাড়ম্বর সাধারণ জীবনযাপন করতেন। আজকাল রাজনীতিবিদের মধ্যে কেউ কেউ ঘটা করে বিশালাকার কেক কেটে জন্মোৎসব পালন করেন, অথচ আব্বু তাঁর জন্মদিন পালন তো দূরের কথা সে বিষয় কোনো দিন আভাস-ইঙ্গিতও দেননি। তিনি চাইতেন তাঁর পরিবারও যেন পরিমিতির মাত্রা কখনো অতিক্রম না করে। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটুক আন্তরিকতা, সংযম ও সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে এবং এর মধ্যেই ফুটে উঠবে সৌন্দর্য। আব্বুর আদর্শের প্রতিফলন যেন ঘটল দলিল ভাইয়ের বিয়েতে। চা-চক্রে উপস্থিত মুজিব কাকু বর, কনে, আব্বু ও আম্মাকে সাথে নিয়ে ছবি তুললেন। তাঁর প্রাণ খোলা হাসি, গমগমে কণ্ঠের রসালাপ ও দ্যুতিময় উপস্থিতি বিয়ের অনুষ্ঠানের আনন্দে নতুন মাত্রা যোগ করল।

আমাদের কিশোরজীবন ছন্দময় হয়ে উঠছে সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতার স্পন্দনে। আর এরই মধ্যে আমরা লক্ষ করলাম যে আব্বু যেন ক্রমেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছেন। যে স্বপ্ন নিয়ে আব্বু মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সেই স্বপ্ন যেন ভস্ম হতে শুরু হয়েছে। দলের ভেতরেই শুরু হয়েছে দুর্নীতি এবং সেগুলো প্রশ্রয় পাচ্ছে ব্যাপকভাবে। সরকার সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করল দুর্নীতি উচ্ছেদের জন্য। আওয়ামী লীগের এক এমপির বাসা থেকে রিলিফের জিনিসপত্র সেনাবাহিনী উদ্ধার করল। ঐ এমপি এবং তার মতো দুর্নীতিবাজ অনেকেরই কোনো বিচার হলো না। আব্বু ঘটনা জেনে হেয়ার রোডের বাড়ি থেকেই মুজিব কাকুকে ফোন করে বললেন, সেনাবাহিনী যখন দেশের সম্মানিত আইন প্রণয়নকারীর বাসা থেকে রিলিফ চুরির মাল উদ্ধার করে এবং সেই ব্যক্তি অনায়াসে পার পেয়ে যায় তখন সরকারের সম্মান কোথায় থাকে ? এর ফলে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা তো আর থাকে না ! তারপর তিনি বললেন যে, সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লার নির্দেশে সেনাবাহিনী হাতে-নাতে ধরেছে এই দুর্নীতিপরায়ণদের। তারা যখন ছাড়া পেল, তার অর্থ কি তারা নির্দোষ ? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সম্মানিত এমপিকে হেয় করার জন্য সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, কারণ একই সঙ্গে দুজন তো নির্দোষ হতে পারে না ! নিশ্চয়ই একজন দোষী। বাস্তব যখন প্রমাণ করছে যে এমপি দোষী তখন তার এবং তার মতো সকলের দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে। নতুবা আইনের শাসন বলতে দেশে কিছু থাকবে না। মুজিব কাকু বললেন, তিনি ব্যাপারটা সুরাহা করবেন। কিন্তু পরে কিছুই হলো না। আব্বু দুঃখভরে মন্তব্য করলেন, 'মুজিব ভাই শেষ পর্যন্ত আর্মিকেও ক্ষেপিয়ে দিলেন।'

সেই অস্থির দিনগুলোতে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, সর্বহারা পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এসব সরকার বিরোধী দলগুলো দেশের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ও মানুষের হতাশাকে ব্যবহার করে শ্রেণী শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক ও পুলিশ দফতরসহ সরকার দলীয় সদস্যদের ওপর হামলা শুরু হয়। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেশকে আরও সংকট ও অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়। সেসময় সরকার যদি শক্ত হাতে আইনের শাসন ও দল মতের উর্ধ্বে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করত, তাহলে সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে আসত। কিন্তু দেখা গেল যে নিজ দলের অনুগত ক্যাডাররা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও শত অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে এবং সন্ত্রাস দমননীতি প্রযোজ্য হচ্ছে শুধু বিপক্ষ দলের বেলায়।

ওদিকে ১৯৭৩-এ আরব ইসরায়েল যুদ্ধের পর তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বব্যাপী তখন খাদ্য সংকট চলছে। উন্নত রাষ্ট্রগুলোতেও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা দেখা দিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে রাতারাতি পরিবর্তন আনা সম্ভবপর ছিল না। দেশের মানুষ সে ক্ষেত্রে কষ্ট সহ্য করার জন্য রাজি ছিল। কিন্তু জনগণ যখন দেখল যে সরকারি দলের অনেক লোকজন সব রকমের সুবিধা গ্রহণ করছে এবং 'আপামর জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে তাতে করে সরকারের জনপ্রিয়তায় ব্যাপক ধ্বস নামে।' (পরিশিষ্টে ইস্টার্ন নিউজ

এজেন্সির প্রাক্তন ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লার সাক্ষাৎকারে উল্লেখিত। পৃ. ২০০।)

মুজিব কাকুর মন্ত্রিসভা থেকে ক'জন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী তাঁদের অজান্তে হঠাৎই বাদ পড়ে গেলেন। সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বেগম নূরজাহান মুরশিদের মতো সৎ, যোগ্য ও স্পষ্টবাদী মানুষদের মন্ত্রিসভায় বেশিদিন ঠাঁই হলো না। নূরজাহান মুরশিদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, শামসুল হক, জেনারেল ওসমানী ও শেখ আবদুল আজীজসহ বেশ কজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে '৭৪ সালের মে মাসে আকস্মিকভাবে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু একটি রেজিগনেশন লেটার ড্রাফট করে সব ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের স্বাক্ষরসহ কপি নিজের কাছে রাখেন। পরে সেই রেজিগনেশন লেটার ব্যবহার করলেন আমাদেরকে বাদ দেওয়ার জন্য। তাঁর ধারণা ছিল যে আমরা তাজউদ্দীন আহমদের অনুসারী সেজন্য আমাদের অনেকেই বাদ পড়ে যান।'[২]

মুজিব কাকুকে যারা ঘিরে ধরেছিলেন এবং তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করছিলেন, তাদের মধ্যে ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সবল ও সমৃদ্ধশালী নতুন বাংলাদেশকে গড়ে তোলার মতো সততা ও যোগ্যতা সম্পন্ন নিবেদিত মানুষের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেসময়ের কেবিনেট সচিব ('৭১-'৭৫) তওফিক ইমাম এ প্রসঙ্গে তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর [খন্দকার মোশতাক] তৎপরতা শুরু হয়। অনুপ্রবেশ ঘটে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজনদের ভিতর। অত্যন্ত দ্রুত বিভিন্ন ছল-চাতুরির মাধ্যমে তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। দিনে-রাতে তাঁদের কান ভারী করতে থাকেন—তাজউদ্দীন এটা করেছে, তাজউদ্দীন সেটা করেছে—ইত্যাদি। পাশাপাশি তোষামোদ। এই দুটি কাজে নির্লজ্জ বেহায়া ছিলেন খন্দকার মোশতাক। আর ঠিক তার বিপরীত ছিলেন তাজউদ্দীন। তোষামোদ, পরনিন্দা, পরচর্চা এ সব তিনি কখনো করতেন না, পারতেনও না। নীতিগতভাবে চরম ঘৃণা করতেন এ সব। অন্যদিকে সুচতুর মোশতাক শুধু নিজে নয়, তার পক্ষের নেতৃবৃন্দ যারা বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন ছিলেন, তাদেরকে দিয়ে, চরম মিথ্যাচার করিয়ে বঙ্গবন্ধু-তাজউদ্দীন দুজনের দূরত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

আমি অবশ্যই বলব খন্দকার মোশতাক এবং অনুগামীদের মূল লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুকে অপসারণ এবং ক্ষমতা গ্রহণ। এর সাথে কাজ করেছে তার প্রতিহিংসা পরায়ণতা এবং নীচ স্বভাব।... বেছে বেছেই পাকিস্তান এবং সহযোগী শক্তিরা একে নিয়োগ করে তাদের বাহন রূপে। খন্দকার মোশতাক একাধিকবার দীর্ঘদিনের জন্য আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন দলবিরোধী অপতৎপরতা এবং শৃংখলাভঙ্গের অপরাধে।... এহেন দুস্কৃতকারীকে কীভাবে বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করলেন এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে এতখানি বিশ্বাসে নিলেন তা আমার বোধগম্য হলো না। বাকশালের গঠনতন্ত্র ও রূপরেখা প্রণয়নে তার ছিল সক্রিয় ভূমিকা। এই বিভেদ আর অবিশ্বাস মোশতাক একা করেননি। তিনি তার তাঁবেদারদের নিয়েই করেছেন। দু-একজনের কথা বলা যাক। তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত স্নেহ করতেন... শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, তুখোড় ছাত্রনেতা; বঙ্গবন্ধুর কাছের লোক, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর প্রমুখ পৃথক পৃথকভাবে একই বক্তব্য রাখতেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। এভাবে এরা একজনের বক্তব্য এবং পরিবেশিত খবর আরেকজন সমর্থন করতেন। পাশাপাশি সুযোগসন্ধানী এবং উচ্চাভিলাষী কিছু আমলা এবং গোয়েন্দা বাহিনীর কর্তাব্যক্তি (যারা পাকিস্তান সরকারকে ভালোভাবেই খেদমত করেছেন এক সময়) বঙ্গবন্ধুকে অনেক কথাই পরিবেশন করতেন নেতৃত্বে ফাটল ধরানোর জন্য।... বঙ্গবন্ধুর আপনজনের মধ্যে শেখ ফজলুল হক মনিরও একটা ভূমিকা ছিল মনে হয়, না-বুঝে, মুজিবনগর সরকারের প্রতি মনির একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল, যার বহিঃপ্রকাশ আমি

কয়েকবার দেখেছি (একবার প্রকাশ্যে আগরতলায়)। মনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং প্রচণ্ড রাগী মানুষ। তাঁকে খেপানো খন্দকার মোশতাক গয়রহের বাম হাতের কাজ।'[৩]

ভিডিওতে ধারণকৃত এক সাক্ষাৎকারে (১৯ এপ্রিল, ২০১১) ড. কামাল হোসেন (বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন) আমার কাছে, মুজিব কাকুর পরিবারের নিকটতম ব্যক্তিবর্গের কাছে, খন্দকার মোশতাকের, আব্বুর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে ড. কামাল হোসেন যখন মুজিব কাকুর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনের দোতলায় তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন, তিনি দেখেন বেগম মুজিব পান বানাচ্ছেন এবং মোশতাক মোড়ায় বসা। তিনি ঘরে ঢোকার সাথে সাথে মোশতাক বলে উঠলেন, 'এই তো ভাবিকে বলছিলাম তাজউদ্দীনই তো চায় নাই বঙ্গবন্ধু ও আপনারা ফিরে আসেন পাকিস্তান থেকে।' কামাল হোসেন তাকে সরাসরি বললেন, 'আমি একটা কাজে এসেছি, আমাকে এ সব বলবেন না।' মোশতাকের এই উক্তি সম্বন্ধে তিনি সাক্ষাৎকারে বললেন, 'First of all এটা totally মিথ্যা কথা—তারপর ভাবিকে [বেগম মুজিব] শুনিয়ে বলা, within her hearing—এটা তো খুব একটা অশুভ কাজ করলেন।'

নেতা যখন অসৎ, অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ ও সুবিধাবাদীদের কাছে টেনে নেন এবং তাঁদের প্রশ্রয় দেন তখন তার ভয়াবহ পরিণাম শুধু তাঁর ভাগ্যেই ঘটে না, পুরো জাতিকেই তার মাসুল দিতে হয়। জাতি পিছিয়ে যায় শত বছর। আব্বু '৭৪ সাল থেকেই বলা শুরু করেছিলেন 'লিলি তুমি বিধবা হতে চলেছ। মুজিব ভাই বাঁচবে না, আমরাও কেউ বাঁচব না। দেশ চলে যাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে।'

আব্বু, যিনি মুক্তিযুদ্ধ সাফল্যর সাথে পরিচালনা করলেন, যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের বিচার প্রসঙ্গে বিজয়ের আগেই মন্ত্রিসভায় বৈঠকের মাধ্যমে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন (২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশ দালাল আদেশ, ১৯৭২ নামে সরকারিভাবে প্রবর্তিত আইনটি ছিল বহুলাংশে তাঁর দৃঢ় ইচ্ছার ফসল) সেই তাঁকে ও এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ না করেই মুজিব কাকু একক সিদ্ধান্তে ও আকস্মিকভাবে ১৯৭৩ সালে, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী নৃশংস অপকাণ্ডে লিপ্ত রাজাকার-আল বদরদের সাধারণ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সাধারণ ক্ষমার মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয়টি জাতীয়ভাবে এবং সংসদীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে আসেনি। এই ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিষ্পত্তির আগেই ছাড়া পেয়ে যায়। তথ্য অনুসারে '৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ তারিখে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩ পর্যন্ত দালাল অধ্যাদেশে অভিযুক্ত মোট ৩৭ হাজার ৩৭১ (নতুন সূত্র ৩৭ হাজার ৪৭১ জন) জনের মধ্যে ২ হাজার ৮৪৮ জনের মামলা নিষ্পত্তি হয়েছিল।'[৪] সাধারণ ক্ষমার ফলে বাংলাদেশ দালাল আদেশ, ১৯৭২ এর অধীনে অভিযুক্ত প্রায় ২৬ হাজার আসামি মুক্তিলাভ করে।

যাদের বিরুদ্ধে খুন, খুনের প্রচেষ্টা, ধর্ষণ, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল তারা সাধারণ ক্ষমা পায়নি বলা হয়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আটক ১১ হাজার আসামির বিচার তখনো চলছিল। আব্বু চেয়েছিলেন যে দালাল আদেশে আটক সকলের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পরই যাদের বিরুদ্ধে বড় অপরাধ প্রমাণিত হয়নি তারা বিবেচনা সাপেক্ষে সাধারণ ক্ষমা পেতে পারে কিন্তু মামলা নিষ্পত্তির আগেই হাজার হাজার অভিযুক্তদের মুক্তির ফলে মানুষের তো জানারই সুযোগ রইল না যে কারা ছিল দালাল, কারা সত্যই নির্দোষ এবং কে কী ধরনের অপরাধ করেছিল। সুনির্দিষ্ট বড় অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাধারণ ক্ষমা প্রদান করা হয়নি বলা হলেও দেখা যায় যে অনেক বড় অপরাধী ও খুনি এই সাধারণ ক্ষমার বদৌলতে মুক্তি লাভ করে। যেমন শহীদ বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণকারী ও তাঁর হত্যাকাণ্ডর

সাথে জড়িত দশ বছরের সাজাপ্রাপ্ত (এই ব্যক্তির তো আরও কঠোর সাজা হওয়া উচিত ছিল) আল বদরের সদস্য খালেক মজুমদারের মুক্তিলাভ। ওদিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসক ড. আলীম চৌধুরীর হত্যার সাথে আল বদরের অন্যতম সংগঠক মওলানা আবদুল মান্নান জড়িত দাবি করেছেন শহীদের পরিবার, সেই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দুষ্কৃতিতে সহায়তাকারী মওলানা মান্নান সাধারণ ক্ষমার ফলে মুক্তি লাভ করেন এবং আশির দশকে জেনারেল এরশাদের শাসনামলে ধর্মমন্ত্রী হন। সাধারণ ক্ষমা প্রাপ্তদের অন্যতম কুখ্যাত দালাল শাহ আজিজুর রহমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রী হন। (জেনারেল জিয়াউর রহমান ও বিচারপতি সায়েম সরকারের আমলে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ দালাল আইন বাতিল হবার পরে ১১ হাজার বা তাঁরও উর্ধ্ব যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যাকারী যারা সাধারণ ক্ষমা প্রাপ্ত হয়নি তারাও বেরিয়ে এসে সসম্মানে পুনর্বাসিত হয়।) অপর সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত দালাল গভর্নর মালিক, তার কতিপয় সহযোগী, যার মধ্যে তার ক্যাবিনেটের মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক অন্যতম মুক্তি লাভ করেন। এ ছাড়াও পাকিস্তানিদের সহায়তাকারী শরষিনার পীর বিএনপির, খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী নৃশংস আলবদর দল প্রধান ও উপ-প্রধান মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মুজাহিদকে মন্ত্রী বানান। বাংলাদেশ বিজয় অর্জনের পর পলাতক এই দুই ঘাতক পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দালাল আইন বাতিলের বদৌলতে পুনর্বাসিত হয়।

'৭৩ এ সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ, তথাকথিত শিক্ষিত দালালরা ছিল পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত আস্থাভাজন। নৃশংস গণহত্যায় তারা পাকিস্তান রক্ষার নামে সেনা বাহিনীকে যে সমর্থন যুগিয়েছিল তা প্রত্যক্ষ খুনের চাইতে কোনো অংশে কম নয়, অনেক ক্ষেত্রে বেশিই ছিল। স্বভাবতই তাদেরকে এভাবে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন আব্বুকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। কোষাগার ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শূন্য, যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অর্থনৈতিক সেক্টরের হাল ধরা অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের তখন অন্য দিকে খুব বেশি মনোযোগ দেবার সময় ও সুযোগ না থাকলেও, দালালদের এমনি করে বিচার বাদে ছেড়ে দেবার বিষয়টি তিনি কোনমতেই মেনে নিতে পারেননি। তিনি "দালাল আইনে অভিযুক্তদের ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানান।"[৫] তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, "যুদ্ধাপরাধীদের কোন দেশেই এভাবে ক্ষমা করা হয় না। এ ক্ষেত্রে যে কারণেই তাদেরকে ক্ষমা করা হোক না কেন, সেটা ন্যূনতম বিচারের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে জাতির পিতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান দণ্ড মওকুফ করে দিতে পারেন। এটা করা হলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মীয়স্বজন ও সভ্য জগৎকে বুঝান যাবে ন্যূনপক্ষে অপরাধীদের বিচার করা গেছে; ইতিহাসে অন্তত লেখা থাকবে যে মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে।"[৬]

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রায় বছরখানেক আগে দালালদের প্রসঙ্গে আব্বু যে কথাগুলো বলেছিলেন তার সবই আজ চল্লিশ বছর পর নতুন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করায় ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'তাদের প্রতি সরকার যে ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন ইতিহাসে তার নজীর নেই। নিজেদেরকে শুধরে নেওয়ার জন্য সরকার তাদেরকে সময় দিয়েছেন। জনগণ যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন সরকারের বলার কিছুই থাকবে না। কিন্তু অন্যথায় তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।'[৭] দেশের বাইরে পলাতক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল না করে তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে দেশের মাটিতেই স্বচ্ছ ও

নিরপেক্ষ বিচার করার পরামর্শ তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন এবং পাকিস্তান যুদ্ধাপরাধী সেনাদের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আইনে বিচারের কথা বলেছিলেন যা পূর্বে উল্লেখিত।

আব্বু জানতেন যে গণহত্যার মূল অপরাধী পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহল থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে নানাবিধ চাপ সৃষ্টির কথা তিনি ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দুদিন আগে অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের কাছে বলেছিলেন। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর প্রবন্ধে ড. আনিসুজ্জামানের বরাত দিয়ে আব্বুর উদ্ধৃতি দেন। আব্বু আনিসুজ্জামানের কাছে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, "চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবে কাজটি সহজ হবে না। আমি [আনিসুজ্জামান] জানতে চাই, কেন ? তিনি বলেন, যুদ্ধবন্দী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাউকে বিচার করা সম্ভবপর হবে বলে তিনি মনে করেন না। আমি আবার জানতে চাই, কেন ? তিনি বলেন, মার্কিনিদের চাপ আছে। তারা পাকিস্তানকে চাপ দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে, ভারতকে চাপ দিচ্ছে যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দিয়ে উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে। তিনি আরও বলেন, যুদ্ধবন্দীদের বিচারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইচ্ছুক নয়, ভারতও উৎসাহী নয়। এ অবস্থায় কার জোরে আপনি বিচার করবেন ? আর মূল অপরাধীদের বিচার না করতে পারলে তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের বিচারের প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য।"[৮] জটিল বাস্তবতার নিরিখে অনেকটা ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই কথাগুলো বললেও, তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে ছিলেন অনমনীয়। দেশে ফিরে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গত নয় মাসে যেসব যুদ্ধবন্দী গণ-হত্যা ও অন্য অপরাধের জন্য দায়ী হবে তাদের বিচার হবে।"[৯]

ঠান্ডা যুদ্ধে জড়িত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ব শক্তিসহ আন্তর্জাতিক চাপ এবং পাকিস্তানে আটক সাড়ে তিন লক্ষের অধিক বাঙালিকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে ভারতে আটক ৯৩ হাজার যুদ্ধ বন্দীর প্রায় সকলের পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া বাস্তব হলেও, মূল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভবপর ছিল। ভারতও পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছিল যে যেহেতু পাকিস্তান সেনা বাহিনী ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সেহেতু বাংলাদেশের সম্মতি ব্যতীত তাদেরকে ছাড়া হবে না।[১০]

প্রথমে এই যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা ১৫০০ হতে ৪০০ এবং সর্বশেষ ১৯৫ জনে এসে চূড়ান্ত হয়। ভারত হতে ১৯৫ জন পাকিস্তান যুদ্ধবন্দিকে বাংলাদেশের রাজধানীতে এনে গণহত্যা ও অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার করা হবে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এই ঘোষণা দেন ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে।[১১]

১১ মে ১৯৭৩, পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক আদালতে পিটিশনের মাধ্যমে অনুরোধ করে যাতে করে ভারত বাংলাদেশের কাছে কোনো পাকিস্তান যুদ্ধবন্দিদের হস্তান্তর না করে।[১২]

কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই প্রণীত হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস) অ্যাক্ট। তার কিছুদিন পরেই জুলাই মাসের শেষে আব্বু ওয়াশিংটন সফরে যান আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা সংস্কার কমিটির সভায় যোগ দিতে। সেই সফরে মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেটস উইলিয়াম রজারসের সাথে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে যে আলোচনা হয় তা সে সময়ের ওয়াশিংটনে কর্মরত অর্থনীতিবিদ ও কূটনীতিক আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বোন রিমিকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "সেক্রেটারি অফ স্টেটস উইলিয়াম রজারস যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি উত্থাপন করে বাংলাদেশকে নমনীয় হতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন যে, নাইজেরিয়া বায়াফ্রার যুদ্ধাপরাধীদের মাফ করে দিয়েছে। তাজউদ্দীন সাহেব এই বক্তব্যকে গ্রহণ করলেন না। তিনি

বললেন যে, বায়াফ্রায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশে কিন্তু সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার হরণে পাশবিক অত্যাচার করে পরাস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ছিল ক্ষমতাশালী এবং তারা যে অপরাধ করেছে তার বীভৎস বিবরণ খোদ আমেরিকার সাংবাদিকরাও লিপিবদ্ধ করেছেন। তবুও বাংলাদেশ সমস্ত সেনাবাহিনীকে ছেড়ে দিয়ে মাত্র ১৯৫ জনের বিচারের দাবী করেছে। এই বিচার মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়।"[১৩]

তাজউদ্দীন আহমদের সেই আদর্শিক স্বপ্ন আর বাস্তব হয় না। পরবর্তী বছর, ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ত্রিপক্ষীয় সমঝোতায় ঐ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধী পাকিস্তান সেনাকেও বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দেন। আন্তর্জাতিক চাপের বিরুদ্ধে এবং সাড়ে তিন লক্ষের উর্ধ্ব বাঙালিকে পাকিস্তান হতে ফিরিয়ে আনার জন্য, ৯৩ হাজার যুদ্ধ বন্দীর বিচার যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পক্ষে একাকী করা সম্ভবপর না হলেও, মাত্র ১৯৫ জনের বিচারের ব্যাপারে সেই বাধা ছিল না। ২৮ অগাস্ট ১৯৭৩, বাংলাদেশের সহায়তায় ভারত ও পাকিস্তানের চুক্তিতেও উল্লেখিত ছিল যে ১৯৫ জন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী ব্যতীত বাকি সকল যুদ্ধবন্দির প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হবে।[১৪]

শতাব্দীর জঘন্যতম গণহত্যার মূল পরিকল্পক ও বাস্তবায়কদের অন্যতম, ১৯৫ জনের তালিকাভুক্ত এই সকল যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তান সেনারা অট্টহাসি দিয়ে শেষপর্যন্ত ফিরে যায় পাকিস্তানে। ইস্টার্ন কমান্ড প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি, যিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টারের সেনাবাহিনীর মিটিঙে পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে বাঙালি নারীদের ওপর লেলিয়ে দেবার এবং বাংলাদেশকে জারজ জাতি উল্লেখ করে তার চেহারা পরিবর্তনের সদম্ভ ঘোষণা দেন (ঐ মিটিঙে উপস্থিত মেজর জেনারেল খাদিম হুসেইন রাজা তার বইতে এ বিষয়ে উল্লেখ করেন) সেই নিয়াজির গায়ে তার নৃশংস পাপ কর্মের জন্য আঁচড়টুকুও লাগে না।[১৫]

'৭১ এর গণহত্যার মাস্টার মাইন্ড, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডর নীল নকশা প্রণয়ণকারী ও তার বাস্তবায়ক, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি সন্ত্রাসী দলগুলোর প্রশিক্ষণদাতা, হিটলারি বর্বরতার আর এক প্রতীক, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীও অবলীলায় রেহাই পেয়ে যান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঐ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বিনা বিচারে কেন ছেড়ে দিলেন সে সম্পর্কে বিচারপতি হাবিবুর রহমান জে. এন দীক্ষিতের উল্লেখ করে বলেন "জে. এন দীক্ষিত তাঁর লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড-এ বলছেন, 'এমনকি এই স্বল্পসংখ্যক যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সরকার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ কিংবা মামলার নথিপত্র প্রস্তুতির ব্যাপারে তেমন তৎপর ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারে হাকসারকে (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত) বলেছিলেন যে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে অসুবিধার কারণে তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে শক্তি ও সময় নষ্ট করতে চান না। হয়তো কোনো দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের কথা ভেবেই মুজিব এ ধরনের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে চালিত হয়েছিলেন। তিনি এমন কিছু করতে চাননি, যাতে পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিপ্রদান বাধাপ্রাপ্ত হয়।'"[১৬]

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এবং তার পরপরই আব্বুর নিষেধ সত্ত্বেও মুজিবকাকু তড়িঘড়ি করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর আমন্ত্রণে লাহোরে গেলেন অর্গানাইজেশন অব দ্য ইসলামিক কনফারেন্সে (২২-২৪ ফেব্রুয়ারি) যোগ দিতে। সেখানে নিশ্চয়ই ভুট্টো-মুজিবের মধ্যে এমন কোনো সমঝোতা হয়েছিল যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তার মাত্র দুই মাস পরের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মধ্যে। ঐ চুক্তির ১৪ প্যারাগ্রাফে উল্লেখিত

হয় "The Prime Minister of Pakistan declared that he would visit Bangladesh in response to the invitation of the Prime Minister of Bangladesh and appealed to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past in order to promote reconciliation. Similarly, the Prime Minister of Bangladesh had declared with regard to the atrocities and destruction committed in Bangladesh in 1971 that he wanted the people to forget the past and to make a fresh start, stating that the people of Bangladesh knew how to forgive."[১৭]

পরবর্তী ১৫ প্যারাগ্রাফে উল্লেখিত 'Having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistan to forgive and forget the mistakes of the past the 'Foreign Minister of Bangladesh stated that the government of Bangladesh had decided not to proceed with the trial as acts of clemency. It was agreed that the 195 prisoners of war may be repatriated to Pakistan along with the other prisoners of war now in the process of repatriation under the Delhi Agreement of 25th August 1973.'[১৮]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশে সফরের ঘোষণা, অতীতের ভুলভ্রান্তি ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করে দেবার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশের কাছে আবেদন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তার জনগণকে অতীত ভুলে নতুন যাত্রা শুরু করার আহ্বান, বাংলাদেশের জনগণ ক্ষমা করতে জানে এবং ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানিকে অনুকম্পার নিদর্শন হিসেবে বিচার না করে অন্য যুদ্ধবন্দিদের সাথে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো প্রভৃতি এই সকল বাক্যবলি চুক্তিতে উল্লেখিত বিধায় মনে হয় যে বাংলার মাটিতে হয়নি কোনো নৃশংস গণহত্যা এবং বাংলাদেশের জনগণের সম্মতি রয়েছে বিচার বহির্ভূত এই নজিরবিহীন ক্ষমায়। ক্ষমা পরম ধর্ম অবশ্যই। কিন্তু ব্যক্তিগত অপরাধের ব্যাপারে ক্ষমা এক বিষয় এবং একটি জাতির বিরুদ্ধে সঙ্গবদ্ধ গণহত্যা, ধর্ষণ ও অমানবিক অপরাধের ব্যাপারে ক্ষমা অন্য বিষয়। এখানে ক্ষমা হতে পারে, তবে তা বিচারের পূর্বে এবং জনগণের সম্মতি ব্যতীত নয়। নতুবা যে জনসাধারণ হয়েছিল নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞর শিকার তাদের প্রতিই করা হয় অবিচার। ইতিহাসের অধ্যাপক ড. কামাল হোসেন এ প্রসঙ্গে বলেন, 'অর্থাৎ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পৃথিবীর ইতিহাসের যে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়, তার জন্য একজন অপরাধীকেও শাস্তি পেতে হয়নি। ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষমা মহৎ গুণ হলেও কোন রাষ্ট্র, সম্প্রদায় বা জাতির প্রশ্নে অপরাধীদের ক্ষমা করে দেওয়া কোনভাবেই মহত্তের পরিচায়ক হতে পারে না। কেননা এ ধরনের ক্ষমার কারণে একটি জাতির আত্মত্যাগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি হয়ে পড়তে পারে বিপন্ন, কিংবা দেশ মানবতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের আবর্তে তলিয়ে যেতে পারে'।[১৯]

বিচারপতি হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর অন্যান্য বক্তব্যর সাথে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ ও ২৬ মার্চ ১৯৭৫ এর দুটি বক্তব্য ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিতে তুলে ধরেন । '২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'কোনো দেশের ইতিহাসে নাই বিপ্লবের পর বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে যারা, শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে যারা, যারা এ দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের কোনো দেশে, কোনো যুগে ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম...সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম।'

২৬ মার্চ ১৯৭৫ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি বললেন, 'ভায়েরা, বোনেরা আমার, আমরা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একটা ওয়াদা আমি রাখতে পারি নাই। জীবনে যে ওয়াদা আমি করেছি জীবন দিয়ে হলেও সে ওয়াদা আমি পালন করেছি। আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করব। এই ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি, তাদের আমি বিচার করিনি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এ জন্য যে এশিয়ায়, দুনিয়ায় আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম।'[২০]

'বাংলাদেশের মানুষ জানে কী করে ক্ষমা করতে হয়,' ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকের ছেড়ে দেওয়ার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর উক্তি সমন্ধে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেন, 'যাঁরা বিচার করতে পারেননি, তাঁদের মুখে ক্ষমা করার অহংকার মানায় না।'[২১]

বলা বাহুল্য যে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বিনা বিচারে ছেড়ে দেবার পরেও বাংলাদেশের প্রতি ভুট্টো ও পাকিস্তান সরকারের যে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ জাগেনি যার প্রমাণ তাদের পরবর্তী বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপ। তারা যে তাদের পাপাচারের জন্য অনুতপ্ত নয়, তার প্রমাণ পাকিস্তান সরকার আজও বাংলাদেশে নৃশংস গণহত্যার সম্পূর্ণ দায়ভার গ্রহণ করে, কোনো চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে, নিঃশর্তে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা এবং গণহত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করেনি। উপরন্তু জামায়েত ইসলামী দলের নেতা গণহত্যাকারী, ধর্ষণকারী ও যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার সাম্প্রতিক ফাঁসির পরে বাংলাদেশের বিজয় দিবস এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্থনের দিনটিকেই বেছে নিয়ে (১৬ ডিসেম্বর, ২০১৩) পাকিস্তান জাতীয় এসেম্বলিতে পাকিস্তানের বিশ্বস্ত বন্ধু ঐ নৃশংস নরঘাতকের জন্য সমবেদনা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'৭১ এ পাকিস্তান সেনা বাহিনীর গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অপহরণের প্রধান দোসর জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আযম চার যুগ পরে বাংলা ভিশন টিভির কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যে কথাগুলো বলেছেন তাতে বোঝা যায় যে দালালদের সাধারণ ক্ষমা ও পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে বিচার না করে রেহাই দেওয়াটা কত বড় মারাত্মক ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল। গোলাম আযম বলেন যে স্বাধীনতার ৪০ বছর পর্যন্ত কেউ তাদের যুদ্ধাপরাধী বলেনি। ১৯৫ জন পাকিস্তান সেনার নাম যুদ্ধাপরাধীর তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু কোনো বেসামরিক ব্যক্তির নাম ছিল না। ঐ ১৯৫ জনকেও ভুট্টোর সাথে মিটিং করে মুজিব কাকুর মাফ করে দেওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'শেখ মুজিব সাহেব নিজেই এই ইস্যুর মীমাংসা করে দিয়ে গেছেন।... তখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে সবাইকে মাফ করলেন– তো তিনি তো এটার মীমাংসা করে দিয়ে গেলেন– যুদ্ধাপরাধী ইস্যুটার মীমাংসা করে দিয়ে গেলেন। এখন ৪০ বছর পর এই ইস্যুটাকে খাড়া করা হলো কেন ?'[২২] মীমাংসা আসলে হয়নি বলেই শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ২৬ মার্চ, ১৯৯২ সালে ঐতিহাসিক রেসকোর্স তথা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, গোলাম আযমসহ ঘাতক দালালদের বিচারের দাবিতে শুরু হয় গণআদালত। ২০০৮ এ জনগণের কাছে দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার বর্তমানে সাহসিকতার সাথে সম্পাদন করছে যুদ্ধাপরাধী ঘাতক দালালদের বিচারের গুরুদায়িত্ব। আশাকরি অচিরেই পাকিস্তানে যুদ্ধাপরাধী সেনাদের যে কজনও বেঁচে রয়েছে তাদেরও বিচার শুরু হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। বিচার করতে হলে সকল অপরাধীরই করতে হবে। বিশেষত সেই সকল মূল যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাছাড়া শুধু জামায়াতে ইসলামীই নয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহায়তাকারী সকল যুদ্ধাপরাধী তারা যে দলেরই হোক না কেন তাদেরও বিচার করতে হবে। বলা বাহুল্য যে শুধু যুদ্ধাপরাধীই নয় মহান মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও

জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র গড়ার অঙ্গীকারের বিপরীত আচরণকারী কোন দল বা নেতার স্থান বাংলাদেশের মাটিতে হতে পারে না।

ইসলাম ধর্মের কলঙ্ক, গণহত্যাকারী, বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী, নারী ধর্ষণকারী ও মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ঘাতক দালালরা যারা সেদিন ১৯৭৩ সালের সাধারণ ক্ষমার ফলে মুক্তিলাভ করেছিল তারা নির্দোষিতার মুখোশ পরে মিশে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের ভিড়ে। তারা (এবং পরবর্তীতে জেনারেল জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবেকহীন দালাল পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যারা পুনঃ জাগরিত হয়েছিল) সঙ্গবদ্ধ হয়ে সংগোপনে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, পাকিস্তানপন্থী তৎপরতা ও নানাপ্রকার অপপ্রচারণা। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন মুজিব সরকারের ব্যর্থতা ও দুর্নীতির কারণে দেশি ও বিদেশি শত্রুদের হাত ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৯৭৪ সালের ৮ আগস্ট আব্বু দুই সপ্তাহের জন্য মধ্যপ্রাচ্য সফরে গেলেন। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার, পারস্পরিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য আব্বুর এই সফর বাংলাদেশের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে বিশ্বের অর্থনীতির নকশা বদলে যায়। তেলসম্পদের ওপর ভিত্তি করে বাণিজ্য, ব্যাংকিং এবং মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা বাংলাদেশের জন্য ছিল প্রয়োজনীয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের দুর্দিনে মধ্যপ্রাচ্য পাশে এসে দাঁড়ায়নি, তার পরও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত, খরা, বন্যাতাড়িত বাংলাদেশের স্বার্থে তিনি ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এই সফরের প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে মধ্যপ্রাচ্যের বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটানো। পাকিস্তান ও পরাজিত পাকিস্তানপন্থীরা ঢালাওভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা করে। তাদের অপপ্রচারণা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে বাংলাদেশের মানুষেরা মুসলমান নয়, তারা কাফের, তারা হিন্দু ইত্যাদি; সুতরাং তারা কোনো সহানুভূতি বা সহমর্মিতা পেতে পারে না। যদিও অপপ্রচারণা, তা সত্ত্বেও হিন্দু, মুসলমান—সে যে ধর্মেরই হোক না কেন—তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে মানুষ। তার ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তার প্রতি বৈষম্যমূলক, অমানবিক ও অপমানজনক আচরণের নামই অধর্ম। এই মহাসত্যটি স্বার্থলোভী মানুষ ভুলে যেতে পারদর্শী।

মধ্যপ্রাচ্যে আব্বুকে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার বিশদ বর্ণনা আব্বুর ব্যক্তিগত সচিব আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকারে উল্লিখিত হয়েছে।[২৩] কুয়েতের অর্থমন্ত্রী আবদুর রহমান সেলিম-আল আতিকি আব্বুর সঙ্গে দেখা করে প্রথম যে কথা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেন পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছ ?' আব্বু খুব সহজভাবে উত্তর দিলেন, 'দেখ, আমাদের সমস্যাটি মূলত অর্থনৈতিক। তুমিও অর্থমন্ত্রী আমিও অর্থমন্ত্রী, তাই বিষয়টি তোমাকে বললে, তুমি বুঝবে ভালো।' তারপর তিনি পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পৃথক হওয়ার কারণগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরে বলেন, 'এর মধ্যে ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই। আমরাও মুসলমান, তারাও মুসলমান। সত্যি বলতে পাকিস্তান আমরাই এনেছিলাম। বাঙালি না হলে পাকিস্তান আসত না। পাকিস্তানের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিমদের ভোটের কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়।'[২৪]

কুয়েতের অর্থমন্ত্রী, যিনি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের প্রথমে শীতল অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, আব্বুর সঙ্গে আলাপের পর তাঁর ব্যবহার পাল্টে যায়। এরপর তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অফিসিয়াল ডিনারের প্রস্তাব দেন। পরদিন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর সম্মানে কুয়েতের অর্থমন্ত্রী এক বিশাল নৈশভোজের আয়োজন করেন। কুয়েত অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ

থেকে উচ্চপর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হন। এভাবে বরফ গলতে শুরু করে। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য কুয়েত প্রতিশ্রুতি দেয়।

সৌদি আরব তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

মালয়েশিয়ার জাতির জনক ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৯৬৩-১৯৭০) টুংকু আব্দুর রহমান আইনগতভাবে আব্বু ও তাঁর সফরসঙ্গীদের সৌদি আরব সফরের ব্যাপারে ঐকান্তিক সহযোগিতা করেন। সৌদি অর্থমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল খেল ও বাদশাহ্ ফয়সলের সঙ্গে আব্বুর সাক্ষাৎকার সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সৌদি আরব প্রথম থেকেই উষ্ণ সংবর্ধনা জানালেও এখানেও কুয়েতের মতোই ধর্মের বিষয়টি ওঠে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আব্বু কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেন, 'লা কুম, দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।' (তোমার জন্য তোমার ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম)। (সুরা : ১০৯ : আয়াত : ৬) 'লা ইকরা হাফিদীন।' (ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই)। (সুরা ২: আয়াত ২৫৬)

ইসলামের সঙ্গে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার সংঘাত নেই এই উত্তরের পর তাঁদের বলার কিছু ছিল না। ঢাকায় ফেরার পর আব্বুর সফরের ঘটনা ও উত্তর শুনে নানা খুশি হয়ে বললেন, 'আমার যোগ্য ছাত্রের যোগ্য উত্তর।' (ঢাকা কলেজে নানা আব্বুর আরবির শিক্ষক ছিলেন)।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অপপ্রচারণা খণ্ডনের জন্য আব্বুর যুক্তি, ধৈর্য, আচরণ, উপস্থাপনা ও বাচনভঙ্গি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনীতি, শান্তি ও উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত সকলের জন্যই শিক্ষণীয় উদাহরণ হতে পারে। কার কাছে কোন বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপন করতে হবে তা তিনি ভালো বুঝতেন এবং তা প্রয়োগ করতেন সত্যের অপলাপ না ঘটিয়ে ও তোষামোদের আশ্রয় না নিয়ে। বাংলাদেশ সম্পর্কে মধ্যপ্রাচ্যের নেতিবাচক মনোভাব বহুলাংশে পরিবর্তিত হয় আব্বুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন দুয়ার খুলে যায় ।

আব্বুর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকের সদস্যভুক্ত হয় বাংলাদেশ। ১২ আগস্ট জেদ্দায় ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সম্মেলনে ভাষণদানকালে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এর ফলে উন্নয়নে অর্থ সরবরাহের ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করবে। শুধু মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যের দ্বারাই ইসলামিক ব্যাংক পরিচালিত হবে না। ... অন্যান্য উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামিক ব্যাংকের মৌলিক পার্থক্য এখানেই।... এই বৈশিষ্ট্যগুলোতে ইসলামের মহান নীতিই প্রতিফলিত হয়েছে।[২৫] ইরাক ও কুয়েত বাংলাদেশকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অপরিশোধিত তেল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তা দিয়ে চট্টগ্রামে তেল শোধনাগার সারা বছর চালু রাখা যাবে এই আশা তিনি পোষণ করেন।

ইরাক সফরকালে আব্বুর মাধ্যমে ইরাক বাংলাদেশের জন্য বড় অঙ্কের আর্থিক অনুদান দেয়।[২৬]

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের জনশক্তির যে বিপুল চাহিদা রয়েছে সেই বিষয়টির ওপর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জোর দেওয়া হয়। বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য আব্বুর আমন্ত্রণে কুয়েত থেকে অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসে।[২৭] সব মিলিয়ে আব্বুর মধ্যপ্রাচ্য সফর সাফল্যমণ্ডিত হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যে রাষ্ট্র সফরেই আব্বু গিয়েছেন বা উচ্চপর্যায়ের বিদেশি ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশের জন্য ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন খুব তীক্ষ্ণভাবেই। তারপর সেই ভাবাবেগ পৃথক করেছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসনের বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকায় তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি মার্কিন সাহায্য গ্রহণেরও বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন খরা-

বন্যাতাড়িত বাংলাদেশের অর্থকোষের ভাণ্ডার শূন্য, সদ্য স্বাধীন এই দেশটির মঙ্গলের জন্য তাঁকে কাজ করতে হবে এইধরনের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে, তখন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ভাবাবেগকে আলাদা করেছেন বাস্তবতা থেকে কিন্তু বাংলাদেশের স্বার্থ ও মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ন হতে দেননি। তাঁর হৃদয় ও চিন্তার বিশালতা মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তাঁর আত্মমর্যাদাপূর্ণ অভিব্যক্তি বহির্বিশ্বের মানুষকে চমকে দিয়েছে, থমকে দিয়েছে, সাধারণের ভিড়ে তাঁকে করেছে অনন্য, বাংলাদেশের মর্যাদাকে করেছে সমুন্নত। এই অধ্যায়ে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আব্বু দিল্লিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো'র আয়োজন করা হয়। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী (সেক্রেটারি অব ডিফেন্স) রবার্ট ম্যাকনামারা ও আব্বুকে সেই অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসানোর ব্যবস্থা করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল; বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল, এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি আব্বু ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। (অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ যাঁরা বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের প্রতি তিনি বরবারই কৃতজ্ঞ ছিলেন)। শ্রীমতি গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র সরকার সম্পর্কে আব্বুর মনোভাব জানতেন সে জন্যই এমনভাবে বসার আয়োজন করেছিলেন যাতে করে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হতে পারে। ম্যাকনামারা বেশ কয়বার পাশে বসা আব্বুর দিকে তাকিয়েছিলেন যেন আব্বু সাড়া দিলেই তাঁরা কথা বলতে পারেন কিন্তু অনুষ্ঠানের পুরো সময়টা আব্বু পাশে বসে থাকলেও একবারও তাঁর দিকে ঘুরেও তাকাননি, কথা বলা তো দূরের কথা। ব্যাপারটা ভারতীয় কর্তৃপক্ষসহ অনেকেরই চোখে পড়েছিল।[২৮]

আব্বুর ব্যক্তিগত সচিব আবু সাঈদ চৌধুরী (যিনি নিজেও ঐ অনুষ্ঠানে আব্বুর পেছনে বসেছিলেন) ব্যাপারটি লক্ষ করেছিলেন। রাতে হোটেলে ফিরে তিনি এ প্রসঙ্গে আব্বুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, ম্যাকনামারার পাশে বসে অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীরা ম্যাকনামারার সঙ্গে কথা বলতে উদগ্রীব হয়ে থাকে, আর সে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে আর আপনি কথা বললেন, না।' এ কথা শুনে আব্বু হঠাৎ সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েন। আব্বু উত্তর দিলেন, 'চৌধুরী সাহেব, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময় এদের ভূমিকা কী আপনি জানেন?' আবু সাঈদ চৌধুরী বললেন, 'উনি তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ছিলেন, তিনি তো আমেরিকান গভর্নমেন্ট না।' আব্বু উত্তর দিলেন, 'He is a super government. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হচ্ছে আমেরিকান গভর্নমেন্টের সুপার গভর্নমেন্ট। এদের রোল ছিল আমাদের মেরে ফেলার। আমি কী করে তাঁর সঙ্গে কথা বলি?'[২৯]

ম্যাকনামারার কাহিনি এখানেই শেষ হলো না। তিনি ভারত সফর শেষে বাংলাদেশে আসলেন। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে কে যাবেন এই নিয়ে কথা উঠল। প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূরুল ইসলাম তাঁর সাক্ষাৎকারে ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন।[৩০]

নূরুল ইসলাম বললেন, "আমি প্রস্তাব করলাম 'ম্যাকনামারাকে রিসিভ করবেন বঙ্গবন্ধু।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তাজউদ্দীন, তুমি কী বলো?' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'মুজিব ভাই আপনার এয়ারপোর্টে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' আমি বললাম, 'আপনি আপত্তি করছেন কিন্তু অন্য অনেক জায়গায় তো এমনই হয়।' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'অন্য জায়গায় যা হয় এখানে সেটা চলবে না, চিফ অব প্রোটোকল যাবে।' আমি বললাম, 'বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট যখন পাকিস্তান যেতেন তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কিংবা যিনি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান থাকতেন তিনি যেতেন। আর আপনি চিফ অব প্রটোকল পাঠিয়ে দেবেন?' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যাবেন। আপনিও যাবেন

না।' বঙ্গবন্ধু সব শুনছিলেন, বললেন, 'ঠিক আছে, তাজউদ্দীন যা বলছে তাই করেন।' শেষ পর্যন্ত তাই হলো। ম্যাকনামারাকে রিসিভ করলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হামিদুল্লাহ সাহেব।"

পরদিন আব্বুর সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ম্যাকনামারা। সঙ্গে প্রফেসর নূরুল ইসলাম। (বৈঠকের এই বিশেষ অংশটি প্রফেসর নূরুল ইসলামের উপরে উল্লেখিত সাক্ষাৎকার থেকে তুলে ধরা হলো।) ম্যাকনামারা জানতে চাইলেন, 'বাংলাদেশের জন্য কোথায় কী ধরনের সাহায্য দরকার।' তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আমাদের যা দরকার, তা আপনি দিতে পারবেন কি না আমার সন্দেহ আছে।' ম্যাকনামারা বললেন, 'মিস্টার মিনিস্টার, আপনি বলুন, আমরা চেষ্টা করব দিতে।' তখন তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'মিস্টার ম্যাকনামারা, আমাদের গরু এবং দড়ি দরকার। যুদ্ধের সময় গরু সব হারিয়ে গেছে। এখানে-ওখানে চলে গেছে, মরে গেছে। পাকিস্তান যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। চাষিরা এদিক-সেদিক পালিয়ে গেছে। তখন গরু হারিয়ে গেছে। এখন যুদ্ধ শেষ, চাষি ফিরেছে, কিন্তু গরু নেই, তাই চাষ করবে কীভাবে ? কাজেই আমাদের অগ্রাধিকার হলো গরু।' ম্যাকনামারার চোখ-মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। তাজউদ্দীন সাহেব বললেন, 'আর আমাদের সব দড়ি তো পাকিস্তানিরা নষ্ট করে ফেলেছে। এখন গরু পেলে গরু বাঁধতে দড়ি প্রয়োজন। গরু এবং দড়ির প্রয়োজন খুব তাড়াতাড়ি, না হলে সামনে জমিতে চাষ হবে না।' ম্যাকনামারা বুদ্ধিমান মানুষ। আব্বুর উপহাস বুঝতে তাঁর অসুবিধা হলো না।

পরবর্তী সময়ে আব্বুর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ম্যাকানামারা মন্তব্য করেছিলেন, 'He probably is the best Finance Minister at present in the world.'[৩১]

আব্বুর সঙ্গে কাজ করে শুধু ম্যাকনামারাই নন, সব বিদেশি কর্মকর্তাই মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর কাজের মধ্যে দিয়েই তিনি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। প্রফেসর নূরুল ইসলামের ভাষায় : 'তাজউদ্দীন সাহেব অত্যন্ত নির্ভুলভাবে খুব অল্প কথায় সব বিষয় তুলে আনতে পারতেন। তাঁর এই বিশেষত্বটি ছিল।... তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন এবং রাজনীতিবিদরা সাধারণত যে ধরনের কথাবার্তা বলেন তিনি তেমন বলতেন না। তাঁর এই পরিষ্কার এবং স্ট্রেট কথার ফলে সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে সহজেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আসা সম্ভব হতো। এটা ঠিক, শুধু ম্যাকনামারাই নয়, যে কোনো বিদেশি যাঁরাই তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর সম্পর্কে অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। তাঁর ক্যাপাসিটি সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। আর একটা জিনিস ছিল তাঁর, যেখানে কোনো ভুল হচ্ছে তিনি সেই ভুলটা স্বীকার করতেন, বুঝতে পারতেন সঙ্গে সঙ্গে।'[৩২]

১৯৭৪ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) সভায় যোগ দিতে আব্বু কুয়ালালামপুরে যান, সেখানেও বাংলাদেশের পক্ষে তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী সবল উপস্থাপনা ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের শ্রদ্ধা কুড়ায় এবং তিনি অভূতপূর্ব সহযোগিতা লাভ করেন। সে সময় মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জমিরউদ্দিন আহমেদ, যিনি আব্বুকে ছোট ভাইয়ের মতোই স্নেহ করতেন, তাঁর স্মৃতিচারণায় এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন :

'মনে পড়ে, ১৯৭৪ সালের ২৪ এপ্রিল এডিবি'র মিটিংয়ের জন্য তাজউদ্দীন কুয়ালালামপুরে এলেন। আমি তখন সেখানে বাংলাদেশের পতাকাবাহী। আমাদের অনেকগুলো ঋণ সম্পর্কে আবেদন ছিল। মিটিং-এর জন্য আমাদের উৎকণ্ঠার কোনো শেষ নেই। অনেক মেমো, অনেক ফাইলপত্র নিয়ে অর্থসচিব কফিলউদ্দিন মাহমুদ প্রস্তুত। আমি ও কফিলউদ্দিন মাহমুদ ঠিক তাজউদ্দীনের পেছনের সারিতে বসা। দেখলাম তাজউদ্দীন ফাইলটি গুছিয়ে ফিতা বেঁধে ফেললেন। বললেন, 'Excellencies, how many times I will repeat that Bangladesh needs soft loans. Do you want me on my knees ?'

[এক্সেলেনসিজ, আমি কতবার পুনরাবৃত্তি করব যে বাংলাদেশের সহজ ঋণের প্রয়োজন। আপনারা কি চান আমি হাঁটু গাড়ি ?] সব মিটিং স্তব্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশের সব কয়টি অনুরোধ গৃহীত হলো। যেখানে তিন ঘণ্টা মিটিং চলার কথা ছিল সেখানে মাত্র পনেরো মিনিটেই মিটিং শেষ হলো। কী আত্মপ্রত্যয় ! কী বাচনভঙ্গী ! সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।'

আব্বু বিদেশ থেকে যে ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন নিজ দেশ থেকে যদি তেমনটি পেতেন তাহলে বাংলাদেশের ভাগ্য খুলে যেত। সহযোগিতার তুলনায় নিজ দেশে তাঁকে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটি বিষয় খুব জোরেসোরেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করা হতো যে তিনি ভারতপন্থী, ভারতের এজেন্ট। নিজ দলের ভেতর এবং বাইরের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিরা এই প্রচারণা অব্যাহত রেখেছিল। পাকিস্তান সরকার প্রচার করেছিল যে, তিনি আসলে হিন্দু। নাম তেজারাম। ভারত থেকে তিনি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেন পাকিস্তান ভাঙার জন্য। পাকিস্তান সরকারের এই ভিত্তিহীন অপপ্রচারণা ছিল হাস্যকর এবং বাংলাদেশে তা কোনো কূল পায়নি। ভারতপন্থী এই অপপ্রচারণাও বিলুপ্ত হয়ে যায় তাঁর নিজ কর্মজীবনের আলোকেই। আব্বু ছিলেন মনে-প্রাণেই স্বাধীনচেতা এবং দেশপ্রেমিক। বাংলাদেশের কল্যাণে তিনি সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন। সে কারণে তিনি বাংলাদেশপন্থী। ন্যায়-নীতির মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের সেবা করেছেন, সেজন্য তিনি ন্যায়পন্থীও বটে। ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে মর্যাদাশীল চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল আব্বুর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নেতৃত্বের কারণেই। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ভারতের স্বীকৃতি লাভ, স্বীকৃতির পরই মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনী হিসেবে ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে এবং যখনই বাংলাদেশ সরকার চাইবে তক্ষুনি বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার হবে, এমন চুক্তি যা আব্বুর নেতৃত্বাধীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ভারতের মাটিতে সম্পাদন করে, তা তো ছিল বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল অর্জন ও সম্মানের ব্যাপার। তিন মাসের মধ্যে বিদেশি সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাহার তো বিশ্বে আজও নজিরবিহীন।

বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের প্রতি আব্বুর কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। বাংলাদেশের চরম দুর্দিনে ভারত বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল সেজন্য কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা স্বাভাবিক। কৃতজ্ঞতাবোধ মনুষ্যত্বেরই অংশ। কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতাবোধ বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষায় তাঁর জন্য অন্তরায় হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যেমন বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষা করেছেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তেমনি।

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তাজউদ্দীন সাহেব সম্পর্কে এই ভারতঘেঁষা কথাটি যারা বলেছে তারা সম্পূর্ণ বাজে কথা বলেছে। তিনি কোনদিনই কারো প্রতি নতজানু ছিলেন না। তাঁর কোনরকম দুর্বলতা ছিল না। কোন দেশের প্রতি তাঁর যা কিছু দুর্বলতা ছিল তা ছিল তাঁর নিজের দেশ বাংলাদেশের জন্য। তিনি ছিলেন প্রো-বাংলাদেশ। আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে এমন প্রমাণ পাইনি যে তিনি ভারতের সঙ্গে খাতির করে সমঝোতা করেছেন। আমি প্রায় তিন বছর তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। আমার অভিজ্ঞতায় এটি নেই যে ভারত আমার বন্ধু দেশ কাজেই ছেড়ে দাও। অথবা ভারতের সঙ্গে আলোচনার সময় শক্ত না থেকে নরম থাকতে হবে। এমন তিনি কখনোই করেননি বা বলেননি। তাজউদ্দীন সাহেবের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। যুদ্ধের দিনে ভারত আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, সেজন্য তিনি কৃতজ্ঞ। কিন্তু দেশের স্বার্থে পাট বিক্রি করতে হবে, ফার্টিলাইজার লাগবে এমন সব কথাবার্তার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা ভারতীয়দের সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করেছি। তাজউদ্দীন সাহেব কোনদিন নরম হতে বলেননি।...

...আমাদের মনোভাব ছিল আমরা স্বাধীন দেশ, কথাবার্তা-আলোচনায় আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলবো। আমাদের দেশের স্বার্থের বিষয় কোনো খাতির নেই। যেমন পাট নিয়ে আলোচনার সময় আমরা সরাসরি ভারতকে বলেছি, তোমাদের পাট উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। তোমাদের খরচ বেশি তোমরা উৎপাদন কেন করছো ? আমরা তোমাদের কাছে পাট বিক্রি করবো। আমি রীতিমত ফাইট করেছি তাদের সঙ্গে। আগে ভারত কিছু কিছু পাট উৎপাদন করতো, বাকিটা নিতো বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে। কিন্তু পাক-ভারত (১৯৬৫) যুদ্ধের পর পাকিস্তান পরবর্তী সময়ে ভারতে পাট বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ভারত বেশ জোরেসোরে পাট উৎপাদন শুরু করে।

আমরা চেয়েছিলাম ওরা বাড়তি পাট উৎপাদন বন্ধ করে আবার আগের মতো আমাদের কাছ থেকে পাট ক্রয় করুক। তাজউদ্দীন সাহেবের কথা ছিল, বিপদে সাহায্য করেছো ভালো কথা, আমরা বন্ধু থাকবো। কিন্তু তাই বলে আমার দেশের স্বার্থের ক্ষতি হয় এমন কোনো সুবিধা আমি তোমাকে দেবো না।'[৩৪]

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান আব্বুর স্বাধীন চিন্তা ও কার্যক্রমের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'মনে আছে ওআইসি (Organization of the Islamic Conference) সম্মেলনে লাহোর যাওয়ার আগে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'ভারত হয়ে যাই, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটু দেখা করে তারপর যাবো।'

তাজউদ্দীন বলেন, 'কেন ? আপনি কেন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটু দেখা করে যাবেন ? আপনি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী, আপনি কেন কাউকে জিজ্ঞেস করবেন ? আপনি কেন অন্যের কাছে মাথা নিচু করবেন ?' তখন মুজিবুর বলেন, 'ঠিক আছে। আমি সরাসরিই চলে যাবো।' তাজউদ্দীন বলেন, 'মুজিব ভাই, আপনি তাই করেন। এতে আপনার মান-সম্মান থাকবে।'[৩৫]

লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে মুজিব কাকুর যোগদান প্রসঙ্গে আব্বু দ্বিমত প্রকাশ এবং যেতে নিষেধ করলেও দেশের মর্যাদার প্রশ্নে বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতিও তাঁর মনোভাব ছিল অবিচল।

আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর তেলের দাম হঠাৎ বেড়ে যায়। বিশ্বের পণ্যবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক খাদ্যসংকট দেখা দেয়। বাংলাদেশের তখন হিমশিম অবস্থা। বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা লাভ, দেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে চালু করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাহায্যে কনসোর্টিয়াম গঠন, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মতো অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আব্বু '৭৪-এর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

আব্বু যখন বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের গভর্নরদের সভায় যোগদান ও আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে পৌছেন তখন মুজিব কাকু জাতিসংঘের সভায় যোগদানের জন্য তার আগেই নিউইয়র্কে পৌছেন। তিনি জাতিসংঘে বাংলায় বক্তব্য প্রদান করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। শিশু বাংলাদেশ সে বছর জাতিসংঘের সদস্য হয়। ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে মুজিব কাকুর মাত্র ১৫ মিনিটের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আব্বু আগে থেকেই মুজিব কাকুকে নিষেধ করেছিলেন যে, যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ ব্যতীত তিনি যাতে ফোর্ডের সঙ্গে দেখা না করেন।[৩৬] মুজিব কাকুর সঙ্গে ফোর্ডের বৈঠক ফলপ্রসূ হলো না। আব্বু খুব মর্মাহত হলেন।

১৩ অক্টোবর, এক মাস সাত দিন পর দেশে ফিরলেন আব্বু। আম্মাসহ আমরা আব্বুকে রিসিভ করতে বিমানবন্দরে (তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর) গেলাম। বিমানবন্দরে উপস্থিত

সাংবাদিকদের কাছে আব্বু জোরালো বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, 'বর্তমান জাতীয় দুর্যোগকালে উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে যদি ভাবা হয় যে ঝড় থেমে গেছে তা হবে মারাত্মক ভুল।' তিনি অবিলম্বে দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয়ভাবে খাদ্যসংকটের বাস্তব সমাধানের আহ্বান জানালেন।

আব্বু দেশে ফেরার পর ঘটনা একের পর এক খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করল। আমরা একদিন স্কুল থেকে ফেরার পর মংলু ভাইয়ের মেয়ে শাহনাজ দৌড়ে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে খবর দিল 'শেখ সাহেব আজকে বাসায় এসেছিলেন। দাদার সঙ্গে ভীষণ তর্কাতর্কি হয়েছে।' আম্মা নিচতলার রান্নাঘরে পিঠা ভাজছিলেন। তিনি আব্বুকে পিঠা খেতে বলার জন্য শাহনাজকে ওপরতলায় পাঠিয়েছিলেন। চঞ্চল শাহনাজ যখন দ্রুতগতিতে আব্বুর ঘরে ঢুকছে তখন শেখ সাহেব চুরুটের পাইপ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছেন। শাহনাজ তাঁর সঙ্গে খেল এক ধাক্কা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে দেখে শেখ সাহেব, তিনি মাত্র এসেছেন। আব্বু সে সময় গোসল করছিলেন এবং শেখ সাহেব আব্বুকে ঘরে না পেয়ে বারান্দায় বসলেন। শাহনাজ দৌড়ে নিচে নেমে রান্নাঘরে আম্মাকে শেখ সাহেবের হঠাৎ আগমনের সংবাদ জানায়। আমাদের শৈশবকাল থেকেই আমাদের বাড়িতে শেখ সাহেব তথা মুজিব কাকুর উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।

আব্বু ও মুজিব কাকু একে অন্যের গৃহে যাতায়াত করতেন অবাধে। তাঁরা একত্রে বুদ্ধি-পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। রাতের পর রাত জেগে দুজনে মিলে দেশ ও দশের জন্য কাজ করতেন। তারা ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। কিন্তু স্বাধীনতার পর তাঁদের দুজনের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই বাড়তে থাকল। এবারে মুজিব কাকুর আগমনের প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। নীতিগত ও আদর্শিক ব্যাপারে দুজন তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছেন। আব্বু ততদিনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে তিনি আর মন্ত্রিসভায় থাকবেন না, মুজিব কাকু যেদিন ইস্তফা দিতে বলবেন সেদিনই তিনি ইস্তফা দেবেন। নিজে থেকে ইস্তফা দিয়ে মুজিব কাকুকে বিব্রত করবেন না, আবার তাঁর আজীবনের নীতি ও আদর্শের সঙ্গেও আপস করবেন না। তিনি রাগ করে কদিন অফিসে যাননি।

মুজিব কাকুর আসার খবর পেয়ে আম্মা ওপরে গেলেন। আব্বুর সঙ্গে মুজিব কাকুর তখন ভীষণ তর্ক চলছে। আব্বু ওনাকে বলছেন, 'মুজিব ভাই আজকে আমি আপনাকে যে কথাগুলো বলব, আমি জানি আপনি সে কথাগুলো যুক্তি দিয়ে খণ্ডাতে পারবেন না।' আব্বু গণতন্ত্রকে হত্যা করে সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একমাত্র রাজনৈতিক দল বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক লীগ) যা তিনি গঠন করতে যাচ্ছেন তার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে বললেন। প্রশ্ন তুললেন দলের হাতে অস্ত্র, দলীয় ক্যাডারদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধার সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষদের তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আত্মীয়স্বজন ও দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ সম্পর্কে। আব্বু বললেন, 'মুজিব ভাই, এই জন্যেই কি আমরা ২৪ বছর সংগ্রাম করেছিলাম। যেভাবে দেশ চলছে, আপনিও থাকবেন না, আমরাও থাকব না, দেশ চলে যাবে রাজাকার আল বদরদের হাতে।'

বাকশাল গঠনের মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আব্বু তাঁর চূড়ান্ত মতামত মুজিব কাকুকে জানিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত সচিব আবু সাঈদ চৌধুরীকে সাক্ষী রেখে তিনি মুজিব কাকুকে ফোন করে বলেছিলেন, 'আপনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে আমি অনেকবারই বলেছি আমার দ্বিমতের কথা। আর আজ আমার চূড়ান্ত মতামত দিচ্ছি। আমি আপনার এই একদলীয় শাসনের সঙ্গে একমত নই ... বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার হাতে এতই ক্ষমতা দেওয়া আছে যে সেই ক্ষমতাবলে দেশে একদলীয় ব্যবস্থা বা আর কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

আমরা বক্তৃতায় সব সময় বলেছি একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশের কথা, যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র। যে গণতন্ত্রের গুণগান করেছি আমরা সব সময়, আজকে আপনি একটি কলমের খোঁচায় সেই গণতন্ত্রকে শেষ করে দিয়ে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। ... বাই টেকিং দিস স্টেপ ইউ আর ক্লোজিং অল দ্য ডোরস টু রিমুভ ইউ পিসফুলি ফ্রম ইউর পোজিশন।'[৩৭]

২৬ অক্টোবর দুপুর ১২:২২ মিনিটে আব্বু পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে অফিস থেকে ফোন করে আম্মাকে জানালেন, 'লিলি, আমি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছি। ১২টা বেজে ২২ মিনিটে আমি পদত্যাগপত্রে সই করেছি।' ফোনের মধ্যেই আম্মা আব্বুকে অভিনন্দন জানালেন। আম্মার Intuitive sense (অন্তর্জ্ঞান) ছিল প্রখর। '৭২ সাল থেকেই তিনি আব্বুকে বলতেন যে আব্বু মন্ত্রিসভায় বেশিদিন টিকতে পারবেন না, তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হবে না।

দুপুর একটার কিছু পরে আব্বু সরকারি বাসায় ফিরে এলেন বন্ধু আরহাম সিদ্দিকীর গাড়ি করে। নিজের জন্য সরকারি গাড়ি ব্যবহার বন্ধ করলেন পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই। আব্বু ফিরে আসার পরপরই আমাদের বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সকলেরই প্রশ্ন তাঁর পদত্যাগ সম্পর্কে। আব্বু হাসিভরা মুখে পদত্যাগ সম্পর্কিত প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে গেলেন। মুজিব কাকুর বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করলেন না।

আম্মা আমাদের বললেন, 'তোমাদের আব্বু পদত্যাগ করে মহাসম্মানের কাজ করেছেন।'

পরদিন সব পত্রিকার শিরোনামে আব্বুর পদত্যাগের বিষয়টি প্রকাশিত হলো— 'তাজউদ্দীনের পদত্যাগ।' সরকার-প্রভাবিত কিছু কাগজে লেখা হলো 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাজউদ্দীন আহমদকে পদত্যাগ করানো হলো।' বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থটা কী ? এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই খুঁজে পেলাম না। পত্রিকার কোনো বিবরণে না। নিজের হৃদয়েও না।

ঐতিহাসিক চরমপত্রের রচয়িতা ও পাঠক এম. আর আখতার মুকুল আব্বুর পদত্যাগ সম্পর্কে লিখেছেন, 'মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দীন বিদায় নিলেন। মনে হলো বঙ্গবন্ধুর কোমর থেকে শাণিত তরবারি অদৃশ্য হয়ে গেল। ... ছায়ার মতো যে নির্লোভ ব্যক্তি অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করেছেন এবং নিঃস্বার্থভাবে পরামর্শ দিয়ে বহু বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন এক গোপন চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে শেখ সাহেব সেই মহৎপ্রাণ ব্যক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন।'[৩৮]

চক্রান্তকারীদের প্ররোচনায় মুজিব কাকু আব্বুকে এমনই অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে আব্বু মন্ত্রী থাকাকালীন সময় সরকারি সচিবকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন আব্বুর কাছে কে আসে, কী কথাবার্তা হয় এসব খবর ওনাকে জানাতে।[৩৯]

বহির্বিশ্বেও আব্বুর পদত্যাগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া হলো। মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জমিরউদ্দিন আহমেদকে ডেকে পাঠালেন সে দেশের জাতির জনক টুংকু আব্দুর রহমান। তিনি জানালেন যে, 'তাজউদ্দীনের এই সরিয়ে দেওয়াটাকে তাঁরা ভালো মনে করছেন না। মুক্তিযুদ্ধের প্রধানমন্ত্রী, বর্তমান অর্থমন্ত্রী যাঁকে সবাই চেনে, যিনি বাংলাদেশের জন্য সবদিকে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁকে কেন হঠাৎ সরিয়ে দেওয়া হলো ?' জমিরউদ্দিন আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে চিঠির মাধ্যমে এবং ঢাকায় এসে মুজিব কাকুকে সরাসরি মালয়েশিয়া সরকারের প্রতিক্রিয়া জানালেন। মুজিব কাকু উত্তর দিলেন, 'আমি কাকে মন্ত্রী রাখি না রাখি তাতে ওদের কী রে ?' রাষ্ট্রদূত জবাব দিলেন, 'এটা অন্য কেউ নয়, তাজউদ্দীন। আমাদের মতো গরিব দেশে তাজউদ্দীন যে কয়দিন অর্থমন্ত্রী ছিলেন, শুধু ভিক্ষা করেই বেড়িয়েছেন। কিন্তু ভিক্ষুকেরও যে ডিগনিটি, আত্মমর্যাদা থাকতে পারে তা তাজউদ্দীনের ছিল। তাই তিনি সবার মনে দাগ কেটেছেন। কাজেই তাঁরা তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানাবেই।'[৪০]

'৭১ এ বাংলাদেশে গণহত্যার অন্যতম মদদদাতা মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেটস (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) হেনরি কিসিঞ্জারের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে আগমনের প্রাক্কালে, মার্কিন আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচক আব্বুর পদত্যাগ লক্ষণীয় বিষয়।

পদত্যাগের ক'ঘণ্টা আগে থেকেই সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সংস্থার লোকরা সচিবালয় ঘিরে রেখেছিল। পদত্যাগ করার পরও আব্বুর যেন মুক্তি মিলল না। আব্বুর ওপর কড়া নজর রাখা হলো। আব্বুর গতিবিধির ওপর রিপোর্ট করার জন্য সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নিযুক্ত করা হলো। প্রথমে সরকারি বাসভবন, সেটা ছাড়ার পর আমাদের নিজস্ব বাসভবনের ওপর নজর রাখা শুরু হলো। আব্বু দুঃখ করে বলতেন যে পাকিস্তান আমলেও যেমন পেছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত, স্বাধীন বাংলাদেশেও ঠিক একই অবস্থা। বাস্তবে পাকিস্তান থেকে ভৌগলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসন পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক মন ও মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সে কারণেই ন্যায়নীতি ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক আব্বুর মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। ঐ বাস্তবতা সত্ত্বেও সেদিন বহু মানুষই কল্পনা করতে পারেননি যে আব্বু ও মুজিব কাকুর পথ স্বাধীন দেশের মাটিতেই চিরতরে আলাদা হয়ে যাবে।

ষাটের দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক স্বর্ণালি লগ্নে মুজিব-তাজউদ্দীন এই নবীন জুটির আবির্ভাব বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে। তারা আওয়ামী লীগে প্রগতিশীল নতুন ধারার সূচনা করেন। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নিতেন একত্রে। বাস্তবায়ন করতেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। তাঁদের কাজ দেখে মনে হতো তাঁরা এক অভিন্ন সত্তা। তাঁদের টিমওয়ার্কের সবল ভিত্তির ওপর ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন ও জনগণের আস্থা অর্জন সম্ভবপর হয়েছিল। তারা ছিলেন একে অন্যর পরিপূরক। মুজিব বাদে তাজউদ্দীনের ইতিহাস যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি তাজউদ্দীন বাদে মুজিবের। বাংলাদেশকে তার অভীষ্ট সুশাসন ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দাঁড় করানোর জন্য বড় প্রয়োজন ছিল তাঁদের। সে কারণেই স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি ছিল আব্বু ও মুজিব কাকুর বিচ্ছেদ। জাতির দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতেই ঘটে তাঁদের আদর্শিক ও নীতিগত বিচ্ছেদ। আব্বু ও মুজিব কাকু সারাজীবন যে নীতি ও আদর্শকে লালন করেছিলেন তারই সার্থক প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ এসেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে। আব্বু তার নীতি হতে দূরে সরে যাননি। কিন্তু মুজিব কাকু ষড়যন্ত্রকারীদের প্ররোচনায় সরে গিয়েছিলেন বহু দূরে। সে কারণেই ঐ বিচ্ছেদ ঘটে। আব্বুর পদত্যাগের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ এর স্বাধীনতাবিরোধী ও মুজিবনগর সরকারবিরোধী এই দুই দলের বিজয় সূচিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপসহীন আব্বু স্বাধীনতা বিরোধী যে দলটির ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেন তারাই মুজিব কাকুর প্রত্যাবর্তনের পর তার কাছে চলে আসে। যেহেতু মুজিব কাকু কখনই আব্বুর কাছে জানতে চাননি নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের কথা, কে ছিল শত্রু কে মিত্র এবং কার কী ভূমিকা সেহেতু তাজউদ্দীন বিরোধী ঐ দুই দলের পক্ষে সম্ভবপর হয় মুজিব কাকুকে বিপথে পরিচালিত করা। শেখ মনির দাবি অনুযায়ী মুজিব কাকু গোপনে ও দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে শেখ মনিকে যদি তাঁর প্রতিনিধি করে ভারতে পাঠিয়েও থাকেন ও তাঁর অনুগত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েও থাকেন, তিনি কি জানতেন না যে যারাই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তারাই তার অনুগত ? অপর দিকে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল জাতীয় ঐক্যের বাইরে কিছু ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য। মুজিব কাকু কি জানতেন না যে জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও সুদক্ষ নেতৃত্ব ব্যতীত পাকিস্তানকে ঠেকিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব ? শেখ মনি ও তার দলটির কি সেই যোগ্যতা ছিল ? এই প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। তাজউদ্দীনের

নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এই সত্যটিকে যেন তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। অথচ আব্বু নিজেকে আড়াল করে রেখে সব কৃতিত্বই দিয়েছেন তাঁর প্রিয় 'মুজিব ভাইকে' মুজিব কাকুর নামেই স্বাধীনতা যুদ্ধকে তিনি পরিচালনা করেছেন। মুজিব কাকুর ভাবমুর্তিকে স্বাধীনতার প্রেরণারূপে মুক্তি পাগল মানুষের কাছে আব্বু উপস্থাপন করেছেন কি নিঃস্বার্থভাবে! দুর্ভাগ্য যে মুজিব কাকু তা যেন বুঝেও বুঝতে চাননি। মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় উপস্থিত থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে অনুপস্থিত ছিলেন এই ব্যাপারটাও তাকে খুব সম্ভব মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এ সম্পর্কে এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেন– 'আমি মুজিবুর রহমানকে ছোট করার জন্য বলছি না, তাকে অশ্রদ্ধা করছি না। কিন্তু শেখ মুজিব যখন পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে ছিলেন তখন অস্থায়ী সরকার ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ফেলেছে; এবং যখন তিনি ফিরে আসেন তখন তিনি আবিষ্কার করেন যে স্বাধীনতার বড় অংশটি তাকে বাদ দিয়ে অর্জন করা হয়ে গেছে।'[৪১] ঐ সাক্ষাৎকারে লে. জে অরোরা মুক্ত কণ্ঠে আব্বুর 'সুনির্মল হৃদয়' ও 'দক্ষ প্রশাসক' গুণাবলির প্রশংসা করেন।[৪২] তিনি অকপটে বলেন মুজিব বাহিনীর, মুক্তিবাহিনীর সাথে অসহযোগিতা করার কথা এবং বাংলাদেশ সরকারের অগোচরে সৃষ্ট মুজিব বাহিনী সম্বন্ধে তিনি যখন জানতে পারেন 'এটা করা ঠিক হচ্ছে না' বলে চিফ অব স্টাফকে জানানোর বিষয়টি।[৪৩] মুক্ত বাংলাদেশে মুজিব বাহিনীর অস্তিত্ব যে শুভ হয়নি, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'যুদ্ধের পর আমরা মুজিব বাহিনী ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম যেন এ বাহিনীর সবাই আবার তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যেতে পারে। এর জন্য পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল কিন্তু যখন শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে এলো তখন তিনি মুজিব বাহিনী না ভেঙে একে গড়ে তুলতে চাইলেন। এর জন্য আমার কাছে যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি ভারতীয় সহায়তা চাইলেন। ব্যক্তিগতভাবে এতে আমি অসন্তুষ্টই হই। এর ফল হলো যে মুজিব বাহিনী দিয়ে তেমন কোনো কাজই হয়নি বরং মুজিব বাহিনীর কারণে বাংলাদেশ আর্মিই খোদ শেখ মুজিবের ওপর খেপেছিল।'[৪৪] মুজিব কাকুর সাথে প্রশাসনিক বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অরোরা বলেন, 'পরবর্তীতে আমি যখন তার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেলাম, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে তিনি প্রশাসনিক বিষয়ে যত না দক্ষ, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে, তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ছিলেন। তিনি কথা বলে লোকজনকে নাচাতে পারতেন। কিন্তু প্রশাসন চালানোর ব্যাপারে তিনি তেমন দক্ষ ছিলেন না।'[৪৫]

প্রশাসনিক বিষয়ে মুজিব কাকুর অদক্ষতা এবং নতুন দেশ গড়ার জন্য যে দূরদর্শিতা, মানসিকতা ও নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল তার ব্যাপক অভাবের ফলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিতর্কিত যে রক্ষী বাহিনী গড়ে ওঠে তা ছিল মুজিব বাহিনীরই নব সংস্করণ। এর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনা যা মুজিব কাকু বাতিল করে দেন তার সাথে ছিল আকাশ পাতাল তফাৎ। সংক্ষেপে দেশ পুনর্গঠন, নিরাপত্তা রক্ষা ও সবল অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উপযুক্ত ট্রেনিং ও শিক্ষা দেবার যে পরিকল্পনা আব্বু নিয়েছিলেন (পরিশিষ্টে জাতীয় মিলিশিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণায় বিস্তারিত উল্লেখিত। পৃ ৩৪১) তার বিপরীতে ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষাকারী মুজিব বাহিনীর নতুন রূপ রক্ষী বাহিনী জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরায়।

ওদিকে স্বাধীন দেশের মাটিতে, মুজিব বাহিনীর ছাত্র নেতাদের মধ্যেও শুরু হয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার রক্তক্ষয়ী লড়াই। সংঘর্ষের জের ধরে '৭২ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। '৭৪ এ নিজ নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি পক্ষের হাতে সাতজন ছাত্র প্রাণ হারায়।[৪৬]

এদিকে স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তান ও সি.আই.এ'র প্রতিনিধি মোশতাক ও তার অনুচরদের লক্ষ্য ছিল ত্রিমাত্রিক। এক, আব্বু ও মুজিব কাকুর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করা; দুই, মুজিব কাকুর ভুল প্লান পলিসিকে সমর্থন করা; তিন, মুজিব কাকুসহ স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা। আব্বুর সাথে মুজিব কাকুর ভাঙন ধরানোটি ছিল খুব সম্ভবত মোশতাকের প্রথম লক্ষ্য। কারণ মোশতাক জানতেন যে আব্বু ছিলেন মুজিব কাকুর বর্মস্বরূপ। তারা এক থাকলে বাকি দুই লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়। মুজিব কাকুকে আব্বুর থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার কাজে তিনি ব্যবহার করেছিলেন শেখ মনিসহ মুজিব কাকুর কিছু নিকট আত্মীয়স্বজনদের। এই আত্মীয়দের ধারণাও ছিল না যে মুজিব-তাজউদ্দীন জুটির ভাঙন শুধু মাত্র দুটি ব্যক্তির সম্পর্কের ভাঙন নয়; ঐ ভাঙনের ফলে একদিকে দেশের যেমন ব্যাপক ক্ষতি সাধন হবে তেমন তাঁরা নিজেরাও হয়তো বেঁচে থাকবেন না। আব্বুর স্পষ্টবাদিতা ও অপ্রিয় সত্যকে তুলে ধরার সৎ সাহসকে তাঁরা অন্তরায় গণ্য করেছিলেন। যদিও ঐ গুণাবলি ছিল দেশ রক্ষার বর্মস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে গোলোক মজুমদারের কথা। ১৯৭১ সালে বি.এস.এফ-এর পূর্বাঞ্চলীয় ইনস্পেক্টর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এই পরম শ্রদ্ধাভাজন মানুষটি তাঁর কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের বাইরেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন নিঃস্বার্থভাবে। সুশাসনভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও সবল কাঠামোর ওপর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ গড়ে উঠুক এই ছিল তাঁর একান্ত কামনা। কথা প্রসঙ্গে '৮৭-এর সেই সাক্ষাতে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন শেখ সাহেবের মহৎ ও বিশ্বস্ত বন্ধু, কিন্তু কঠোর সমালোচক। তিনি শেখ সাহেবকে সাথে নিয়েই বাংলাদেশের জন্য পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।'[৪৭]

(উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে, বস্তুনিষ্ঠভাবে, দল ও মতের পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে আরও গবেষণা ও আলোচনা হওয়া দরকার ছিল কিন্তু তা হয়নি। একটি জাতির জন্ম ও তার রাজনৈতিক ইতিহাস জানবার জন্য দরকার উন্মুক্ত মানসিকতা ও সত্যকে জানবার অঙ্গীকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'ইতিহাস দেশের গৌরব ঘোষণার জন্য নহে, সত্য প্রকাশের জন্য।' ইতিহাস যত সুস্পষ্ট হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সঠিক পথ বেছে নেওয়া ততই সহজ হবে।)

আব্বুর পদত্যাগের পর শুরু হলো আমাদের জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়। আব্বু বললেন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সরকারি বাসভবন ছেড়ে আমাদের নিজেদের বাসায় উঠতে হবে। ধানমণ্ডির বাসার ভাড়াটেদের নোটিশ দেওয়া হলো। পূর্ণোদ্যমে শুরু হলো বাঁধাছাঁদার কাজ। বাসা বদলাবার তোড়জোড়ের মধ্য দিয়েই আব্বুকে হঠাৎ করেই যেন কাছে পেলাম। তাঁর সঙ্গে যেন নতুন করে পরিচয় শুরু হলো। দেখা গেল যে গোছগাছ, বাঁধাছাঁদা ও মেরামতের কাজে আব্বুর জুড়ি নেই। আম্মার সঙ্গে সঙ্গে আব্বুও কাজ করে যাচ্ছেন সুচারুভাবে। ছোট্ট রিমি, যে ছোটবেলা থেকেই খুব দায়িত্বশীল ও সংসারী, সে-ও আব্বু ও আম্মাকে বাসা বদলানোতে খুবই সহায়তা করছিল। সরকারি বাড়ির সব আসবাবপত্র যা আমাদের দায়িত্বে ছিল, তার তালিকা আব্বু তৈরি করলেন। কর্তৃপক্ষকে তালিকা অনুযায়ী সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে আব্বু আম্মা ও আমাদের নিয়ে রওনা দিলেন হাতে-গড়া জীবনের প্রথম বাড়ি ধানমণ্ডির ৭৫১ সাতমসজিদ রোডের উদ্দেশে। ২৮ নভেম্বরের ঘন সন্ধ্যায় আমরা ফিরে এলাম নিজ গৃহে। আব্বু ও আম্মার কোলে চড়ে পুরান ঢাকার ১৭ কারকুন বাড়ি লেন থেকে রিমি ও আমি এই বাড়িতে প্রথম গৃহ প্রবেশ করি ১৯৬৩ সালের ৫ এপ্রিল।

মিমি ও সোহেল তখনো জন্মগ্রহণ করেনি। চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বাবা কফিলউদ্দিন চৌধুরী (১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্তমন্ত্রী ছিলেন) আব্বুকে খুব স্নেহ করতেন। তিনিই ধানমণ্ডির সরকারি প্লট কেনার জন্য আব্বুকে জোর দেন। সে সময় ধানমণ্ডি প্রায় বিরান ভূমি। সেই এলাকার প্রতি মানুষের তখনো আকর্ষণ গড়ে ওঠেনি। জমি-

জমারও চাহিদা নেই। পুরান ঢাকার র‍্যাঙ্কিং স্ট্রিট, ওয়ারি, সেগুনবাগিচা প্রভৃতি এলাকাই তখন অভিজাত ও আবাসিক এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আব্বু সে সময় তিন হাজার টাকায় ধানমণ্ডিতে দশ কাঠা জমি কেনেন। বিয়ের পর '৬১ সালে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নেন বাড়ি করার জন্য। প্রতি মাসে ৩৪৪ টাকা কিস্তিতে হাউস বিল্ডিংয়ের ধার শোধ করতেন। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বাড়ি তৈরি করলেন দোতলা। আম্মা তখন আপত্তি জানিয়েছিলেন দোতলা বাড়ির কী দরকার ? একতলাই যথেষ্ট। আব্বু কিছু বলতেন না। মিটিমিটি হাসতেন। তারপর দীর্ঘ সময়ের জন্য যখন কারাবাসে গেলেন, তখন ঐ দোতলার ভাড়া দিয়েই আম্মাকে চলতে হতো। সাতশো টাকা ভাড়ার প্রায় অর্ধেকই চলে যেত হাউজ বিল্ডিং-এর দেনা শোধ করতে। বাকি টাকা দিয়ে আম্মা কোনো মতে সংসার চালাতেন। রাজনৈতিক কর্মী ও দুস্থ আত্মীয়স্বজনকেও আম্মা সাহায্য করতেন। এই বাড়িটি ছিল আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

আব্বুর পরিবারের ভূমি ও কৃষি সম্পদের অভাব ছিল না। সারা জীবন চাকরি বা পরিশ্রম না করে জমির আয় দিয়েই আব্বু চলতে পারতেন। কিন্তু আদর্শগত কারণে তিনি স্বইচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন সাধারণ জীবন। সেন্ট গ্রেগরি স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করার পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে বৃত্তির টাকা বা নিজ উপার্জনের টাকা দিয়ে তিনি লেখাপড়া করবেন। নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যাপারে ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ।

ধানমণ্ডির বাড়িতে ওঠার পর আব্বু পূর্ণোদ্যমে লেগে গেলেন বাগান করা ও খুঁটিনাটি মেরামতের কাজে। আব্বুর একটি টিনের টুল-বক্স ছিল। সেটার ভেতর থেকে স্ক্রু ড্রাইভার, পেরেক, তারকাটা ইত্যাদি বের করে বিভিন্ন কাজ সারতেন। আব্বুর ডিজাইন করা (বাংলার ঐতিহ্যবাহী কলসের ডিজাইন) জানালার গ্রিলগুলো আম্মা ধুয়ে-মুছে নতুন করে রং করালেন। আম্মা বললেন, '৬৩ সালে প্রথম যেদিন এই বাড়িতে আনার আপা, ছোট কাকু দলিল ভাইসহ উঠলেন, তখনো বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। ঘরে ঢুকে দেখেন যে অতি প্রয়োজনীয় টয়লেট তখনো বানানো হয়নি। আব্বু সঙ্গে সঙ্গে টয়লেট বানানোর কাজে লেগে গেলেন। হাইয়ের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে (বারেক মিয়া) সারা রাত জেগে কোদাল নিয়ে গভীর গর্ত করে মাটির চাড়ি বসিয়ে কাঁচা টয়লেট বানালেন। আম্মা বললেন, 'এই হলো তোমাদের আব্বু। কোনো কাজকেই ও ছোট মনে করে না। সব কাজ নিজে করতে পারলেই তার আনন্দ।'

'৭৪-এর ডিসেম্বর মাসে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ঠাকুরমার ঝুলি অবলম্বনে 'বুদ্ধুভুতুম' নৃত্যনাট্য দুই দিনের জন্য মঞ্চস্থ হয়। সাবেক তথ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজের স্ত্রীর উদ্যোগে ৩৫ জন শিশু ও কিশোরদের একটি দল এই নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করে। নাটকে রিমি হয়েছিল রাজা। আমি দুষ্টু পাঁচ রানির এক রানি এবং শেষ দৃশ্যে বেশভূষা বদলে হয়েছিলাম রাজপুত্র বুধকুমার। শাপমুক্তি পেয়ে বাঁদর বুদ্ধু, কলাবতী রাজকন্যার স্বামী রাজপুত্র বুধকুমারে রূপান্তরিত হয়। নাটকের মধ্য দিয়েই আমাদের দলটি হয়ে যায় এক পরিবারের মতো।

নাটকটি প্রথমে মোস্তফা মনোয়ারের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ টিভিতে প্রদর্শিত হয়। তারপর এই মঞ্চ নৃত্যনাট্য। দু'দিনই ছিল হাউস ফুল। টিকিট বিক্রি থেকে অর্জিত সব অর্থ মিসেস আজিজ বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে মুজিব কাকুর হাতে তুলে দেন। আব্বু ও আম্মা ব্যস্ত থাকায় আমরা বাসাতেই ওনাদের কিছুটা নাচ ও অভিনয় করে দেখাই।

'৭৫-এর ২৪ জানুয়ারি একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল বাকশাল গঠনের জন্য সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী আনা হলো। মুজিব কাকু রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। বিগত ২৪ বছরের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছিল সেদিন তার যেন সমাধি ঘটল। আব্বুর আজীবনের চিন্তা-চেতনা, সংগ্রাম ও মূল্যবোধের অংশ ছিল যে

বহুদলীয় গণতান্ত্রিক, নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন, সবই তখন বিলুপ্তির পথে। বাকশালের ১৫ সদস্যর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হলেন মুজিব কাকু। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলীর পরেই চার নম্বরে খন্দকার মোশতাকের স্থান হলো। জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি ও আব্দুর রাজ্জাক হলেন সাধারণ সম্পাদক। ১১৫ সদস্যর কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর পরে পাঁচ নম্বরের স্থানটি নিলেন মোশতাক। এছাড়াও গঠিত হলো জাতীয় কৃষক, শ্রমিক, যুব, ছাত্র, মহিলা লীগ প্রভৃতির জন্য এবং জেলা ভিত্তিক কমিটি। আব্বু কোনো কমিটিতেই যোগ না দিয়ে সাধারণ সদস্য হিসেবে বাকশালে রইলেন। বাকশাল ত্যাগ করলে তার তিলতিল করে হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগ ত্যাগ করতে হয় সেই কারণে তিনি নামে মাত্র সদস্য পদে রইলেন। আব্বু তখনো আশার বিপরীতে আশা করছিলেন যে মুজিব কাকু একদিন তার ভুল বুঝতে পারবেন। মনে পড়ে বহু দলের বিপরীতে যখন ত্রিদলীয় ঐক্যজোট করা হলো, আব্বু কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহকে বলেছিলেন, 'মণিদা, আপনারা ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট করেননি, ত্রিশূল করেছেন। এক শূলে মুজিব ভাই মারা যাবেন, অপর শূলে আপনারা ও আমরা, এবং তৃতীয় শূলে দেশপ্রেমিক শক্তিকে মারা হবে।' আমরা হেয়ার রোডের বাসায় থাকার সময় আব্বু মণি সিংহের কাছে এই উক্তি করেছিলেন। মুজিব কাকুকেও বাকশাল গঠনের ভয়াবহ পরিণামের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু কোনো ফলই হলো না। আব্বু যেন উল্কা বেগে ছোটা ট্রেনের সম্মুখের সারিতে বসা এক যাত্রী। তিনি দেখছেন ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে গভীর খাদের দিকে ধাবমান। তাঁর আশপাশের অন্যান্য যাত্রীরা কেউ ঘুমন্ত, কেউ বা গালগল্পে মশগুল। ট্রেন চালকেরও কোনো হুঁশ নেই। ট্রেনটি এগিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে। ফেব্রুয়ারি মাসে আম্মা একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখলেন। আব্বু যেন মহাশূন্য থেকে দড়ি ধরে নিচে নেমে আসছেন। অগণিত জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে দণ্ডায়মান। আব্বু যেই মাটিতে পা রাখবেন এবং মানুষও হাততালি দিতে যাবে সেই মুহূর্তেই অদৃশ্য টানে কে যেন তাঁকে মহাশূন্যে তুলে নিল। তিনি হারিয়ে গেলেন মেঘের আড়ালে। মহাশূন্যের গভীরে। স্বপ্নটি দেখার পর আম্মার মনে গভীর আশঙ্কা জন্মাল যে আব্বু আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

আব্বু তখন ব্যস্ত, কিন্তু ভিন্নভাবে। তিনি বাগান করেন, আমাদের জন্য মোটা সুঁই-সুতা দিয়ে সেলাই করে রাফ খাতা বানান। শরৎচন্দ্রের রচনাবলি কিনে দেন, পাঁচ বছরের একমাত্র পুত্র সোহেলকে তাঁর প্রথম স্কুলে ভর্তি করেন। মিমি ও সোহেলের হাত ধরে ধানমণ্ডি লেকের পাড় ও আবাহনী মাঠে বেড়াতে যান। খাবার টেবিলে তাঁর ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক জীবন ও '৭১-এর স্মৃতিচারণা করেন। ধর্ম, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন।

'৪৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার একদিন আগে আব্বু শের-এ-বাংলা এ. কে ফজলুল হকের বক্তৃতা শুনতে সভায় গিয়েছিলেন। পরীক্ষার দিন আরেকজনের কাছ থেকে লেখার জন্য ভালো কলম ধার করে পরীক্ষা দেন। ফলাফল যেদিন বের হলো হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভুল রোল নম্বর দেখে রাজনীতির কাজে ব্যস্ত আব্বুকে খবর দিয়েছিলেন যে তিনি সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছেন। নিয়মিত বৃত্তি-পাওয়া আব্বু ভাবলেন যে এবারে আর স্কলারশিপের অর্থে কলেজে পড়া হবে না। এরপর আব্বুর রাজনৈতিক সহকর্মী শামসুল হক ও মুজিব কাকুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, তাঁরা মেধা তালিকায় ১২তম স্থান লাভের জন্য আব্বুকে অভিনন্দন জানান। তাঁদের মাধ্যমেই আব্বু প্রথম সঠিক ফল জানতে পারেন। আব্বু ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান লাভ করে। কিন্তু মাঝখানে লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। ব্রিটিশ শিক্ষাবর্জন আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে তিনি এক বছর লেখাপড়া করেননি। পরে দাদির চাপে ১৯৪৮ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন এবং অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

আব্বুর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণায় চলে আসত অসংখ্য মানুষের নাম। সকলের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্কের মূল যোগসূত্র ছিল দেশসেবা। স্মৃতিচারণায় যখন মুজিব কাকুর প্রসঙ্গ উঠত লক্ষ্য করতাম আব্বু কেমন ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর কথা বলছেন, তাঁর প্রতি আব্বুর অভিমান ছিল, কিন্তু ভালোবাসায় ছিল না এতটুকু খাদ।

মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী রাজনীতিক আব্বু যখন দেখলেন যে মুসলিম লীগ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠান না হয়ে পরিণত হয়েছে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী ক্ষমতাসীনদের প্রতিনিধি ও স্বৈরাচারী সরকারের তল্পিবাহকে, তখন তিনি হলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সংগঠক। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্বু ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পান। নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে যুক্তফ্রন্ট জোট গঠিত হয়। এই নির্বাচনে আব্বু পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রভাবশালী ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ ফকির আবদুল মান্নানকে ১৩,০৬৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রাদেশিক পরিষদের কনিষ্ঠতম সদস্য (এমএলএ) নির্বাচিত হন। আব্বু বলতেন যে, যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পক্ষে জয়। ১৯৫৮ সালে প্রাদেশিক পরিষদের তরুণ সদস্য আব্বু রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের বেশ কিছু দেশ সফর করেন। জনগণ নির্বাচিত সেই রাষ্ট্রগুলোর গণমুখী সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাকে অনুপ্রাণিত করে।

ধর্মের প্রসঙ্গ উঠলে আব্বু বলতেন নিঃস্বার্থভাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জীবসেবার নামই ধর্ম। সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই স্রষ্টাকে পাওয়া সম্ভব। আব্বু বরাবরই ধর্মান্ধতা ও ধর্ম বিরোধিতার মাঝামাঝি স্থানকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং রাষ্ট্রে সব ধর্মের সমান অধিকার থাকবে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। পাকিস্তান আমলের মতো রাষ্ট্রের হাতে যাতে ধর্মের অপব্যবহার না হতে পারে সে জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতা স্বাধীন বাংলাদেশে গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল অব রাইটসের ভিত্তিতে গড়া সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে উল্লিখিত ধর্মীয় অধিকারের সাথে আব্বুর চিন্তাধারার মিল লক্ষ করা যায়। আব্বু বলতেন যে আমাদের দেশে ধর্মকে আমরা আচার ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। আমাদের ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে বিরাট গলদ। সে কারণেই ধর্মের মূল বার্তা নির্যাতিত ও অসহায়ের পক্ষে সংগ্রামের সময় অধিকাংশ ধর্মজ্ঞ ও ধর্মীয় নেতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আব্বুর তরুণ বয়সের ডায়েরিগুলো পড়লে দেখা যায় যে তিনি মিশেছেন সব ধর্মমত ও শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে। জড়িত থেকেছেন বিভিন্ন মানবকল্যাণমূলক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করেছেন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে যুক্ত করেছেন জনকল্যাণে। কলেজছাত্র তাজউদ্দীন জোহরের নামাজ পড়ছেন এবং বেরিয়ে যাচ্ছেন নগর ছাত্রদের জন্য সাংগঠনিক কমিটি গঠনের কাজে। তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি, ৬ আগস্ট, ১৯৪৬ (বি. দ্র. ১৯৪৭-১৯৫০ সনের ডায়েরির উদ্ধৃতিগুলো প্রতিভাস থেকে প্রকাশিত তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি থেকে নেওয়া।) কুরআন শরিফ কিনছেন (২৯ জানুয়ারি ১৯৪৮), জমিয়াতুল উলেমা প্রসঙ্গে মাওলানা সাহেবের জন্য বিবৃতি তৈরি করছেন (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০), জুম্মার নামাজ পড়েছেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০), মাদ্রাসার সভায় যোগ দিচ্ছেন (৫ এপ্রিল ১৯৫০), মাদ্রাসার সভায় সভাপতিত্ব করছেন (১২ মে ১৯৫০)। আবার পাশাপাশি তিনি রেলস্টেশনে পড়ে থাকা অচেনা এক মৃতসম যাত্রী বৃদ্ধার জন্য উদাসীন রেল কর্তৃপক্ষের কাছে ও হাসপাতালে করছেন ছোটাছুটি (২৫ আগস্ট ১৯৪৭)। তিনি লড়ছেন অন্যায়ের শিকার এতিমখানার ছাত্রদের অধিকার নিয়ে (২৮ নভেম্বর

১৯৪৭)। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে ও নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের পক্ষে সোচ্চার হচ্ছেন (১০, ১১, ১২, ১৮ ফেব্রুয়ারি) বন বিভাগের কর্মচারীদের ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে হাজত খাটছেন (৭ জুলাই ১৯৫০)।

আব্বু বলতেন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা ধর্মের লেবেল পরে অপকর্ম করে তারা ধর্মেরই অবমাননা করে। তাদের অপকর্মের ফলে সহিংসতা, দাঙ্গা প্রভৃতি ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো, দুর্নাম হয় ধর্মের। আব্বু ধর্মের লেবেল-ভিত্তিক রাজনীতি সমর্থন করতেন না। তিনি সকল ধর্মের নির্যাস ও বিশ্বজনীন মূল্যবোধ, ন্যায়, সমতা ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ গড়ার জন্যই আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। সেই কত যুগ আগে থেকেই আব্বু এমন ধরনের চিন্তা - ভাবনা করতেন যার যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা দিনে দিনেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ধর্মের লেবেলধারী অধিকাংশ রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতি, স্বৈরাচার, নারী নিষ্পেষণ, অসহিষ্ণুতা, অজ্ঞতা ও হিংসার প্রতীক। যেসব ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রের গায়ে ইসলামি লেবেল পরানোর চেষ্টা করে বা ইসলামি রাষ্ট্র গড়ার কথা বলে·তারা ভুলে যায় রাষ্ট্রের ধারণাটি ইসলাম থেকে আসেনি, এসেছিল হাজার বছর পরে ইয়োরোপ থেকে এবং তা ছিল জাতিসত্ত্বা ও ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক। নবী করিম (স.) ইসলামি রাষ্ট্র গড়েননি, তিনি গড়েছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে প্রগতিশীল উম্মাহ্ বা এমন এক জাতি যার কোনো ভৌগলিক সীমারেখা ছিল না বা বিশেষ কোনো বংশ বা বর্ণ ভিত্তিক জাতি সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। এই উম্মাহ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী-গোত্রে গঠিত এবং উচ্চ আদর্শ ও মূল্যবোধের সংমিশ্রণে সৃষ্ট ছিল। ইসলাম ধর্ম ইয়োরোপে রেঁনেসার পথিকৃত হতে পেরেছিল ঐসব উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর, এবং হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল ল' জার্নালের প্রতিষ্ঠাতা ড. রবার্ট ডিকসন ক্রেইনের মতে নবী করিম (স.) বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রকে একত্র করে যে উন্নত মডেল গঠন করেছিলেন পরবর্তী সময়ে তা আদি আমেরিকান চেরোকি গোত্র সৃষ্ট কনফেডারেশন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনফেডারেশন প্রণয়নে প্রভাবিত করে।[৪৮]

আব্বু ছিলেন একজন যথার্থ রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর চিন্তাধারা ছিল স্বাধীন, উদার ও সুদূরপ্রসারী। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদ যা বাংলাদেশের জন্য কল্যাণকর হবে মনে করতেন তা থেকে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। সাম্য ও সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক সুষম বণ্টনের বিষয়টি ছিল তাঁর চেতনার একটি অংশ। তাঁর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকের সদস্যভুক্ত হয় বাংলাদেশ। তিনি মনে করতেন যে এই ব্যাংকের একমাত্র লক্ষ্য ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মুনাফা হবে না, বরং পুঁজি বিনিয়োগ হবে সাধারণ মানুষের কল্যাণে।[৪৯] তিনি সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বলতেন, 'আমরা বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব যা সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা চীনের ধরনের হবে না, বরঞ্চ তা হবে আমাদের নিজেদের মতো। আমরা গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে সুষম সমন্বয় ঘটাব যা বিশ্বে একটি অসাধারণ ব্যাপার হবে'।[৫০]

আব্বুকে কাজ করার সুযোগ দিলে এবং তিনি বেঁচে থাকলে আমার বিশ্বাস, তিনি যেমন মাত্র নয় মাসে দেশকে মুক্ত করেছিলেন তাঁর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও আন্তরিকতা দিয়ে তেমনি আত্মিক ও জাগতিক দিকগুলোর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলাদেশকেও গড়ে তুলতে পারতেন সারা বিশ্বের জন্যই এক অনুকরণীয় মডেল হিসেবে।

আব্বু বলতেন যে শুধু রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্মৃতিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে হবে তৃণমূলে। শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকদের এ ক্ষেত্রে বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে, ১৯৭১-এ যেমন তাঁরা করেছিলেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে আব্বু চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য ছিলেন। সে

সময় ছবি দেখে ভাবতেন যে খরা, বন্যা, অভাব-তাড়িত এই দেশে গণমানুষের সংগ্রামের কাহিনি যেন চলচ্চিত্রের মধ্যে ফুটে ওঠে। সুস্থ রুচিশীল ছবির চাহিদা যেন গড়ে ওঠে সেই জন্য পরিবেশ ও মানসিকতা তৈরি করার কথা তিনি ভাবতেন। তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন ১৯৭১ সালেই। সেই অপূর্ণ ইচ্ছার কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করতেন—সেই জাদুঘরে প্রদর্শিত হবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, বিগত ২৪ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস, তথ্য ও নিদর্শন। জাদুঘরের সঙ্গেই থাকবে গবেষণাগার যেখানে বসে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ওপর গবেষণা করবে। আব্বু বলতেন বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস সংরক্ষণের মধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা সম্ভব। সাধারণত খাবার টেবিলেই চলত এসব আলোচনা। আব্বু খাবার খেতেন খুব পরিপাটি করে। এতটুকু খাবার নষ্ট করতেন না। আমাদের বলতেন, 'যতটুকু খাবার খেতে পারবে ততটুকুই প্লেটে নাও। কিন্তু বেশি নিয়ে নষ্ট করবে না।' একদিন ছোট্ট সোহেল মাছ দেখে মুখ ব্যাজার করে বলে, 'মাছ খাব না।' আম্মা বললেন, 'তাহলে ডিম ভেজে দিই।' আব্বু সেই মুহূর্তে সোহেলকে খাবার টেবিল থেকে উঠিয়ে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। খুব আস্তে করে ছেলেকে বললেন, 'এই দেশ স্বাধীন করার জন্য লাখ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, দেশের বহুলোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে, আর তুমি মাছ খেতে চাও না ?' শিশু সোহেলের ঐ কথাগুলো বোঝার বয়স হয়নি। তারপরও ঐ মাছ না-খেতে চাওয়ার মতো ছোট্ট ঘটনার মধ্যে দিয়েই দেশপ্রেমের শিক্ষা দিতে আব্বু দ্বিধা করলেন না। অন্যকে যা করতে বলতেন তিনি নিজেও তা পালন করতেন অক্ষরে অক্ষরে। নিজেকে নিয়ে গর্ব করা বা অহমিকার মতো ব্যাপারটা তাঁর মধ্যে ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। নিজের কাজ নিজে করতে ভালোবাসতেন। থাকতেন সাধাসিধাভাবে, কিন্তু পরিষ্কার-পরিপাটি। পড়ালেখা করতেন প্রচুর। সুরাপান ও ধূমপান বর্জন করেছেন আজীবন। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন বিদেশ সফরে উঠতেন সস্তা হোটেলে এবং গরিব দেশের পয়সা বাঁচুক এ জন্য সস্ত্রীক তিনি কখনোই বিদেশে যাননি। সত্য ও ন্যায় ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অবিশ্রান্ত যোদ্ধা। তিনি যেন এক ক্ষণজন্মা সাধকেরই গুণাবলিতে ভূষিত ছিলেন।

আমাদের বিয়ে প্রসঙ্গ উঠলে আব্বু বলতেন, 'বিয়ে হবে সাধারণভাবে। ডাল, ভাত, করল্লা ভাজি দিয়ে বিয়েতে মেহমান আপ্যায়ন করা হবে। মেয়েদের বিয়েতে গয়নাগাটি দেব না। আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আমাদের মেয়ে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আর কোনো কথা থাকে না। যাঁদের ঘরে ওরা যাবে তাঁরাই হবে ভাগ্যবান।' আব্বু ও আম্মার বিয়ের সময় আম্মা আব্বুকে বলেছিলেন যে তিনি সোনার অলংকার চান না, আব্বু যেন বিয়ের দিন বেলি ফুলের মালা নিয়ে আসেন। আম্মার ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁদের বিয়ে হয়েছিল বেলি ফুলের মালা বদল করে। তাঁরা একত্রে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মেকি ও অর্থহীন সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ উদাহরণ সৃষ্টি করে। আমার জন্মের দিন আব্বু প্রথা ভেঙে আতুরঘরে আম্মা ও আমার সঙ্গে সারারাত জেগে আমাদের পরিচর্যা করেছিলেন। আমার জন্ম উপলক্ষে সাইকেলে বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন একটা সাদা বেতের দোলনা। দোলনায় দোল দিয়ে আমাকে শোনাতেন কত রকমের ছড়া। দীর্ঘ কারাবাসের আগে আমাদের বুকে নিয়ে বলতেন হরেক রকমের গল্প। ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে পড়ে-যাওয়া পাখির নীড় বাঁধতেন মাধবীলতার ঝাড়ে। বাগান আলোকিত করতেন মৌসুমি ফুলের সম্ভারে। ১৯৭৫-এর ঐ দিনগুলোতে মনে হতো ছেলেবেলার সেই হারানো দিনগুলোই বুঝি আবার ফিরে এল। যেন যুদ্ধে পরিশ্রান্ত আব্বু বহুকাল পর ঘরে ফিরে এলেন।

১৯৭৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, ভাষা আন্দোলন দিবসে শহীদ মিনারে কে বা কারা ছড়িয়ে দিল অসংখ্য হ্যান্ডবিল। হ্যান্ডবিলের শিরোনাম ছিল, 'ফ্যাসিস্ট খুনি মুজিব ধ্বংস হোক।' হ্যান্ডবিলের কথাগুলো এমনভাবে লেখা ছিল যে পড়লে গা কেঁপে ওঠে। মুজিব প্রশাসনের

দুর্নীতি, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে হ্যান্ডবিলের লেখাগুলো যেন কী এক অশুভ সময়ের দিকে ইঙ্গিত করছিল। চারদিকে গুঞ্জন ভয়াবহ কিছু একটা ঘটতে চলল বলে।

১৭ এপ্রিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে খন্দকার মোশতাকসহ মুজিবনগর মন্ত্রিসভার সদস্যরা মেহেরপুরে গেলেন। আব্বুকে আমন্ত্রণ বা খবর জানাবার প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না। পদত্যাগের পর থেকে দলের উচ্চপদস্থ নেতা ও সহকর্মীদের প্রায় সকলেই তাঁকে এড়িয়ে চলেন।

১৭ এপ্রিলের মতো বিশেষ দিনটিতেও আব্বু যেন নির্বাসিত। ঐদিন আব্বু কেমন যেন আনমনা হয়ে রইলেন। কারো সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বললেন না। কী যেন ভাবতে ভাবতেই অতর্কিতে আমাদের '৬৫ মডেলের সবুজ ফক্সওয়াগন গাড়িটি উঠিয়ে দিলেন রাস্তার আইলের ওপর। আব্বু একাই গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং ভাগ্য ভালো বড় কোনো দুর্ঘটনা থেকে সেদিন বেঁচে গেলেন।

দেশ স্বাধীন করার কী নির্মম প্রতিদান পেলেন আব্বু ! ১৯৭১ এর সেই রক্তঝরা দিনগুলোতে, নাওয়া-খাওয়া প্রায় বিসর্জন দিয়ে, এক বস্ত্রে তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পারিবারিক জীবনযাপন করবেন না এই শপথ গ্রহণকারী মন্ত্রী সভার সদস্যদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সেই শপথ রক্ষা করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে। ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের অফিস কক্ষ হয়েছিল তাঁর কর্মস্থল ও বাসস্থান। স্বাধীনতা অর্জন ছিল তার ধ্যান ও লক্ষ্য। তথ্য ও প্রামাণ্যবহুল '২৬৬ দিনে স্বাধীনতা গ্রন্থের' রচয়িতা মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ নুরুল কাদিরের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'আল্লাহ-তায়ালা আমাদের স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হতে সাহায্য করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের একচ্ছত্র নেতা বানিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদের জায়গায় অন্য কেউ—এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থাকলেও—অত সুষ্ঠুভাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়তো-বা পারতেন না। কারণ স্বাধীনতাযুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে যে-সকল কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই-সকল পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে সবকিছু ঠান্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য নেতৃত্বের যে দৃঢ়তা ও কঠোরতার প্রয়োজন ছিল তা একমাত্র প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেখাতে পেরেছিলেন।'[৫১]

বিশ্বে মেধাবী মানুষের অভাব নেই, বাগ্মী ও বাকপটু মানুষেরও কমতি নেই। অভাব পূর্ণাঙ্গভাবেই সৎ (Integrity) মানুষের, যাঁর চিন্তা, চেতনা ও কর্মধারা সত্যের জ্যোতিতে আলোকিত। লোকচক্ষুর অন্তরালে যিনি নিজেকে যাচাই করেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে এবং উত্তাল সাগরে দিক হারা নাবিকের জন্য পরিণত হন অনির্বাণ লাইট হাউসে। নিভৃতে ও জনারণ্যে তিনি ধারণ করেন একই রূপ, মুখোশহীন খাঁটি রূপ, জাগরিত বিবেকের দ্যুতিময় স্পর্শে তা সদা ঝলমল। পৃথিবীর বিচিত্র বাজারে যাঁরা নিজ বিবেক ও উচ্চ আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে সওদা করেন স্থূল প্রবৃত্তি, ক্ষমতা, বিষয়-বৈভবের, তাঁদের দৃষ্টিতে ঐ দ্যুতিময় মানুষগুলো পথের কাঁটাস্বরূপ। সাধারণের চোখে তাঁরা যেন মহা বিস্ময়। আব্বু তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন উচ্চ আদর্শে দীক্ষিত, মেধা, যুক্তি ও বিবেচনাবোধে শাণিত এমনই এক বিরল ধারার পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও আলোর পথের অভিযাত্রী। অতি ক্ষমতাধর মানুষও দুর্বল ও নিষ্প্রভ হয়ে যেত তাঁর উন্নত নীতিবোধ ও যুক্তির সংস্পর্শে এসে। তাজউদ্দীন সম্পর্কে পাকিস্তান পিপলস পার্টি-প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর উক্তিটি খেয়াল করুন। সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরীর বরাত দিয়ে ঘটনাটি তুলে ধরা হলো—'তাজউদ্দীনকে পাকিস্তানিরা বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তাঁর সহকর্মীরা কি

ভয় করতেন তার একটা ঘটনা বলি। ১৯৭১ সালে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের সেই রুদ্ধশ্বাস দিনগুলোর কথা। ভুট্টো এসেছেন ঢাকায়। আছেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে কড়া মিলিটারি পাহারায়। আমরা ক'জন বাঙালি সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছি। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বেশি কিছু বলতে চাইলেন না। দুজন সহকর্মীর সঙ্গে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে আলাপ করছিলেন। একসময় আমাদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে উর্দুতে বলে উঠলেন—আলোচনা বৈঠকে মুজিবকে আমি ভয় পাই না। ইমোশনাল অ্যাপ্রোচে মুজিবকে কাবু করা যায় কিন্তু তাঁর পেছনে ফাইল বগলে চুপচাপ যে নটোরিয়াস লোকটি বসে থাকে তাঁকে কাবু করা শক্ত। *দিস তাজউদ্দীন, আই টেল ইউ, উইল বি ইউর মেন প্রবলেম'* (আমি তোমাদের বলছি এই তাজউদ্দীনই হবে তোমাদের জন্য বড় সমস্যা)।[৫২]

ভুট্টোর উক্তি ও আশঙ্কাই ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তানের জন্য তাজউদ্দীন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক বিশাল সমস্যা। তিনি আপস করেননি, দৃঢ় হাতে মুক্তিযুদ্ধের হাল ধরে মুক্তিকামী জনগণের জন্য পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা।

ভুট্টোর ঐ উক্তির একত্রিশ বছর পর তাঁর কন্যা, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (স্যানঅ্যান্টোনিও, টেক্সাসে) আসেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত Distinguished Lecture Series-এ প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখার জন্য। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে (১ অক্টোবর, ২০০২) আমাদের পারিবারিক বন্ধু ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপক ও প্রকৌশল বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. মাহবুবউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বেনজির যখন জানতে পারেন যে তিনি বাংলাদেশের এবং আব্বুর সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সূত্রে পরিচয় রয়েছে তখন তিনি মন্তব্য করেন, 'I heard a lot about Tajuddin Ahmad from my father. He was the reason Bangladesh was formed' (আমি তাজউদ্দীন আহমদ সম্বন্ধে আমার বাবার কাছে অনেক শুনেছি। তাঁর কারণেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।) ২৬ মার্চ, ২০০৯-এ ড. মাহবুবউদ্দিন আমার কাছে বেনজির ভুট্টোর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা ও তাঁর মন্তব্যটি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে আব্বুর ভূমিকা সম্বন্ধে পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের কোনো সংশয় ছিল না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে নিজ দেশে যাঁরা এই ঐতিহাসিক সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা হয়তো বিস্মৃত হয়েছিলেন যে সত্যকে কেউ আড়াল করতে পারে না। সত্যর আলো বড় তীব্র। নির্মম। সুন্দর।

আশা-হতাশা, দুঃখ-বেদনার ঢেউ এপ্রিল পেরিয়ে পদার্পণ করল মে মাসে। মুক্তিযোদ্ধা আবুল মনসুর খানের সঙ্গে সাঈদা রওশন আরার বিয়ে হলো ১১ মে। বরযাত্রী হিসেবে মনসুর ভাইয়ের সঙ্গে আব্বু তাঁর শান্তিবাগের বাড়ি থেকে খিলগাঁয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। বউভাতে যেতে পারেননি বলে মনসুর ভাই পরের মাসে তাঁর বাড়িতে আব্বুসহ আমাদের সবাইকে দাওয়াত করেন।

নবপরিণীতা সাঈদা ভাবির শিক্ষক আবুল কালাম আজাদও (সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও প্রাথমিক শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি) আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। নতুন ভাবি অনেক উপাদেয় পদ রান্না করে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। মনসুর ভাই ও ভাবির আতিথেয়তা ও ছিমছাম নতুন সংসার দেখে সবাই খুব খুশি। এই দাওয়াতটিই ছিল আমাদের সাথে করে কোনো পারিবারিক দাওয়াতে আব্বুর শেষ যোগদান।

খাবার শেষে আম খেতে খেতে আমরা বড়দের আলাপ শুনছি। আব্বু কথা প্রসঙ্গে মনসুর ভাইকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার আত্মীয় হিসেবে, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এদের অবদান ও প্রাপ্য থাকা সত্ত্বেও এদের রেকমেন্ড করিনি, যাতে মানুষ বলতে না পারে আমি স্বজনপ্রীতি করেছি। তারপরেও আমি রেহাই পাইনি।'

আব্বুর স্মিত হাসিভরা মুখে কেমন এক চাপা বেদনা খেলে গেল। মনে পড়ে আমার ছোট ফুফা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম খান (সোনামিয়া) যিনি সৎ, দানশীল ও নিবেদিত সমাজসেবক হিসেবে তাঁর এলাকায় পরিচিত ছিলেন, তিনি যখন ১৯৭৩-এর নির্বাচনের সময় তাঁর এলাকা ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চান, আব্বু তখন তাঁর নীতি, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনকে সুবিধা বা অনুগ্রহ না দেওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করেন। আব্বু ফুফাকে বলেন 'আপনি একজন সৎ ও ভালো মানুষ। কিন্তু যখনই আপনি আমার মাধ্যমে নমিনেশন পাবেন, অন্য নিকট লোকেরা অসঙ্গত সুবিধা নেবে। এই লোকেরা ন্যায় বিচারে বাধার সৃষ্টি করবে। অন্যায় হলেও, এদের পেছনে আমি রয়েছি, এই ভেবে সাধারণ মানুষ ভয়ে চুপ করে থাকবে।'

ন্যায়নীতি, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এই শব্দগুলোর সঠিক অর্থ যেন আব্বুর সমগ্র জীবনেই বিদ্যমান। আব্বুর মামা আওয়ামী লীগ নেতা ও সমাজসেবক হেকিম মোল্লাকে আব্বু খুব শ্রদ্ধা করতেন। হেকিম নানাও আব্বুকে স্নেহ করতেন। গৌরবর্ণের বলিষ্ঠ গড়নের এই প্রাণচঞ্চল মানুষটিকে যখন সন্ত্রাসীরা হত্যা করে আব্বু তখন অর্থমন্ত্রী। ঐ হত্যাকাণ্ডে আব্বু গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। ১৯৭৩-এর নির্বাচনের সময় আব্বু যখন কাপাসিয়ায় গেলেন তখন পুলিশ সুপার আব্বুকে বলেছিলেন, হত্যার ব্যাপারে কাউকে যদি আব্বু সন্দেহ করে থাকেন তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অথবা এ বিষয়ে আব্বুর কোনো নির্দেশ থাকলে তা তিনি পালন করবেন। আব্বু পুলিশ সুপারকে একটি নির্দেশই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'আইনকে তার নিজ গতিতে চলতে দিন। আইনকে কারো হাতের মুঠোয় বন্দী রাখবেন না।'

এই হলো আব্বু। এক স্মরণীয়, বরণীয় ও অনুকরণীয় চরিত্র ও আদর্শের অধিকারী। মানুষের চরিত্রের আসল পরিচয় ফুটে ওঠে মূলত দুটি সময়ে। এক দুঃসময়ে এবং দুই ক্ষমতা প্রাপ্তির পর। জাতির চরম দুঃসময়ে একজন খাঁটি সেবকের মতোই আব্বু মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ক্ষমতার শিখরে পৌঁছেও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি জনগণের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতার কথা; সততা, সংযম ও সুনীতির আদর্শকে। তারপরও তো তিনি রেহাই পাননি। অজ্ঞানতার পরিমণ্ডলে তাঁর সততা ও ন্যায়-নীতি বোধই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক বিরাট অপরাধস্বরূপ।

মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পর লিভার সিরোসিস রোগাক্রান্ত মফিজ কাকুর শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে যাওয়ায় আব্বু ঠিক করলেন চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাশিয়ায় নিয়ে যাবেন। ভিসার জন্য আব্বু তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। রাষ্ট্রদূত জানালেন যে, বাংলাদেশের বাইরে যাওয়ার জন্য ভিসা পেতে হলে আব্বুকে প্রথমেই রাষ্ট্রপতির অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সেরকম নির্দেশই তাদের দেওয়া হয়েছে। এ কথা শুনে আব্বু বললেন, তাহলে তিনি দেশের বাইরে যাবেন না। যে দেশ তিনি স্বাধীন করলেন সেই দেশের বাইরে যেতে হলে তাঁকে অনুমতি নিতে হবে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে ! (১৯৭৭ সালের ২৮ জুলাই লিভার সিরোসিস ব্যাধিতে মফিজ কাকু ইন্তেকাল করেন)।

আমাদের বাড়ির সামনে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের তখনো কড়া নজর। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা আব্বুর প্রাণনাশের উদ্যোগ নিয়েছিল তাদের হুমকির কারণে আমাদের দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় লোহার গ্রিলের দরজা বসেছে। দেশ স্বাধীন করার কী অভিনব প্রতিদান ! আব্বু বলতেন, যুগান্তকারী বৈপ্লবিক কাজ করার সুযোগ মানুষের জীবনে খুব কমই আসে। সেই কাজ সারা জীবনে মানুষ একবারই করতে পারে। তাঁর কাঁধে এসে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধের

নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব তিনি সফলভাবে পালন করেছেন। বিজয়ের পর বেঁচে থাকাটাই তাঁর জন্য বাড়তি পাওনা।

বিজয়ের পরবর্তী দু'বছর দশ মাস দশ দিন সময় পর্যন্ত মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাতে এটাই প্রমাণিত হয় মুক্তিযুদ্ধের সফল কাণ্ডারী হিসেবেই আব্বুর ভূমিকা অনন্য ছিল না বরং দেশ গড়ার কাজেও বাংলাদেশে বড় প্রয়োজন ছিল তাঁকে। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন ভাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাজনীতির সঙ্গে সুশাসনের সংযোজন ঘটানোর ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। ক্ষমতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব সে ব্যাপারে বেশিরভাগ রাজনীতিবিদই সচেতন নন। তাঁরা মনে করেন ক্ষমতায় যাওয়াই রাজনীতির সফলতা। কিন্তু রাজনীতির সফলতা নির্ভর করে ক্ষমতায় যাওয়ার পর দেশে সুশাসন নিশ্চিত করা। সুশাসন নিশ্চিত করার মূল তিনটি উপাদান রয়েছে : (১) রাজনৈতিক, (২) সামাজিক, (৩) অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। রাজনীতিবিদ যখন জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার বদলে নিজেকে সার্বভৌম মনে করেন তখনই ঘটে স্খলন। আমরা সংবিধানের প্রস্তাবনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ তিনটি বিষয়ের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলাম। এই উপাদানগুলোকে প্রতিষ্ঠার জন্য একজন রাজনীতিবিদের সবচেয়ে প্রয়োজন নিজেকে আইনের কাজে অনুগত করা। তাজউদ্দীন ভাইই ঐ তিনটি বিষয়কে—যা ছিল আমাদের স্বাধীনতার অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠিত করার বলিষ্ঠ উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন।'[৫৩] আত্মপ্রচার বিমুখ আব্বু তার সারাজীবনের চিন্তায় ও কাজে যে মহৎ উদাহরণগুলো সৃষ্টি করেছিলেন, তা নতুন, সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার জন্য সমুজ্জ্বল দিক নির্দেশক হতে পারে এখনো।

তারপর দেখতে দেখতে জুলাই মাসও প্রায় এসে গেল। আমাদের দিন চলছে নিত্য দিনের মতোই। এই সময় আম্মা লক্ষ করলেন দুপুরের খাবারের পর আব্বু কাউকে কিছু না বলে নিভৃতে কোথাও যেন উধাও হয়ে যাচ্ছেন। বেশ কয়েক দিন ধরেই এই অবস্থা চলছে। আম্মা একদিন ঠিক করলেন তিনি আব্বুকে অনুসরণ করবেন। দুপুরের খাবারের পর আব্বু আস্তে করে দোতলা থেকে নিচতলায় নেমে এলেন। পেছনেই আম্মা। আব্বু নিচতলার লনের ওপর দিয়ে হেঁটে বাড়ির পেছনের গ্যারেজে ঢুকলেন। গ্যারেজে জাল দিয়ে ঘেরা কাঠের খাঁচায় রাখা ধবধবে সাদা খরগোশ দুটি আব্বুকে দেখে যেন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। সোহেল খরগোশ পছন্দ করে বলে মুজিব কাকু ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে ওর জন্য খরগোশ দুটি উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সেই খরগোশ সেখানে রাখা ছিল। আব্বু মাটিতে উবু হয়ে বসে খাঁচার দরজা খুলে সেই খরগোশ দুটিকে পরম যত্নে কচি ঘাস খাওয়াতে থাকলেন। হঠাৎ আম্মার উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি পেছনে ফিরে তাকালেন। আম্মা হতাশা ভরা নম্র কণ্ঠে বললেন, 'তোমাকে দিয়ে দেশের কাজ আর হবে না।' আব্বু গভীর দৃষ্টিতে আম্মার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন। সেই হাসিতে মিশে ছিল এক অপরূপ নির্মলতা ও গোপন গভীর বেদনা।

জুলাই মাসে কামাল ভাইয়ের (শেখ কামাল) বিয়ে ঠিক হলো ক্রীড়া নক্ষত্র সুলতানা (খুকী) আপার সঙ্গে। তিনি একবার আমাদের ধানমণ্ডি স্কুলে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। বিয়ে উপলক্ষে মুজিব কাকুর ৩২ নং রোডের বাড়িতে খুব শোরগোল। আম্মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সন্ধ্যা রাতে মুজিব কাকুর বাসায় গেলেন। সবাই তখন আসন্ন বিয়ের আয়োজন নিয়ে আলোচনা করছেন। মুজিব-কাকি ঘরের সামনের বারান্দায় বসে পান খেতে খেতে গল্প করছেন। আমি মুজিব কাকুর ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতেই ভেতর থেকে মুজিব কাকু আমাকে ডাকলেন, 'এই রিপি নাকি ? ভেতরে আয়।' ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় মুজিব কাকু বালিশে মাথা রেখে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার কাছে চেয়ারে শেখ ফজলুল হক মনি বসা। তিনি মুখ নিচু করে নিম্নস্বরে মুজিব কাকুকে কিছু বলছিলেন। মুজিব কাকুর ডাকে

আমি ঘরে ঢুকতেই শেখ মনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি শীতল ও সতর্ক। মুজিব কাকু তাঁর স্বভাবজাত উষ্ণতা ভরা কণ্ঠে আমাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। এরপর দরাজ গলায় বললেন, 'শোন, আমি তোকে লেখাপড়া করতে রাশিয়ায় পাঠাব।' আমার সঙ্গে মুজিব কাকুর সেই শেষ কথা। মনে পড়ে ১৯৬৮ সালে মুজিব কাকু ও আব্বু যখন জেলে, তখন এই বাড়িতেই অনাড়ম্বর পরিবেশে অল্প কিছু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতিতে মুজিব কাকুর জ্যৈষ্ঠ কন্যা হাসিনা আপার (শেখ হাসিনা) সাথে বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদ মিয়ার বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আম্মার সাথে সেই অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছিলাম। ঘোমটা পরা নববধূ হাসিনা আপাকে এই সামনের বারান্দায় বসানো হয়েছিল। বেণী বাধা রেহানা আপা (শেখ রেহানা) বড় বোনের বিয়েতে খুব উৎফুল্ল ছিলেন। সে সময় সংগ্রামী রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হিসেবে আমরা সুখ দুঃখ ভাগ করে নিতাম। বিশেষ করে আব্বু ও মুজিব কাকুর হৃদ্যতার কারণে মুজিব কাকু ও আমাদের পরিবারের মধ্যেও সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠে। মুজিব-কাকি ও হাসিনা আপা আম্মার হাতের রান্না খুব পছন্দ করতেন। বিশেষ করে শুঁটকি, নানারকম ভর্তা ও মাছের তরকারি। আম্মা সেগুলো রেঁধে টিফিন ক্যারিয়ারে করে পাঠিয়ে দিতেন। হাসিনা আপা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। কখনো তাঁর সাথে থাকত তাঁর খালাতো বোন জেলী আপা। আনার আপার সহপাঠী। ইডেন কলেজে হাসিনা আপা, আনার আপার এক ক্লাস ওপরে পড়তেন। তিনি যখন ছাত্রলীগের নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী হন, আনার আপা তখন সাধারণ সম্পাদকের পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর মুজিব কাকু ও আব্বুর মধ্যে আদর্শিক দূরত্ব বাড়তে থাকলেও আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে সৌজন্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল।

কয়েকদিন পর ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ে নতুন গণভবনে কামাল ভাইয়ের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হলো। আজকাল যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে বলিউড ও হিন্দি সংস্কৃতির ছড়াছড়ি ও বাড়াবাড়ি, বাংলা গানের বদলে হিন্দি গানের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় সে সময়ের অনুষ্ঠানগুলো তেমন ছিল না। কামাল ভাইয়ের গায়ে হলুদ ও বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে ঘিরে। অনুষ্ঠানে অনেকেই রং খেলেছিলেন। রং খেলার পর রঙে রাঙানো অনেকেই নেমে পড়লেন লেকের পানিতে। লেকের পানি লাল রঙে রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। মুজিব-কাকি ভালো সাঁতার জানতেন। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের পর তিনি ও অন্য অতিথিরা লেকে সাঁতার কাটলেন। জ্বর থাকায় রিমি গায়ে হলুদে যেতে পারেনি। বাসায় ফিরে আমি ওকে এই আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিলাম। কামাল ভাইয়ের বিয়ের দিন আমরা মুজিব কাকুর বাসা থেকে বরযাত্রী হয়ে বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাবে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। রেহানা আপা বন্ধুদের নিয়ে নতুন ভাবিকে লক্ষ্য করে মজার গান গাইলেন। ঐ বিয়ের কিছুদিন পরই মুজিব কাকু আব্বুকে ফোন করে জানালেন জামাল ভাইয়ের বিয়েও ঠিক হয়েছে তাঁর বোনের মেয়ে রোজীর সঙ্গে। ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠিত জামাল ভাইয়ের বিয়েতে আব্বু ও আম্মা যোগ দিলেন।

দুই ছেলে ও নতুন দুই বউসহ মুজিব কাকু ও কাকির ছবি সব দৈনিকের প্রথম পাতায় ছাপা হলো। কোনো কোনো পত্রিকায় বিয়ের ছবির নিচেই স্থান পেল দুর্ভিক্ষের শিকার ক্ষুধার্ত, মরণাপন্ন মানুষের ছবি। জুলাই মাসের শেষে আব্বুর কাছে খবর এল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে কেউ কেউ মুজিব কাকুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তারা যে কোনো সময় মুজিব কাকু ও তাঁর সরকারের ওপর আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত। এই খবর পেয়ে একদিন রাত ১১টায় গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরেই আব্বু হেঁটে সোজা চলে যান মুজিব কাকুর বাসায়। মুজিব কাকু তখন শোবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আব্বু মুজিব কাকুকে ষড়যন্ত্রের খবর জানিয়ে বলেন তিনি যেন অবিলম্বে সেনাবাহিনী, বিশেষ করে তাঁর গোয়েন্দা বাহিনীর ওপর নজর দেন। তিনি যেন এই খবরকে

কোনো মতেই হাল্কাভাবে না নেন। কিন্তু মুজিব কাকু আব্বুর এই সতর্কবাণীকে কোনো আমল দিলেন না। সেদিন আব্বু খুব চিন্তিতভাবেই ঘরে ফিরে এলেন।

১৫ আগস্ট সকালে আব্বুর কাপাসিয়া এবং আমাদের দরদরিয়া গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু অভাবনীয়ভাবে ঘটনা মোড় নিল অন্যদিকে। খুব ভোরে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আমার সমবয়সী খালাতো বোন ইরিনা আগের রাতে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে থেকে গিয়েছিল। সে চিৎকার করে রিমিকে জড়িয়ে ধরল। রাজশাহীর এসপি (আমাদের এক মামা ও আম্মার মামাতো ভাই) সৈয়দ আবু তালেব দু'দিন আগে সরকারি কাজে ঢাকায় আমাদের বাসায় উঠেছিলেন। তিনি হতভম্বের মতো ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশে আব্বু ও কাজের ছেলে ইলিয়াস দাঁড়ানো। আমরাও একে একে বারান্দায় জড়ো হলাম। আম্মা চিন্তাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'হঠাৎ এত গোলাগুলি কোথা থেকে আসছে।' আব্বু বারান্দা থেকে দ্রুত ছাদে ছুটে গেলেন। রিমি ও আমিও গেলাম আব্বুর পেছনে পেছনে। দু-একটা গুলির শব্দ আবারো শোনা গেল। তারপর সব নিঃশব্দ হয়ে গেল। আব্বু নিচে নেমে বারান্দায় ইস্ত্রির টেবিলের পাশে রাখা ফোনে বিভিন্নজনকে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই ভোরে ফোনে কাউকেই পেলেন না। এরপর আব্বুর নির্দেশ মতো রিমিও ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করল। মিন্টো রোডে অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সরকারি বাড়ির ফোন ধরল তাঁর মেয়ে বেবি। বেবি জানাল যে ওর বাবা নামাজ পড়তে গিয়েছেন এবং তাঁদের বাড়ির কাছেও অনেক গোলাগুলি হয়েছে। বেবি তখনো জানত না মুজিব কাকুর ভগ্নিপতি খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের মিন্টো রোডের বাসাতেও অভ্যুত্থানকারীরা আক্রমণ করে তাঁকেসহ তাঁর পরিবারের পাঁচ সদস্যকে হত্যা করেছে। আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ছোট মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত রিমির সহপাঠী ছিল। সেও নিহতদের মধ্যে ছিল। তাঁর বড় মেয়ে শেখ ফজলুল হক মনির স্ত্রী আরজু মনি তাঁর স্বামীসহ তাঁদের ধানমণ্ডির বাসায় ১৫ আগস্ট ভোরে একই দলের গুলিতে নিহত হন। মুজিব কাকু ও তাঁর পরিবারের নিকটতম অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গরা একই দিনে, কাছাকাছি একই সময়ে অকালেই জীবন হারালেন। একটু সকাল হতেই আব্বু ফোনে খন্দকার মোশতাককে পেলেন। তিনি আব্বুর কাছে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক পিয়ন আনোয়ার আগের রাতে আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে এসে বেশি রাত হওয়ায় আমাদের বাসায় থেকে গিয়েছিলেন, তিনি চলে গেলেন। আমাদের বাড়ি যিনি দেখাশোনা করতেন সেই বারেক মিয়া (হাইয়ের বাবা) এবং ইলিয়াস বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। একটু পর বারেক মিয়া রাস্তা থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরের কাছে এসে চিৎকার করে রেডিও অন করতে বলেন। রাস্তায় অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। তারা রেডিওতে কী এক ভাষণের কথা যেন বলাবলি করছে। আব্বু রেডিও অন করলেন। ইথারে ভেসে এল মেজর ডালিমের উত্তেজিত কণ্ঠ– 'খুনি মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে।' আমরা সবাই বাক্যহারা হয়ে গেলাম। বেদনায় বিমূঢ় আব্বু গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মুজিব ভাই জেনে গেলেন না কে ছিল তাঁর প্রকৃত বন্ধু আর কে শত্রু। মৃত্যুর আগে যদি চিন্তার সময় পেয়ে থাকেন তাহলে হয়তো ভেবেছেন আমিই তাঁকে হত্যা করিয়েছি। আমি যদি মন্ত্রিসভায় থাকতাম কারো সাধ্য ছিল না মুজিব ভাইয়ের শরীরে কেউ সামান্য আঁচড় কাটে।' সপরিবারে স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, তিনপুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, দশ বছরের বালক শেখ রাসেল, ছোট ভাই শেখ নাসের, দুই পুত্র বধূ সুলতানা কামাল খুকী ও পারভীন জামাল রোজীসহ মুজিব কাকু নিহত হন। দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময় পশ্চিম জার্মানিতে থাকায় তারা প্রাণে বেঁচে যান। শিশু রাসেলকেও ছাড়েনি বর্বর ঘাতকের দল। ১৯৬৪ সালে যখন রাসেলের জন্ম হয়, আম্মার সাথে আমি নবজাতক শিশুকে দেখতে গিয়েছিলাম। মুজিব কাকির কোল আলো করে রয়েছে ফুটফুটে রাসেল। আজ সে নেই ! তাঁরা

কেউ নেই ! কী এক নির্মম ও অবিশ্বাস্য সত্যের মুখোমুখি আমরা সেদিন দাঁড়ানো ! মুজিব কাকুকে হত্যার খবর রেডিও মারফত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ইলিয়াস রাস্তা থেকে আরও খবর নিয়ে এল। অনেক মানুষ এই হত্যাকাণ্ডে উল্লাস প্রকাশ করেছে। হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে কেউ কেউ শ্লোগানও দিচ্ছে।

পঁচাত্তরে মুজিব কাকুর জনপ্রিয়তা ছিল শূন্যের কোঠায়। তার নেতৃত্ব সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত জনগণ তার স্বৈরশাসনের অবসান কামনা করছিল। যদিও তারা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেনি (অতীতে একই জনগণ তার জন্য প্রাণ আহুতি দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল) তা সত্ত্বেও ধারণা করা যায় যে দেশের অধিকাংশ মানুষ এই নির্মম হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেনি। দুর্ভাগ্য যে সেদিনের নির্মম হত্যাকাণ্ডকে রুখতে বা সেই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে মুজিব কাকুর অনুগত রক্ষী বাহিনী চরমভাবেই ব্যর্থ হয়। একমাত্র বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাতির জনকের হত্যার সশস্ত্র প্রতিবাদ করেন ও জেনারেল জিয়াউর রহমান নিয়ন্ত্রিত আর্মির সাথে সংঘর্ষের ফলে দেশান্তরী হতে বাধ্য হন। মুজিব কাকুকে হত্যা করা হয়েছে– এই ঘোষণা শোনার পর আব্বু বলেছিলেন, মুজিব কাকু জেনে গেলেন না কে ছিল তাঁর প্রকৃত বন্ধু আর কে শত্রু। রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোশতাকের নাম ঘোষিত হওয়ার পর মনে হলো নিয়তির কী নির্মম পরিহাস, মুজিব কাকুর অতি কাছের আস্থাভাজন এই ব্যক্তিটি নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। সে ও তার মতো ষড়যন্ত্রকারীরা ঠিকই জানত যে আব্বু মুজিব কাকুর পাশে থাকলে তারা আঘাত হানতে পারবে না। সে কারণেই কুমন্ত্রণা ও ভুল পরামর্শ দিয়ে তারা মুজিব কাকুকে আব্বুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। মুজিব কাকুর আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ আব্বুর প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে আব্বু ও মুজিব কাকুর সম্পর্কে ফাটল ধরায় এবং হত্যাকারীদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পথকে সহজ করে দেয়। আব্বুর নিঃস্বার্থ উপদেশ, সতর্কবাণী সব অগ্রাহ্য করে মুজিব কাকু স্বাধীনতার শত্রুদের বরণ করেন পরম বন্ধু হিসেবে।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের সকালবেলাটা ছিল উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা ও বেদনাসিক্ত। আশপাশের অনেকেই আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আব্বুর সাবেক একান্ত সচিব আবু সাঈদ চৌধুরীসহ অনেকে সকাল থেকেই আমাদের বাসায় ফোন করা শুরু করলেন। কেউ কেউ আব্বুকে বাসা ছেড়ে যাওয়ার উপদেশ দিলেন। আম্মা বারবার আব্বুকে অনুরোধ করলেন, 'তুমি বাসায় থেকো না, আশপাশে কোথাও চলে যাও। নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দেখো পরিস্থিতি কী হয়।' আব্বু বাসা ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না। আব্বুর মুখমণ্ডলজুড়ে কী নিদারুণ বেদনার ছাপ। আব্বুর এক সতীর্থ উপদেশ দিলেন ভারতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। আব্বু বললেন, 'যে পথে একবার গিয়েছি সে পথে আর যাব না।' একাত্তরের সেই সময় ও আজকের সময়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেদিন বঙ্গবন্ধু জীবিত ছিলেন। তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে তাজউদ্দীন এক স্বাধীনতা-পাগল জাতির মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ তিনি যদি পালিয়ে যান তাহলে হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীরা অপপ্রচারণার সুযোগ পাবে যে তিনিই মুজিবকে হত্যা করিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। আব্বু বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক অপবাদ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।'

সকাল সাড়ে নয়টার দিকে সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য আমাদের বাসা ঘিরে ফেলল। সামনের বড় রাস্তাজুড়ে সেনাবাহিনীর অতিকায় ট্রাকগুলো মূর্তিমান আতঙ্কের মতো একে একে বাসার সামনে জড়ো হলো। আব্বুর সঙ্গে আমরা বাসার টেলিফোনের পাশে দাঁড়ানো। সেই মুহূর্তে একজন অফিসার দ্রুতগতিতে আমাদের দোতলার বারান্দায় উঠে এলেন। ক্যাপ্টেন শহীদ হিসেবে পরিচয়দানকারী এই অফিসার আম্মাকে বললেন, 'এই মুহূর্ত থেকে আপনারা কেউ বাসার বাইরে যেতে পারবেন না এবং বাইরের কেউ ভেতরে আসতে পারবে না।' আব্বু প্রত্যুত্তর

দিলেন, 'বলুন হাউস অ্যারেস্ট। আমাদের গৃহবন্দি করলেন।' ক্যাপ্টেন শহীদ আমাদের কাছে একটা চাকু চাইলেন। তাঁর হাতে চাকু দেওয়া মাত্রই তিনি টেলিফোনের তারটি দ্বিখণ্ডিত করলেন। তারপর ফোন-সেট সহকারে নিচে নেমে গেলেন। আমাদের নিচতলাটি একটি স্কুলকে ভাড়া দেওয়ার সময় আব্বু সামনের রুমটি ব্যক্তিগত অফিস হিসেবে ব্যবহারের জন্য খালি রেখেছিলেন (ষাটের দশকেও ঐ রুমটি তিনি অফিস, পড়ার ঘর ও বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করতেন)। সেই রুমটিকেই তারা তাদের থাকার জন্য বেছে নিল এবং বাসায় ছাদের ওপর অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট-গান স্থাপন করল। তাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল কোনো বাহিনীর মোকাবিলা করতে যাচ্ছে। ছোট সোহেল আমার কোলে চড়ে দোতলার জানালা দিয়ে নিচের রাস্তায় জমায়েত আর্মির ট্রাকগুলো দেখে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল 'ব'পা, মিলিটারি বন্দুক' !

এর পর থেকে আমরা সবাই বাসায়, সবার কাছ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। সময় যেন আর কাটছে না। প্রতিটি মুহূর্ত মনে হচ্ছে যেন একটি দিন। তারপর গভীর রাতে আমাদের দোতলার দরজার কলিংবেল আচমকা বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখা গেল যে হত্যাকারীদের অন্যতম মেজর ডালিম ও তার সঙ্গে অন্য একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেজর ডালিম জানাল যে আব্বুর নিরাপত্তার জন্য বাসায় আর্মির পাহারা বসেছে। নিরাপত্তা ঠিক আছে কি না সেটা দেখতেই তার আগমন। আব্বু তাকে ধমক দিয়ে বললেন যে তাদের আসার উদ্দেশ্য আসলে তিনি বন্দী হয়েছেন কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে আটকে পড়া সেই মামা চলে গেলেন পরদিন। আব্বু বলে-কয়ে তাঁর চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ইরিনা গেল কয়েক দিন পর। তাঁদের চলে যাওয়ার অনুমতি মিললেও আমাদের কারো বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। আব্বু বহু কষ্টে নিচের তলা থেকে সেনাবাহিনীর কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৮ আগস্ট থেকে রিমি ও মিমির স্কুলে যাওয়ার অনুমতি জোগাড় করলেন। অন্তত বাইরের পরিস্থিতি রিমি স্বচক্ষে দেখে আমাদের জানাতে পারবে, যেটা আব্বু চিন্তা করেছিলেন। তাদের স্কুলে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড ঝামেলা পোহাতে হতো। তাদের ব্যাগ, বই, খাতাপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করা হতো। স্কুল থেকে ফেরার পর আবারো একইভাবে আসতে হতো।

রিমির স্কুলের সহপাঠীদের ধারণা ছিল ১৫ আগস্টে আমাদেরও মেরে ফেলেছে। ওকে ক্লাসে প্রবেশ করতে দেখে তারা সবাই খুব চমকে গিয়েছিল। স্কুল থেকে রিমি শুনে এল যে আর্মির পাহারায় মুজিব কাকুকে টুঙ্গিপাড়ায় কবর দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় সে আর্মির পাহারা দেখল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে একটি ট্যাংক রাখা হয়েছে দেখতে পেল।

১৯ আগস্ট রিমি ১৪ বছরে পা দিল। আমার জমানো অনেক স্ট্যাম্প ও কার্ডের মধ্যে একটি কার্ড রিমির খুব পছন্দের ছিল। সেই কার্ডটি ওকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে দিতেই সে খুশিতে আপ্লুত হয়ে উঠল। আব্বুও মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, তিনি সচরাচর যা করেন না, কয়েক লোকমা খাবারও তার মুখে তুলে দিলেন।

২২ আগস্ট শুক্রবার সকালে আমাদের বাড়ির সামনে পুলিশের দুটি জিপ এসে থামল। এক পুলিশ অফিসার এসে আব্বুকে বললেন, 'স্যার আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।' আব্বুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে তা তিনি প্রকাশ করলেন না। আব্বু গোসল করে নাশতা খেয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন জামা-কাপড় নিতে হবে কি না। অফিসার বললেন, 'নিলে ভালো হয়'। আব্বু একটা ছোট সুটকেসে কিছু জামা-কাপড় গুছিয়ে নিলেন। সঙ্গে নিলেন কুরআন শরিফ ও কালো মলাটের ওপর সোনালি বর্ডার দেওয়া একটা ডায়েরি, যাতে তিনি

লিখেছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালের কথা ও ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কীভাবে চলবে তার নির্দেশনা। আব্বুর ঘরের সামনের বারান্দায় আমরা চার ভাইবোন দাঁড়িয়ে রয়েছি বিদায় দিতে। আব্বু আমাদের সবার মাথায় হাত বুলালেন। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হয়, কবে তোমাকে ছাড়বে ?' আব্বু সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই এক হাত নেড়ে বললেন, 'Take it forever, ধরে নাও চিরদিনের জন্যই যাচ্ছি।' আমরা দৌড়ে লতাগুল্ম ও ফুলে ছাওয়া দোতলার জলছাদে এসে দাঁড়ালাম। গৃহবন্দি থাকা অবস্থায় আব্বু গাড়ি বারান্দার ওপরের এই জলছাদে দাঁড়িয়ে বাইরে অপেক্ষমাণ তাঁর ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশে হাত নাড়তেন। আজ আমরা আব্বুকে বিদায় দিতে তাঁর উদ্দেশে হাত নাড়ছি। আব্বু জিপে উঠতেই রাস্তার উল্টো দিকের মুদি দোকানের সামনে দাঁড়ানো নীল বর্ণের জিনসের ট্রাউজার পরিহিত এক বিদেশি আব্বুর জিপের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি আব্বুকে কী যেন বললেন, আব্বুও তাঁকে কী যেন উত্তর দিলেন। পুলিশ এবার তাঁকে বাধা দিল এবং আব্বুকে বহনকারী জিপটি শাঁ করে চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমাদের মনে প্রশ্ন ছিল কে এই বিদেশি, তাঁর সঙ্গে আব্বুর কী কথা হয়েছিল ? প্রায় এগারো বছর পর আলোড়ন সৃষ্টিকারী Bangladesh: The Unfinished Revolution গ্রন্থের রচয়িতা মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফসুল্টজ সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ওয়াশিংটন ডিসি-র উপকণ্ঠে আমাদের ডেমোক্রাসি বুলেভার্ডের বাসায় বেড়াতে এসে জানালেন যে তিনিই ছিলেন সেই বিদেশি যার সঙ্গে আব্বুর কথা হয়েছিল। লিফসুল্টজ আব্বুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আপনাকে কী মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?' 'আব্বু উত্তর দিয়েছিলেন 'আমার তা মনে হয় না।' আব্বু যেন ধরেই নিয়েছিলেন যে ঐ যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া।

তথ্যসূত্র

১. আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলের সমাপনী অধিবেশনে প্রদত্ত তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ। ঢাকা, ২০ জানুয়ারি, ১৯৭৪। তাজউদ্দীন আহমদ : ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ৩৯০-৪১৩

২. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার। ৫ ও ৬ জুলাই, ২০১২। ঢাকা : বাংলাদেশ

৩. এইচ টি ইমাম, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭১, পৃ. ৮৪-৮৬

৪. একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় ? ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭, পৃ. ২০

৫. কামাল হোসেন। তাজউদ্দীন আহমদ : বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর। ঢাকা : অংকুর প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ৫৪৬

৬. প্রাগুক্ত পৃ. ৫৪৬-৫৪৭

৭. ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭২ সোমবার : দৈনিক পূর্বদেশ

৮. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। 'মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার'। ঢাকা : প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২

৯. ডিসেম্বর ২৯, ১৯৭১ বুধবার : দৈনিক পূর্বদেশ

১০. Bina D' Costa। "The scars of war, victory and justice." December 16, 2012. Website source: http://opinion.bdnews24.com/2012/12/16/the-scars-of-war-victory-and justice

১১. Statesman Weekly, 21 April 1973 cited in Bina D' Costa's aforementioned research article "The scars of war, victory and justice." December 16, 2012

১২. Pakistan Affairs, 1 June 1973 cited in Bina D' Costa's aforementioned research article

১৩. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ১১২

১৪. Bina D' Costa. "The scars of war, victory and justice." December 16, 2012

১৫. Major General (retd.) Khadim Hussain Raja. A Stranger in My own Country: East Pakistan 1969-1971. Karachi: Oxford University Press,p.98. Website source : http://www.scribed.com/doc/103930881/stranger-in-my-country

১৬. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। 'মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার'। ঢাকা : প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২

১৭. Dr. Sinha M. A. Sayeed। "Victory Day: A pointer also for Pakistan's apology to Bangladesh". Dhaka: Dhaka Courier, Friday, December 14th, 2012

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. কামাল হোসেন। তাজউদ্দীন আহমদ : বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর। পৃ. ৫৪৬

২০. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। 'মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার'। ঢাকা : প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২

২১. প্রাগুক্ত

২২. বাংলা ভিশন : গোলাম আযমের মুখোমুখি। ডিসেম্বর ১৪, ২০১১

২৩. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা : পৃ. ১৪৪-১৪৮; ওয়েব সাইট :

http:// tajuddinahmad.com/interviews-with-abu-sayeed-chowdhury-private-secretary-of finance-minister-tajuddin

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২৫. আগস্ট ২২, ১৯৭৪, বৃহস্পতিবার, দৈনিক বাংলা ও তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ৪৬

২৬. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ১৪৮

২৭. আগস্ট ২৪, ১৯৭৪, শনিবার, দৈনিক বাংলা

২৮. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ১৪০, ২৬০; ওয়েব সাইট : http://tajuddinahmad.com/interviews

২৯. Tajuddin Ahmad : An Unsung Hero-তাজউদ্দীন আহমদ : নিঃসঙ্গ সারথী। Documentary (DVD) script and direction- Tanvir Mokammel, Produced by Simeen Hossain Rimi, 100 Min. Language : Bangla : Subtitled : Eng. 2007

৩০. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা : পৃ. ২৬০-২৬১, ওয়েব সাইট http://tajuddinahmad.com/interviews

৩১. আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার। Tajuddin Ahmad : An Unsung Hero তাজউদ্দীন আহমদ : নিঃসঙ্গ সারথী। ডকুমেন্টারি

৩২. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ২৬২

৩৩. জমিরউদ্দিন আহমেদ : মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারীর নাম কোথায় ? যায়যায়দিন, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৭

৩৪. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা, পৃ. ২৬০

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩ এবং Website: http://tajuddinahmad.com/interviews উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে, কাউন্সিলর হিসেবে ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ অ্যাম্বাসিতে কর্মরত থাকাকালীন সময় আব্বু সাঈদ চৌধুরী আমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাকশাল গঠন প্রসঙ্গে একই ঘটনার উল্লেখ করেন

৩৮. এম. আর আখতার মুকুল : আমি বিজয় দেখেছি। ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৪, পৃ. ১২৮

৩৯. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্ত ধারা, পৃ. ১৯০

৪০. জমিরউদ্দিন আহমেদ : মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারীর নাম কোথায় ? যাঁয়যায়দিন, ৪ নভেম্বর-১৯৯৭

৪১. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জে অরোরার সাক্ষাৎকার। 'শেখ মুজিব একজন উদার-হৃদয় ব্যর্থ শাসক।' বিজয় দিবস সংখ্যা। ঢাকা: বিচিত্রা, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ. ৪৫। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ সংযোগ ও গবেষণা সেন্টারের পক্ষে ভিডিও সাক্ষাৎকারটি পরিচালনাও প্রযোজনা করেন অধ্যাপক ফুয়াদ চৌধুরী। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ক্যানাডার ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের, যাতে বাংলাদেশের এই অধ্যাপক কর্মরত ছিলেন সহযোগিতার চুক্তি হয়। তিনি ঐ চুক্তির অধীনে উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ফুয়াদ চৌধুরী পরিচালিত, ১৯৮৭ তে ইংরেজিতে গৃহীত চার পর্বের এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারটির নাম ছিল Reminiscence of Bangladesh-Fifteen Years Later. সাক্ষাৎকারটির গ্রহণ করেন ভারতের বিশিষ্ট সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি বাংলায় অনুবাদ করেন আহসানুল আলম

৪২. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৭

৪৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৭

৪৪. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৭

৪৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৯

৪৬. কামাল হোসেন। তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর। পৃ. ৫৪৫

৪৭. আমার ডায়েরি। ১ অগাস্ট, ১৯৮৭। ১৯৭১ এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে আলাপচারিতা। সল্ট লেক সিটি, কোলকাতা। ভারত

৪৮. Dr. Robert Dickson Crane, 'Islamic Social Principle of the right to freedom : An analytical approach' Arches Quarterly. 3.4 (summer 2009) : 8-10 Available on line at http.www.the cordobafoundation.com/attach/ARCHES FINAL WEB 3 e4. pdf

৪৯. তাজউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ৪৬৭

৫০. এপ্রিল ৮, ১৯৭৩, রোববার, দৈনিক পূর্বদেশ ও তাজউদ্দীন আহমদ : ইতিহাসের পাতা থেকে, পৃ. ৩১৮

৫১. মোহাম্মদ নূরুল কাদির, ২৬৬ দিনে স্বাধীনতা, ঢাকা, মুক্ত প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৬৭

৫২. আবদুল গাফফার চৌধুরী। একজন বিস্মৃত নেতার স্মৃতি কথা, ঢাকা : যায়যায়দিন, ১১ জুন, ১৯৮৬, পৃ. ৫

৫৩. ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১১। ঢাকা : বাংলাদেশ

সপ্তম পর্ব

আত্মাকে প্রতিটি মহান কাজে সদা নিয়োজিত রাখার সংগ্রামই প্রকৃত মানবজীবনের সংগ্রাম।
আত্মার থেমে থাকার অবকাশ নেই। দেহান্তেও এই গতির শেষ নেই।
এটাই সৃষ্টির মহাবিস্ময়কর রহস্য।

লেখকের কাছে মা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের লেখা চিঠির অংশবিশেষ। ২৩.০৮.১৯৯০

অমর্ত্যলোকের যাত্রী

শক্তিশালী আন্তর্জাতিক চক্রের যোগসাজশে ১৫ আগস্টে সংগঠিত সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ছিল সেই বেসামরিক চক্র যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি, একাত্তরে আব্বু যাদের ষড়যন্ত্রকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিহত করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কারনেগি এন্ডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস বেসরকারি সংগঠনটি ১৫০ জনের বেশি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা ও সিআইএ এজেন্টদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাধ্যমে গণহত্যার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত হওয়ার ব্যাপারটি নয় মাসের একটি দীর্ঘ অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টা নেয়। রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশিত না হলেও সাংবাদিক লরেন্স লিফসুল্টজকে রিপোর্টটি পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। রিপোর্টটি থেকে ১৯৭১ সালে কিসিঞ্জারের প্ররোচনায় এবং খন্দকার মোশতাকের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিলম্বিত করার ব্যাপার এবং মোশতাকের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার ব্যাপারটি উল্লিখিত হয়। লিফসুল্টজের তথ্যানুসন্ধান থেকে আরও জানা যায় ১৯৭৫-এ ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার ওয়াকিবহাল ছিলেন যে মুজিবের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হতে চলেছে। অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল।[১] এক দিকে যেমন মার্কিন দূতাবাস জ্ঞাত ছিল যে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে চলেছে, তেমনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহকর্মী ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গও এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের অন্যতম পরিকল্পক লে. কর্নেল আবদুর রশীদ ও লে. কর্নেল ফারুক রহমান, বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও তদানীন্তন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে জুনিয়র সেনা অফিসারদের অভ্যুত্থানের বিষয়টি অবহিত করে এবং উভয়ের সমর্থন লাভ করে।[২] বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর যোগসাজসে এভাবেই সংঘটিত হয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। (পরিশিষ্টে সাংবাদিক লরেন্স লিফসুল্টজ রচিত বাংলাদেশ দ্য আনফিনিশড রেভ্যুলুশন গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ বিশেষের উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত। পৃ. ২৬৫) অতি বেদনাদায়ক ব্যাপারটি ছিল যে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধী ও পাকিস্তান-মার্কিন স্বার্থরক্ষাকারী মোশতাক, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষী– এই পরাজিত চক্রটিই স্বাধীনতার পর মুজিব কাকুর আস্থাভাজনে পরিণত হয়ে নিজ দলের ভেতর থেকেই ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসলীলায় সহায়তাকারী জামায়াতে ইসলামী, আলবদর প্রভৃতি মৌলবাদী দলগুলো নিষিদ্ধঘোষিত হলেও নিজ দলের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা ও মুজিব কাকুর প্রশ্রয়প্রাপ্ত ষড়যন্ত্রকারীরা রেহাই পেয়ে যায়। এরাই ছিল মুজিব-হত্যার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী। এরা মুজিব কাকুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং এরা আঘাত হানবে স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী,

আপসহীন নেতৃত্বের ওপর, সে বিষয়ে আব্বুর কোনো সন্দেহ ছিল না। আব্বুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো আব্বুসহ ২৬ জন নেতাকে দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করা হয়েছে।[৩]

আব্বুকে গ্রেপ্তার করার পরও আমাদের গৃহবন্দি দশার অবসান ঘটল না। তার ওপর শুরু হলো নতুন হয়রানি। আর্মি ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) লোকেরা আব্বুর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আম্মাকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। আব্বুকে দুর্নীতির সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টা করে তারা নিজেরাই যেন হয়রান হয়ে গেল। দুর্নীতি তো দূরের কথা, তদন্তে আব্বুর বিরুদ্ধে তারা একটি সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘনেরও প্রমাণ বের করতে পারল না। এসবির এক অফিসার শেষ পর্যন্ত শুকনো মুখে নিরাশ গলায় আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বড় ছেলে কোথায় ?' আম্মা সোহেল ও আমাকে ডেকে আনলেন, বললেন, 'এই আমাদের একমাত্র ছেলে, সবার ছোট। আর এই আমাদের বড় মেয়ে।' স্বাধীনতার শত্রুরা আব্বুর বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা করেছিল তাঁর বড় ছেলে হাইজ্যাকের সঙ্গে জড়িত। মোশতাক কারচুপি করে ১৯৭৩-এর নির্বাচনে জিতেছিলেন এবং মন্ত্রীর পদে থেকে নানাপ্রকার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন যা সর্বজনবিদিত। দুর্ভাগ্য যে, সেই মোশতাক আব্বু ও অন্যান্য নেতাকে দুর্নীতির ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে জেলে নেয়। আব্বুকে দুর্নীতির সঙ্গে জড়ানোর জন্য মোশতাক সমর্থিত আর্মি প্রশাসন এতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে আমাদের আত্মীয়স্বজন ছাড়াও আমরা যে দর্জির দোকানে জামাকাপড় তৈরি করতাম সেই দর্জিকেও ধরে নিয়ে নানারকম জেরা করেছিল। তারা যতই চেষ্টা করছিল আব্বুকে অভিযুক্ত করতে ততই তাঁর নিষ্কলুষ জীবন দীপ্তিময় হয়ে উঠছিল। এ প্রসঙ্গে নানার বলা একটি ফার্সি প্রবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—'আনরা কে হেসাব পাক আস্ত, আয মোহাসেবে চেহ বাক আস্ত' (যার হিসাব পরিষ্কার, সে হিসাব রক্ষকের ধার ধারে না)।

আব্বুর সঙ্গে জেলে দেখা করার অনুমতি মিলল এক মাস পর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। তার কয়েক দিন আগে রিমি স্কুলে যাওয়ার নাম করে স্কুলের ভেতর না ঢুকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গোপনে লক্ষ্মীবাজারে ছোট কাকুর বাসায় গিয়ে তাঁকে অনুমতির ব্যবস্থা করতে বলে। ছোট কাকু কয়েকদিনের মধ্যেই আব্বুর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি জোগাড় করেন। নিচতলার ডিউটিরত অফিসার প্রথমে খুব আপত্তি জানালেও কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর আম্মা ও আমাদের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি মেলে। আম্মাকে অনুমতি দিতে তারা সবচেয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করে। দীর্ঘ এক মাসের বেশি সময়ের পর আম্মা ও আমি বাসার বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। ছোট কাকুসহ আমরা সবাই রওনা দিলাম ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের উদ্দেশে। স্বাধীনতার আগে কতবারই তো নাজিমউদ্দীন রোডে অবস্থিত এই সেন্ট্রাল জেলে আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। কিন্তু আজ এই স্বাধীন দেশে বিনা অপরাধে আব্বুর বন্দিত্ব মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। জেলের ফটক দিয়ে আমরা ঢুকলাম ডান দিকের বড় ওয়েটিংরুমে। আমাদের আসার খবর আব্বুকে দেওয়ার জন্য কেউ ভেতরে গেল। আমরা ওয়েটিংরুমের জানালা দিয়ে জেলের ভেতরে তাকালাম। দূরে প্রাচীন গাছ-পালা ও সবুজ ঘাসের মাঝখানের পথটি দিয়ে আব্বু হেঁটে আসছেন। মুখে স্মিত হাসি। আমরা সবাই ওয়েটিংরুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আব্বুকে অভ্যর্থনা জানালাম। আব্বুর প্রথম কথাই ছিল আমরা কেন এত দিন আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। যখন জানলেন আমরা এখনো গৃহবন্দি এবং জেলে সাক্ষাতের জন্য অনুমতিপত্র দেখাবার পরও নিচতলার ডিউটিরত আর্মি বাসার বাইরে আসার অনুমতি দিচ্ছিল না, তখন আব্বু বেশ রেগে গেলেন। আব্বু বললেন, তাঁকে তো বলা হয়েছিল তাঁকে জেলে নিয়ে আসার পরপরই আমাদের বাসা থেকে আর্মির সশস্ত্র পাহারা তুলে নেওয়া

হয়েছে। আব্বু জেলখানার অফিস থেকে কোথায় যেন ফোন করে অভিযোগ করলেন মিথ্যে কথা বলার জন্য। ফোনে কথা বলার পর আব্বু আমাদের সঙ্গে ওয়েটিংরুমে বসলেন। সেদিন ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর মেয়ে শিরিনও গিয়েছিল তার বাবাকে দেখতে। আমাদের কাছেই মনসুর আলী কাকু তাঁর একমাত্র মেয়ে শিরিনকে ধরে অনেক কাঁদছিলেন। আম্মা ওনাকে সালাম দিতেই তিনি বললেন, 'ভাবি, আমাদের কী হবে ?' আম্মা সান্ত্বনা দিলেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাই।' আম্মা সান্ত্বনা দিলেও সেই পড়ন্তবেলার ম্লান আলোয় মনে হলো সব আশার আলোই কেমন নিভু নিভু হয়ে আসছে। আব্বুর চোখের চাহনিও কেমন উদাসীন, অন্যমনস্ক। যেন তিনি কোন দূরের জগতে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মনে পড়ে, ছোটবেলায় এই সেন্ট্রাল জেলে আব্বুর সঙ্গে দেখা করার সময় পরিচয় হয় এক কয়েদির সঙ্গে। কয়েদিদের ডাকা হতো 'ফালতু' বলে। আব্বু ও আম্মা শিখিয়ে দিলেন আদব সহকারে তাদের নাম ধরে সম্বোধন করতে। আমরা সে সময় কয়েকবার ফটক দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকের ওয়েটিংরুমে আব্বুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওয়েটিংরুমের সঙ্গেই বিশাল প্রাচীর ঘেরা উঠানে সেই কয়েদিটি কাজকর্ম করত। আমি ছিলাম চঞ্চলপ্রকৃতির ও সবার সঙ্গে ভাব জমানো ব্যাপারটা ছিল আমার সহজাত। আব্বু ও আম্মা ওয়েটিংরুমে আলাপ করতেন। আর আমি কাবুলিওয়ালার মিনির মতো উঠানে দাঁড়িয়ে এই কয়েদির সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতাম। কয়েদিটির নাম কী, কেন জেলে, ওর মা ওর জন্য কাঁদে কিনা, ও পড়তে পারে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন করে তার কান ঝালাপালা করতাম। কয়েদিটি বিরক্ত না হয়ে উৎফুল্লভাবে আমার শিশু-সুলভ সব প্রশ্নের জবাব দিত। একবার আব্বুর সঙ্গে জেলে সাক্ষাতের দিন কয়েদিটি বলল, আগামী সপ্তাহ থেকে তাকে অন্য জায়গায় কাজে লাগানো হয়েছে তাই আমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তারপর হঠাৎই আমার ওপাশে খেলায় রত রিমি ও আমাকে উদ্দেশ করে আঞ্চলিক ভাষায় বলল, 'তোমার নাম দিলাম 'আদর্শ'। তোমার ছোট বোনের নাম 'আশা'। মনে রাইখো তোমার আব্বা আমাদের সবার আদর্শ, আমাদের সবার আশা। তিনি বাঁচলে দেশও বাঁচব।' সেই বহুকাল আগেকার কথা। এক সাধারণ কয়েদির কাছ থেকে শোনা অসাধারণ কথাগুলো যেন ছিল কোনো ভবিষ্যদ্বাণী।

সেদিন আব্বুর অভিযোগে কাজ হয়েছিল। আব্বুর সঙ্গে দেখা করে আসার পরদিনই আমাদের বাসা থেকে আর্মি উঠে গেল। ফোনের লাইন পেতে সময় লাগল আরও কয়েক দিন। নিচতলার স্কুলও ততদিনে উঠে গেছে। তারপর অক্টোবরের প্রায় মাঝামাঝি সময় এক মেজরের নেতৃত্বে আমাদের বাসায় আবার আর্মির দল উপস্থিত হলো। তারা আমাদের বাসা ঘিরে চতুর্দিক দিয়ে আমাদের বাসার অনেক ছবি তুলল, তারপর শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদের পালা। অন্যান্য তদন্তকারীর মতো তারাও আব্বুর বড় ছেলেকে দেখতে চাইল। আম্মা পাশে দাঁড়ানো সোহেলকে দেখিয়ে বললেন, 'এই হলো একমাত্র ছেলে, সবার ছোট।' আব্বু কটা পেট্রোল পাম্পের মালিক, লঞ্চ কোম্পানিতে কত শেয়ার আছে, তাঁর নামে আরও কটা বাড়ি আছে ইত্যাদি প্রশ্নের সময় আম্মা একটু কঠোর হয়ে বললেন, 'আপনারা যদি আরও একটু খোঁজখবর করে আসতেন তাহলে এত সময় নষ্ট হতো না। এই বাড়িটি ছাড়া তাজউদ্দীন সাহেব কোনো বিষয়-সম্পত্তি করেননি। কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে নিজ নামে বা বেনামে জড়িত নন।' এবার প্রশ্ন, 'কবে এ বাড়ি তৈরি হয়েছে ?' আম্মা বললেন, '১৯৬১ সালে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের লোন নিয়ে এই বাড়ি তৈরি হয়েছে। তাদের কাছে দলিলপত্র জমা রয়েছে, যেগুলো দেখলেই প্রমাণ পাবেন তাজউদ্দীন অর্থমন্ত্রী থাকাকালে এই বাড়ি তৈরি হয়নি।' প্রশ্নকারী অফিসার বিব্রত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, সত্যি কথাটা এই যে আব্বুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের করার জন্য নানারকম মিথ্যা তথ্য ও ঘটনা সাজানো হলেও তদন্তে একটাও টেকেনি।

এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে সমর্থন আদায়ের জন্য খন্দকার মোশতাক ১৬ অক্টোবর বঙ্গভবনে এক বিশেষ সভার আয়োজন করে। তার আগেই আমাদের জেলে সাক্ষাৎকারের দিনটিতে আব্বু দৃঢ়ভাবে আমাদের জানিয়ে দিলেন আমরা যতজনকে সম্ভব জানাই তারা যেন ঐ সভা বয়কট করে। শামসুল হক সাহেবের (আওয়ামী লীগের এমপি এবং স্থানীয় সরকার ও পাটমন্ত্রী) ছেলে মাসুদ ভাই সেদিন আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আব্বুর নির্দেশ পৌঁছাতে বিভিন্ন জায়গায় গেলেন। আবদুল আজিজ বাগমার ও রিমি গোয়েন্দা পুলিশের নজর এড়িয়ে এমপি হোস্টেলসহ বিভিন্ন স্থানে দলীয় সদস্য ও সমর্থকদের কাছে আব্বুর নির্দেশ পৌঁছে দিল। তারপরও বঙ্গভবনে সভা ঠিকই অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনা জেনে আব্বু খুব ব্যথিত হলেন। পরবর্তী সাক্ষাতের দিন আব্বু আম্মাকে বললেন, 'আমাদের আর বাঁচিয়ে রাখা হবে না।' তারপর বললেন, 'লিলি, আমি জীবনে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করিনি, ১৫ আগস্টে বাসা থেকে বের না হওয়াই ছিল মারাত্মক ভুল।' ওই সাক্ষাতের দিনটিতেই আব্বু মুজিব কাকুকে স্বপ্নে দেখার কথা জানালেন। আব্বু যেন জেলখানার ভেতরে বাগানে কাজ করছেন হাতে খুরপি। মুজিব কাকু যেন আব্বুকে বলছেন, 'তাজউদ্দীন সেই ৪৪ সাল থেকেই আমরা একসঙ্গে আছি, এখন আর তোমাকে ছাড়া ভালো লাগে না, তুমি চলে আসো আমার কাছে।' আব্বু বললেন, 'মুজিব ভাই আমার অনেক কাজ রয়েছে। আমাকে কেন ডাকছেন ?' মুজিব কাকু বললেন, 'আমাদের আর কোনো কাজ নেই। সব কাজ শেষ।'

এই সময় আম্মা আইনজীবীদের সহায়তায় হাইকোর্টের মাধ্যমে আব্বুর আটকাদেশকে অবৈধ চ্যালেঞ্জ করে আব্বুকে মুক্ত করার জন্য নথিপত্র জোগাড় করলেন। ৫ নভেম্বর আদালতে আব্বুর রিট পিটিশন ওঠার কথা। আমরা আশায় বুক বাঁধছি। অক্টোবরের শেষ দিকে একদিন আম্মার এক মামাতো বোন হোসনে আরা খালা আব্বুর জন্য খাবার রেঁধে বিকেল বেলায় আমাদের বাসায় উপস্থিত হলেন। তিনি শুনতে পেয়েছেন আব্বুকে নাকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও খবরটি ভুল ছিল কিন্তু ক্ষণিকের জন্য হলেও মনে হলো হয়তো বা আব্বু খুব শিগগির মুক্তি পাবেন। আমাদের সব আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে আব্বু ফিরে আসবেন আমাদের মাঝে।

কিন্তু '৭১-এর পরাজিত আন্তর্জাতিক শক্তি ও তাদের এদেশীয় এজেন্টদের পরিকল্পনার নীলনকশা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুজিব হত্যা ছিল তাদের পরিকল্পনার প্রথম অংশ। সর্বশেষ এবং মূল অংশটি ছিল যেভাবেই হোক স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী নেতৃত্বকে হত্যা করা। বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল দুই বিশ্বশক্তি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সূচিত ঠান্ডা যুদ্ধের আবর্তে। জোটনিরপেক্ষ নীতিমালার সমর্থক প্রথম বাংলাদেশ সরকার যে কোনো বিশ্ব শক্তির উপগ্রহ রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থানের বদলে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হওয়ার ঘোষণা দিলেও পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে নবজাত বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের রোষানলে পড়ে। ঠান্ডা যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এবং চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম অনুগত স্বৈরাচারী সামরিক সরকার শাসিত পাকিস্তানকে যেকোনোভাবে টিকিয়ে রাখাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। অন্যদিকে পাকিস্তানি হামলার শিকার এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়দানকারী ভারতের সমর্থনে এগিয়ে আসে ভারতের মিত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন ঠেকাতেই ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত রণতরীর সংখ্যা ঐ সময় (১৯৭১) বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানকে সহায়তার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন বঙ্গোপসাগর অভিমুখে পাঠান সপ্তম নৌবহর।[৪] অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত টাস্কফোর্স-৭৪ নামে ঐ বিশাল নৌবহরের নেতৃত্ব দিতে অগ্রভাগে বঙ্গোপসাগরের পথে যাত্রা করে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জাহাজ The USS Enterprise.[৫] পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন সাংবাদিক জ্যাক অ্যান্ডারসন '৭১ সালে

বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রাকারী এই আক্রমণাত্মক নৌবহর সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত বইয়ে বিশেষ বর্ণনা দেন।

রণসম্ভারে সজ্জিত ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ ও অনুসরণকারী সপ্তম নৌবহর মূর্তিমান আতঙ্কের মতো এগিয়ে আসে বাংলাদেশের পথে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অজান্তেই পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় মুখোমুখি হয়। পাকিস্তানের বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের প্রতি অন্ধ সমর্থনের কারণে বিশ্বশান্তি যদি নষ্টও হয় তবু যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন করবে, এই ছিল মার্কিন প্রশাসনের নীতি। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কিছুতেই ইচ্ছা ছিল না যে পাকিস্তান পরাজিত হোক।[৮]

তারপরও পাকিস্তান পরাজিত হয়। কোটি প্রাণের আহুতি রক্ত-সাগর থেকে সগৌরবে উদিত হয় নতুন সূর্য—বিজয়ী বাংলাদেশ, অভিষিক্ত বাংলাদেশ।

কিন্তু '৭১-এর পরাজিত শক্তি এই বিজয়কে কখনোই মেনে নেয়নি। তারা মরণ হামলা হানার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মনস্তত্ত্বকে তারা সুচারুভাবে কাজে লাগায়। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মুজিব উপস্থিত ছিলেন না। দলকে কোনো দিক নির্দেশনা না দিয়ে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে ধরা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, সেই দুঃসময়ে স্বাধীনতাযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। মুজিব বাদেই দেশ স্বাধীন হয়েছে, এই সত্যটি তিনি যেন কখনোই মেনে নিতে পারেননি। জাতির জনকের নামে সরকার পরিচালনা ও তাঁকে সব কৃতিত্ব প্রদান করলেও, ষড়যন্ত্রকারীদের প্ররোচনায় তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকর্মী তাজউদ্দীনকেই করলেন নির্বাসিত ও নিগৃহীত। কাছে টেনে নিলেন তাঁর দলের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা স্বাধীনতা-বিরোধীদের। মন্ত্রিত্বসহ বিভিন্ন উচ্চপদে তাঁদের আসীন করলেন। তাদের প্ররোচনায় কখনো ঝুঁকলেন মার্কিন, কখনো সোভিয়েত বলয়ের দিকে। সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতি ও দিকনির্দেশনার অভাবে তিনি বাংলাদেশকে ঠেলে দিলেন অস্থিতিশীলতা ও দুর্যোগের দিকে। তদুপরি বঙ্গবন্ধু প্রশাসনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অদক্ষতা স্বাধীনতার শত্রুদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পথ সুগম করে দেয়। যে জনগণনন্দিত নেতার মধ্য দিয়ে জাতি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই নেতা সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। আন্তর্জাতিক শক্তি ও তাদের দেশীয় এজেন্টদের চক্রান্তের প্রথম অধ্যায়টি এভাবেই বাস্তবায়িত হয়।

জেলের পচা নর্দমা ভরাট করে আব্বু মৌসুমি ফুলের একটি সুন্দর বাগান করেছেন। রক্তলাল জবা ফুলের একটি গাছও লাগিয়েছেন। মৃত্যুর আশঙ্কার মধ্যেও সুন্দরের চর্চায় মগ্ন তিনি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান এই আদর্শে বিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপনে অভ্যস্ত তিনি নিজ হাতে জামা-কাপড় ধুয়ে দড়িতে মেলছেন পরিপাটি করে। মাটির চুলায় রান্নার জন্য লাকড়ি ফাঁড়ছেন। ফেলে দেওয়া কাঠ দিয়ে বানাচ্ছেন বেঞ্চি। অবসরে জেলের লাইব্রেরি থেকে আনা বই পড়ছেন। গাছের ছায়ায় পাঠ করছেন ঘর থেকে আনা কুরআন শরিফ। ডায়েরিতে লিখে চলেছেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কীভাবে চলবে তার পরিকল্পনা। মৃত্যুর হাতছানির মধ্যেও তিনি বুনে চলেছেন নয়া জীবনের স্বপ্ন ও আশা।

নভেম্বরের ১ তারিখ, শনিবার। আম্মা একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। স্বপ্নে দেখেন বাঁশের চারটি তাঁবু পাশাপাশি রাখা। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন 'কাদের এই তাঁবু ?' কে যেন উত্তর দিল 'এই তাঁবুগুলো তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান সাহেবদের জন্য।'

স্বপ্নের মধ্যেই আম্মার মনে হলো বাঁশের তাঁবু দেখা তো ভালো না। সেদিনই আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে আম্মা একাই জেলে গেলেন আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে। টিফিন কেরিয়ার ভরে আব্বুর পছন্দের খাবারও রেঁধে নিয়ে গেলেন। আব্বুকে আম্মা কেমন চিন্তামগ্ন

দেখতে পেলেন। আব্বু বললেন, 'লিলি, আজ রাতে ডায়েরির শেষ পাতা লেখা শেষ হবে। সেইসঙ্গে শেষ হবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা।' খুব সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথা সেরে আব্বু বললেন, 'আর বোধহয় বাঁচব না।' জেলে আব্বুর সঙ্গে আম্মার সেই শেষ সাক্ষাৎ। জেল কর্তৃপক্ষ দেখা করার সময় দিয়েছিলেন মাত্র পনেরো বা বিশ মিনিট। আম্মা যখন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরলেন। আম্মার চোখ-মুখজুড়ে সন্ধ্যার চেয়েও গাঢ় বিষণ্ণতা। ঘরে ফেরার আগে অনেকটা বেদিশার মতোই ঢাকা ও টঙ্গির রাস্তায় ঘুরলেন। রাতে আম্মা খাবার খেলেন সামান্যই। নামাজ পড়লেন দীর্ঘ সময় ধরে। ৩ নভেম্বর, মাত্র ভোর হওয়া শুরু হয়েছে। আম্মা স্বপ্ন দেখলেন যে বিস্তীর্ণ মহাকাশে বিচরণকারী মধ্যগগনের সূর্যটি যেন আচমকাই অস্তগামী সূর্যের মতো রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। সিংহাসনের মতো এক আসনে বসা আব্বুর সারা শরীরের ওপর সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত লাল আলো। আব্বুর পরনের সাদা গেঞ্জিটি ক্রমশই লাল হয়ে উঠছে। যেন সূর্য থেকে বের হচ্ছে রক্তের ধারা। আম্মা স্বপ্নের মধ্যেই ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'মধ্যগগনের সূর্যের রং অস্তমিত সূর্যের মতো লাল রঙের হয় কী করে ?' অদৃশ্য থেকে কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, 'দেশের ওপর মহাবিপদ নেমে আসছে।' আম্মা এক অজানা আশঙ্কা নিয়ে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। সাতসকালে জঙ্গি বিমানের প্রচণ্ড শব্দে আমাদেরও ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের বাসার খুব নিচ দিয়ে জঙ্গি বিমান ও হেলিকপ্টার ঘন ঘন উড়ে যেতে দেখলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে আম্মাকে নানা জিজ্ঞেস করলেন (আমরা গৃহবন্দি দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, নানা ছোটমামার বাসা থেকে আমাদের কাছে চলে আসেন), 'লিলি এত প্লেন কেন উড়ছে ?' আম্মা বললেন, '...অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। মনে হয় আমাদের বাসা ছাড়তে হবে।'

ইতোমধ্যে সকাল সাতটায় রেডিওর অনুষ্ঠান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অসুস্থ মফিজ কাকু চিন্তিত হয়ে ছোট ফুফুর ছেলে ঢাকা কলেজের ছাত্র বাবুলকে (মহম্মদ নজরুল ইসলাম খান) আমাদের বাসায় পাঠালেন কোনো খবর আছে কি না জানতে। বাবুল সকাল ৮টার দিকে আমাদের বাসায় পৌঁছল। আম্মা সেসময় বারান্দার ডাইনিং টেবিলের কাছে বসা, চেহারায় সুস্পষ্ট চিন্তার ছাপ। বাবুলকে দেখে তিনি ভোর রাতে দেখা মধ্যগগনের সূর্যের স্বপ্নটি বললেন। বাবুল তাৎক্ষণিকভাবে ভাবল (যা সে পরে প্রকাশ করে) যে 'সূর্য দেখা তো ভালো। নিশ্চয়ই মামার কাছে কোনো ভালো দায়িত্ব আসবে।' বাবুল চলে যাওয়ার পর আম্মা আমাদের তাড়া দিলেন তৈরি হওয়ার জন্য। আম্মার নির্দেশ অনুযায়ী সেদিন স্কুলে যাওয়ার বদলে ব্যাগে জামা-কাপড় ভরে নানাসহ আমরা আশ্রয় নিলাম ধানমণ্ডির ১৯ নম্বর রোডে মধুবাজারে মফিজ কাকুর বাড়িতে। সাতসকাল থেকেই আম্মার ডান চোখের পাতা অনবরত কাঁপছিল। মফিজ কাকুকে আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'মফিজ ভাই ডান চোখের পাতা কাঁপা কি ভালো ?' মফিজ কাকু বললেন, 'ভাবি, ভালো-মন্দ আল্লাহর হাতে। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।' মফিজ কাকু আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও আম্মার অস্থিরতা কমল না। ভোর রাতে দেখা স্বপ্নটি আম্মা মফিজ কাকুকে বললেন। স্বপ্নটি শুনে তিনি চিন্তামগ্নভাবে নীরব হয়ে রইলেন। মফিজ কাকুর বাসায় ফোন লাইন ছিল না (১৫ আগস্টে আমাদের বাসায় ফোন লাইন কেটে দেওয়ার পর অক্টোবরে কিছুদিনের জন্য কানেকশন দিয়ে আবারো কেটে দেওয়া হয়। ৫ নভেম্বর সকালে পুনরায় ফোন লাইন আসে।) আম্মা অস্থিরভাবে ছুটে গেলেন আমাদের চার বাসা পরে লালু ফুফুর (মেহেরুন নেসা রহমান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মহিলা অ্যাডভোকেট) বাসায়। তাঁর বাসার ফোনে চারদিক থেকে নানাধরনের খবর আসছিল। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের খবর আম্মাকে দিলেন। কেউ বললেন, আব্বু ও সহকর্মীদের জেল থেকে বের করে বঙ্গভবনে নিয়ে গিয়েছে সরকার গঠনের জন্য। কেউ বললেন, যে ওনাদের কোনো গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং

সেখানে তাঁদের চাপ দেওয়া হচ্ছে নতুন সরকারে যোগদানের জন্য ইত্যাদি। সেদিন ঢাকার রাস্তাঘাট জুড়ে আব্বুদের ঘিরে নানা গুজব চলছে। আম্মা দুপুর পর্যন্ত লালু ফুফুর বাসায় রইলেন, তারপর মাঙ্কো খালাকে সঙ্গে করে ছুটলেন বিভিন্ন জায়গায় খবরের আশায়। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সে রাতে আমরা সবাই মফিজ কাকুর বাসায় থেকে গেলাম।

পরদিন, নভেম্বরের চার তারিখ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে খবর এল আব্বুর বন্ধু ডাক্তার এম. এ করিম—আমাদের করিম কাকু, আম্মার জন্য অপেক্ষা করছেন লালু ফুফুর বাসার সামনে, তাঁর কাছে জরুরি খবর আছে। সংবাদ পাওয়া মাত্রই আমাকে সঙ্গে নিয়ে আম্মা রিকশায় চেপে বসলেন। রিকশা চলছে নিশ্চিন্ত গতিতে। স্বচ্ছ নীল আকাশ থেকে ঝরে-পড়া হৈমন্তী সকালের নরম রোদ আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আশপাশ দিয়ে হেঁটে চলা স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের কলহাস্যে পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দিনটি হয়তো উপভোগ করা যেত, কিন্তু আজ যেন সবই এলোমেলো। আশপাশের ঐ স্বাভাবিক জীবনচারিতাই লাগছে অস্বাভাবিক। যেন আমরা ভিন্ন গ্রহে সহসাই পদার্পণ করেছি।

রিকশা থামল লালু ফুফুর বাসার সামনে। আম্মা ও আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন করিম কাকু। ছোটবেলায় অসুখ-বিসুখ হলে আব্বুর এই রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, নিঃস্বার্থ সেবক, চিকিৎসক বন্ধু করিম কাকু ছিলেন আমাদের ভরসাস্থল। তাঁর সদাহাস্য চেহারা ও মজার মজার আলাপ শুনে অসুখ অর্ধেক ভালো হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে আজ স্বজনহারা সন্ধ্যার মতো একরাশ অন্ধকার জমে রয়েছে। তিনি হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, 'ভাবি, তাজউদ্দীন ও তাঁর সহকর্মীদের আর্মিরা মেরে ফেলেছে।' খবরটি শুনে আম্মা হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেলেন। আম্মার হাত আঁকড়ে ধরে আমি বলে উঠলাম, 'এ নিশ্চয়ই ভুল সংবাদ।' করিম কাকুর পরিচিত ডাক্তার সেকান্দারের চেম্বার ছিল জেলের কাছেই বকশি বাজারে। তিনি ভোরবেলায় ওনাকে ফোন করে জেলের ভেতরে হত্যাকাণ্ডের দুঃসংবাদটি জানান।

একটা গভীর আতঙ্ক নিয়ে আম্মা, রিমি ও আমি সারা দিন ছোটাছুটি করলাম। কত জায়গায় যে গেলাম ও কতজনের কাছে যে ফোন করলাম তার হিসেব নেই। তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা তার বাবার খবর জানতে চাইছে এ কথা জেনে ঊর্ধ্বতন মহলের কেউ কেউ সতর্ক হয়ে গেলেন। ফোনে কিছু বলতে চাইলেন না। ততক্ষণে একটা কথা সকলের মুখেই শোনা যাচ্ছিল। গতকাল সোমবার ৩ নভেম্বর ভোর রাতে জেলে পাগলা ঘণ্টি ও গোলাগুলির শব্দ শোনা গিয়েছে। নাজিমুদ্দীন রোডে অবস্থিত জেলখানার আশপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁদের মধ্যে পরিচিত কয়েকজন আমাদের সংবাদটি জানালেন। যদিও সরকারি প্রশাসন ৪ নভেম্বরের সারাটি দিন পেরিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের কিছুই জানায়নি। মিডিয়াও এ বিষয়ে নিস্তব্ধ।

বেগম নুরুন্নাহার সামাদ আম্মার সঙ্গে দেখা করতে মফিজ কাকুর বাসায় এলেন। তাঁর স্বামী স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ কাকুও আব্বুদের সঙ্গে জেলে বন্দী ছিলেন। জেলের পাশাপাশি তিন রুমের একটিতে মনসুর আলী কাকুর সঙ্গে উনিও ছিলেন। জেলে পাগলা ঘণ্টি ও গোলাগুলির আওয়াজের খবর সামাদ-কাকির কানেও পৌঁছেছে। তাঁর চোখ দুটি ছলছল করছিল। আমাদের এক আত্মীয় দুপুরে আমাকে ও হাসান ভাইকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে জানালেন যে আব্বুকে জেলে হত্যা করা হয়েছে। খবরটি শুনে বেদনামিশ্রিত অবিশ্বাস্য কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম, 'হতেই পারে না। আব্বুকে মেরে ফেললে দেশের কী হবে ?' যদিও কোনো দেশই একটি মানুষের বেঁচে থাকার ওপর নির্ভরশীল নয়, তারপরও একটি নব্য স্বাধীন দেশের উন্নতির জন্য নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব তো প্রতিযুগে আসে না।

সেই নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে থাকে শত বছরের সাধনা ও আত্মোৎসর্গের ফসলরূপে। আব্বুকে মনে হতো তিনি যেন সেই শত বছরের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় পাওয়া এক মানুষ, সময় ও সুযোগ পেলে যিনি গড়ে তুলতে পারতেন সোনার বাংলা। হঠাৎ তাঁকে হত্যা করার সংবাদটি এ জন্যই যেন ছিল অবিশ্বাস্য !

বিকেল পর্যন্ত আম্মাসহ আমরা একবার আমাদের বাসায় আর একবার মফিজ কাকুর বাসাসহ বিভিন্ন জায়গায় ছুটতে থাকলাম। আমাদের বাসা ও মফিজ কাকুর বাসাতে মানুষজন নানা খবর নিয়ে ছুটে আসছিল। বিকেল ৪টার দিকে যখন আবারো মফিজ কাকুর বাসায় গেলাম তখন দেখি কয়েকজন মহিলা ঘরে ঢুকছেন। তাঁদের একজন পরিচয় দিলেন যে তিনি মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের মা। ফুফাতো ভাই বাবুল সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। খালেদ মোশাররফের মা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাজউদ্দীন সাহেব তোমার কে হয় ?' বাবুল জবাব দিল, 'মামা হয়।' তিনি বাবুলকে বললেন, 'একটু এইদিকে শোনো' এই বলে তিনি ও বাকি মহিলারা বাবুলকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাবুলকে কী যেন বলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলেন। তাঁরা যেতে না যেতেই ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল বাবুলের হাহাকার-ভরা আর্তনাদ। ঘরে ঢুকে দেখি জ্ঞানহারা বাবুল 'মামা' 'মামা' বলে চিৎকার করে বিছানায় লুটোপুটি খাচ্ছে। খালেদ মোশাররফের মা বাবুলকে বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন সাহেব জেলখানায় মারা গেছেন। কিন্তু এই খবর এখন বোলো না। আমরা চলে যাওয়ার পর বলবে।' (খন্দকার মোশতাক ও তদানীন্তন মেজর আবদুর রশীদের নির্দেশে এই বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই দুইজন হত্যাকারীদের জন্য জেল গেট খুলে দেবার হুকুম দেয়। বিগ্রেডিয়ার আমিনুল হক, বীর উত্তম, যাকে খালেদ মোশাররফ জেল হত্যার তদন্তে নিয়োগ করেছিলেন, তিনি ১৬ জুন, ১৯৮৭'র সাক্ষাতে এই তথ্য আমাকে দেন।)

পড়ন্ত বিকেলে গাঢ় সন্ধ্যা যেন নেমে এল ঝপ করে। চারদিকে শুধু আঁধার ও আর্তনাদ। সবচেয়ে বড় বেদনা তখুনি যখন প্রকাশের সব ভাষা হারিয়ে যায় নিমেষেই। কেমন যেন যন্ত্রচালিতের মতোই রিমিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম আমাদের বাসায়। মনে হলো সারাদিন পাওয়া খবরগুলো অদ্ভুত কোনো দুঃস্বপ্ন। জেলে পাগলা ঘন্টি, গোলাগুলি, আব্বু নিহত ! এবার হয়তো বাসায় কেউ ভালো খবর নিয়ে আসবে, এমনি নিভু নিভু আশায় বুক বেঁধে আম্মার পাশে এসে দাঁড়ালাম। এক এক করে আম্মাকে ঘিরে মানুষের ভিড় জমে উঠতে থাকল। আম্মা চেয়ারে বারান্দায় হেলান দিয়ে বসা, বাকরুদ্ধ বেদনাক্লিষ্ট। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ময়েজউদ্দীন আহমদসহ আব্বুর বেশ ক'জন সহকর্মী ও বন্ধু নিয়ে এলেন পাকা খবর। জেলখানায় আব্বু ও তাঁর তিন সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়েছে। খবরটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আম্মা হয়ে গেলেন নিস্পন্দ। সংবাদদাতাদের দিকে আম্মা তাকিয়ে রইলেন নিস্পন্দ দৃষ্টিতে। আমি ছুটে আব্বু ও আম্মার ঘরে ঢুকলাম। ওনাদের খাটে বসে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কতক্ষণ ওভাবে অশ্রুপ্লাবনে সিক্ত হয়েছিলাম জানি না। তারপর কেমন যন্ত্রচালিতের মতোই ঘরের লাগোয়া বাথরুমের বেসিনের সামনে দাঁড়ালাম। কল খুলে সারা মুখে অনেকক্ষণ ধরে পানির ঝাপটা দিতে থাকলাম। যেন পানির ঝাপটায় ধুয়ে যাবে সব দুঃখ। অথবা বেদনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই হয়তো বা সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ঘরের বাইরে থেকে অগণিত মানুষের কোলাহল ভেসে এল। আমি দরজা খুলে ঘরের বাইরে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে বারান্দা থেকে আম্মাকে ড্রইংরুমের সোফায় বসানো হয়েছে। আম্মার পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছেন চেনা-অচেনা অনেকেই। আম্মার পরনে মলিন একটা সুতির শাড়ি। এলোমেলো চুলে ঘেরা

আম্মার মুখজুড়ে কী নিদারুণ হাহাকার। একপর্যায়ে আম্মা ডুকরে কেঁদে বললেন, 'এই সোনার মানুষটাকে ওরা কীভাবে মারল ! দেশ কী হারাল।' রোগে জীর্ণ শোকাতুর মফিজ কাকু মধ্যের ঘরের খাটের ওপর লুটিয়ে পড়ে 'ভাই সাব, ভাই সাব' আর্তনাদ করে কাঁদতে থাকলেন। কাকি কাঁদতে কাঁদতে আমাদের মাথায় হাত বুলাতে থাকলেন। পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষ জানালেন যে মানুষের ভিড় কমে যাওয়ার পর পুলিশের গাড়িতে করে আব্বুকে বাসায় নিয়ে আসা হবে। অনেকেই বললেন যে, চারদিকের অবস্থা ভালো না। লাশ না আসা পর্যন্ত আমাদের বাসায় না থাকাই ভালো।

আম্মা, মিমি ও সোহেলকে নিয়ে যাওয়া হলো লালু ফুফুর বাসায়। রিমি ও আমাকে মফিজ কাকু ও কাকি তাঁদের বাসায় নিয়ে গেলেন। গভীর রাতে বড়ফুফুর ছেলে মুক্তিযোদ্ধা শাহিদ ভাইয়ের (আবু সাঈদ) কাছে জেল কর্তৃপক্ষ আব্বুর মরদেহ হস্তান্তর করে। রাত ১২টা ২৫ মিনিটে পুলিশের প্রহরায় পুলিশের ট্রাকে করে জেলখানা থেকে চিরনিদ্রায় শায়িত আব্বু ঘরে ফিরলেন, সঙ্গে ফিরল আব্বুর রক্তমাখা ঘড়ি, জামা, স্যান্ডেল ও বুলেটে ছিদ্র হওয়া টিফিন কেরিয়ার, যাতে করে ১ নভেম্বর বিকেলে আব্বুর জন্য আম্মা খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন। আব্বুর কুরআন শরিফটি বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। আব্বুর মহামূল্যবান ডায়েরিটি জেলেই রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যায়। (আব্বুর সঙ্গে বন্দী ছিলেন এ. এস. এম মহসীন বুলবুল। ১৯৮৭ সালের ৮ জুলাই যখন তাঁর সাক্ষাৎকার নেই, তখন তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে আওয়ামী লীগের এক নেতা কোরবান আলী, যিনি পরে প্রেসিডেন্ট এরশাদের দলে যোগ দেন, তিনি নিজের কাছে ডায়েরিটি এবং বুলেট ঝাঁঝরা হওয়া কুরআন শরিফটি রেখে দিয়েছিলেন)।

কে যেন খবর দিল যে আব্বু ঘরে ফিরেছেন। আমরা আব্বুকে শেষ বিদায় জানাতে বাসায় ফিরলাম।

নিচতলার জলছাদ-ওয়ালা গাড়ি বারান্দার পাশের ঘরটিতে আব্বু শুয়ে রয়েছেন। ১৫ অগাস্টে এই ঘরটিতেই মিলিটারি আস্তানা গেড়ে আমাদের গৃহবন্দি করে রাখে। স্বাধীনতা-পূর্বকালে এই ঘরটি আব্বু ব্যবহার করতেন লেখাপড়া, মিটিং ও অফিসের কাজকর্মের জন্য। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই ঘরটিতে বসেই আব্বু দেশ পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ তৈরি করেছিলেন। শৈশবে ঘরটির জানালার পাশে বসে আমি খেলতাম। আব্বু টেবিলে রাখা মর্নিং নিউজের পাতা থেকে আমার জন্য কার্টুন জমিয়ে রাখতেন। জানালা পথে গাড়ি বারান্দার কলাম বেয়ে ওঠা মাধবীলতার ঝাড়ে পাখির আনাগোনা দেখে আমি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠতাম, 'আব্বু, পাখি, পাখি।' আব্বু মিষ্টি হেসে বলতেন, 'ঐ পাখির নাম জানো ? ওর নাম তিতির।'

ঐ একই ঘরে আজ প্রবেশ করছি, কিন্তু পরিস্থিতি ও পরিবেশ কত ভিন্ন ! আজ আমি মুখোমুখি হতে চলেছি এক নিষ্ঠুর সত্যের। আমি যেন নিজ হৃদয়েরই রক্ত ঝরা আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি, 'ভালোবাসার মানুষ কেমন করে নিমেষেই স্মৃতি হয়ে যায়। সবই অনিত্য, সবই অস্থায়ী !'

ঘরে ঢুকতেই দেখি ভেতরে আম্মা। যেন কোনো পাষাণ মূর্তি। আমাদের থমথমে গলায় বললেন, 'যাও তোমার আব্বুকে দেখে এসো। আমি সারারাত ওঁর পাশে বসে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি।' ঐ তো এক পাশে মাথা হেলিয়ে আব্বু শুয়ে আছেন। কী নিশ্চিন্ত চেহারা। রিমি ও আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম, 'আব্বু, আব্বু !'

৫ নভেম্বর, বুধবার। সূর্য তখনো ওঠেনি। শান্ত ভোর আজ সরব হয়ে উঠেছে অগণিত মানুষের গুঞ্জরণে। সাতমসজিদ সড়কের মাইল খানেক দূর থেকে মানুষের বিশাল লাইন শুরু হয়েছে; শ্রদ্ধাবনতভাবে তাঁরা নিচতলার ঘরটিতে প্রবেশ করছেন। তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতার প্রতি

শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, একে একে তাঁরা বেরিয়ে আসছেন। আমি দরজার এক কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। ঐ তো ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম দরজার কাছে দাঁড়ানো, চোখে অশ্রু টলোমলো। ঐ দেখা যায় অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে 'মামা, মামা' (পরিচয় সূত্রে আব্বুকে তিনি মামা ডাকতেন) বলে অঝোরে কেঁদে চলেছেন। ঐ যে একসারি মানুষ কেমন চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু মানুষ চেনা, অধিকাংশই অচেনা, এনারা কারা ? কেন আসছেন ? আব্বু কি সত্যিই নেই ?

পেছনের গ্যারেজের কাছে আব্বুর নিজ হাতে করা বাগানের এক কোণে লাকড়ির চুলায় বড় হাঁড়িতে গরম পানি বসানো হলো। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে রিমি চুলার আগুন জ্বালাল। বারেক মিয়া, ১৯ নম্বর রোডে অবস্থিত মসজিদের ইমাম সাহেব ও সাঈদ ভাই গোসলের তদারকিতে ব্যস্ত। ছোট্ট সোহেল কেমন অসহায়ের মতো আব্বুর চারপাশে ঘুরে ঘুরে আব্বুকে দেখছে। মাঝে-মাঝে আব্বুর মাথার কাছে বসে থাকছে অনেকক্ষণ ধরে। বিমর্ষভাবে মিমি একবার আম্মার কাছে আর একবার আব্বুর কাছে ঘোরাফেরা করছে। রিমি বলল, যে আব্বুর ডান পায়ের গোড়ালিতে বুলেটের রক্তাক্ত ক্ষত সে দেখেছে। আমার শক্তি ছিল না সেই দৃশ্য দেখার। আমাদের সমবয়সী চাচাতো বোন (মফিজ কাকুর মেয়ে) দিপি দেখল যে বুলেট আব্বুর গোড়ালির এপাশ-ওপাশ ফুঁড়ে বেরিয়েছে। ডান কোমরের এক পাশে কিছু মাংসও ঝুলে থাকতে সে দেখেছিল।

গোসল করানোর সময় বারেক মিয়া ও সাঈদ ভাই আব্বুর শরীরের তিন জায়গায় বুলেটের ক্ষত দেখতে পান। একটি ডান পায়ের গোড়ালির সন্ধিস্থলে, দ্বিতীয়টি উরুতে এবং তৃতীয়টি ছিল নাভি থেকে ছয়-সাত ইঞ্চি দূরত্বে ডান কোমরের হাড়ের ঠিক পাশে কিডনি বরাবর। আব্বুর মৃত্যু নিয়ে কিছু কিছু মন্তব্য ভিড়ের মধ্যে আমাদের কানে এল। কেউ একজন বললেন, যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে নাকি উল্লেখ করা হয়েছে যে বুলেট বিদ্ধ হওয়ার পর রক্তক্ষরণে আব্বুর মৃত্যু হয়। অন্য কেউ আপসোস করে বললেন, 'আহা, জেল কর্তৃপক্ষ যদি সঙ্গে সঙ্গেই তাজউদ্দীন ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন তাহলে তিনি বেঁচে যেতেন।' মনসুর আলী কাকুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রিমি দিপিকে সঙ্গে নিয়ে ১৯ নম্বর রোডে ওনাদের এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিল। ঐ বাসায় তাঁর মরদেহ রাখা হয়েছিল। রিমি ও দিপি দেখল যে তাঁর বাঁ চোখটা খোলা ও জবা ফুলের মতো লাল। তাঁর পেটের সাদা কাফন রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল। ওখানে তাঁকে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করা হয়।

দোতলার ভেতরের বারান্দায় বসা আম্মার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই আম্মা আমার হাত আঁকড়ে ধরে বললেন, 'দেখো তোমার আব্বুকে বিদায় দিতে আজ কতজন এসেছে।' জানালা পথে আমগাছের নিচে ট্রাকের ওপর শায়িত আব্বুকে ঘিরে থাকা শত শত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে দেশ, যে মানুষ ছাড়া তুমি কিছু বোঝনি আজ দেখো তোমাকে বিদায় দিতে কত মানুষ এসেছে।' নিচের তলা ও রাস্তাভরা শত শত মানুষ। দোতলায়ও আম্মাকে ঘিরে লোকে লোকারণ্য। জেলহত্যার খবর পেয়ে ধানমণ্ডি স্কুলের বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীই স্কুল থেকে সেদিন ছুটে এসেছিলেন আমাদের পাশে—খালেক স্যার, মনীষাদি, জোহরা আপা, আরও কতজন এসেছিলেন সমবেদনা জানাতে।

আব্বু ও তিন নেতাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কবর দেওয়ার দাবিতে সেদিন অনেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন। মোশতাক সরকারকে অপসারিত করে খালেদ মোশাররফ ৩ নভেম্বর থেকে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। জাতীয় চার নেতাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাফনের ব্যাপারে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত দেননি, এ কথা অনেকেই বললেন। সামরিক ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানাল যে আব্বু

ও তিন নেতাকে বনানি কবরস্থানে দাফন করা হবে। এ কথা শুনে আমাদের বাসার সামনে সকলেই শ্লোগান দিয়ে জোর প্রতিবাদ জানাল।

পুলিশ কয়েকজনকে সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করল, প্রতিবাদরত অনেকের গায়ে পড়ল পুলিশের লাঠির বাড়ি। জনতা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। আর্মি-পুলিশ কর্তৃপক্ষ আব্বুকে বনানিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল, যেন তারা জানাজা বাদেই আব্বুকে সেখানে নিয়ে যাবে। বেলা দেড়টার দিকে মফিজ কাকু তাঁর পরম ভালোবাসার 'ভাই সাহেবের' জানাজা পড়ালেন তাঁরই হাতে লাগানো আমগাছের নিচে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সফররত রাজনীতিবিদ নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান আমের চারাটি আব্বুকে উপহার দেন। আব্বু যত্ন সহকারে চারা গাছটি আমাদের বাসার সামনে লাগিয়েছিলেন। সযত্ন পরিচর্যায় বড় হওয়া গাছটির ছায়ায় বিশ্রাম নিত পথচারী ও শ্রমে ক্লান্ত মুটে-মজুরের দল। আজ সেই গাছ ছায়া দিচ্ছে জনতার শ্রদ্ধা-বেষ্টনীর মাঝে শায়িত এমন এক মানুষকে যাঁর জীবনের প্রতিটি পল উৎসর্গীকৃত হয়েছিল মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে।

আম্মার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা দোতলার জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে রইলাম। জানাজা শেষে আব্বুকে বহনকারী ট্রাকটি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। ট্রাকের সঙ্গে সোহেলকে কোলে করে চলে গেলেন মফিজ কাকু। তাঁর সঙ্গে গেলেন ছোট-কাকু, শাহিদ ভাই, সাঈদ ভাই, দলিল ভাই, বাবুল, মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান, খালেদ খুররম, আবু মোহাম্মদ খান বাবলু ও আরও দু-একজন। আর্মি-পুলিশের বাধায় খুব বেশি লোক বনানি কবরস্থানে যেতে পারেনি। যাঁরা আব্বুর সঙ্গে গেলেন তাঁরাই বকুলগাছের নিচে আব্বুকে তাঁর শেষ শয্যায় শায়িত করলেন। বড় মামা সোহেলকে ডাকলেন। সোহেলের হাতে পড়ল তার বাবার কবরের প্রথম মাটি।

ট্রাকটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল হৃদয়ের এক বড় অংশ। আমগাছ থেকে একটু দূরে, লাঠিতে ভর করে নানা একাকী দাঁড়ানো, পরনে ধবধবে সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবি, মাথায় সাদা টুপি। অশ্রুজলে তাঁর শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল প্লাবিত হয়ে গেছে। তিনি কাঁদছেন। নানাকে কাঁদতে দেখা সেই প্রথম।

সেই কবেকার কথা। আমার বয়স তখন চার কি পাঁচ। ধানমণ্ডির বাড়ির নিচতলায় আব্বু আম্মার ঘরে সকালবেলায় আমি ঘুমাচ্ছি। ঘুমের মধ্যেই একসময় বড়খাটটি জুড়ে গড়াতে শুরু করলাম। হঠাৎ শুনি আব্বুর গলা, 'এই পড়ল, এই পড়ল'। চোখ মেলে দেখি ঘরের লতাবেলীতে ছাওয়া জানালার পাশের টেবিলের ধারে আব্বু বসা। হাতে কলম ধরা। তিনি চেয়ার থেকে ঘুরে, আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন। যাতে গড়াতে গড়াতে নিচে না পড়ে যাই। আব্বুকে দেখেই চোখ দুটি আবারও বুজে পরম নিশ্চিন্তে আমি গড়াতে শুরু করলাম। জানি, আমি পড়তে গেলেই আব্বু ধরে ফেলবেন। সন্তান পড়ে গেলে তাকে ধরা বাবার কাজ। আঘাত থেকে রক্ষা করে ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরা সে-ও পিতামাতারই কাজ। আর দেশকে সন্তানতুল্য ভালোবেসে, মহৎ আদর্শ ও নীতিকে সমুন্নত রেখে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করা সে তো আব্বুর কাজ।

আব্বু অমর্ত্যালোকে চলে গেলেন আমাদের হৃদয়কে শূন্য করে। কিন্তু আসলেই কি চলে গেলেন ? যারা অসীম প্রেমময় ও সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার আরাধনাকে রূপান্তরিত করেন মেহনতি ও নির্যাতিত মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির সংগ্রামে, তারা আশা-আলোর দিশারী হয়ে অমরত্ব লাভ করেন এ জগতেও।

In Search of a Pearl
I found the Ocean !

তথ্যসূত্র

১. Christopher, Hitchens, The Trial of Henry Kissinger, London, New York, Verso, 2001, P.52-54. এ বিষয়ে আরও তথ্য এই বইটিতে পাওয়া যাবে

২. ইউটিউব লিংক: সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকেরেনহাসের কাছে দেওয়া লে. কর্নেল আবদুর রশীদ ও লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানের সাক্ষাৎকার

http// www.youtube.com/watch?v=dgllic OQYUK

৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ আগস্ট, ১৯৭৫। তাজউদ্দীন আহমদসহ ২৬ জনকে গ্রেপ্তারের দিনটি পত্রিকায় ২৩ আগস্ট হিসেবে উল্লেখিত হয়। কিন্তু সঠিক তারিখটি ছিল শুক্রবার, ২২ আগস্ট, ১৯৭৫

৪. Jack Anderson with George Clifford. The Anderson Papers. New York : Ballantine Books, 1974, P. 280

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

পরিশিষ্ট

সাক্ষাৎকার

আম্মা ও ভাইবোনদের সাক্ষাৎকার

আব্বুকে যখন হত্যা করা হয় তখন ছোট বোন সিমিন হোসেন রিমি (লেখক, সমাজকর্মী ও সাংসদ) ও আমি কিশোরী। কনিষ্ঠতম বোন মাহজাবিন আহমদ মিমির (লেখক, কবি ও সমাজকর্মী) বয়স সে সময় নয় বছর ও একমাত্র ছোট ভাই তানজিম আহমদ সোহেল (প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদ) পাঁচ বছরের শিশুমাত্র। আব্বু সম্বন্ধে রিমি তার বহুল প্রশংসিত বই *আমার ছোটবেলা : ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ* (২০০১)-এ বহু মূল্যবান তথ্যের জোগান দিয়েছে এবং স্মৃতিচারণ করেছে। সে লিখে চলেছে অবিরাম। আব্বু সম্বন্ধে আমার প্রথম স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধ 'তাজউদ্দীন নেতা না পিতা'র (সচিত্র সন্ধানী/বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৭৯) মধ্য দিয়ে আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি একজন অসাধারণ মানুষকে। সেই প্রচেষ্টা বিবর্তিত হয়েছে আরও নানা লেখার মধ্য দিয়ে।

এবারে আব্বুকে ঘিরে আম্মা, রিমি, মিমি ও সোহেলের শৈশবের স্মৃতিভিত্তিক সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে এক মহৎ প্রাণ অনন্য মানুষের চরিত্রের অপ্রকাশিত দিকগুলো ও তাঁকে হারানোর অন্তহীন বেদনার স্মৃতিমালা উন্মীলিত হলো।

(যুক্তরাষ্ট্র হতে ঢাকায় টেলিফোনে ধারণ করা এই সাক্ষাৎকারগুলো তারিখ অনুযায়ী উল্লেখিত হলো।)

মিমির সাক্ষাৎকার

রিপি : মিমি তোমার ছোটবেলায় আব্বুকে তুমি যেভাবে দেখেছ এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলো তোমার মনে দাগ কেটেছে, সে সম্বন্ধে তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।

মিমি : আমি একটি মজার ঘটনা দিয়েই আব্বুর স্মৃতিচারণা করব। ১৯৭৪-এর শেষের দিকের ঘটনা সেটি। আব্বু তখন মন্ত্রিসভা থেকে রিজাইন দিয়ে আমাদের নিয়ে ধানমণ্ডির বাসার দোতলায় উঠেছেন। আম্মা সবেমাত্র পুরো বাসার দেওয়ালে সুন্দর করে সাদা রং করিয়েছেন। আমি তখন ক্লাস ফাইভে উঠি। নতুন ক্লাসের জন্য আমি সদ্য লসাগু বা লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক শিখেছি। মনের আনন্দে আমি সেই লসাগু নতুন রং করা সাদা দেওয়াল জুড়ে লিখে চললাম। আম্মা, আমার ওই দেওয়াল অঙ্কন দেখে মোটেও প্রীত হলেন না। তিনি আমার কান মলে বললেন, 'দাঁড়াও, তোমার আব্বুকে দেখাচ্ছি'। আম্মার নালিশ শুনে আব্বু এলেন সরেজমিনে দেখতে। রাগ করার বদলে তিনি মুগ্ধ নয়নে সাদা দেওয়াল ভরা আমার লসাগু দেখে আম্মাকে বললেন, 'দেখো লিলি, কী পাকা হাতের লেখা !'

আর একবার আমি ও সোহেল বাথরুমের ঝরনার নিচে হাফপ্যান্ট পরে মহানন্দে গোসল করছিলাম। একবার আমি সোহেলকে ধাক্কা দিয়ে ঝরনার নিচে দাঁড়াচ্ছিলাম। আর একবার সোহেল। বেশ মজা করে আমরা দুই ভাইবোন গোসল করছিলাম। অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়াতে আম্মা তাড়া দিলেন 'এই তোমরা শিগগির গোসল শেষ কর।' এরই মধ্যে আব্বু আমার ভূগোল খাতা নিয়ে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, 'এই ভূগোল খাতা কি তোমার ?' আমি বললাম 'হ্যাঁ আমার।' আব্বু খুব খুশি হয়ে খাতা খুলে আম্মাকে আমার লেখা ও আঁকা আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, সৌর জগতের ছবি দেখিয়ে বললেন, 'দেখো কী সুন্দর ওর হাতের লেখা !'

আমার মনে আছে যে আমাদের একটি সাদা-কালো জাপানি এনইসি টিভি ছিল। সেই টিভিতে Anna and the King সিরিয়ালটি প্রত্যেক রোববার সকালে আমরা দেখতাম। তারপর আব্বু আমাকে ও সোহেলকে ধানমণ্ডির দোতলার সিঁড়ির কাছের বাথটাবটিতে নামিয়ে দিতেন। ঐটিই একমাত্র বাথটাবওয়ালা বাথরুম ছিল। আমরা মহাফূর্তিতে বাথটাবে ঝাঁপাঝাঁপি করতাম। আব্বু বাথরুমের পাশের ঘরের ইজি চেয়ারে বসে পড়তেন।

রিপি : আব্বু, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা খুব পছন্দ করতেন। ১৯৬৬-তে জেলে যাওয়ার আগে, নিচতলার বাথটাবওয়ালা বাথরুমে তিনি রিমি ও আমার সঙ্গে গোসল করতেন। বাথটাব ভর্তি পানির মধ্যে রিমি ও আমি ঝাঁপাঝাঁপি করতাম। গেঞ্জি-লুঙ্গি পরিহিত আব্বু বাথটাবে শরীর ডুবিয়ে ঘুমের ভান করতেন। তারপর হঠাৎ 'হাউ' শব্দ করে আমাদের চমকে দিতেন। শুধু রাজনৈতিক জীবনই নয়, আব্বুর চরিত্রের এই কোমল ও উজ্জ্বদিকগুলো থেকেও মানুষের জানার ও শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু রয়েছে। বাংলাদেশে ও ট্রাডিশনাল অনেক সমাজেই বাবারা সাধারণত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব একটা ইনভলভড থাকেন না। রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে আব্বুকে আমরা খুব একটা কাছে পাইনি। তা সত্ত্বেও যতটুকু পেয়েছি, তা যেন পরম পাওয়া।

মিমি : হ্যাঁ, তাই। আব্বু যখনই সময় পেয়েছেন, আমাদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করেছেন। রিজাইন দেওয়ার পর তাঁর হাতে অনেক বেশি সময় ছিল। সেই সময় তিনি ব্যয় করতেন খুব সুন্দরভাবে। মনে পড়ে, তিনি বিকেল ৩টার দিকে ঘরে বিশ্রাম নিতেন। বিকেল ৪টায় দিবানিদ্রা থেকে উঠে সোহেল ও আমাকে ওনার দুই হাতের দুই কড়ে আঙুলের মাথায় ধরে বৈকালিক ভ্রমণে বের হতেন। আমাদের দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা তিনি মনোযোগের সঙ্গে দেখতেন। উপভোগ করতেন।

রিপি : এবারে তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই ৪ ও ৫ নভেম্বরের দিনটির কথা।

মিমি : ৪ তারিখে মফিজ কাকুর বাসার ঘরের মাটিতে বাবুল ভাইকে রোলিংপিনের মতো এ-মাথা থেকে ও-মাথা গড়াগড়ি খেতে দেখেছিলাম। উনি 'ও মামাগো, ও মামাগো' আর্তনাদ করে কাঁদছিলেন। ৫ তারিখ সকাল থেকে বাসার উত্তর দিকে আবাহনীর মাঠ থেকে আমাদের বাসার সামনে ছিল বিশাল লাইন। বাসার দক্ষিণে বিডিআর-এর গেট থেকেও আমাদের বাসা পর্যন্ত বিরাট লাইন ছিল। সকলেই লাইন করে নিচতলার সামনের ঘরে রাখা আব্বুকে দেখতে আসছিল। ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা রেজা ভাইকে মিছিল নিয়ে আসতে দেখলাম। আমি বারবার ওপর-নিচ করছিলাম। একবার আম্মাকে দেখছিলাম, আর একবার আব্বুকে। দোতলার বারান্দায় বসা আম্মা কেঁদে কেঁদে আক্ষেপ করছিলেন 'আমি রিট পিটিশন করেছিলাম। পেরোলটা হয়ে গেলেই ও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যেত।' গ্যারেজের কাছে, পিছনের বাগানে আব্বুকে গোসল করানোর সময় সাঈদ ভাই ও হাসান ভাইয়ের গোসল সংক্রান্ত কথাবার্তা ভেসে আসছিল। তুমি, আমাকে ও সোহেলকে দোতলার বারান্দার জানালার সামনে দাঁড় করালে।

জানালার বাইরে, আম গাছের নিচে ট্রাকে আব্বুকে রাখা হয়েছিল। সোহেল খুব কাঁদছিল। তুমি সোহেলকে বললে, 'সোহেল কেঁদো না। আমরা বড় হয়ে এর বদলা নেব।'

রিপি : সামগ্রিকভাবে আব্বুকে কীভাবে তুমি মূল্যায়ন কর ?

মিমি : ব্যক্তি হিসেবে আব্বুর সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভিন্নতা আমি লক্ষ করি। একাধারে তিনি এ জগতের হয়েও এ জগতের নন। রবিঠাকুর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যেভাবে মনোনিবেশ করেছেন, নিজ ভাই ও আত্মীয়স্বজনকে উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে রচনা করেছেন 'সোনার তরী'র মতো মহাকাব্য। আব্বু জাগতিক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ও ছোটখাটো বিষয়গুলো যেমন দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও সুরাহা করেছেন, তেমনি জাগতিক বিষয়াবলির বাইরের মানবিক, আত্মিক ও বিমূর্ত দিকগুলোর সঙ্গেও সমানভাবেই সম্পৃক্ত থেকেছেন। রবিঠাকুরের পরই উনি হাতেগোনা বাঙালির মধ্যে একজন, যিনি যতটুকু স্পৃহা ও উদ্দীপনা নিয়ে জাগতিক বিষয়গুলোকে দেখেছেন তেমনি একই স্পৃহা ও উদ্দীপনায় তিনি মানবিক ব্যাপারগুলোকেও উপলব্ধি করেছেন।

রিপি : আম্মার মধ্যেও কিন্তু একই ধরনের আত্মিক, জাগতিক ও মানবিক গুণাবলির সমন্বয় দেখা যায়।

মিমি : হ্যাঁ, সে জন্যেই ওনাদের মধ্যে এত মিল ছিল। ওনারা ছিলেন পরস্পরের যোগ্য জীবনসঙ্গী।

(রবি ও বুধবার, ৪ ও ২১ জুলাই, ২০১০)

সোহেলের সাক্ষাৎকার

রিপি : আব্বুকে যখন হত্যা করা হলো, তখন তোমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। সেই সময় আব্বুকে ঘিরে তোমার স্মৃতির পটে যে ঘটনাগুলো আজও জাগ্রত, সে সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।

সোহেল : আমার অল্প বয়সে আব্বু চলে যাওয়াতে ওনার সঙ্গে আমার স্মৃতির সংখ্যা হয়তো কম কিন্তু প্রতিটি স্মৃতিই খুব মূল্যবান ও দিকনির্দেশনাকারী। বর্তমান রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে আব্বু ছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিবিদেরা অধিকাংশ সময়ই মানুষের হাততালি নেওয়ার জন্য বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য মানুষের সামনে এক রূপ ধারণ করেন কিন্তু পেছনে অন্য রূপ। কিন্তু লোকচক্ষুর বাইরে মানুষ যে কাজটি করে থাকে তার মধ্যেই তো প্রকাশ পায় তার আসল রূপ। ব্যক্তি আব্বু ছিলেন একজন অসাধারণ দেশপ্রেমিক ও দুর্ধর্ষ ধরনের সৎ মানুষ। ঘরে ও বাইরে তিনি দেশপ্রেম বোধ ও সৎ জীবনযাপনের এক বিরল নিদর্শন স্থাপন করেছিলেন। মনে পড়ে, রাতে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর যখন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দেখানো হতো ও জাতীয় সংগীত বেজে উঠত, আব্বু সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং আমাকেও অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াতে বলতেন। আমি হাত টান টান করে আব্বুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতাম। এই ঘটনাটির স্মৃতি আমাদের ধানমণ্ডির বাড়িতে। আব্বু তখন অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

ওই ধানমণ্ডির বাড়িতেই একবার খাবার সময় যখন আম্মা আমাকে মাছ দিলেন তখন আমি ঘ্যানঘ্যান শুরু করলাম যে মাছ খাব না। আব্বু তখন আমাকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বললেন,

'দেশের মানুষ খাবার পায় না। লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আর তুমি মাছ খেতে চাও না ?' আব্বু যে কথাগুলো আমাকে বললেন, সেগুলো বোঝার বয়স তো তখনো হয়নি তারপরও আব্বু তো বিরত থাকেননি দেশ প্রেমের শিক্ষা দিতে। সে সময় ঐ কথা বুঝিনি কিন্তু আজ তা মনকে ভীষণ নাড়া দেয়।

ছোটবেলায় আমি খুব চঞ্চল ছিলাম। সবার ছোট বলে বড়দের কাছ থেকে অতি আদর পেয়ে বেশ আহ্লাদিপনা করতাম ও জেদও ধরতাম। আব্বু কিন্তু ছোট বলে বা একমাত্র ছেলে বলে প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি যেমন ভালোবাসা দেখাতেন তেমনি অযথা আবদার করছি দেখলে শাসনও করতেন, যাকে বলে 'tough love'। আম্মাকেও সতর্ক করতেন, বলতেন 'বেশি আদর দিয়ে ছেলেটাকে নষ্ট করে দিয়ো না'। সে সময় আব্বুর কথা শুনে আম্মাকেই সমর্থন করতাম। কিন্তু আজ বুঝি আব্বু কত সঠিক ছিলেন। অতি শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে ন্যায়নীতি বোধের শিক্ষা তিনি দিতেন তাঁর নিজের আচার, আচরণ ও উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে। আবার অজস্র ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার শিশুসুলভ কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতেন এবং অনেক সময় আমার সঙ্গে এমন আচরণ করতেন যেন মনে হতো আমিও বড় কোনো ব্যক্তি। আব্বু তখন অর্থমন্ত্রী। আব্বু ও আম্মাসহ আমি গাড়ি করে কাকরাইলের পাশ দিয়ে আসছি। হঠাৎ দেখি এক বিশাল হাতি সেই পথ দিয়ে চলছে। আমি বায়না ধরলাম যে হাতিতে চড়ব। আম্মা আমার মনোযোগ অন্যদিকে সরাবার চেষ্টা করলেন, ভাবলেন, আব্বু বিরক্ত হবেন। কিন্তু আব্বু সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থামিয়ে আমাকে হাতিতে চড়ালেন। সেদিন হাতিতে চড়ে আমার মনে মহা আনন্দ। আমার চার বছরের জীবনের সেটি এক অমূল্য স্মৃতি।

আর একবার আব্বু আমাকে সঙ্গে করে চিড়িয়াখানায় গেলেন। চিড়িয়াখানার কর্মকর্তারা আব্বুকে খুশিতে ঘিরে ধরেছে। ঐ ভিড়ের মধ্যেও আব্বু একটি জীবজন্তুর ছবিওয়ালা ব্যাজ নিজ হাতে আমার শার্টে গেঁথে দিলেন। আব্বু আমাকে মনে করে নিজ হাতে আমাকে ব্যাজ পরিয়ে দিয়েছেন এটা ভেবে সেদিন আমি খুব গর্বিত বোধ করেছিলাম।

আব্বু অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন আমাদের হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবনের আর একটি স্মৃতি মনে পড়ে। বিশাল গাছপালায় ঘেরা সেই বাসভবনের আশপাশে রাতের বেলা কোনো হায়েনা বা শেয়াল-জাতীয় জন্তু এসেছিল। আব্বু ওনার রাইফেলটি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে বললেন 'সোহেল, এসো'। আমি কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা নিয়ে আব্বুর পিছে পিছে গেলাম। সামনে পেছনের মাঠ ও গাছপালার আশপাশ ঘুরে আমরা ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে ফিরে আমি বললাম, 'আব্বু ভয় লাগছে।' আব্বু ওনার পিস্তলটি আমার বালিশের নিচে রেখে বললেন, 'ভয় নেই। এখন ঘুমাও।' আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে, আব্বু জীবনে কোনো প্রাণী এমনকি একটি পাখিও হত্যা করেননি এবং কোনো পশুপাখি জবাইয়ের দৃশ্য সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি অস্ত্র সংগ্রহ পছন্দ করতেন। রাইফেল ও পিস্তল-জাতীয় কিছু অস্ত্র শখ করে কিনেছিলেন।

আব্বু আমাকে দায়িত্ব দিতে পছন্দ করতেন। আমার মতামত বিবেচনা করতেন। আমার পাঁচ বছর বয়সে আমাদের ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে আব্বু আমাকে নিয়ে গেলেন স্কুলে ভর্তি করাতে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কাকলী স্কুল ছিল। সে সময় ঐ স্কুলের সামনে গাছের নিচে কোনো ক্লাস চলছিল। মনে হয় কোনো আর্টের ক্লাস। আমি স্কুলটা দেখে বললাম 'আব্বু, এই স্কুলে ভর্তি হব না। আমি গাছের নিচে পড়ব না।' এরপর কাছেই গ্রিন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটি দেখে খুব পছন্দ হলো। স্কুলের সামনের খেলার মাঠে দোলনা ও স্লাইডে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দেখে মনে হলো যে এটাই আমার স্কুল হবে। আব্বুকে মনের কথাটি জানাতেই আব্বু ঐ স্কুলে আমাকে ভর্তি করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেন। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস

আব্বুকে জানালেন যে তারা স্কুলে শুধু বিদেশিদের ভর্তি করেন। আব্বু যুক্তি উত্থাপন করে বললেন যে স্কুলটি চলছে বাংলাদেশের মাটিতে অথচ বাংলাদেশিদের ভর্তি করা হবে না সেটা কেমন কথা ! আব্বুর কথার পরই স্কুলের পলিসি পরিবর্তন করা হয়। তারা বাংলাদেশিদের জন্য, যতদূর মনে পড়ে, পাঁচ পার্সেন্টের একটি কোটা নির্ধারণ করে। আমি গ্রিন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হই।

জীবজন্তুর প্রতি আব্বুর খুব মায়া ছিল। মুজিব কাকু আমাকে যে খরগোশ দুটি উপহার দিয়েছিলেন তাদেরকে আব্বু নিজ হাতে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে খরগোশদের পরিচর্যা করতেন। আবাহনী মাঠে যখনই খেলা হতো আব্বুর কড়ে আঙুল ধরে আব্বুর সঙ্গে খেলা দেখতে যেতাম।

জেলে আব্বুকে হত্যা করার পর যখন আব্বুর লাশ আমাদের ধানমণ্ডির বাসায় নিয়ে আসা হলো, তখনকার খণ্ড খণ্ড স্মৃতিগুলো কেমন আলো-ছায়ার মতো মনে এখনো ভাসে। আলো-ছায়ার উপমাটি দিলাম এ কারণে যে তখনো মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়নি। আমি অগণিত মানুষের কোলাহল ও হাহাকার শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ঘটনার গভীরতা। আমি শুনতে পারছিলাম যে আব্বুকে হত্যা করা হয়েছে, বুঝতে পারছিলাম যে আব্বু আর নেই। কিন্তু আবারও মনে হচ্ছিল আব্বু আসলেই বেঁচে আছে। মনের মধ্যেই চিন্তার সংঘর্ষ চলছিল। আমাদের বাসার পেছনে গ্যারেজের সামনের উঠোন মতো জায়গায় আব্বুকে যখন গোসল করানো হচ্ছিল, আমি তখন সেখানে ঘোরাফেরা করছিলাম। বোঝার চেষ্টা করছিলাম কী হচ্ছে। আব্বুর মাথার কাছে অনেকক্ষণ বসে আব্বুকে দেখছিলাম। তারপর আবার ভিড়ের মধ্যে দোতলায় আম্মার কাছে যাচ্ছিলাম। দেখি আম্মা কাঁদছেন। কিছু বিদেশি সাংবাদিক ও দূতাবাস থেকে আগত বিদেশিদের দেখতে পেলাম তাঁরা আম্মাকে সমবেদনা জানিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি একটু ওপর-নিচ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমার ভেতরে অনুভূতিগুলো কেমন জট পাকিয়ে বিবশ হয়ে যাচ্ছিল। একসময় আমি অঝোরে কান্না শুরু করলাম। মনে হয় তুমি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলেছিলে।

রিপি : আমি বলেছিলাম, 'সোহেল কেঁদো না, আমরা বড় হয়ে এর বদলা নেব'। এই স্মৃতিটি আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, মিমির সাক্ষাৎকার থেকে জানলাম।

সোহেল : এ রকম মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে একটি শিশুর মনে কী আলোড়ন চলছে সে সম্পর্কে ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। আমাদের সামাজিক পরিবেশে অনুভূতিকে প্রায় সময়ই প্রকাশ করার বদলে ভেতরে চেপে রাখতে হয়। বিশেষ করে, একজন শিশু, যে এ রকম একটা নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছে, সে জানছে না যে কীভাবে সে তার বেদনাময় অনুভূতিকে প্রকাশ করবে। তার কাছ থেকে কেউ জানতে চাইছে না। সবার মাঝেও সে ভীষণ একা।

আব্বুকে যখন আব্বুরই হাতে লাগানো আমগাছের নিচে রাখা হলো আমি তখন আবারও আব্বুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ট্রাকে করে সবার সঙ্গে আমিও গেলাম বনানি কবরস্থানে। মনে পড়ে, একটা গাছের নিচে আব্বুর কবর খোঁড়া হয়েছিল।

রিপি : ওটা ছিল বকুলগাছ। ছোটবেলায় খুব ভোরে আব্বুর সাথে ধানমণ্ডির ২১ নাম্বার রাস্তায় চলে যেতাম বকুল ফুল কুড়াতে। মালা গেঁথে উপহার দিতাম আব্বু ও আম্মাকে।

সোহেল : হ্যাঁ, সেই বকুলগাছের নিচেই আব্বুকে মাটি দেওয়া হলো। আমার হাত দিয়েই আব্বুর কবরে প্রথম মাটি পড়ল। কারা যেন আমাকে ডাকলেন, বললেন, 'বাবা, তোমার বাবার কবরে একটু মাটি দাও'। আব্বু আমার চোখের সামনেই মাটির মধ্যে মিশে গেলেন। পরে

আমাকে বোঝানো হলো যে আব্বু বিদেশে। আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। আমার মনে হলো যে আব্বু হয়তো মাটির নিচ দিয়েই বিদেশে চলে গিয়েছেন। আমার ছয়-সাত বছর বয়স পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতাম যে আব্বু আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। যদিও আমার মনের এক অংশ জানত যে আব্বু মৃত। কিন্তু আব্বু বিদেশে চলে গিয়েছেন, এই কথাটি বিশ্বাসের মধ্যে মনে এক প্রকার স্বস্তি পেতাম।

আমার সাত বছর বয়সে আমার আদরের পোষা কুকুর হাইডি রাস্তায় দুর্ঘটনায় মারা যায়। আমি আমার সে বছরের ডায়েরিতে লিখেছিলাম যে আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো আমার বাবার মৃত্যু ও আমার কুকুর হাইডির মৃত্যু। শিশুমন জীবজন্তু ও মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য করে না। সে শুধু বোঝে যে প্রিয়জন, সে যে প্রজাতিরই হোক না কেন, তাকে হারানোর দুঃখ অপরিসীম। শিশুর ভালোবাসা খাঁটি ও অকৃত্রিম।

জীবনে অনেক দুঃখ-বেদনাকেই আমি অতিক্রম করেছি। কিন্তু আব্বুকে হারানোর বেদনা এখনো যেন জাগ্রত।

রিপি : আব্বুর সমস্ত জীবনটাই ছিল একটা পরিষ্কার আয়নার মতো।

সোহেল : হ্যাঁ, তাই। আব্বুর চালচলন ও চিন্তাধারা ছিল far advanced। তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়েই তিনি আমাদের জন্য monumental message রেখে গিয়েছেন।

(সোমবার, ৫ জুলাই, ২০১০)

রিমির সাক্ষাৎকার

রিপি : মেয়ে হিসেবে তুমি আব্বুকে কীভাবে মূল্যায়ন কর ?

রিমি : আব্বুর কথা আমি মেয়ে হিসেবে আলাদা করে চিন্তা করতে পারি না। উনি এমন একজন আলোকিত মানুষ যে তিনি যদি শারীরিকভাবে বেঁচে না-ও থাকেন, ওনার কাজের মধ্যেই তিনি চিরজীবী। খুব কষ্ট হয় যে এই মানুষটির অনেক কিছু দেবার ছিল, তাঁর অকালমৃত্যু নির্মম হত্যাকাণ্ড হওয়াতে তিনি সেটা দিতে পারলেন না। তার পরও যেটা মনে করে ভালো লাগে যে তাঁর কাজ যদি তুলে ধরা হয়, তাহলে তাঁর রোল মডেল ও আদর্শের অনুকরণে একটা রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণভাবে গঠন করা যায়।

রিপি : তুমি তো আব্বুর ছেলেবেলার সঙ্গীসাথিদের অনেকেরই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছ, তাঁদের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আব্বু সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো বের হয়ে এসেছে তা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।

রিমি : আব্বুর ডায়েরিতে কালুর বাপের (সাবু শেখ) অনেক উল্লেখ পাই। তাঁকে যখন নব্বই সালে ইন্টারভিউ করি উনি বললেন যে বালক তাজউদ্দীন যখন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলত সে কখনো ঝগড়া-বিবাদে শরিক হতো না। বরং সে সব সময় ঝগড়া মিটিয়ে দিত। সাধারণত অল্পবয়সীরা ঝগড়া, মারামারিতে সহজেই জড়িয়ে পড়ে, সে কখনোই ওসবে জড়াত না। ছোটবেলার ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে এমএলএ (প্রাদেশিক সদস্য) নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তাঁর

এলাকার থানায় চলে গিয়েছিলেন যে দরদরিয়া গ্রামের কোনো লোকের মামলা যেন থানা গ্রহণ না করে। উনি বলতেন যে যত ব্যস্তই আমি থাকি না কেন তোমাদের বিভেদ হলে আমি সালিশ করে দেব। তিনি মামলা-মোকদ্দমার বিরোধী ছিলেন। মামলা-মোকদ্দমা করে অযথা অপচয়, মন-কষাকষি ইত্যাদির বাইরে সুসম্পর্ককে তিনি দাম দিতেন। কালুর বাপ আরও বলেছিলেন যে অন্যের যে কোনো কাজ, তা যত ছোটই হোক না কেন, আব্বু তা এত আন্তরিকতার সঙ্গে করতেন যেন তাঁর নিজের কাজ। সাধারণত মানুষ অন্যের কাজ কখনোই এত যত্ন নিয়ে করে না।

রিপি : মানুষকে যিনি সত্যিকারের ভালোবাসেন, তিনি তাঁর কাজটিও নিজের মনে করেই করেন। আপন পর ভেদাভেদ করেন না। ভালোবাসার সঙ্গে নিখুঁতভাবে কাজ সম্পন্ন করার অভ্যাসটিও তাঁর চরিত্রের এক অঙ্গ ছিল। কাজ কাজই, সে ব্যাপারে তিনি আপন-পর ভেদাভেদ করতেন না।

রিমি : পরস্পরের সঙ্গে আব্বুর সুসম্পর্ক গড়ে তোলার একটা সুন্দর নিদর্শন শফিউদ্দীন দফাদারের ছেলে আজিজের মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। প্রতিবেশী ফজর আলীর গুলিতে বালক আজিজ মারা যায়। বন্য শূকর শিকারের সময় এই বালক খেলতে খেলতে বন্দুকের সামনে চলে আসে এবং গুলিবিদ্ধ হয়। আব্বু তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং তার প্রাণরক্ষার জন্য রক্তদান করেন। কিন্তু তারপরও তার মৃত্যু ঘটে। তখন আজিজের পরিবার ফজর আলীর বিরুদ্ধে মামলা করে। সেই মামলাও আব্বু সালিশের মাধ্যমে মিটিয়ে দেন। আব্বু বলেন যে এই দুঃখজনক ঘটনা অনিচ্ছাকৃত। আব্বু ঐ শোকসন্তপ্ত ও অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর জন্য অনুতপ্ত দুই পরিবারের মধ্যে মিল করিয়ে দেন। আজও ঐ দুই পরিবারের মধ্যে মিল বিদ্যমান।

রিপি : নবী করিম (স.) বলেছিলেন যে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও মিলমিশ করে দেওয়া অতিরিক্ত নামাজ ও দানের চেয়েও উত্তম। আদি (ইয়োরোপীয় আগ্রাসনের পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাসকারী উন্নত সভ্যতার ধারক-বাহক) আমেরিকানদের জীবনধারা পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে তাদের সমাজে সেই ব্যক্তিকেই সবচেয়ে মর্যাদাশীল ও শক্তিশালী হিসেবে গণ্য করা হতো, যিনি পরস্পরের মধ্যে শান্তি রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। আব্বুর চারিত্রিক গুণাবলির আলোকে বলা যেতে পারে যে তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বর্তমানে 'শান্তি শিক্ষা', 'সংঘর্ষ সমাধান' (conflict resolution) মধ্যস্থতা, সালিশ ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা ও আইন প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। আব্বু সেই কাজগুলো ছেলেবেলা থেকেই করে আসছিলেন।

রিমি : হ্যাঁ, তাই। এখন খাদ্যনিরাপত্তার কথা বলা হয়। আব্বু সেই কতকাল আগে ছাত্রাবস্থায় পল্লি মঙ্গল সমিতি করে তাতে ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাৎসরিক ফসল ওঠার পর যারা ধনী, তারা সেই ধর্মগোলাতে আধা মণ করে ধান জমা দিত যাতে আকালের সময় দুস্থ, অভাবী ও গরিব কৃষকেরা সেই মজুদকৃত ফসল থেকে উপকৃত হতে পারে। আব্বুর এ ধরনের সমাজ সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ আমাকে মুগ্ধ করে। তিনি নীরবে এই কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন।

রিপি : ভবিষ্যতের দিকনির্দেশক হিসেবে, তাঁর আদর্শকে কীভাবে সামনে নিয়ে আসা যায় মনে কর ?

রিমি : আলাপ, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে জানাতে হবে এতে তিনি লাভবান হবেন না। মানুষ ও সমাজ উপকৃত হবে।

রিপি : আব্বুকে ঘিরে ছোটবেলার বিশেষ স্মৃতি, যা তোমার মনে পড়ছে, তা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।

রিমি : আব্বুর গাছ নিড়ানোর স্মৃতি খুব মনে পড়ে। কী অসীম যত্নের সঙ্গে তিনি চারাগাছের মাটি নিড়াতেন। শক্ত মাটিকে দুই হাত দিয়ে ভেঙে গুঁড়া গুঁড়া করতেন। তারপর কত যত্নের সঙ্গে চারা গাছের শিকড় মাটির ভেতরে বসাতেন। মাটি দিয়ে শিকড় ঢেকে দিয়ে তাতে পানি ঢালতেন। তখন আমি দেখে ভাবতাম গাছটা সত্যিই জীবিত। সে একদিন বড় হবে।

আব্বুর খুব প্রশংসা করার, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। আমি তো ছোটবেলা থেকেই রান্নাবান্না পছন্দ করতাম। আব্বু তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীদের বলতেন, 'দেখ আমার মেয়ে রেঁধেছে।' আব্বু ছোটদেরও দায়িত্ব দিতেন। উনি বিশ্বাস করতেন যে আমরা দায়িত্ব পালন করতে পারব। আব্বু একবাক্যে ছিলেন অনন্য মানুষ।

(সাক্ষাৎকার। বুধবার [১ রমজান]

১১ অগাস্ট, ২০১০)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কাণ্ডারী, আহ্বায়িকা ও দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আম্মা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের সাক্ষাৎকার

আম্মার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে ওঠানামা করছে। সে কারণে এই সাক্ষাৎকার সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত হলো। ২০০৭ ও ২০০৮-এ ভিডিওতে আম্মার দীর্ঘ যে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করি, তা ভবিষ্যতে প্রকাশের আশা রাখি

রিপি : আম্মা, আব্বুকে একজন মানুষ ও স্বামী হিসেবে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

আম্মা : এমন ব্যক্তিত্ব, এমন স্বচ্ছ মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। খুবই মানসম্পন্ন। পরের জন্য অনুভূতি ও বিশ্লেষণমুখী চেতনা খুব প্রখর ও সুদক্ষ ছিল। ওনার কোনো কথাতে জটিলতা ছিল না। কোনো জটিল প্যাঁচের কথা বলতেন না। মানুষ যেটা সহজে বুঝতে পারে, সেভাবেই বলতেন। আমার জীবনে তিনি এক অনন্য-অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমার জীবনে আমি দেখি যে উনি এক অভাবনীয় ও আলোকিত মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়েছিলেন।

আমার বিয়ের পর দেখি যে উনি খুব সাধারণভাবে থাকতে পছন্দ করেন। দেশে প্রচুর বৈষয়িক সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও নিজে অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। উনি একটা চৌকিতে থাকতেন। আমাদের বিয়ের সময় ওনার বন্ধুরা নতুন তোশক, বালিশ ও চাদর দিয়ে ঘর সাজিয়ে দেয়। ওনার উপার্জন হতে তিনি দুস্থ, অসহায়, বিধবা ও এতিমদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। নিজের জন্য কিছু রাখতেন না।

ওনার চিন্তাচেতনা ও ব্যবহারের কারণে উনি আমার জীবনে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী মানুষ ছিলেন।

(বৃহস্পতিবার, ১২ আগস্ট, ২০১০)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটের সাবেক প্রতিমন্ত্রী

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত তাজউদ্দীন আহমদ ট্রাস্ট ফান্ডের প্রথম স্মারক বক্তৃতা, সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান (৩ জুলাই, ২০১২) অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য যখন মধ্য আমেরিকার কোস্তারিকা রাষ্ট্র হতে ঢাকা আসি, তখন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের টেলিফোন সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করি।

আমীর কাকু, ২৫ মার্চের ঘটনা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। সে সময়ের পরিবেশ কেমন ছিল ? আপনি কী করছিলেন ?

২৫ মার্চ সারাদিন ধরেই নানারকমের আশংকাপূর্ণ খবর আসছিল। ইয়াহিয়া খানের সাথে সমঝোতাপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা আর নেই। ৬ দফা ভিত্তিক সাংবিধানিক সমাধানের জন্য যে আলোচনা চলছিল তা কতটুকু সদিচ্ছাপূর্ণ ছিল সেটা নিয়েই সন্দেহ। ইয়াহিয়া খান ও তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের অপারেশন সার্চ লাইট বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে সামরিক সরকার যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং তারা যে হার্ড লাইন বেছে নিতে যাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং রোডের বাড়ির নিচতলার লাইব্রেরিতে টাস্ক ফোর্সের অফিস করা হয়েছিল। টাস্ক ফোর্স ২৪ ঘণ্টা কাজ করত। আমি ও কামাল হোসেন (ডঃ কামাল হোসেন) টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে [১ মার্চ-২৫ মার্চ ১৯৭১] সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতাম, বঙ্গবন্ধুকে ব্রিফিং দিতাম, প্রেসে খবর পাঠাতাম ইত্যাদি কাজ করতাম। তাজউদ্দীন ভাই, এই টাস্কফোর্সের নেতৃত্ব দিতেন। দিনের শেষে আমি সারা দেশের অসহযোগ আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও অবস্থা জানাতাম। টাস্ক ফোর্সের সাথে বৈঠক হতো ব্যাংকারদের, কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী সংগঠন, সরকারি কর্মকর্তা, ওয়্যারলেস কর্মকর্তা, যোগাযোগ ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে। অফিস-আদালত ইত্যাদির জন্য প্রতিদিন কী নির্দেশ যাবে, তার পরিকল্পনা করা হতো এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশ পাঠানো হতো। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ করে আমরা প্রতিদিনের নির্দেশনা তৈরি করতাম। আমাদের একটা সিক্রেট প্ল্যান ছিল যে, যখনই মিলিটারি টেক ওভার হবে, তাজউদ্দীন ভাই, কামাল হোসেন ও আমি একত্রিত হব এবং নেক্সট কী করব সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। কনটিনজেনসি প্ল্যান নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম। বঙ্গবন্ধুর সাথে আমাদের এ পরিকল্পনার বিষয়টি নিয়ে কথা বলা জরুরি মনে করি। তাজউদ্দীন ভাই দুদিন আমাকে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন আমাদের কনটিনজেনসি প্ল্যানের জন্য। বঙ্গবন্ধু ডাইরেকটিভ দিলেন না। বললেন, 'এখন দেশ স্বাধীন হবে। তোমরা নিশ্চিন্তে থাক।' আমরা বললাম, 'আপনাকে নেতৃত্ব দিতে হবে'। উনি বললেন, 'আমাকে নিয়ে কোথায় যাবি, আমাকে খুঁজতে যেয়ে গ্রাম-গঞ্জ পোড়াবে' এইসব কথা

বললেন। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কী করব সে সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দিলেন না। এদিকে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট আর্মস স্ট্রাগলে পরিণত হতে যাচ্ছে। ২৫ মার্চ রাজারবাগ পুলিশ লাইন হতে বিভিন্ন খবর আসছিল, যাতে বোঝা যাচ্ছিল যে মারাত্মক কিছু হতে যাচ্ছে। যশোর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মশিউর রহমানকেও জানিয়েছিলাম যে বাসায় থাকবেন না। উনি আমাকে বলেছিলেন যে যশোর ক্যান্টনমেন্টের জিওসি [পাকিস্তানি জেনারেল] ওনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু উনি আমন্ত্রণে যাননি। পরে শুনেছি উনি বাড়ি থেকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাইরে হোঁচট খেয়ে আবার বাড়িতেই ফিরে আসেন। তারপর পাকিস্তান আর্মি ওনাকে বন্দী করে এবং যশোর ক্যান্টনমেন্টে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আব্বুর কাছে ওনার কথা শুনেছি। উনি একজন নিবেদিত দেশপ্রেমিক ছিলেন। ওনার মতো হাজার হাজার নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক তো এভাবেই পাকিস্তান আর্মির হাতে প্রাণ হারায়। তো, ২৫ মার্চে আপনারা বিভিন্ন খবর থেকে বুঝতে পারছিলেন যে পাকিস্তান আর্মি হার্ড লাইন নিতে যাচ্ছে ?

হ্যাঁ। ওইদিন দুপুর আড়াইটার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে যখন আমি সার্কিট হাউসে আমার বাসায় খেতে এসেছি, তখন দেখি যে ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হক সাহেব [ইস্টার্ন ওয়্যারলেস ডিভিশনের, ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার] আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। আমার মতোই ওনার দেশের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলায়। ওনাকে আমি খোকা ভাই বলে ডাকতাম। কিছুটা বামপন্থী রাজনীতির সাথে ওনার যোগাযোগ ছিল। ওনার স্ত্রীও [নাসরিন বানু] ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। খোকা ভাই ছিলেন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে পাস করা ব্রিটিশ সময়ের একজন প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার। ১৯৬১ সালে রানি এলিজাবেথ যখন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন, তখন মিন্টো রোডের পুরাতন গণভবনে ছিলেন খোকা ভাই, সেখানে wirless set up করে, বাকিংহাম প্যালেসের সাথে রানি এলিজাবেথের ডাইরেক্ট যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। পাকিস্তান সরকার ওনাকে নেপালেও পাঠিয়েছিল টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা set up করার জন্য। পাকিস্তানের ইসলামাবাদের মিলিটারি বেইসেও উনি Wireless set up করেন। তিনি ট্রান্সমিটার বানাতে পারতেন। তার কাজের জন্য পাকিস্তান সরকার তাকে বড় খেতাবও দেয়। তো, সেদিন দুপুরে যখন লাঞ্চ ব্রেকে বাসায় যাই, খোকা ভাই এলেন আমার সাথে দেখা করতে। উনি ছিলেন খুব স্মার্ট, চমৎকার ইংরেজি বলতেন এবং সব সময় well dressed থাকতেন। সেদিনও উনি একটি মভ কালারের শার্ক স্কিন স্যুট পরে এসেছিলেন। উনি বললেন, 'বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন একটি ট্রান্সমিটার যোগাড় করতে। আমি খুলনা থেকে এটা নিয়ে এসেছি। আমি এখন এটা কোথায় পৌঁছে দেব ?' আমি বললাম, 'ট্রান্সমিটার কাজ করে ?' উনি বললেন, 'হ্যাঁ এটা কাজ করে।' আমি তখন বললাম, 'আমাকে তো বঙ্গবন্ধু এ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেননি। বলেননি ট্রান্সমিটার সম্বন্ধে। তবে ওনার একটা কথা সবাই জানে, সেটা হলো– যার কাছে যা আছে, তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আপনার কাছে ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার আছে, তা দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবেন। আমার কাছে আছে সাংগঠনিক শক্তি, তা দিয়ে আমি করব।' তারপর আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ওয়্যারলেসে কী বলবেন তা কি আমি বলে দেব এবং ওটা লিখে দেব ?' উনি বললেন, 'আমি জানি কী বলতে হবে। It will cost my life, but I will do it. It's worth doing.'* উনি নির্দ্বিধায় এবং জোর দিয়ে

---

* ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানের ভিডিও রেকর্ডকৃত বক্তব্যে (১৮ এপ্রিল, ২০১৪) এবং লেখকের সাথে পরবর্তী আলাপে (২৫ এপ্রিল ২০১৪) নূরুল হকের শেষ বাক্যটি যোগ করেন।

কথাটি বললেন। আমার ধারণা he was the one who sent out the wireless message. খোকা ভাই চলে যাবার পর আমি আবার ৩২ নম্বর রোডে ফিরে আসলাম। এক অবাঙালি ভদ্রলোক, ইউ.পিতে বাড়ি, নাম দিলদার রিজভী United Bank Limited-এর ভাইস চেয়ারম্যান, উনি আমার কাছে আসলেন বিকেল চারটা-সাড়ে চারটার দিকে। ওনার কিছু লিগাল কাজ করে দিয়েছিলাম। সেই সূত্রে পরিচয়। উনি আমাকে ৩২ নম্বর রোডের কাছেই ওনার বাসায় নিয়ে বললেন, 'Things are very bad. আজ রাতেই ঘটনা ঘটতে পারে। আমি আমার ফ্যামিলিকে অন্য জায়গায় শিফট করেছি। আমার এই খালি বাড়ি আপনি ব্যবহার করতে পারেন।' আমাদের Secret plan অনুসারে গত সাতদিন ধরে কামাল হোসেন ও আমি নিজ বাড়ির বাইরে থাকা প্র্যাকটিস করছিলাম। এ ক্ষেত্রে আমরা সাত মসজিদ রোডের ওপর মুসা সাহেবের বাসা বেছে নিয়েছিলাম।

ওনার পরিচয় ?

উনি ব্যবসায়ী ছিলেন। বাড়ি কুষ্টিয়ায়। প্রতিদিনের মতোই ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় তাজউদ্দীন ভাই, কামাল হোসেন ও আমার রিভিউ কমিটির মিটিং করার কথা ছিল। বঙ্গবন্ধুর বাসার লাইব্রেরি কক্ষে রেগুলার আমাদের এই মিটিং হতো। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় মিটিং হলো না। তাজউদ্দীন ভাই ও কামাল হোসেনকে খুঁজে পেলাম না। চারদিক থেকে তখন নানারকমের আতঙ্কপূর্ণ খবর আসছিল। সন্ধ্যায় বের হবার আগে বঙ্গবন্ধুর Speech draft করে, ফাইনাল করে, ওনার প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশাকে দিই সাইক্লোস্টাইলে প্রিন্ট করতে। তারপর সেই বিবৃতির প্রিন্ট বঙ্গবন্ধুকে দেখাই। সাইক্লোস্টাইলে প্রিন্ট করা এই বিবৃতিতে তিনি ২৬ ও ২৭ মার্চ হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে রাত ন'টা-সাড়ে ন'টার সময় তোমাদের বাসায় যাই। দেখি যে বেগম নূরজাহান মুরশিদ বাইরের ঘরে বসা। ভেতরের ঘর থেকে তাজউদ্দীন ভাইয়ের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। উনি জোরে জোরে ভাবির সাথে কথা বলছিলেন। একটা ব্যাগ খুঁজে না পাওয়াতে উনি খুব Upset ছিলেন বলে শুনেছি।

আব্বুর সাথে তখন দেখা হয়েছিল ?

না। কিন্তু ভেতরের ঘর থেকে ওনার গলা শুনে বুঝলাম যে He is disoriented. ওনাকে Reinforce করা দরকার। কিন্তু তার জন্যে ওনাকে একা দরকার। আমি তখন নূরজাহান মুরশিদকে ওনার ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে নামিয়ে দিতে চলে গেলাম।

আপনার গাড়িতে ? গাড়ি কী আপনি চালাচ্ছিলেন ?

হ্যাঁ আমার নিজস্ব গাড়ি। আমিই চালাচ্ছিলাম।

কী গাড়ি ? রং কী ?

মরিস ১১০০। বটল গ্রিন কালার।

গাড়ির কথাটি জিজ্ঞেস করলাম কারণ, এ ধরনের খুঁটিনাটি তথ্যও একদিন ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো এই ঘটনা নিয়ে একটি মুভিও হয়ে যেতে পারে।

That's right. ঐতিহাসিক কনটেক্সটে ছোটবড় সব তথ্যেরই গুরুত্ব রয়েছে। সেদিন ওই গাড়িতেই নূরজাহান মুরশিদকে নামিয়ে নিয়ে বাসায় যাবার পথে দেখি যে, হোটেল শেরাটনের [পূর্বে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল] দক্ষিণ দিকে রেডিও পাকিস্তানের অফিস আর্মিরা টেক ওভার করছে। তারা দলে দলে ট্রাক থেকে নামছে। আমি বুঝলাম যে ভয়ংকর কিছু হতে যাচ্ছে। তখন পাশেই ৩ নম্বর সার্কিট হাউসে কামাল হোসেনের বাসায় ঢুকলাম। দেখি উনি বাড়ির বাইরে ন্যাপের [বামপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি] লিডার আহমদুল কবির ও লায়লা কবিরকে বিদায়

দিচ্ছেন। আমি ওনাকে তাড়া দিলাম। বললাম, 'রেডি হন। আমি বাসা থেকে রেডি হয়ে আসছি।'

আমার বাড়ি পাশেই ৪ নম্বর সার্কিট হাউসে। সেখানে ল্যান্ডলেডি গেটের তালা বন্ধ করে দেওয়ায় দেওয়াল টপকে বাসায় প্রবেশ করি। মেয়ে শম্পা তখন নারায়ণগঞ্জে, নানা বাড়িতে আছে। ছোট ছেলে আদিল স্ত্রীর সাথে বাসায়। আমি স্ত্রীকে বললাম, 'লীলা বাচ্চাদের নিয়ে সাবধানে থেকো।' তারপর আমি চলে গেলাম। যাবার পথে কামাল সাহেবকে তুলে নিলাম। তখন দেখি রাস্তায় ব্যারিকেড পড়েছে। শাহবাগ দিয়ে যেতে পারলাম না, ব্যারিকেডের জন্যে। তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভেতর দিয়ে গেলাম। সেখানেও স্টুডেন্টরা রাস্তায় গাছ ফেলে ব্যারিকেড করেছে। ছাত্ররা, আমাদের চিনে ব্যারিকেড একটু ফাঁক করে দিল। তার ভেতর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে আবার ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফিরলাম।

তখন রাত ক'টা বাজে ?

তখন রাত সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। যেয়ে দেখি বঙ্গবন্ধু ও ওনার পার্সনাল এইড হাজী গোলাম মোরশেদ নিচতলার ডাইনিংরুমে বসা। বঙ্গবন্ধু খুব Calm ও Relaxed ছিলেন। ওনার পরনে গেঞ্জি। আমরা বঙ্গবন্ধুকে বললাম, 'আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।' উনি বললেন, 'না, আমি কোথাও যাব না। এখানেই থাকব। Whatever happens I will face it.' উনি ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথাটি বললেন। আমরা বললাম, 'তাহলে আমরা যাব না। আপনার সাথেই থাকব।' উনি এবার বেশ দৃঢ় স্বরে ইংরেজিতে বললেন, 'Both of you are oath bound to obey my order. You must leave my house. God bless you'. ওটা বলে he walked with us. উনি আমাদের দুই কাঁধে ধরে গ্রাউন্ড ফ্লোরের লাস্ট স্টেপ-এ এসে বিদায় দিলেন। যখন বেরিয়ে যাচ্ছি, তখন সামনের গেটের ভেতর দিয়ে ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ ঢুকছেন। তোফায়েলকে বললাম, 'ওনাকে বের করতে চেষ্টা করলাম, উনি বের হলেন না। Now you try.' এরপর গাড়ি চালিয়ে আবার তোমাদের বাসায় গেলাম।

তখন রাত ক'টা ?

রাত এগারোটার কাছাকাছি। যেয়ে দেখি তোমার বাবা তোমাদের বাড়ির সামনের লনের বাগানে খুব অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। আমি ওনাকে বললাম, 'Military has taken over. আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।' উনি বললেন, 'কী করব ? কোথায় যাব ?' ওনার মুখে প্রচণ্ড অভিমান ও Confusion লক্ষ করলাম। পরে বুঝলাম যে উনি নেতার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পাননি। উনি নেতার নির্দেশ পুংখানুপুংখভাবে পালন করতেন। সে কারণেই নির্দেশহীন অবস্থায় উনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন। তখন ওনাকে বললাম, 'আর্মি রাজারবাগ ও ইপিআর টেক ওভার করছে। আজ রাতের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম হতে যাচ্ছে।' ঠিক তক্ষুনি ইপিআর এলাকা থেকে [আমাদের সাতমসজিদ রোডের বাড়ির দক্ষিণে ইপিআর বর্তমান বিডিআর-এর হেড কোয়ার্টার।– লেখক] আওয়ামী লীগের সমর্থক এক ব্যক্তি বাসার সামনে প্রায় দৌড়ে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন যে আর্মিরা ইপিআরকে ডিসআর্ম করছে। একথা শোনার পরেই তাজউদ্দীন ভাই মাইন্ড চেঞ্জ করলেন। ওনার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। ইতোমধ্যে পথের সমস্ত আলো নিভে গিয়েছে। তাজউদ্দীন ভাই আমাদের অপেক্ষা করতে বলে বাড়ির ভেতরে গেলেন। সেই সময়ই কামাল হোসেন insist করলেন ধানমণ্ডির ১৩ নম্বর রোডে ওনার এক আত্মীয়র বাসায় নামিয়ে দিতে।

তখন আমি বললাম, 'না, আগে উনি আসুক, তারপর ডিসাইড করব কোথায় যাব না-যাব। ওনাকে ফেলে চলে যেতে পারি না।' তাজউদ্দীন ভাই যখন আসলেন, দেখলাম ওনার ভেতরে

একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। তখন ওনার কাঁধে রাইফেল, একটা থলি ও কোমরে ম্যাগাজিন ভরা পিস্তল। তাজউদ্দীন ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছিল যে, আমরা সশস্ত্র বিপ্লবে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে উনি অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং নিয়েছেন এবং রাইফেলও যোগাড় করেছেন ওনার বন্ধু ও সহকর্মী আরহাম সিদ্দিকীর মারফত। পরে ওনার পিস্তল আমি নাড়াচাড়া করে, কীভাবে লোড ও আনলোড করতে হয় তা রপ্ত করে ফেলেছিলাম।

আব্বু ও আপনি কী ধরনের পোশাক পরে বের হয়েছিলেন ?

তাজউদ্দীন ভাইয়ের পরনে ছিল সাদা ফতুয়ার মতো হাফ শার্ট ও চেক লুঙ্গি। আমার পরনে ছিল পায়জামা, পাঞ্জাবি ও স্যান্ডেল।

বের হয়ে আপনারা তিনজন কোথায় গেলেন ?

কামাল হোসেন আমাদের সাথে থাকতে চাইলেন না। উনি জোরাজুরি করায় ওনাকে ধানমণ্ডি ১৩ নম্বর রোডে ওনার এক আত্মীয়র বাড়িতে নামিয়ে দিই। তারপর আমরা সাত মসজিদ রোডের ওপরে মুসা সাহেবের বাসায় যাই। গত সাতদিন ধরে আমি ও কামাল হোসেন রাতে বাসায় না থেকে বাইরে থাকার প্র্যাকটিস করছিলাম। আমি ও কামাল হোসেন মুসা সাহেবের বাসার চিলেকোঠার ঘরে রাত কাটাতাম।

কিন্তু সে রাতে তো আপনারা অন্য জায়গায় আশ্রয় নিলেন।

হ্যাঁ। তার কারণ হলো যে মুসা সাহেবের বাসা ইপিআরের কাছে ছিল। আমি ও কামাল হোসেন চিলেকোঠার যে ঘরে থাকতাম সেই ঘরেই মুসা সাহেবের এক ড্রাইভার Stray bullet-এ মারা যায়। আমি মুসা সাহেবের বাসায় আমার গাড়িটা রাখলাম এবং ওনাকে অনুরোধ করলাম ওনার গাড়ি ও ওনার ড্রাইভার দিতে। এই ড্রাইভার লালমাটিয়ায় রেলওয়ের রিটায়ার্ড চিফ ইঞ্জিনিয়ার গফুর সাহেবের বাসা চিনত। ওনার বাসায় আশ্রয় নেব, এই সিদ্ধান্ত নিলাম।

গফুর সাহেবের সাথে কীভাবে পরিচয় হয় ?

গফুর সাহেব আমার ক্লায়েন্ট ছিলেন। দুদিন আগেই উনি আমার টেবিলে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার বাড়িতে পরিবার নেই। বাড়ি খালি। কোনো জরুরি কাজে আপনি আমার বাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন।' গফুর সাহেব একজন বিশ্বস্ত ও সৎ মানুষ ছিলেন। রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ছিলেন না। সে জন্য ওনার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। উনি আমাদের অতি সমাদরে গ্রহণ করেন। ওখানেই আমরা ছদ্মনাম ধারণ করি। তাজউদ্দীন ভাই হলেন মুহম্মদ আলী ও আমি রহমত আলী। লালমাটিয়া ঐ রাতেই অবরুদ্ধ হয়ে গেল। সাত মসজিদ রোডে অবস্থিত ফিজিকাল ইনস্টিটিউটে আর্মি ক্যাম্প বসানো হলো। পরে যেখানে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারফিউ তোলার পর ২৭ তারিখে চলে যাবার সময় গফুর সাহেবের বাসায় রাইফেল ফেলে যেতে হয়। ওই বড় রাইফেল নিয়ে চলা তখন বিপজ্জনক। গফুর সাহেব রাইফেলটি প্লাস্টিকে জড়িয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখেন। স্বাধীনতার পর তিনি সেটা তোমার আব্বুকে ফেরত দেন।

সেই ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হক সাহেবের তারপর কী হলো ?

সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। উনি ওয়্যারলেসে যেসব সংকেত সেট-আপ করে রেখেছিলেন, তা পাকবাহিনী ইন্টার সেপ্ট করে। তারা ট্রান্সমিটার খুঁজতে ওনার ওয়্যারলেস কলোনির বাসা ঘেরাও করে এবং ২৯ মার্চ ওনাকে বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। উনি আর ফিরে আসেননি। ওনার স্ত্রী এখনো বেঁচে আছেন। তুমি ওনার সাথে কথা বলতে পারো। আরও একজন

সেই ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোন কল রিসিভ করেছিলেন, সেই হাজী গোলাম মোরশেদ সাহেবের সাথেও কথা বলতে পারো। বয়স হলেও উনি মেনটালি খুব শার্প এবং তোমাকে বিস্তারিত বলতে পারবেন। সেই রাতে ওনাকেও কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সাথেই বন্দী করা হয় এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ওনার ওপর অনেক অত্যাচার চালানো হয়। তার একটি পা এখনো অকেজো। ক্রাচে ভর করে হাঁটেন। বঙ্গবন্ধুর একজন নিঃস্বার্থ, নির্লোভ নিবেদিত প্রাণ সর্ব সময়ের সঙ্গী।

ওনার সাথে আপনার কবে থেকে পরিচয় ?

বহু যুগের পরিচয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় মোরশেদ ভাই এবং আমি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন জায়গায় সফরসঙ্গী হই। নির্বাচনের বিজয়ের পর যখন পাকিস্তান সরকার গণরায়কে বাতিল করে যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করছিল, তখন হাজী গোলাম মোরশেদ ও আমি একই সাথে রাজশাহী জেলে ছিলাম।

আশ্চর্য ! এ ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কোনো উল্লেখই নেই ইতিহাসে। কী অকৃতজ্ঞ জাতি আমরা। থ্যাংকস কাকু ওনাদের ইনফরমেশন দেবার জন্য। আমি চলে যাবার আগে অবশ্যই ওনাদের সাথে যোগাযোগ করব। (১১ জুলাই কোস্তারিকার পথে রওয়ানা দেবার আগে হাজী গোলাম মোরশেদ ও নূরুল হক পরিবারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি)

তারপর ওই ফোন কলটি কে করেছিলেন, কী ব্যাপারে ?

এক ব্যক্তি, মধ্য রাতে ফোন করে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলতে চাইলেন। হাজী সাহেব বললেন, 'আপনি কে ?' উনি পরিচয় না দিয়ে বললেন যে 'বঙ্গবন্ধুকে বলেন যে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি, এখন মেশিন কোথায় রাখব, কী করব ?' তখন বঙ্গবন্ধু হাজী গোলাম মোরশেদকে বললেন যে, ওই ব্যক্তিকে বল মেশিন ভেঙে সে যেন পালিয়ে যায়। আমার ধারণা ওই ব্যক্তি ছিলেন নূরুল হক বা তাঁর বিশ্বস্ত কোনো লোক যাকে দিয়ে তিনি খুলনা থেকে আনা ট্রান্সমিটারে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। ওয়্যারলেসে ইংরেজিতে স্বাধীনতার যে ডিক্লেয়ারেশনটা দেওয়া হয় সেই কণ্ঠটি হয়তো নূরুল হকের ছিল এবং তা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেওয়া হয়। [লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক ও দক্ষিণ এশিয়া করেসপন্ডেট ডেভিড লোশাক, যিনি সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ভাষণটি উল্লেখ করেন, তিনি লিখেছিলেন যে গলার আওয়াজ খুব ক্ষীণ ছিল এবং যাতে মনে হচ্ছিল খুব সম্ভবত ওটা আগেই রেকর্ড করা ছিল।]

বঙ্গবন্ধু, আব্বুর লিখে আনা স্বাধীনতার ঘোষণায় সাইন করলেন না, আপনাদের অনুরোধ সত্ত্বেও টেপ রেকর্ডারেও কোনো নির্দেশ দিলেন না। অথচ আপনাদের অজান্তে নির্দেশ পাঠালেন ভিন্ন মাধ্যমে। এর যুক্তি কী ?

আমার মনে হয় উনি স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সরাসরি কোনো লিঙ্ক রাখতে চাননি। বঙ্গবন্ধু হয়তো কোনো নেগশিয়েটেড সেটেলমেন্ট চাচ্ছিলেন। আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে যেয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের যে পথটা বেছে নিচ্ছিলাম তার ফলাফল নিশ্চিত ছিল না। উনি হয়তো ভাবছিলেন যে উনি বন্দী হবার পরেও স্বাধীনতার জন্য নেগশিয়েটেড সেটেলমেন্ট করা সম্ভব। উনি জানতেন যে ওনাকে হত্যা করা হবে না। He actually made a decision to surrender to the arrest. He knew that his life would be saved. But if he leaves home, he would be termed as a traitor-a fugitive. He could have been killed in that situation and the blame could be shifted as if he was killed by the extremists in his own party. I can understand his position. It was

communicated to him that Bangladesh is not on the map of either the state Department or the C.I.A. Later, the same thing was communicated to me by one Mr. Brut of the U. S Consulate in Dhaka.

মিস্টার ব্রুট ? পুরো নাম কী ? কবে দেখা হয় ?

পুরো নামটা মনে পড়ছে না। ১৯ বা ২০ মার্চে ওনার সাথে দেখা হয়। He was the number three in Dhaka U.S Consulate in 1971. He invited me to a lunch and conveyed to me the same message. He said that although he has personal empathy for our struggle, but there is no Bangladesh as an independent country in the map of C.I.A or the State Department. It was most likely that the same message was conveyed to Bangabandhu at a higher level.

তারপরও তো দেশ স্বাধীন হলো। জাতি যেখানে প্রস্তুত, নেতৃত্ব যেখানে সবল সেখানে স্বাধীনতাকে কোনো শক্তি যত বড়ই প্রতাপশালী হোক না কেন তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তিনি বাইরের চাপে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে যদি নাও জড়াতে চান কিন্তু এ সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা তো করতে পারতেন, একটা দিক নির্দেশনা তো দিতে পারতেন।

যেহেতু তিনি তার জীবন বাজি রেখে শত্রুর শিবিরে বন্দী হবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, স্বাধীনতার জন্য তাই আমাদের উপর সবটা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ওনার কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা না পাওয়াতে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালানোর সময় আমাদের অনেক রকমের সমস্যা হয়েছে এবং সব সময়ই আমরা তাঁর অভাব অনুভব করেছি। তবে পাকিস্তান কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধু এত শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হয়ে সকল ছাত্র, যুবক, তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দিক নির্দেশনা ছিলেন। তাজউদ্দীন ভাইয়ের সাথে যখন বর্ডার ক্রস করলাম তখন বিএসএফ [বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স] বলল যে, তারা টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর মেসেজ পেয়েছে এবং তারা সেটা প্রিন্টও করেছে।

স্বাধীনতা ঘোষণা ?

হ্যাঁ। ওই মেসেজ বিভিন্নভাবে গিয়েছিল। ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে, টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও টেলিগ্রাফের টরেটক্কা সংকেত হিসেবে। আমরা যখন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করলাম তখন আমরা বললাম যে, অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অতএব ওই দিন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা কার্যকরী হবে। আমরা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার গঠন করলেও শেখ মনি ওই সরকার কখনোই মেনে নেয়নি। ১০ এপ্রিল রাতে তোমার আব্বুর বক্তৃতা প্রচারের সময় শেখ মনি আমার সামনে তোমার আব্বুকে বলেছিল যে, তার কাছে বঙ্গবন্ধুর লিখিত নির্দেশ আছে যে সে-ই বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবে– টু অ্যাক্ট অন হিজ বিহাফ। শুনেছি ওই চিঠি ভারত সরকারের উচ্চ কর্মকর্তাদের দেখিয়েছিলেন।

আপনাদেরকে কি দেখিয়েছিল ?

না। যদিও তাকে ও তার অনুগত ছাত্র ও তরুণদের নিয়ে আমরা কাজ করতে চেয়েছিলাম এবং সেই সুযোগও তাদের দেওয়া হয়েছিল। তোমার আব্বুর ১০ এপ্রিলের বক্তৃতা যাতে প্রচার করা না হয় সেই চেষ্টাও সে করেছিল। শেখ মনির অনুরোধে তাজউদ্দীন ভাই বক্তৃতাটা বন্ধ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন। গোলোক মজুমদার যখন আমাকে বললেন যে, বক্তৃতার ক্যাসেট শিলিগুড়ির গোপন স্থানে পৌঁছে গিয়েছে এবং তিনি বন্ধ করার চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু তা কি

ঠিক হবে ? তখন আমি বলেছিলাম যে, ক্যাসেটটি যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যেয়ে থাকে তবে বক্তৃতাটা নির্ধারিত সময় অনুসারে প্রচার হোক। তাজউদ্দীন ভাইয়ের ওই একটা নির্দেশ আমি অমান্য করেছিলাম। সেটা ভুল কি সঠিক ছিল তা ইতিহাসই বলবে। আর একটা কথা, বর্ডার ক্রস করার পর কোলকাতায় যখন পৌঁছলাম, তখন তোমার আব্বু বলেছিলেন যে, মার্চ মাসে উনি একদিন মুজিব ভাইয়ের ঘরে ঢোকার সময়ে শোনেন যে মুজিব ভাই, শেখ মনি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ ছাত্র নেতাদের বলছেন যে, ১০ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ অ্যাভিনিউতে গেলে খোঁজ পাবে। সে সময় তিনি চিত্ত সুতারের নাম শোনেন। পরে কোলকাতায় শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়কে [ভারতীয় নিরাপত্তা অফিসার] নিয়ে আমরা হন্যে হয়ে রাজেন্দ্র প্রসাদ অ্যাভিনিউতে ওই বাসা খুঁজি।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সাথে '৮৭ সালে কোলকাতায় যখন দেখা হয় তখন উনি আমাকে ওই বাসা খোঁজার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

হ্যাঁ। আমরা পরে ঠিকই ১০ নম্বর রাজেন্দ্র প্রসাদ অ্যাভিনিউয়ের বাসা খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বলা হলো যে ওই নামে ওই বাসায় কেউ থাকেন না। পরে আমরা জানতে পারি যে চিত্ত সুতার ছদ্ম নামে ওই বাসায় থাকতেন। উনি সেখানে থেকে 'র'-এর চ্যানেল হিসেবে কাজ করতেন। ওনার মাধ্যমেই শেখ মনি গ্রুপটি 'র'-এর সাথে যোগাযোগ করে এবং মুজিব বাহিনী গড়ে তোলে।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে স্বাধীনতার এই বিশাল আয়োজনে দলের সুযোগ্য নেতৃবৃন্দকে কোনো নির্দেশ দেওয়া হলো না কিন্তু গোপনে নির্দেশ দেওয়া হলো শেখ মনি গ্রুপটিকে !

বঙ্গবন্ধু হয়তো চেয়েছিলেন একটা সো কলড স্ট্রাগল হবে এবং তার ভিত্তিতে নেগশিয়েশন হবে।

এবার একটা ভিন্ন প্রশ্ন করি। ১৯৭৪-এর মে মাসে আপনাকেসহ সাতজনকে মন্ত্রিসভা থেকে কেন বাদ দেওয়া হলো ? প্রসিডিয়ারটি কী ছিল ?

বঙ্গবন্ধু একটা রেজিগনেশন লেটার ড্রাফট করে সব ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের স্বাক্ষরসহ কপি নিজের কাছে রাখেন। পরে সেই রেজিগনেশন লেটার ব্যবহার করলেন আমাদের বাদ দেওয়ার জন্য। ওনার ধারণা ছিল যে আমরা তাজউদ্দীন সাহেবের অনুসারী। সে জন্য আমাদের অনেকেই বাদ পড়ে যান। অথচ তাজউদ্দীন সাহেব আমাদেরকে কী বলতেন ? উনি বলতেন, 'আসুন আমরা এমনভাবে দেশের জন্য কাজ করি, যাতে আমাদেরকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয়।'

আব্বু তো কখনোই লোক দেখানো কাজ করতেন না। ওনার ভিশনটাকে যদি কাজে লাগানো যেত তাহলে নতুন সৎ নেতৃত্বর সৃষ্টি হতো। বাংলাদেশ এগিয়ে যেত বহু দূর।

তাজউদ্দীন ভাইয়ের একটা বড় স্বপ্ন ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। উনি পরিকল্পনাও করেছিলেন যে ওদেরকে শুধু সার্টিফিকেট দিয়ে ঘরে না পাঠিয়ে ওদেরকে জাতির পুনর্গঠনে কাজে লাগানো হবে। ওদের জন্য বিশাল ক্যাম্প তৈরি হবে, সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে উনি থাকবেন, বঙ্গবন্ধু থাকবেন, আমরা থাকব। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হতে শিক্ষা, অর্থনীতি সব কিছুর ওপর তাদেরকে উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়া হবে। কর্মক্ষেত্রের জন্যও তারা দক্ষতা অর্জন করবে। ওই ট্রেনিং নিয়ে তারা বাংলাদেশ গড়বে। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলেই তো মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে যায় না– এই চিন্তাটা উনি করতেন।

আব্বু তো মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে দেশ পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় মিলিশিয়া গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। ওনার সেই স্বপ্ন বাস্তব হতো যদি মুজিব কাকু আব্বুর কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের

ইতিহাস, নয় মাসের ইতিহাস শুনতে চাইতেন। বুঝতে চাইতেন সেই সময়কে। রাষ্ট্র গঠনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ওই নয় মাসের ইতিহাস জানা জরুরি ছিল।

সেটা যে হতে পারেনি, তা আমাদের দেশের জন্য একটা বড় ট্র্যাজেডি। তাজউদ্দীন ভাই বঙ্গবন্ধুকে ভীষণ ভালোবাসতেন। '৭১-এ বঙ্গবন্ধুর কথা ভেবে ওনাকে কাঁদতে দেখেছি। উনি নিজেকে আড়াল করে সব কাজের কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুকে দিতেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ওনার বিশ্বস্ততা ছিল একশো ভাগ। ১৫ আগস্ট সকালে যখন তোমাদের বাসায় ফোন করি, তাজউদ্দীন ভাই বললেন, 'আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ মুজিব ভাই জেনে গেলেন না কে তাঁর বন্ধু, কে তাঁর শত্রু। উনি হয়তো ভেবেছেন, তাজউদ্দীনের লোকই তাঁকে মেরেছে।' আমি সেদিন ওনাকে বলেছিলাম, 'আপনি বাড়িতে থেকেন না। অন্য কোথাও চলে যান।' উনি বললেন, 'আমি তো ক্যাবিনেটে নেই আমাকে কী করবে ?' ওনার গলা শুনে মনে হলো, উনি যেন ডেস্টিনির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। আমি তখন তোমাদের বাসার কাছেই ধানমণ্ডির ২২ নম্বর রোডে থাকতাম। সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে আমি ড. মনিরুজ্জামানের বাসায় শেল্টার নিই এবং ওখান থেকে আবার তাজউদ্দীন ভাইকে ফোন করি। কিন্তু ফোনে আর পেলাম না। বুঝলাম লাইন কাটা।

আপনার সাথে কথা বলার একটু পরেই আর্মি আমাদের বাসা ঘিরে ফেলে আর ফোন লাইন কেটে দেয়। আব্বু কিন্তু জানতেন যে মুজিব কাকুকে যারা হত্যা করেছে তারা আব্বুদেরকেও বাঁচিয়ে রাখবে না।

তোমার বাবাকে শেষ বিদায় দিতে যখন তোমাদের বাসায় যাই, ভাবি কেঁদে কেঁদে আমাকে বলছিলেন, 'সেদিন আপনি তাজউদ্দীনকে বাসা থেকে বের করে নেওয়ায় উনি বেঁচে ছিলেন। ১৫ আগস্টে যদি আপনি আবার এসে নিয়ে যেতেন উনি আজ বেঁচে থাকতেন।' কিন্তু সেই '৭১-এর ২৫ মার্চ আর '৭৫-এর ১৫ আগস্টের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর তাজউদ্দীন ভাই নিজের জীবনকে ডেস্টিনির হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সাক্ষাৎকার ৫ ও ৬ জুলাই, ২০১২।

সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর সাক্ষাৎকার

প্রাক্তন নিউজ এডিটর ও ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট, ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি (এনা), ঢাকা, বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রকাশিত প্রথম নিয়মিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা (১৯৮৫) ও সম্পাদক।

আমি সে সময় (১৯৭২-৭৫) ঢাকার এনা'র ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট এবং গণভবনের সঙ্গেও অ্যাটাচড ছিলাম। এনার চিফ এডিটর গোলাম রসুল মল্লিক আমাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল। উনি একবার কাউকে দেখলে পরে চিনতে ভুল করতেন না। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন সফর, মিটিং ও অনুষ্ঠানে আমি যেতাম। সে সময় আমি সাংবাদিক হিসেবে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের ৩৫ হেয়ার রোডের সরকারি বাসভবনেও যেতাম। তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করতেন। '৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের সময় একদিন তাঁর হেয়ার রোডের বাসায় পৌঁছে দেখি যে নমিনেশন পাওয়ার আশায় ওই বাসার নিচতলায় বহু প্রার্থীর ভিড়। এক লোক সঙ্গে এক সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবের অফিস রুমে ঢুকে নমিনেশন চাইতে যান। তাজউদ্দীন সাহেব ভীষণ রেগে তাদের ঘর থেকে বের করে দেন। ওই নির্বাচনে আতাউর রহমান খান [পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানের এককালীন মুখ্যমন্ত্রী] স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোটের দিন উনি তাজউদ্দীন সাহেবকে ফোন করলেন। বললেন যে, আওয়ামী লীগের লোকজন তার এলাকার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে গোলমাল করছে। তারা তাঁর সমর্থকদের ভোট দিতে দিচ্ছে না। তাজউদ্দীন সাহেব তখন ওই অঞ্চলের পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ফোন করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বললেন এবং ঢাকা থেকে একজন বিদেশি সাংবাদিকসহ কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিককে সে এলাকায় পাঠালেন। এর ফলে ওই এলাকায় গোলমাল প্রশমিত হয় এবং আতাউর রহমান খান ইলেকশনে জিতলেন।

আমার সাংবাদিক জীবনের অনেক ঘটনা, স্মৃতি ও তথ্যের মধ্যে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং যা জানানো দরকার মনে করি। '৭৩-এর নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় আমরা চারজন সাংবাদিক রমনার পুরনো গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। উনি তখন নিচতলার পূর্ব দিকের ওয়েটিং রুমে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। আমরা রুমে ঢুকতেই উনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। উনি আমার সঙ্গের সিনিয়র সাংবাদিকদের স্নেহ করে 'তুই' সম্বোধন করতেন। তাদেরকে চিনতেন বহুদিন ধরে। আমি জুনিয়র সাংবাদিক, নতুন পরিচয়। আমাকে তুমি সম্বোধন করতেন। আমার সঙ্গের সিনিয়র সাংবাদিকরা ছিলেন ইংরেজি দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভারের সিটি এডিটর আব্দুর রহিম ও সিনিয়র স্টাফ করেসপন্ডেন্ট জোয়াদুর রহীম এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) চিফ,

যিনি ১৯৯৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সেক্রেটারি হয়েছিলেন, জাওয়াদুল করিম।

বঙ্গবন্ধু আমাদের বসতে বললেন এবং আমাদের বললেন, 'দেখো নির্বাচন দিলাম, আমার একটা প্ল্যান আছে। তাজউদ্দীনদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি কিন্তু ক্ষমতার বাইরে থাকব। এরা যদি ঠিক মতো চালাতে না পারে, বা অন্যায় করে, লোকে তখন আমার কাছে আসবে। আমি আল্টিমেট আদালতের মতো থাকব।' এ কথা শুনে আমি বলতে চেয়েছিলাম, 'স্যার, খুব ভালো হবে'। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বাক্য বলা হলো না, 'স্যার' পর্যন্ত বলতে পেরেছিলাম। আমার তিন বড় ভাই সাংবাদিক সেই মুহূর্তেই বসা থেকে লাফিয়ে উঠে প্রবলভাবে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যে আপত্তি জানালেন। তাঁরা বললেন যে বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে, এই সিদ্ধান্ত ঠিক হবে না, ইত্যাদি। ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রতিমন্ত্রী কে এম ওবায়েদুর রহমানের স্ত্রী অধ্যাপিকা শাহেদা ওবায়েদ মিষ্টির ভাণ্ড নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ওবায়েদ জিতেছেন। তাঁর এলাকায় ফলাফল তাড়াতাড়ি ঘোষিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু উনার হাত থেকে মিষ্টি নিয়ে আমাদের নিজ হাতে তুলে দিলেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক বক্তব্য তখন চাপা পড়ে গেল এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ এসে গেল।

খালেদা জিয়া দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়, সম্ভবত ২০০২ সালে, সে সময় আমি ঢাকায় একদিন জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়েছি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে। নিয়তির কী পরিহাস, '৭৩-এ বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের ওই প্রতিবাদকারীদের একজন, আব্দুর রহীম, এদিন প্রেসক্লাবে কথা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে 'ভঙ্গবন্ধু' বলে উপহাস করছিলেন!

সাল-তারিখ মনে নেই। আমি লালবাহিনীর জনসভা কাভার করি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বঙ্গবন্ধু লালবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। লালবাহিনীকে বলা যেতে পারে দলীয় সমর্থনপুষ্ট ও তরুণদের নিয়ে গঠিত বাহিনী। শ্রমিক লীগের আবদুল মান্নান ছিলেন লালবাহিনীর প্রধান। জনসভায় শেখ সাহেব দেশে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে উক্তি করেন, 'লাল ঘোড়া দাবড়ায়ে দেব।' উক্তিটির যদিও পরিপ্রেক্ষিত ছিল, কিন্তু সমালোচকদের কাছে তা ছিল শ্রুতিকটু। সে সময় সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি ও আরও বেশ কিছু দল ও গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি নাম দিয়ে দেশব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছিল। শেখ সাহেব ওই মিটিং থেকেই দ্বিতীয় বিপ্লবেরও ডাক দেন। শেখ সাহেব যেদিন সোহরাওয়ার্দী ময়দানে লালবাহিনীর সালাম নিচ্ছেন, ঠিক তখন তাজউদ্দীন সাহেব জিঞ্জিরায় এক জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে বলেন, 'প্রাইভেট বাহিনী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক।' আমার সহকর্মী সাংবাদিক যিনি জিঞ্জিরায় তাজউদ্দীন সাহেবের মিটিং কাভার করছিলেন, তিনি এ কথা আমাকে জানান। শেখ সাহেবের লালবাহিনীর জনসভায় সব মন্ত্রী এবং দলের উচ্চপর্যায়ের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাজউদ্দীন সাহেবই একমাত্র মিনিস্টার যিনি ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেননি।

কাজী ফজলুর রহমান ছিলেন সিএসপি অফিসার। ইয়াহিয়া খান তাঁকেসহ বেশকিছু বাঙালি অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে পদচ্যুত করে। তাকে '৭৪ অথবা '৭৫ সালে একদিন লালবাহিনীর সভাপতি শ্রমিক লীগের আবদুল মান্নান তার পুরানা পল্টনের অফিসে বন্দী করে রাখেন। তাজউদ্দীন সাহেব খবর পেয়ে সোজা সেখানে গিয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন।

১৯৭৪ সালে হিমাগার সমিতি হোটেল পূর্বাণীতে তাদের বাৎসরিক মিটিং ও ডিনারের ব্যবস্থা করে। সেই মিটিংয়ে তারা বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ দাবি করে। সেখানে আমার সঙ্গে আরও অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সে সময় সরকারি সিদ্ধান্তহীনতায় কয়লা আমদানির অভাবে বিদ্যুতের তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়। খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানাসহ অনেক মিল ও ইন্ডাস্ট্রির

প্রডাকশন স্থবির হয়ে যায়। ইন্দিরা গান্ধী তখন বঙ্গবন্ধুর বার্তা পেয়ে জরুরিভিত্তিতে ভারত থেকে কয়লা সরবরাহ করেন। সে বছর বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকট চলছিল। রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল এবং সেই সংগ্রহ হতে কয়েক জাহাজ খাদ্যশস্য ধার হিসেবে ভারতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। ওই জাহাজগুলো গভীর সমুদ্রে থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারত একটি বা দুটি জাহাজ ডাইভার্ট করে বাংলাদেশে পাঠায়। তাজউদ্দীন সাহেব হিমাগার সমিতির উক্ত অনুষ্ঠানে এসব বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বেশ ইমোশনাল হয়ে গেলেন। বললেন, 'সার্বভৌমত্ব অটুট রাখতে হলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সচেষ্ট হতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে এবং আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে হবে।' তিনি আরও বললেন, 'রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না। যেমন একজন নারী তার সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে পারে না।' তাঁর সেদিনের ওই উক্তিটি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল।

১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে আমি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সেশন এবং বঙ্গবন্ধুর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন সফর কাভার করি। বাংলাদেশ সে বছরই জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হয়। বঙ্গবন্ধু নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পরপরই তাজউদ্দীন সাহেব আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সম্মেলনে যোগ দিতে ওয়াশিংটনে আসলেন। সেটিও আমি কাভার করি। মুহিত সাহেব (বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত) তখন ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ অ্যাম্বেসিতে ইকোনমিক মিনিস্টার হিসেবে কাজ করছেন। তাজউদ্দীন সাহেবের সম্মানে তিনি তাঁর বাসায় ডিনারের আয়োজন করেন। ওয়াশিংটন ডিসির ডুপন্ট সার্কেলের হোটেল থেকে অনু ভাই (নুরুল ইসলাম অনু, তখন বাংলাদেশ দূতাবাসে কাউন্সিলর হিসেবে কর্মরত) আমাকে ও আরও ক'জন সাংবাদিককে উঠিয়ে নিজে ড্রাইভ করে মুহিত সাহেবের বাসায় নিয়ে যান। তাজউদ্দীন সাহেব সেই ডিনারে দুঃখ প্রকাশ করে অনেক কথাই বলেছিলেন। আভাসও দিয়েছিলেন যে তিনি আর বেশিদিন মন্ত্রিসভায় থাকবেন না। তিনি একটা কথা শুনে খুব আপসেট ও শকড হয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকার এক মার্কিন পাবলিক রিলেশন্স কোম্পানিকে বঙ্গবন্ধুর যুক্তরাষ্ট্রের সফর কাভার করতে ২০ থেকে ৪০ হাজার ডলার দিয়েছে, এ তথ্য তিনি সেদিনই জানতে পারেন। তাজউদ্দীন সাহেব অর্থমন্ত্রী, অথচ এ ব্যাপারে তাঁকে আগে জানানো হয়নি। তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন যে গরিব দেশের এতগুলো টাকার অপচয় হলো, অথচ পাবলিসিটিও হলো না। এখানে উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যোগ দেওয়ার জন্য আফ্রিকার কোনো এক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিউইয়র্কে এসে এখানকার এক ছোট্ট মোটেলে ওঠেন। তিনি বলেন যে তাঁর রাষ্ট্রের সামর্থ্য নেই যে তাঁকে দামি হোটেলে রাখবে। শুধু এই কারণে ওই প্রেসিডেন্ট বিশাল মিডিয়া কাভারেজ পান। তাঁর কোনো পাবলিসিটি কোম্পানির সহায়তার প্রয়োজন হয়নি।

তাজউদ্দীন সাহেব পার্লামেন্টে সকল সদস্যের বক্তব্যের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি সবার আলোচনার নোট নিতেন। পার্লামেন্টে ছোট্ট বিরোধী দলের সদস্যদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন খুব গুছিয়ে, যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে। এর বিপরীত চিত্রও উল্লেখ করা যায়। একবার স্পিকার মোহম্মদ উল্লাহর (পরবর্তীকালে স্বল্পকালীন রাষ্ট্রপতি) তিনবার অনুরোধের পর মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক বিরোধী দলের এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হন। তিনি অর্ধেক দাঁড়িয়ে, অনিচ্ছুকভাবে বলেন যে তার আরও সময়ের দরকার।

স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বন্ধে আমার হাইপোথিসিস হলো যে :

বঙ্গবন্ধুর নামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সে সময় আমি চট্টগ্রামে ছিলাম এবং অনেক ঘটনা কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ

আমার হয়। বেলাল মোহাম্মদ ছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী। তিনি '৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় হৃদয়গ্রাহী কথিকা পাঠ করে অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দেশপ্রেমিক। তিনি, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ এবং আরও ক'জন ইঞ্জিনিয়ার চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ এক কিলোওয়াটের রেডিও স্টেশন স্থাপন করেন। সেখান থেকেই আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা আব্দুল হান্নান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন [২৫ মার্চ গত ২৬ শে মার্চের শুরুতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম বেতার হতে আব্দুল হান্নান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২য় বার কালুরঘাট ট্রান্সমিটার হতে ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষ হতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বেলাল মোহাম্মদ চট্টগ্রামের পটিয়া অঞ্চল হতে মেজর জিয়াকে কালুর ঘাটে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য একজন সিনিয়র মিলিটারি অফিসারকে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করা। বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার হতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ, একারণেই যে ঐ দিনেই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।– লেখক][১]। এই দেশপ্রেমিকেরা নিজেরাই বঙ্গবন্ধুর নাম দিয়ে ওয়্যারলেসে বিভিন্ন স্থানে মেসেজ পাঠান। ফোনেও তারা নিজেদের গ্রুপের মধ্যে একই বার্তা বিনিময় করেন।

আর একটা ব্যাপার হলো বেলাল মোহাম্মদরা জানতে পারেন যে কয়েকজন বাঙালি আর্মি অফিসার কালুরঘাট থেকে কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান করছেন। তারা ২৭ মার্চ সেখানে গিয়ে ওই অফিসারদের বেতার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার হিসেবে মেজর জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বাংলায় লেখা একটি বিবৃতি দিয়ে সেটি পাঠ করতে বলেন। জিয়া বিবৃতিটি পড়ে নিজে কাগজ কলম নিয়ে ইংরেজিতে একটি বিবৃতি তৈরি করেন এবং সেটি পাঠ করে শোনান। সেই ইংরেজি বিবৃতিতে তিনি নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন, যা আমি চাঁটগা থাকাকালীন নিজ কানে শুনি। আধঘণ্টা পর তিনি আরেকটি সংশোধিত ঘোষণা পাঠ করে শোনান। তাতে তিনি নিজেকে আর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেননি, শুধু বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[২] পরবর্তী সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত কয়েকজনের বরাতে শুনেছি যে জিয়া নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করায় উপস্থিতদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তাদের প্রতিবাদের মুখে জিয়া নিজের ওই রাষ্ট্রপতিত্বের দাবি বাদ দিয়ে সংশোধিত ঘোষণা পাঠ করতে বাধ্য হন। আমার মতে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকেই স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে ধরা যেতে পারে।[৩]

দেশ যখন স্বাধীন হলো তখন সবকিছু বিধ্বস্ত ছিল। ব্রিজ, ফ্যাক্টরি, রাস্তাঘাট সবই বিনষ্ট ছিল। খরা, বন্যা লেগে ছিল। তারপর '৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বব্যাপী সকল পণ্যের দাম বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। সে সময় বিশ্বের সর্বত্র তীব্র খাদ্যসংকট ছিল, ফলে মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও প্রচণ্ড খাদ্যসংকট দেখা দেয়। কিন্তু ওই সংকট ও অন্যান্য দ্রব্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকার দায়ী ছিল না। কারণ যুদ্ধের ফলে দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে গিয়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসররা লাখ লাখ ঘরবাড়ি, দোকানপাট পুড়িয়ে দিয়েছিল। পর পর দুটি শস্য মৌসুমে আবাদের সুযোগ পায়নি মানুষ। তা ছাড়া যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানিরা কলকারখানা, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি ধ্বংস করে দিয়েছিল। ফলে দেশের সার্বিক অবস্থা একটা

প্রচণ্ড বিপর্যয়ের কবলে নিপতিত হয়েছিল। দেশের মানুষ এসব দেখেছে এবং বুঝতে পেরেছে। তাই তারা কষ্ট সহ্য করতে রাজি ছিল। মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল না। মিরাকল ঘটানোও সম্ভব ছিল না। সে হিসেবে সরকার ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু জনগণ যখন দেখল যে অনেক আওয়ামী লীগার রাতারাতি ধনী বনে যাচ্ছে, সব সুবিধা নিচ্ছে এবং আপামর জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে তাতে করে সরকারের জনপ্রিয়তায় ব্যাপক ধস নামে। এ ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা হতে ফেনীর জয়নাল হাজারীর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। হাজারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর তিনি অধিকাংশ অস্ত্র সমর্পণ করেননি, সন্ত্রাস করেছেন এবং অনেক লুটপাট করেছেন। তার বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যাপক অভিযোগ ছিল। তিনি অবৈধভাবে ফেনীর দুটি আবাসিক হোটেল দখল করেন। জেলখানার পাশে কলেজ রোডের ওপর ওই হোটেল দুটি ছিল। একটির নাম হোটেল ডিনোফা, অন্যটির নাম মনে নেই। হাজারী একটি হোটেলে তার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন এবং অন্য হোটেলকে জেলখানা ও টর্চার চেম্বার করে পাকিস্তানপন্থীদের ওপর নির্যাতন চালান। তাদের স্বজনদের কাছ থেকে অনেক অর্থ আদায় করতেন। ফেনীর আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি খাজা আহমেদ (তিনি ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের একজন বীর সেনানী ছিলেন এবং কিছুকাল নৈনিতাল জেলে জওহরলাল নেহেরুর পাশের সেলে বন্দী ছিলেন)।– তিনি হাজারীর অত্যাচার হতে পাকিস্তানি দালালদের বাঁচানোর এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের সরকারি জেলে পাঠিয়ে দেন। জয়নাল হাজারীর অত্যাচার এতই বৃদ্ধি পায় যে বঙ্গবন্ধুর সরকার তার বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনী পাঠাতে বাধ্য হয়। একদিন পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে হাজারীর সশস্ত্র বাহিনীর কয়েক ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়। হাজারীর ওই দখল করা হোটেল থেকেই পুলিশ বাহিনী তাকে আটক করে। পরে তিনি উচ্চ কানেকশনের বলে ছাড়া পান। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবলীগ প্রধান শেখ ফজলুল হক মনি পল্টন ময়দানে যুবলীগের বিশাল এক সমাবেশ করেন। সেই সমাবেশে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি ছিলেন। সেদিন হাজারীর হাত দিয়ে শেখ মনি বঙ্গবন্ধুকে হরিণ উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এতে ফেনী এলাকার জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। এর কয়েক দিন পর ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে আমার সঙ্গে এ নিয়ে শেখ মনির প্রচণ্ড তর্ক হয়। আমি মনিকে বলেছিলাম যে তিনি হাজারীর মতো সন্ত্রাসীর হাত দিয়ে শেখ সাহেবকে হরিণ উপহার দিয়ে ঠিক কাজ করেননি। আমার সহকর্মী সাংবাদিক সৈয়দ নাজিম উদ্দিন মানিক (প্রয়াত) আমাকে সমানে চিমটি কাটছিলেন যাতে মনির সঙ্গে তর্কে ক্ষান্ত দেই। সেদিন মনি আমাকে বলেছিলেন যে জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অপপ্রচারণা। তিনি আরও বলেছিলেন, যারা অস্ত্র হাতে নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে, তাদের অস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ থাকবেই। অস্ত্র তারা নিজেদের কাছে রাখলেও সেটা অপরাধের পর্যায়ের পড়ে না। যারা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়নি, তাদের পক্ষে এসব বোঝা মুশকিল।

আরেকটি ঘটনা। ১৯৭৩ বা '৭৪ সালের কথা। বাংলা একাডেমীতে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমানের স্মরণসভার আয়োজন করেন তাঁর আত্মীয় অধ্যাপক আলাউদ্দীন আল-আজাদ। তৎকালীন বিমানমন্ত্রী জেনারেল ওসমানী ছিলেন প্রধান অতিথি। তাঁর উপস্থিতিতেই একজন সার্ভিং আর্মি অফিসার বললেন যে মতিউর বেঁচে থাকলে আজ তিনি '৭১ এর মতোই যুদ্ধবিমান নিয়ে বিদ্রোহ করতেন। তিনি সরকারের দুর্নীতি ও ব্যর্থতার সমালোচনা করে এ কথা বলেছিলেন। ওসমানী কোনো প্রতিবাদ করলেন না। আমি সেই মিটিং কভার করেছিলাম।

'৭২-এ পার্লামেন্টে কনস্টিটিউশন নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন প্রতিমন্ত্রী কে.এম ওবায়দুর রহমান একদিন আলোচনাকালে বললেন যে রিপাবলিকের বাংলা হবে সাধারণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র নয়। যখন রাজতন্ত্র থাকে তখন প্রজা থাকে। গণতন্ত্রে প্রজা থাকে না। শেখ সাহেব তখন তাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। ওবায়দুর রহমান যে খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন বা আইডিয়াটা যে তাঁর নিজস্ব ছিল তা নয়। সে সময় পূর্ব জার্মানিকে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি বলা হতো। বাংলা পত্রপত্রিকায় ফেডারেল রিপাবলিককে সাধারণতন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা হতো। শেখ সাহেব মানবেন্দ্র লারমাকেও একদিন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা বাঙালি হয়ে যাও।' লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের জন্য সংবিধানে বিশেষ অধিকারের দাবি তুলেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর সময় সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেবিনেটে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। ১৯৯১ সাল থেকে গণতন্ত্র উত্তরণের পরও এখন যেমন আলোচনার বদলে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের প্রথম বছরগুলোতে তেমনটি হতো না, অন্তত বাকশাল গঠন না হওয়া পর্যন্ত। এখনকার মিনিস্টাররা ভয়ে প্রধানমন্ত্রীর সামনে কথা বলেন না, দ্বিমত প্রকাশ করেন না। প্রকৃতপক্ষে জিয়াউর রহমানের আমল হতেই এমন অবস্থা শুরু হয়।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি (অর্গানাইজেশন অব দ্য ইসলামিক কনফারেন্স) সম্মেলনের পক্ষ থেকে কয়েকজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় এসেছিলেন। রমনা থানার সামনে স্টেট গেস্ট হাউসে তাদের সঙ্গে সারা রাত বাংলাদেশ ডেলিগেশনের আলোচনা হয়েছিল। আমি সারা রাত ডিউটিতে ছিলাম আলোচনা কাভারের জন্য। আমরা সাংবাদিকেরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম, তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিলেন সেই আলোচনায় যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত নন। ব্যাপারটি প্রোটোকল বহির্ভূত। ওনারা ভেতরে আলোচনা করছিলেন, আমরা সাংবাদিকেরা ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করছিলাম। আলোচনা শেষ হওয়ার পর তাহেরউদ্দীন ঠাকুর আমাদের জানালেন যে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে, কেবিনেট মিটিংয়ের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। উল্লেখ্য যে তার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকালীন ও পরবর্তী সময়েও পাকিস্তান ও সিআইএ-এর সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ ছিল।

আর একটা ব্যাপারও আমি লক্ষ করি যে তাহেরউদ্দীন ঠাকুর সম্ভবত ১৯৭৪ সালে যখন ভারত সফরে গেলেন তখন তাঁকে পূর্ণ মন্ত্রীর মতোই প্রোটোকল দেওয়া হয়। ভারতের তথ্যমন্ত্রী তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এবং এরপর দু-তিনদিন তার সফরসঙ্গী হিসেবে অন্যান্য শহরে যান। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর সেবার আজমীরসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রায় দুই সপ্তাহ সফর করেন। আমার ধারণা, ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ণ সমর্থন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার আদর্শের প্রতি। কিন্তু তাঁর অজান্তে ভারত রাষ্ট্রের বেশকিছু শক্তিশালী গ্রুপ, ভিন্নমত ও লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপারে কাজ করছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা গেছে যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কখনো কখনো রাষ্ট্রপতির অজান্তেই অনেক তৎপরতা চালায়। ভারতীয় সরকারের মধ্যেই এক গ্রুপ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। (সিআইএ ও পাকিস্তান আইএসআইসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এলায়েন্স গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।– লেখক)

২১ অক্টোবর, ২০০১

লেখকের ডায়েরি থেকে।

(ডায়েরির অধিকাংশই ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সঙ্গতি রাখার জন্য ইংরেজিতে লেখা ঘটনা ও তথ্যাবলি বাংলা অনুবাদ করা হলো। কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ অনুবাদ ব্যতীত ব্যবহার করা হলো।)

মুজিব হত্যা সম্পর্কে তথ্য

ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি-এনার তৎকালীন সাংবাদিক ও নিউইয়র্কের বাংলা সাপ্তাহিক প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর সঙ্গে কথা হলো। মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই আমার জানামতে অত্যন্ত সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে কতগুলো তথ্য পেলাম যা লিখে রাখলাম ভবিষ্যতের জন্য। (নিম্নে উল্লিখিত ৪ ও ৫ নম্বর-এ মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেব আরও কিছু তথ্য যোগ করেছেন)।

মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রধান ব্যক্তিবর্গের কার্যকলাপ

১) ১৯৭৪ বা '৭৫ সালে খন্দকার মোশতাক তার তেহরান সফরের সময় চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক অনির্ধারিত মিটিং করেন।

২) মোশতাকের ডান হাত বলে পরিচিত তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর দুই সপ্তাহ ধরে ভারত সফর করেন। তাকে ভারতের তথ্যমন্ত্রী (পূর্ণ মন্ত্রী) অভ্যর্থনা জানান যা প্রোটোকলের বাইরে।

৩) যখন লাহোর কনফারেন্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধুকে সেখানে যোগদানে রাজি করাতে আসেন তখন প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর তাদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

৪) মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই আরও জানান "পূর্ব এশিয়ায় নিউজ উইকের ব্যুরো চিফ আর্নল্ড জেটলিন, তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন পর কোলকাতা হয়ে বাংলাদেশে আসেন। এ সময় একদিন তিনি আমাদের এনার কার্যালয়ে এসেছিলেন। আমাদের এক্সিকিউটিভ এডিটর হাসান সাঈদের টেবিলের ওপর বসে সামনের একটি চেয়ারে পা রেখে (অনেক পশ্চিমা তৃতীয় বিশ্বের লোকদের সঙ্গে আচরণে এখনো যে ধৃষ্ঠতার পরিচয় দিয়ে থাকে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।– সাক্ষাৎকারদাতার উক্তি) আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হাসান সাঈদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি আগে থেকে এসব ব্যাপারে কোনো কিছু

জানতে না বা আঁচ করতে পারোনি ?' উত্তরে তিনি জানান যে ম্যানিলায় তিনি বেনজির ভুট্টোর চাচা মমতাজ আলী ভুট্টোর সঙ্গে ডিনার করেছিলেন। সে সময় তাঁর কাছে একটি ফোন আসে এবং তাঁকে জানানো হয় যে মুজিব নিহত হয়েছেন। তিনি এই তথ্যটি মমতাজ ভুট্টোকে জানান। তখন ভুট্টো স্মিত হাসি হাসেন [knowing smile] কিন্তু কিছুই বলেননি। তাতে ধারণা করা যেতে পারে–এ বিষয়ে তারা আগে থেকে কিছু জানত।

৫) জেটলিন আরেক ঘটনা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, মাস দেড়েক আগে আমি ঢাকা এসেছিলাম। বিমানবন্দর থেকে আমি সোজা তোমাদের সচিবালয়ে খন্দকার মোশতাকের অফিসে যাই। কিছুক্ষণ সেখানে কথা বলার পর তিনি আমাকে তার গাড়িতে করে তার সরকারি বাসভবনে নিয়ে যান। সেখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলি এবং খাওয়া-দাওয়া করি। এরপর ওইদিনই সন্ধ্যায় আমি ঢাকা থেকে কোলকাতা চলে যাই।

হাসান সাঈদ তার এই দুই বক্তব্যের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেও জেটলিন আর কিছু বলতে রাজি হননি।"

ব্যক্তিগত, টেলিফোন ও ভিডিও সাক্ষাৎকার
১১ নভেম্বর ও ৩০ নভেম্বর, ২০০৯ এবং ১২ জানুয়ারি ২০১০
ওয়াশিংটন-নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

তথ্যসূত্র

১. বেলাল মোহাম্মদ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৩ সংস্করণ, পৃ. ৩৩-৩৪, ৪০

২. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ ডঃ মইনুল ইসলামের সাথে এ প্রসঙ্গে কথা বললে (৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪) তিনিও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন সে ২৭ মার্চ, ১৯৭১ মেজর জিয়াউর রহমানের প্রথম ঘোষণাটি যাতে তিনি নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তা চট্টগ্রাম থেকে তিনি শোনেন। তিনি আরও জানান যে, তারপর সেই সন্ধ্যায় কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত, ডঃ মমতাজউদ্দীন (নাট্যকার) বেলাল মোহাম্মদ প্রমুখের প্রতিবাদের মুখে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর নামে ঐ সন্ধ্যাতেই আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

৩. কালুর ঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থপতি বেলাল মোহাম্মদ পূর্বে উল্লেখিত বইয়ে (পৃ. ৪০, ৪৪-৪৫) উল্লেখ করেন যে ২৭ মার্চ মেজর জিয়া নিজের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথাটি লিখেছিলেন। পরে বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধে তিনি নিজের নামের শেষে বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ করে, তাঁর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৮ মার্চ তিনি নতুন একটি লিখিত ঘোষণা নিয়ে এসেছিলেন যাতে তিনি নিজেকে Provisional Head of Bangladesh ও স্বাধীন বাংলা লিবারেশন আর্মির প্রধান হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। এই দ্বিতীয় ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে অনুল্লেখিত থাকে যা ছিল শ্রোতাদের কাছে আপত্তিকর। ঐ আপত্তির কারণে, মেজর জিয়া তৃতীয় ঘোষণায় মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর নাম বারবার উল্লেখ করেন। সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ এবং ডঃ মইনুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় তাঁরা মেজর জিয়াউর রহমানের প্রথম ঘোষণাটি শোনেন, যাতে তিনি নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে উল্লেখ করেন। বেলাল মোহাম্মদ এ প্রসঙ্গে তার বইতে ২৮ মার্চ উল্লেখ করেন।

বঙ্গবন্ধুর পার্সনাল এইড হাজী গোলাম মোরশেদের সাক্ষাৎকার

হাজী গোলাম মোরশেদ। নামটি আমি প্রথম শুনি ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়। ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার সাথে থেকে যান। ঐ কালো রাতে বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনিও ৩২ নং রোডের বাসগৃহ হতে কারাবন্দি হন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটকাধীন মোরশেদ সাহেবের ওপর চলে পাশবিক নির্যাতন। মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি মুক্তি লাভ করেন ২৫ নভেম্বর, ১৯৭১। ওনার উদ্যোগে ও অনুরোধে, ভারতীয় সেনারা বঙ্গবন্ধুর গৃহবন্দি পরিবারকে ধানমণ্ডির ১৮ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে মুক্ত করে, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১। কিশোর বয়স হতে রাজনীতির সাথে জড়িত হাজী গোলাম মোরশেদের জীবন বর্ণাঢ্য ঘটনামালায় ভরপুর। বরেণ্য ও শক্তিধর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন; সাক্ষী হয়েছেন এমন সব ঘটনাবলির যা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভবিষ্যতের সত্যান্বেষী-বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচয়িতাদের ইতিহাসকে আলোকিত করতে পারে।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের কাছ থেকে ওনার নাম ও ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে, পরদিন ওনাকে ফোন করি। উনি সাথে সাথেই ওনার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। পুত্রবধূ প্রিয়াংকার ভিডিও ক্যামেরাটি নিয়ে ওনার ঢাকার আসাদগেটের বাড়িতে যখন পৌঁছি তখন বিকেল তিনটা পেরিয়ে গিয়েছে। উনি খাটের ওপর আধশোয়া অবস্থায় স্ত্রী, কন্যা, জামাতা ও পরিবারবর্গ পরিবৃত অবস্থায় সাপ্তাহিক ছুটির দিনটি উপভোগ করছিলেন। আমাকে সাদরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন, যেন বহুদিনের চেনা। এক নিমিষে আপন করে নেওয়ার মতো গুণাবলি সমৃদ্ধ এই অশীতিপর মানুষটির অভিব্যক্তি ও আচরণে তারুণ্যর উদ্দীপনা স্পষ্ট।

রসিকতা করেন স্বাচ্ছন্দ্যে। রসালাপে যে কোনো আলোচনাকে করে তোলেন প্রাণবন্ত। স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। কালের গর্ভে নিমজ্জিত ইতিহাসকে বর্ণনা করেন এমনভাবে, যেন মাত্র সেদিনের ঘটনা। সত্য বলেন নির্দ্বিধায়, কোনোরকম রাখ ঢাক ছাড়াই।

ভিডিওতে ধারণকৃত ওনার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো :

আসসালামু আলাইকুম। চাচা আপনার পুরো নামটি বলবেন ?

আমার নাম মহম্মদ গোলাম মোরশেদ। আমাকে হাজী মোরশেদ নামেই সবাই চেনে।

চাচা আপনি যদি একটু শুরু করেন সেই সময়ের ঘটনা থেকে– ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলছিলেন যে রাত সাড়ে দশটার দিকে উনি এবং ড. কামাল হোসেন, ২৫ মার্চ, ১৯৭১, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেলেন। যেয়ে দেখলেন যে ডাইনিং টেবিলে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনি বসা। ওখান থেকে আপনি কি স্মৃতিচারণ করবেন ?

যখন আমীর-উল আসল, তখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাবার চেষ্টাই সে করল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বললেন যে তিনি ডিসিশন নিয়ে ফেলেছেন আগেই। তার আগেই উনি বলে দিয়েছেন, "If they don't get me, they will massacre all the people and destroy the city." আমার মনে

হয়েছে যে এটা তার ও আমার জীবনের শেষ রাত্রি। স্বাধীনতার Key লগ্ন যাকে বলে। লগ্ন শুরু হলো। বঙ্গবন্ধু আমাকে অনেক দিন আগে একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন 'যখন কোনো ডিসিশন নিয়ে ফেলব, তুমি কখনো আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করবার চেষ্টা করবে না।' তার আগে তিনি বলেছেন, 'তুমি আমার সবচেয়ে কাছে থাক, তার ফলে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারি।'

২৫ মার্চ রাতে– তাহলে আমি সকাল থেকে বলি। প্রতিদিন সকালে আমি চলে আসতাম। সারাদিন আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে থাকতাম। অনেক রাত হলে চলে যেতাম। এটা আমার রুটিন ছিল।

আপনার বাসা কোথায় ছিল ?

কাকরাইলে বাসা ছিল। আমার একটা গাড়ি ছিল ঢাকা গ, ওয়ান। ঐ গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধু আমার সাথে যেতেন। বঙ্গবন্ধু প্রেফার করতেন আমার সাথে যাতায়াত।

কী গাড়ি ছিল ?

টয়োটা সেমি ডিলাক্স। এটা কিনেছিলাম হীলু ভাইয়ের কাছ থেকে। উনি ঢাকার মোত্তালিব কলোনির মালিক ছিলেন। ইস্টার্ন হার্ডওয়ারের মালিক। সিক্সটি নাইনে হজ থেকে ফিরে আসার পর গাড়িটা কিনি।

বঙ্গবন্ধু মাঝে মাঝে আপনার সাথে ঐ গাড়িতে যেতেন ?

মাঝে মাঝে না ডেইলি।

কোথায় যেতেন ?

আওয়ামী লীগ অফিসে। আর বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরে যেতাম। একবার নড়াইলে গেলাম। তখন তাজউদ্দীন ভাই, মনসুর ভাই আমাদের সাথে।

গাড়ির কী রং ছিল ?

সাদা।

আচ্ছা ! এখন মনে পড়ে সাদা টয়োটা গাড়ি !

হ্যাঁ। তোমাদের বাড়িতেও ঐ গাড়ি গিয়েছিল।

মুজিব কাকু এ গাড়ি করে আসতেন আমাদের বাসায়।

হ্যাঁ, ঐ গাড়িতেই উনি আসতেন। তোমার মা কাবাব বানিয়ে আমাদেরকে খাওয়াতেন।

তখন ২৫ মার্চ সকাল বেলায় কী হলো ?

আমি আসলাম নয়টার দিকে। এরপর ওসমানী সাহেব আসলেন (জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী), শেখ আব্দুল আজীজ ভাই আসলেন। তারপর তাজউদ্দীন ভাই তো এসে এক দুঘণ্টা করে থাকতেন ডেইলি। পেপার তৈরি করা, স্টেটমেন্ট তৈরি করা, ইভ্যালুয়েট করা এ সমস্ত ওনাকেই করতে হতো। He was one dynamo behind শেখ মুজিবুর রহমান। আনসার ডাইরেক্টর আব্দুল আউয়াল সাহেব বললেন যে আনসার বাহিনীর আর্মস-অ্যামুনেশন আছে। এটা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টের পুলিশ লাইনে মালখানায় জমা আছে। উনি একসময় যশোরের এস.পি ছিলেন। আমার সাথে সেই জন্যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমি তখন যশোর মহকুমা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি। উনি এই অ্যাডভাইসটা দিলেন। আমি এই ব্যাপারটা সিরাজুল আলম খানের সাথে আলোচনা করলাম যে আমাদের তো অ্যামুনেশন দরকার। প্রত্যেক আনসারের জন্য যে একটা 'বিরাট আর্মস, বিরাট অ্যামুনেশন, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে আছে, আউয়াল সাহেব অ্যাডভাইজ করেছেন যে ওটা আমাদের লোকজনদের ভেতর যেন ডিস্ট্রিবিউট করে দেই। সিরাজুল আলম খান সাহেব হেসে উড়িয়ে দিলেন কথাটা। এরপরে আমি

বঙ্গবন্ধুকে বললাম। বঙ্গবন্ধু ওসমানী সাহেবকে বললেন 'মুরশেদ কী বলছে, আপনি শোনেন।' [ওনাকে মুরশেদ নামেও অনেকে সম্বোধন করে থাকেন।] আমি ওসমানী সাহেবকে বললাম। উনি বললেন 'দেখি চিন্তা করে।' এরপর দুপুর হয়ে গেল। বাসায় ফিরব খাওয়ার জন্য। ওসমানী সাহেব আমাকে বললেন, 'আমাকে একটা লিফট দেন।' ওসমানী সাহেবকে নিয়ে ধানমণ্ডির ৬ কি ৫ নম্বর রোডে সামাদ সাহেবের (আবদুস সামাদ আজাদ) বাড়িতে নামালাম। ওসমানী সাহেব আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ভিতরে। ওখানে দুপুরে খেলাম। নামাজ পড়লাম। তারপর তিনটা চারটার দিকে চলে আসলাম বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। এক বালুচ নবাব এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ওনার সাথে কথা বললেন। পাঁচটার দিকে আমি ঘরে ঢুকলাম। বঙ্গবন্ধু ও আমীর-উল (ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম) বসে আছে। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন যে 'তোমাকে একটু ঢাকার এসপির কাছে যেতে হবে।' আউয়াল সাহেব সাথে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তোমরা দুজন ঢাকার এসপিকে বল আর্মস ও অ্যামুনেশন যেন ফোর্সের ভেতর ডিস্ট্রিবিউট করে।' রাজারবাগে (পুলিশ লাইন) সব আর্মস ও অ্যামুনেশন। রাজারবাগ তখন ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ হেড কোয়ার্টার ছিল। আমরা তখন সার্কিট হাউসের সামনে ঢাকার এস.পির বাড়িতে গেলাম। উনি একটু অসুস্থ ছিলেন। উনি আসলেন। আসলে আমি বললাম। আউয়াল সাহেব ডিটেলস বললেন। তারপর মাগরিবের নামাজ পড়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে এসে রিপোর্ট করলাম। তখন আমীর-উল বলল, 'মুরশেদ ভাই যশোরে খবর দেওয়া দরকার। মশিয়ুর রহমান সাহেবকে একটু খবর দেন।' আমি তখন বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকালাম। বঙ্গবন্ধু বললেন 'যা'। তখন আমি বাসায় চলে আসলাম। বাসায় চলে এসে যশোরের মশিয়ুর মামাকে (যশোর আওয়ামী লীগের সভাপতি, শহীদ মশিয়ুর রহমান) ফোন করলাম। সেখানে রওশন আলী সাহেব, তবীবুর রহমান সাহেব এম. এল. এ, এম.পি সবাই ছিলেন। তো বলে দিলাম যে বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে পুলিশ লাইনে যত আর্মস ও অ্যামুনেশন আছে সেগুলো ফোর্সের ভেতর ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়ার জন্য।

আমাদের স্বাধীনতার সমর্থকদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করার কথা বলেছিলেন ?

না, পুলিশ ফোর্সের ভেতর ডিস্ট্রিবিউট করার কথা বলেছিলাম। বাঙালি পুলিশের মধ্যে। পুলিশ লাইনের প্রায় সমস্তই বাঙালি। দু-একজন হাবিলদার বাদে।

ওদের কাছে অস্ত্র থাকত না ?

না, ওরা রেস্টে থাকে। পুলিশ লাইনে সাধারণত আন-আর্মড থাকে।

আচ্ছা, তাই, মালখানা থেকে তুলে তাদের হাতে যেন অস্ত্র তুলে দেওয়া হয় ?

হ্যাঁ, ডিস্ট্রিবিউট যেন করা হয়। আমীর-উলই বলল, 'মুরশেদ ভাই এখান থেকে ফোন করা তো অসুবিধা, আপনি আপনার বাসায় যেয়ে ফোন করেন।'

কারণ এটা গোপন ব্যাপার–

হ্যাঁ। তখন আমি আমীর-উলের অ্যাডভাইজ মতো বাসায় চলে গেলাম। বাসায় চলে গিয়ে ফোন করলাম। তখন আটটা সাড়ে আটটা বাজে।

এটা ২৫ মার্চ রাতে ?

হ্যাঁ ২৫ মার্চ রাতে–

মাই গুডনেস, এটা তো সাংঘাতিক– !

এরপর আমার মা আবার মারা গিয়েছেন ৩ ফেব্রুয়ারি সে বছরেই। মার জানাজায় মুজিব ভাই, তাজউদ্দীন ভাই সবাই এটেন্ড করেছিলেন। আমার বড়ভাই (আতিউর রহমান) তখন চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের। হাতিরপুলের বাসায় থাকতেন। (সেখানে জানাজা

হয়) যখন আমি বের হলাম তখন (রাত) সাড়ে নয়টা বাজে। মার কবর জিয়ারত করার জন্য বেরিয়েছি, তারপর মুজিব ভাইয়ের বাসায় যাব। এসে আমি দেখি শাহবাগের মোড়ে ব্যারিকেড ফেলা হচ্ছে। তখনো দশটা বাজেনি, দশ বাজে বাজে করছে।

ব্যারিকেড ফেলছে আমাদের ছেলেরা ?

হ্যাঁ। আমাদের ছেলেরা ব্যারিকেড দিচ্ছে। তখন আজিমপুর গোরস্থানে যাওয়া অ্যাবানডান করে, এয়ারপোর্ট রোডটা খালি পেলাম সেই এয়ারপোর্ট রোড দিয়ে সোজা চলে আসলাম। চলে এসে দেখি সামনে আবার ব্যারিকেড। তখন বাঁয়ে গ্রিন রোডে ঢুকলাম। ঢুকে যেয়ে একটা গলি দিয়ে কলাবাগানের ভেতর দিয়ে আমি মিরপুর রোডে উঠলাম। আমার সামনে ধড়াস করে একটা গাছ পড়ল। দেখি কুড়াল হাতে রাশেদ মোশাররফ (মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের ভাই)। আমরা রাস্তায় আটকে গেলাম। রাস্তায় আটকে গেলে রাশেদ মোশাররফ ছুটে আসল। আমাকে আবার নানা বলে। বলে 'নানা এ দিকে তো রাস্তা বন্ধ। তো এদিক দিয়ে যান।' আমাকে আট নাম্বার (ধানমণ্ডি) রোড দিয়ে যেতে অ্যাডভাইস করল। তো আমি আট নাম্বার রোডে ঢুকে, ঐ ব্রিজটা পার হয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গাড়িটা রেখে সোজা ছুটে গেলাম। নিচে কেউ নেই (হাজী মুরশেদ সাহেব জানান যে, সে রাতে বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর সাথে শিশু রাসেল ও বেগম মুজিব ছিলেন। বাকি চার ছেলেমেয়ে বাসার বাইরে ছিল)।

শুনসান ?

শুনসান। শুধু পুলিশের একটা দারোগা ছিল, সেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরের বারান্দার সামনে। আমি সোজা ওপরে উঠে গেলাম। ওপরে উঠে দেখি বঙ্গবন্ধু পাইপ হাতে বসে আছেন। আমি ঢোকার সাথে সাথে বললেন, 'আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম। They are coming to arrest me. I have decided to stay.' ঠিক এই তিনটা কথা উচ্চারণ করলেন।

তখন রাত সাড়ে দশটা বাজে ?

হ্যাঁ। এ রকমই।

ড. কামাল ও আমীর-উল কাকু তো–

ওরা একটু পরেই আসল।

বঙ্গবন্ধু কোথায় বসা ?

ওপরে বেডরুমে বসাছিলেন।

আমীর-উল কাকু ও ড. কামাল হোসেন কি বেডরুমে গেলেন ?

না, ওনারা নিচের বারান্দায় আসলেন। তারপরে নিচের টেবিলে বসলেন।

আপনারা কি তখন নিচে নেমে এসেছিলেন ?

হ্যাঁ, আমি তখন ওপর নিচ করছি। প্রচুর টেলিফোন আসছে। মওদুদ (ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ) ফোন করে বলল যে 'হাজী ভাই পালান'। তারপর সিরাজুল হক সাহেবের (অ্যাডভোকেট, এম.সি.এ) স্ত্রী বললেন যে, 'মুজিব ভাইকে বলেন যে পালিয়ে যেতে, ওরা মেরে ফেলবে। তারপর সুবোধ মিত্র ছিলেন যশোরের এম.সি.এ তিনি বললেন 'আপনারা পালান।'

আপনি উপর নিচ করছিলেন ?

উপরেও টেলিফোন, নিচেও টেলিফোন।

দুইটা লাইন ?

২টা টেলিফোন। মুজিব ভাই কোনো টেলিফোন ধরছিলেন না।

তারপর এই সময় আমীর-উল আসল। কামাল হোসেন তো অ্যাগ্রেসিভ টাইপের না। খুব নরম সরম। মানুষের ভিড়ের বাইরে থাকতেই পছন্দ করতেন। আমীর-উল ছুটে আসল। ছুটে এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলল। ঐ সময়টায় আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। আমার যেন কেন আবারও ছুটতে হলো। তো ওর সাথে কী কী কথা হলো এটি আমি শুনিনি। আর তখন শুনবার মতো মনের অবস্থাও না। এরপরে তবীবুর রহমান আসল। তবীবুর রহমান হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর মতো লম্বা সাইজ। পরে ডাইরেক্টর অব পাবলিক কমিশন হয়। সে এসে বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরল, বলল, 'মুজিব ভাই, পালান। ওরা মেরে ফেলবে আপনাকে।' তখন কী বলল সেটা শোন 'If they don't get me, they will massacre all the people, all my people and destroy the city'. এরপরে রাত এগারোটা বেজে গেল, বারোটা প্রায় বাজে বাজে, এমন সময় একটা টেলিফোন আসল। বলে 'আমি বলদা গার্ডেন থেকে বলছি। মেসেজ পাঠান হয়ে গিয়েছে, মেশিন নিয়ে কী করব ?' আমি মুজিব ভাইয়ের কাছে দৌড়ে গেলাম, বললাম যে ফোন এসেছে– 'মেসেজ পাঠান হয়ে গিয়েছে। মেশিন নিয়ে আমি কী করব ?' উনি বললেন, 'মেশিনটা ভেঙে ফেলে পালিয়ে যেতে বল।' বঙ্গবন্ধু বললেন মেশিন ভেঙে পালিয়ে যেতে। আমি তাকে (বার্তা প্রেরক) সে কথা বললাম।

রাত ক'টায় এ কলটা আসে ?

Around Twelve (am).

আমার হাতে একটা ঘড়ি ছিল। ঘড়িতে দেখলাম একটা দশ-পনেরো হবে, সে সময় চারদিক আলোকিত হয়ে গেল। পরে শুনলাম ট্রেসার বুলেট বলে ওকে। আমি তখন নিচ ওপর করছি। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কোনদিক দিয়ে এই গুলিগুলো আসল ?' আমি একটি দিক দেখিয়ে দিলাম। আমারও তখন হিতাহিত জ্ঞান নেই। তারপর বঙ্গবন্ধু আবার ওপরে চলে গেলেন। এরপর আমি ফোন ধরে কথা বলছি– তখন একটা কথা শুনলাম 'হ্যান্ডস আপ'। তারপর আমি হাত উঁচু করে ফেললাম। তারপর আর একজন আওয়াজ করল 'মাত মার।' কিন্তু তার আগেই আমার মাথায় আঘাত লাগল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

Oh, My God !

এরপর যেটা শুনেছি। স্বাধীনতার পরে– পাশেই এ.কে মোশাররফ হোসেন সাহেব থাকতেন, পরে খালেদা জিয়া বা জিয়াউর রহমানের মিনিস্টার হন– কেমিক্যাল কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পশ্চিমের বাড়িতে থাকতেন। উনি ব্যালকনিতে শুয়ে সব দেখছেন। আমাকে যখন রক্তাক্ত অজ্ঞান অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে– তখন বঙ্গবন্ধু নিচের বারান্দায় এসে গিয়েছেন এবং আমাকে এই অবস্থায় দেখে বলেছেন, 'How dare you hit him ? I want him alive.' এই শব্দটা উনি এমনভাবে আওয়াজ করেছিলেন যে উনি পাশের দোতলার ভেতর থেকে শুনতে পেয়েছিলেন।

আপনি জ্ঞান ফিরে কী অবস্থায় নিজেকে দেখতে পেলেন ?

তখন আমি গোঙাচ্ছি। দেখি– মাটিতে শুয়ে আছি। পরে রমার কাছে শুনেছি ওটা সংসদ ভবনের সামনের মাঠ। রমা ও বুড়িকেও ওখান থেকে উঠিয়ে নিয়েছিল।

ও, সেই বুড়ি ! শেখ সাহেবের বাসায় যে কাজ করত– আমাদের বাসায় মাঝে মাঝে আসত।

হ্যাঁ। আর রমা মানে রহমান নামে যে ছেলেটা কাজ করত। এই আমাদের তিনজনকে একটা ট্রাকে নিল। আর বঙ্গবন্ধুকে আলাদা কীভাবে নিয়ে গেল আমি জানতে পারিনি। এরপর সংসদ ভবনে রাখল। রেখে আর একটা গাড়িতে সূর্য ওঠার আগেই আমাকে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে নিয়ে গেল। আমি তখন শীতে কাঁপছি। দাঁত কটকট করছে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। তখন আমার জ্ঞান এসেছে। আমাকে বসিয়ে রেখেছে। তারপর আমাকে বলছে 'নজর নিচে রাখ।' চোখ নিচে রাখ। আমাকে দেখতে দেবে না। এই সময় আজান হলো। আদমজি পাবলিক স্কুলের সামনে ছোট ট্রাকে আমাকে

রেখে দিল। তারপর অফিসে কিছুক্ষণ রাখল। তারপর সি.এম.এইচে (Combined Military Hispital) আমাকে ভর্তি করে দিল। সি.এম.এইচে দুদিন থাকার পর, মেজর এস.বি রহিম তিনি ডাক্তার ছিলেন, ব্রিগেডিয়ার মজিদুল হকের সূত্র ধরে ওনাদের সাথে আমাদের অ্যাকুয়েনন্টেনস ছিল– সিলেটের জায়গির বাড়ির জামাই– উনি আমাকে দেখতে আসলেন। দেখে বললেন, 'ভাবিকে খবর নিয়ে দেব।' উনি চলে যাচ্ছেন। এমন সময় এক সিপাই তাকে চ্যালেঞ্জ করল– 'কিউ উসকা সাৎ বাৎ কিয়া ? মানা হ্যায়।' কেন ওর সাথে কথা বললে ? কথা বলা নিষেধ। উনি কী জবাব দিয়ে চলে গেলেন। একটা সিপাই একটি মেজরকে থ্রেট করল।

যেহেতু তিনি বাঙালি।

হ্যাঁ তিনি বাঙালি। এরপর দুই তিনদিন ওরা আমাকে হাসপাতালে রাখল। এরপর একটা কাঠের শেডে নিয়ে গেল। সেখানে আরও তিরিশ-চল্লিশ জন বন্দী ছিল। সেখানে মেঝের ওপর আমাকে শুইয়ে রাখল। এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমরা সেখানে থাকলাম। একটা ঝড় হলো কাঠের শেড ভেঙে গেল। পাশের একটা গোডাউনে নিয়ে গেল। এই সময় আমাদের পায়খানা পেশাবে কোনো পানি দিত না। একটা থালার মধ্যে ভাত আর কিছু ডাল দিয়ে দিত– দশজন খেত এক থালার ভাত। ক্ষুধার যন্ত্রণা সে সময় উপলব্ধি করলাম। তখন থেকেই নিয়ত করলাম যে ক্ষুধার্ত মানুষ আমার কাছ থেকে না খেয়ে যেন ফেরত না যায়।

আহ্।

এরপরে একই কাপড় একই জামা। যখন রক্তাক্ত অবস্থায় সি.এম.এইচে ভর্তি হলাম, তখন পায়জামা-পাঞ্জাবি রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। একটা সিপাই যে পাহারা দিচ্ছিল, সে তার সালওয়ার কামিজ আমাকে দিল। ওটা বদলে ফেললাম। এই সালওয়ার কামিজ দিয়েই আটমাস চলে গেল। (স্ত্রীকে লক্ষ করে) আছে না সেই সালওয়ার কামিজ ?

স্ত্রী, হাজজা রোকেয়া মোরশেদ : হ্যাঁ আছে। আর যেটার মধ্যে খেতে দিত। ও রকম সেইম আমরা একটা কিনে রেখেছি।

যদি থাকে আমাকে একটু দেখিয়েন। তারপর কী হলো চাচা ?

তারপরে যে আসে সেই বলে "মুজিব কা সেক্রেটারি,মুজিব কা ড্রাইভার' এই বলে পিটায় আর চলে যায়। এর পরে ইন্টারোগেশনের জন্য নিয়ে গেল আর একটা ব্যারাকে সেখানে নীল গ্লাস ওয়ালা ঘর– সেখানে পুরো উলঙ্গ করে পেটাতে লাগল,তারপর জুন মাস পর্যন্ত এ ভাবেই চলল। মারে। যতক্ষণ না অজ্ঞান হই ততক্ষণে মারে। ঠিক মনে হয় যে সময় জান বেরিয়ে যাচ্ছে,সে সময় মার বন্ধ করে দেয়। তারা এত ট্রেনড।

তারপরে বলে, 'বাতাও'। আমি বলি 'কেয়া বাতায়গা ?' আমাদের তো গোপন করার কিছু ছিল না। আমরা তো কিছু গোপন করিনি। আমাদের তো কোনো প্রিপারেশন ছিল না। আবেগ ছাড়া। কয়েকটা লগি আর চায়নিজ কুড়াল ছাড়া আমাদের আর কিছু ছিল না। অবশ্য সিরাজুল আলম খানদের একটা প্রিপারেশন ছিল। জুন মাসে আমাকে অর্ধমৃত অবস্থায় ৬ দিন হাসপাতালে রেখে দিল। এর মধ্যে আগস্টের দিকে কিছু মানুষ ছাড়া আরম্ভ করল। তখন খালেক ভাই বলে টি.এন্ড.টির এক পিয়ন বাসায় খবর দিল। সে আমার জন্য একটা লুঙ্গি ও একটা গেঞ্জি বাসা হতে নিয়ে আসল। তারা সেটা রাখতে দিল। আগস্ট মাসের ছয় তারিখে মেজর ফারুকী আসল আমাকে দেখতে। বলল 'কাল সুভা তোমাকো লে যায়েগে, তোমকো গাওয়াই দেনা পরেগা'। বললাম 'কেয়া গাওয়াই দেগে' ? বলল 'যো জানতা হ্যায়।' আমি বললাম, 'যো জানতা হ্যায়– আপলোগ যো বলেগা, ওহি বলনা পরেগা'। (মেজরের উত্তর) 'নেহি যো জানতা হ্যায়, ওহি বলেগা'। (রোকেয়া মোরশেদ সেই নমুনা টিনের পাত্র নিয়ে আসলেন। এরকম পাত্রে বন্দী অবস্থায় খাবার দেওয়া হতো।)

এটার মধ্যেই খাবার দিত ?

হ্যাঁ। শেষের দিকে। এটার অর্ধেকের কম ভাত দিত। আর সন্ধ্যায় যেটা দিত সেটা আধা সেদ্ধ কুমড়োর তরকারি বা কিছু- টেস্টলেস।

কোনমতে বাঁচিয়ে রাখা–

সেই আরকি আবার যদি পেশাব লাগত। রাত্রে এটাতেই পেশাব করতে হতো। তারপর পানিও খেতে ভয় পেতাম।

তারপর কোন পর্যন্ত বললাম ? অগাস্টে আমাকে গাওয়াই (সাক্ষী) দিতে হবে। তখন আমি মনে মনে ঠিক করলাম– প্লেনে তো আমাকে নিয়ে যাবে। তখন বাথরুমের ভেতর দিয়ে ইন্ডিয়ান ওশানে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। যখন মনে মনে ঠিক করলাম তখন মনটা শান্ত হয়ে গেল।

ডেসপারেশন থেকে এই চিন্তাটা আসল।

হ্যাঁ। স্বাক্ষী দিতে যাওয়া মানে– কী সাক্ষী ? মুজিবের বিরদ্ধে সাক্ষী দিতে বলবে। তারপর যে টর্চার করবে,সেই টর্চারের ফলে যা বলবে, তাই বলতে হবে।

হ্যাঁ সেটাই।

এরপরে ওরা আর নিয়ে গেল না। আর আসল না। আমাকে একটা বড় ডায়েরি লেখার মতো বই দিল। বলল 'তোম যো জানতা হ্যায় বোল– লেখ। তোমারা যিন্দেগিকা শুরু সে লেখ।' পেনসিল দিল। তো– শুরুতেই লিখতে থাকলাম।

আপনার কোন ইয়ারে জন্ম ?

সার্টিফিকেটে ও পাসপোর্টে থারটি টু। অ্যাকচুয়্যালি থারটি ওয়ান। 10th December, 1931. আমাদের দেশে তো বয়স চুরি করা হয়।

তারপর কী হলো ?

২৫ সেপ্টেম্বর আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ট্রান্সফার করল। আমাদের ঐ ক্যাম্পটাই খালি করে জেলখানায় পাঠিয়ে দিল। জেলখানায় যেয়ে পেট ভরে ভাত খেলাম ছয় মাস পর। মনে হলো যে বেহেশতে আসলাম। তখন আমার চল্লিশ পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছে। জেলখানায় থাকতে থাকতে এখন যেখানে নির্বাচন কমিশন সেখানে আমাকে নিয়ে আসল। মেজর ও তিন-চার জন আমাকে বলল 'কী কী জান আমাদেরকে বল। ওরা কথা বলত তুমি করে।' আমি বললাম 'যা জানি তা তো বলেছি।' তারপর আবারও কিছু কিছু বললাম। কয়েক মিনিট পরে বলে 'যাও'। জেলখানায় ফেরত পাঠিয়ে দিল। ২৫ নভেম্বর আমাকে ছেড়ে দিল।

আপনার পরিবার পরিজন– যখন জেলে ছিলেন ?

আমার বড় বোন, আমার স্ত্রী দুই তিনবার ঢাকা জেলে আমার সাথে দেখা করে এসেছে।

(স্ত্রী রোকেয়া মোরশেদকে লক্ষ করে) তখন আপনার মনোভাব কী ছিল ? উনি ছাড়া পাবেন কি না ?

উনি ছাড়া পাবেন,এই আশা নিয়েই তো বেঁচে ছিলাম। তারপর কাশেম সাহেব একটা চিঠি দিলেন যে হয় ওনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন না হয় ছেড়ে দেন। উনি এসব (রাজনৈতিক) ব্যাপারে জড়িত না। মিস্টার কাশেম, মালেক (গর্ভনর) কেবিনেটের মিনিস্টার ছিলেন। তিনি ব্রিগেডিয়ার বশীরকে চিঠি দিলেন। বিগ্রেডিয়ার বশীর ঢাকার ইনচার্জ ছিলেন।

আবুল কাশেম সাহেব Former Deputy Speaker of Pakistan- ময়দুল ইসলামের বাবা। উনি একটা চিঠি দিলেন যে He is a deeply religious man.He has no conncetion with politics. রিলেশনশিপের কারণে সে শেখ মুজিবের বাড়িতে যেত। পরে সেই চিঠির কপি ওর থেকে (স্ত্রীকে লক্ষ করে) পেয়েছিলাম।

কাশেম সাহেব ব্রিগেডিয়ার বশীরকে চিঠিটি দিলেন এবং ওটার ভিত্তিতে আপনাকে ছেড়ে দিল ?

সম্ভবত। প্লাস গভর্নর মালেকের ছোট ভাই আমাদের কাজিন। তিনি আমাদের ভগ্নীপতি– মুজিবর রহমান মালেক– টিপু মালেকের আব্বা।

আপনি যখন ছাড়া পেলেন তখন তো আপনার অবস্থা খুবই শোচনীয়। তখন কী ট্রিটমেন্ট চলল ?

রোকেয়া মোরশেদ : না তখন তো ট্রিটমেন্ট সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ চলছে। আমরা কাকরাইলে বাসা ভাড়া দিলাম। যখন উনি বাড়িতে এসেছিলেন– বাসায় বসে থাকতেন। বের হবার ক্ষমতা ছিল না। উনি থরথর করে কাঁপতেন। পা দুটো কাঁপত। দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। খেতেও খুব কষ্ট হতো। ডিসেম্বরে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন উনি মোনাজাত শুরু করলেন যাতে দেশটা স্বাধীন হয়।

তারপর কীভাবে আপনার সাথে বেগম মুজিবের দেখা হলো ?

১৭ ডিসেম্বর সকাল বেলা ফজরের নামাজ পড়ে আমার মামাতো ভাই আবুল ইলিয়াস মজিদ,উনি তখন ব্রিটিশ কোম্পানি এভারি স্কেলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার। এখন আটলান্টায় থাকেন। ওনার গাড়ি করে ভাবি যেখানে বন্দী আছে সেটা খুঁজে খুঁজে সেখানে গেলাম। ধানমণ্ডির ১৮ নাম্বার রোডে। তো আমার মাথায় টুপি,মুখে দাড়ি– গাড়ি থেকেই নেমে গেটের কাছে যেতেই [আর্মির গার্ড] বলে 'মাত আও'।

১৭ ডিসেম্বর ?

হ্যাঁ ১৭ ডিসেম্বর। তখনও পাকিস্তান আর্মি ওনাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

Oh My God, ১৭ ডিসেম্বর !

হ্যাঁ বিজয়ের পরের দিন। তো আমি ভয়ে পিছিয়ে আসলাম। খানিক দূরে আসলে দেখি এম.ই চৌধুরী সি.এস.পি আর হাতেম আলী খান চিফ ইঞ্জিনিয়ার ওনারা হেঁটে যাচ্ছেন মর্নিং ওয়ার্ক করে। ওনাদের দুজনকে আমি চিনতাম। আমাকে দেখে বলেন 'করছেন কী, কাল বিকালে এখানে দুজনকে গুলি করে মেরেছে।' তখন আমি চলে আসলাম। ভাইকে সাথে করে সার্কিট হাউসে ঢুকলাম। সেখানে দেখি একজন মেজর জেনারেল [নাম] গনজালভেস। ওনাকে বললাম 'মুজিব ভাই এর Family in serious condition—army may kill her at any time' তখন উনি একজন শিখ জেনারেলের সাথে কথা বললেন। Two star, না three star জেনারেল মনে নেই। দুজন আলোচনা করে,জেনারেল গনজেলভেস আমাকে বললেন, 'তোমার গাড়ি আছে ?' আমি বললাম, 'আছে, আমার ভাই গাড়ি নিয়ে নিচে বসে আছে।' তিনি বললেন, 'আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে চল।' ওনাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে আসলাম। এয়ারপোর্টে এসে উনি মেজর রাজা বলে একজনের সাথে কথা বললেন। তার সাথে তিনজন সিপাই দিয়ে আমার সাথে ওনাকে আসতে বললেন। মেজর রাজাকে আমার সাথে পাঠালেন, বেগম মুজিবকে রেসকিউ করার জন্য। আর এক ভদ্রলোক ওনাকে গাড়ি অফার করল। দুই গাড়িতে আমরা আসলাম।

আপনি কি পেছনের গাড়িতে ছিলেন ?

না। মেজর রাজা আমাদের গাড়িতে ছিলেন। আমার মামাতো ভাইয়ের গাড়ি।

তাহলে আপনার ইনিশিয়েটিভেই বেগম মুজিব ছাড়া পেলেন। আপনিই মেজর জেনারেল গনজালভেসের সাথে সার্কিট হাউসে দেখা করলেন এবং উনি মেজর রাজাকে বললেন আপনার সাথে যেয়ে মুক্ত করতে।

হ্যাঁ মেজর রাজা। অথচ সেদিনই পেপারে দেখলাম লিখেছে মেজর অশোক তারা। (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২ জুলাই, ২০১২। হতে পারে মেজর রাজার অন্য নাম ছিল অশোক তারা। পত্রিকাটিতে হাজী গোলাম মোরশেদের নাম ও অবদান অনুল্লেখিত)।

মেজর রাজাকে নিয়ে আপনি ধানমণ্ডির ১৮ নম্বর রোডে গেলেন ?

হ্যাঁ। ওনার কোমরে একটা মাত্র গ্রেনেড, হাতে কোনো অস্ত্র নেই। ওনার সিপাইদের হাতে অস্ত্র আছে। সিপাইদের পেছনের গাড়িতে রাখলেন। উনি একাই হেঁটে গেটের কাছে গেলেন। যেয়ে ওদের সাথে কথা বললেন। তখন ওরা টার্ম দিল যে 'আমাদের আর্মস-অ্যামুনেশন নিয়ে যদি চলে যেতে দাও। তাহলে আমরা কিছু করব না। না হলে সব ম্যাসাকার করে দিয়ে যাব।' ওদের কাছে ছোট মাইক্রোবাস ছিল– মেজর রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা আর্মস-অ্যামুনেশন নিয়ে চলে যাও।' তখন ওরা আর্মস-অ্যামুনেশন নিয়ে– পাঁচ-সাতজন ছিল, চলে গেল। [পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্দেশপ্রাপ্ত ছিল যে তারা বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে দ্রুত গৃহবন্দি দশা হতে মুক্তির উদ্যোগ ও মুক্ত করার ব্যাপারে হাজী গোলাম মোরশেদের অবদান অনস্বীকার্য।]

তারপর ভেতরে ঢুকে কী দেখলেন ?

দেখলাম সবাই বসে আছে। হাসু বসে আছে, রেহানা বসে আছে, তারপর রাসেল বসে আছে। [বড় দুই পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামাল পালিয়ে ভারতে চলে গিয়েছিলেন] খোকা ভাই আছেন–

খোকা ভাই কে ?

খোকা ভাই হচ্ছেন হাসুর মামা। খোকা ভাইকে বললাম– (যে অফিসার বঙ্গবন্ধু পরিবারকে মুক্ত করল তাকে যেন সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়)।

হাসু হচ্ছেন শেখ হাসিনা ?

হ্যাঁ। ভাবিকে আমি সালাম করলাম– এরপর সম্ভবত শমসের মুবিন চৌধুরীর মা বাড়িতে ঢুকলেন। তিনি দেখা করে চলে গেলেন– আমি চলে আসলাম।

চাচা, মুজিব কাকু যখন ফিরে আসলেন– মুক্ত হলেন পাকিস্তান কারাগার থেকে তখন আপনি আবার ফিরে গেলেন ওনার সাথে কাজ করতে ?

হ্যাঁ। ১০ জানুয়ারি ওনাকে যে ট্রাকে আনা হলো, সে ট্রাকের পেছনে আমি পা ঝুলিয়ে আসলাম। পথে উনি পিপাসায় কাতর হলেন। তখন রেডিও অফিসের সামনে দৌড়ে– সাইফুল বারী বোধহয় ওখানের স্টেশন ম্যানেজার–, তার কাছ থেকে একটা জগ ও পানি নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে খাওয়ালাম। এরপরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মিটিং করে, বক্তৃতা করে বঙ্গবন্ধু সামনে বসলেন, আমি পিছনে বসলাম। ঐ একই গাড়িতে ধানমণ্ডির বাসায় আসলাম। এরপরে ডেইলি আমি যেতাম। বঙ্গবন্ধু Oath (প্রধানমন্ত্রী পদে) নিলেন, সেখানেও গেলাম। তারপর একুশে জানুয়ারি আমি বার্লিনে চিকিৎসার জন্য গেলাম। সেই জাহাজে ক্যাপ্টেন ডালিম, মেজর আমিন আহমেদ চৌধুরী, মেজর হারুন অর রশীদ, লেফটেনেন্ট শমসের মুবিন চৌধুরী– [তাদের সাথে] একই জাহাজে বার্লিনে চিকিৎসার জন্য গেলাম। আমার চিকিৎসা হয়ে গেল, ওরা বলল, 'তোমার এখানে তিনমাস থাকতে হবে। রেস্ট নিতে হবে।' তখন আমার মন আর টানে না। আমি শুনলাম বঙ্গবন্ধু রাশিয়ায় আসছেন। তো ওদেরকে বলে মস্কোতে চলে আসলাম বাই ট্রেন। থার্ড অথবা ফোর্থ মার্চে আমি মস্কোতে পৌঁছলাম। শামসুর রহমান (খান) তখন ওখানে অ্যাম্বাসেডর। এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে রিসিভ করে ওনার ওখানে নিয়ে গেলেন। তারপর বঙ্গবন্ধুর সাথে ট্যুর করলাম। লেনিনগ্রাদ-স্ট্যালিনগ্রাদ এসব জায়গায় গেলাম। বঙ্গবন্ধু ও আমি একই কমপ্লেক্সে থাকতাম। আমরা তখন বোধহয় লেনিনগ্রাদে, ঐ সময় বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন যে এন্টারপ্রাইজ (ইউ.এস.এস) থেকে সামান্য দূরে (সোভিয়েত) সাবমেরিন ছিল– যদি কোনোভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্টারফেয়ার করত (মার্কিন যুদ্ধ নৌবহর) এন্টারপ্রাইজ ডুবিয়ে দিত (সোভিয়েত সাবমেরিন)।

ইউ.এস.এস এন্টারপ্রাইজের কথা বলছিলেন উনি। হ্যাঁ সে বিষয়ে রাশিয়ার তো একটা প্রস্তুতি ছিল। তারপর আপনি যখন ফিরে আসলেন দেশে। তখন কবে থেকে কাজে লাগলেন ?

আমি যখন ফিরে আসলাম তখন প্রতিদিন গণভবনে যেতে থাকলাম। বঙ্গবন্ধুর সাথে ওঠা বসা করতাম।

এরপরে বোধহয় মার্চের লাস্ট উইকে Honorary Aide to the Prime Minister এই একটা গেজেট নোটিফিকেশন করে অ্যাপয়েনমেন্ট দিল। তৌফিক ইমাম তখন কেবিনেট সেক্রেটারি। তারপর ঐ যেতাম, কাজ করতাম, লোকের সুখ-দুঃখের কথা শুনতাম। তখন প্রত্যেক শহীদ ফ্যামিলিকে দু হাজার টাকা দেওয়া হতো। সেটার চেক লেখা হতো, সই হতো। বঙ্গবন্ধু সই করার সময় পেতেন না। আমি রাত এগারোটা-বারোটার সময় বাসায় যেয়ে ওগুলো সই করে নিয়ে আসতাম। এরপরে রেডক্রসের মাধ্যমে চিঠিপত্র আসত, পাকিস্তানে যারা আটকে আছে তাদের সাহায্যের জন্য আবেদন আসত। তাদের চিঠিপত্র নিয়ে আমি ওনার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে দিতাম। বাংলাদেশ রেডক্রস থেকে Disabled freedom fighters rehabilitation institute করেছিল, এখন সেটা রেডক্রসের হেডকোয়ার্টার, ঐ বিল্ডিংটাতে আমার অফিস ছিল।

আপনার প্রত্যাশা কী ? আপনার স্বপ্ন কী ?

আমার স্বপ্ন Justice and Fairness. আর আমার একটা ফর্মুলা আছে, যে ফর্মুলার প্রথম ইনস্ট্রাকশনটি বঙ্গবন্ধু সই করেছিলেন। একটা গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছিল, Order number one one four, dated 24th May, 1972 সেটা এই সি.এস.পি- সেক্রেটারিরা স্যাবোটাজ করেছে- সেটা হারিয়েই ফেলেছে। তার প্রথম লাইনটা হচ্ছে : সকল পত্রের ও আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে। অফিসে কোনো ফাইল পিয়ন-চাপরাশি বহন করিবে না। Relevant officials will take and give it to the relevant officers within seventy two hours. Section officer- [and] Assistant Secretary within forty eight hours, the Deputy Secretary- [and] Joint Secretary within twenty four hours- [and] the Secretary will dispose all the files.

সেটা পাস হয়েছিল ?

অর্ডার ইস্যু হয়েছিল কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হয়নি- এক্সিকিউট হয়নি- কিন্তু স্যাবোটাজড হয়েছে নু ঃযবংব নঁৎবধঁপৎধঃং. আমরা কারো রেসপেক্ট নষ্ট করতে চাইনি, আমরা কারো পজিশন নষ্ট করতে চাইনি। আমরা সাধারণ মানুষ। এখন প্রত্যেক গর্ভমেন্ট অফিসের সামনে লিখে দেওয়া উচিত 'মানুষকে হয়রান, অপমান ও ঘুষ সংগ্রহ কেন্দ্র।' রিঃয ািবং ভবি বীপবঢ়ঃরড়হং এইসব ঘটনা ঘটছে। শাসন করবে কে ? পলিটিশিয়ান কি আর পলিটিশিয়ান আছে- সে ট্রেডার হয়ে গিয়েছে। আমার কিছু পজিটিভ প্রোপোজাল ছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে- ঐড়ি ঃড় ৎঁহ ঃযব মড়াবৎহসবহঃ- যড়ি ঃড় ঃধপশষব ঃযব ঢ়ড়ষরঃরপধষ ঢ়ৎড়পবংং. একজন মেম্বার অব পার্লামেন্ট কী করবে আর কী করবে না। ডেভেলপমেন্টের সাথে একজন পলিটিক্যাল লিডারের কানেকশন থাকা উচিত। কিন্তু সবাই আশা করে যে এম. পি সাহেব রাস্তা করে দেবে। কিন্তু রাস্তা করা তো এম.পি সাহেবের কাজ না। এম.পি সাহেবের কাজ হচ্ছে এঃড় মরাব ংড়পরধষ লঁংঃরপব ধহফ ভধরৎহবংং. সে তো আইন প্রণেতা- মড়ড়ফ মড়াবৎহধহপব রহংঃৎড়ফঁপব করার জন্য তার সৃষ্টি।

পঁচাত্তরে বাকশাল গঠনের আগেই আপনি কাজ ছাড়লেন ?

তার আগেই আমি কাজ ছেড়ে দেই। আমি চুয়াত্তরের শেষের দিকে গণভবনে যাতায়াত বন্ধ করে দিলাম। রিজাইন করেছিলাম আমি ২৫শে জুন, তিয়াত্তরে। কিন্তু উনি [বঙ্গবন্ধু] সেটা একসেপ্ট করেননি। আমি তখন টঙ্গি চলে গিয়েছিলাম। উনি ফোন করে বললেন 'তুই যদি না আসিস, আমি ডি.আই.জি দিয়ে তোকে অ্যারেস্ট করিয়ে নিয়ে আনব।' তো আমি চলে আসলাম।

তারপর বললাম, 'আমি এসে কী করব ? আপনি তো আমার কোনো কথা শুনবেন না।' আমার কথা শুনতেন কিন্তু করতেন না এবং যাদের দিয়ে করাতেন, তারা করতে চাইত না।

তাদের দিয়ে করাতে পারতেনও না। বুরোক্র্যাসি ওনাকে টোট্যালি ঘিরেছিল। এই বুরোক্র্যাসির ভেতরে আমি Total anti people force পেয়েছি। মানুষের প্রতি কোনো রেসপেক্ট নেই, লাভ [ভালোবাসা] নেই, মর্যাদা দেওয়ার ইচ্ছাও নেই এবং অন্যকে মর্যাদাহীন করতে পারলেই তারা এনজয় করে। ফরাসউদ্দীনও (ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দীন– বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব ১৯৭৩-১৯৭৫) পি.এস ছিলেন। কিন্তু তিনি ভদ্র ও সোবার ছিলেন। He was not an anti people force. কিন্তু কিছু করতে পারতেন না। পরে পুলিশ সার্ভিস থেকে আই.জি আব্দুর রহীম সাহেব আসলেন সেক্রেটারি হয়ে। He was a good man.

তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে কি দেখা হতো ?

হ্যাঁ, দেখা হতো– তাজউদ্দীন ভাই ছিলেন Behind the scene real কারিগর of our liberations. But for Tajuddin– বঙ্গবন্ধু কখনোই দেশকে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না। তাজউদ্দীন ভাইয়ের ধীরতা এবং গঠন করবার শক্তি এবং বঙ্গবন্ধুর আইডিয়াকে সেইপে নিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া– তাজউদ্দীন ছিলেন এক্সট্রা অর্ডিনারি। এক্সটা অর্ডিনারি। আল্লাহ বঙ্গবন্ধুকে তাজউদ্দীন দিয়েছিলেন। লিবারেশন ওয়ারের সময় তাজউদ্দীনকে আমীর-উল ইসলাম দিয়েছিলেন।

আমীর কাকুই তো সে রাতে আব্বুকে জোর করে বাড়ি থেকে বের করেন– আব্বু যদি বাসায় থাকতেন আব্বুকে তো মেরেই ফেলত– আব্বু ছিলেন ডেথ লিস্টে।

তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে বলেছিলেন 'হাজী সাহেব, আবুল হাশিম সাহেব যদি বেঙ্গল মুসলিম লীগের সেক্রেটারি না থাকতেন, আবুল হাশিম সাহেবের কাজ, ফিলসফি, মিশন যদি আমাদের সামনে না থাকত, তাহলে আমরা সবাই কমিউনিস্ট হয়ে যেতাম।' ব্রিটিশ আমলের কথা তিনি বলছিলেন। আমার লাইফে ছোট ছোট টুকরো ঘটনার সাথে আমি জড়িত– আমি অনেক কিছু জেনেছি– শুনেছি কিন্তু তার কোনো সাক্ষী নেই।

কিন্তু আপনি ইতিহাসের কত বড় সাক্ষী।

কিন্তু আমি যে সর্বনাশও করেছি। জিয়াউর রহমানের জন্য পোস্ট ক্রিয়েট করেছি। করে তাকে প্রমোশন দিয়েছি। That post was created on my Insistency, on my request. Deputy Chief of Staff পদে।

কোন সালে ?

সেভেন্টি টু। আমাকে হাঁটু জড়িয়ে ধরে বলল, 'নানা আমাকে বঞ্চিত করেছে (জেনারেল) ওসমানী সাহেব– আমাকে দেখতে পারেন না বলে।'

জিয়াউর রহমান বললেন ?

হ্যাঁ। বললেন, 'আপনি বিচার করে দেন।' আমি বিচার করতে গেলাম– বঙ্গবন্ধুকে যেয়ে বললাম যে 'এই হয়েছে– এই হয়েছে জিয়াউর রহমানকে বঞ্চিত করা হয়েছে– ওনার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দাঁড়া, দাঁড়া- থাম-থাম'। তারপর ডেপুটি চিফ অব স্টাফের পোস্ট ক্রিয়েট করে বঙ্গবন্ধু ওনাকে বসিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, 'তুই নাছোড়বান্দা যা ধরবি ছাড়বি না।'

জিয়াউর রহমান পরে আপনাকে দেখতে এসেছিলেন ?

জিয়াউর রহমান– আমি সেভেন্টি সিক্সে কবর জিয়ারত করতে গিয়েছিলাম, আমাকে অ্যারেস্ট করেছে।

কার কবর জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন ?

বঙ্গবন্ধুর মাজার। টুঙ্গিপাড়ায়। তখন জিয়াউর রহমানের গভর্নমেন্ট। সেভেন্টি সিক্সের ১৫ আগস্ট সকালে আমাকে ধরে নিয়ে ফরিদপুরের জেলে পুরে পনেরো দিন পচাল।

রোকেয়া মোরশেদ : পনেরো দিন নয়– আঠারো দিন।

আমি ওদেরকে (পুলিশ) জিজ্ঞেস করেছিলাম 'কেন ধরেছেন ? ওনার কি কোনো দোষ ছিল ?' বলল, 'না। উনি জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন। আমরা না করায় উনি জিয়ারত করেননি। কিন্তু আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ধরেছি।' বিনা অপরাধে– জিজ্ঞাসা করার জন্য ওনাকে ধরল।

আঠারো দিন ফরিদপুরের জেলে ! এই হচ্ছে জিয়াউর রহমানের প্রতিদান ! এই হচ্ছে জাতির জনকের মাজার জিয়ারত করার অপরাধ ! বলদা গার্ডেন থেকে যে ফোনটা এসেছিল ওটার মানে কী ছিল ?

মেসেজ, মানে ওয়্যারলেস পাঠানো হয়ে গিয়েছে !

কী মেসেজ পাঠানো হয়েছিল ?

সেটা তো জানি না। কিন্তু সে মেসেজ লিবারেশন ছাড়া আর কী হতে পারে ?

আপনার লাইফের সিগনিফিক্যান্ট মুহূর্ত কী ?

ডিউরিং সোহরাওয়ার্দী টাইম। তাঁর সাথে যখন আমি থেকেছি তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে 'এমন একটা সময় আসে যখন সব স্ট্রিট লেবারার টু দ্য টপ অব দ্য কান্ট্রি একই সময়ে একই কথা ভাবে, একই চিন্তা করে ঠিক রেডিও ওয়েভ লেন্থের মতো, তখুনি দেশ মুক্ত হয়।'

বাহ ! কোন সালে একথা বলেছিলেন ?

এটা বলেছিলেন ফিফটি থ্রি-ফিফটি ফোরে। সে সময় আমি একজন কর্মী ছিলাম। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আমি রাজনীতির সাথে জড়িত। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে রশীদ আলী ডে অ্যাটেনড করেছি কোলকাতায়। (নেতাজি সুভাষ বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশীদ আলী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন দেন। আজাদ হিন্দ ফৌজে যুক্ত থাকার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বন্দী করলে ওনার মুক্তির দাবিতে ভারত ব্যাপী আন্দোলন হয়।) উনিশশো ছেচল্লিশ সালে পাকিস্তান ইস্যুর ওপর ইলেকশনে আমরা কাজ করেছি। উনিশশো সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ, ঊনপঞ্চাশ, পঞ্চাশে আমি মুসলিম ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলাম। উনিশশো আটচল্লিশ সালে ঢাকার রাস্তায় রাষ্ট্র ভাষার পক্ষে প্রসেশন করেছি। যশোর ডিসট্রিক্ট মুসলিম স্টুডেন্ট লীগের সেক্রেটারি ছিলাম। বায়ান্নতে রাষ্ট্র ভাষা সংগঠনের কনভেনর ছিলাম। তিপান্নতে যশোর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার ইলেক্টেড হই এবং ইস্ট পাকিস্তানে I was the youngest member elected to the district board. এর পর ফিফটি থ্রিতে আমরা মুসলিম লীগের সংস্পর্শ ত্যাগ করি। যুক্তফ্রন্ট ইলেকশনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।* এই যুক্তফ্রন্ট ইলেকশনের সময় আমি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর খুব নিকট সান্নিধ্যে আসি। তিনি আমাকে নিয়ে সব ট্যুর করতেন। তিনি ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিশন করেছিলেন ক্যান্ডিডেটদের পপুলারিটি যাচাই করার জন্য। প্রফেসর

---

* পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন ও বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবীতে ঐক্যবদ্ধ প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, আওয়ামী মুসলিম লীগের (অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিক হিসেবে ১৯৫৫ সালে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম করণ হয়) নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নিজাম-এ-ইসলাম পার্টির নেতা মাওলানা আতহার আলী এবং গণতন্ত্রীদলের নেতা হাজী মহম্মদ দানেশ এবং মাহমুদ আলী সিলেটি। ঐ নির্বাচনে (৮ মার্চ, ১৯৫৪) পূর্ব পাকিস্তানের চিফ মিনিস্টার মুসলিম লীগ নেতা নূরুল আমিন হেরে যান এবং পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। যুক্তফ্রন্ট হয় জয়যুক্ত।

নূরুর রহমানও ছিলেন। পরে তিনি সোহরাওয়ার্দী ক্যাবিনেটের স্টেট মিনিস্টার (অর্থ প্রতিমন্ত্রী) হন। তাঁকে আর আমাকে নিয়ে উনি একটা ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি করে দেন। আমরা ঈশ্বরদী, নাটোর, বগুড়া, এসব বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং করতাম। অনেক সময় আওয়ামী লীগের সাপোর্টার বাদ পড়ে যেত। কে.এস.পির (শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত কৃষক শ্রমিক পার্টি) সাপোর্টার নমিনেশন পেয়ে যেত। (উদাহরণস্বরূপ পাবনায় আওয়ামী লীগের প্রফেসার হামিদ বাদ পড়ে যান এবং কে.এস.পির মাওলানা গফুর নমিনেশন পান।) এর জন্য কেউ কেউ আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হতেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব খুব জাস্ট মানুষ ছিলেন। অথচ একটা কলংক আছে যে হি ওয়াজ অ্যা কমিউনাল। ফিফটি থ্রি থেকে সিক্সটি থ্রি পর্যন্ত আমি তার সাথে কাজ করেছি। হি ওয়াজ অ্যা টোটালি সেক্যুলার ম্যান। অথচ ওনাকে কলঙ্কিত হতে হলো– বড় দুর্ভাগ্য।

এখন যে বাংলাদেশ দেখছেন– আপনার কী প্রত্যাশা ? কিছু বলার আছে ?

আমার বক্তব্য হচ্ছে I am a born politician but I do not do politics. আমি মনে করি politics is a trust and politicians are trustees.আজকে সাধারণ মানুষ সকাল থেকে পিয়নের হাত থেকে শুরু করে সেক্রেটারি পর্যন্ত প্রত্যেকের হাতে লাঞ্ছিত,অপমানিত,শোষিত এবং অত্যাচারিত। তাদের কারো কোনো স্বাধীনতা নেই। যে কোনো পর্যায়ের আমলা, পিয়ন, চাপরাশি, তফসিলদার, যুগ্ম সচিব, সচিব, চেয়ারম্যান, সরকারি কর্মচারী প্রথমে সাধারণ মানুষকে হয়রান করে, তারপর অপমান করে, তারপর ঘুষ খায়, with very few exceptions. তা হলে মানুষ স্বাধীন হলো কী করে ? এখন Government of the servant, for the servant and by the servant চলছে। আমি সেখানে নিজের নাম লিখতে পারব না। আমার একাশি বছর বয়স। My days are numbered– যেখানে বিবেকের দংশন আর এত অসম্মান সেখানে পলিটিকস করা যায় না।

সেদিনের সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি হাজী গোলাম মোরশেদ শেষ করলেন আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে– 'তুমি আসলে যে আমার মনে হচ্ছে এই গত সাঁইত্রিশ বছরের মধ্যে আজকের দিনটা আমার জন্য সবচেয়ে বড়দিন।'

হাজী গোলাম মোরশেদের সাক্ষাৎকাটি গ্রহণ করতে গিয়ে আমিও হয়ে উঠছিলাম আবেগ আপ্লুত। ওনারা যে বাংলাদেশের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন সেই লক্ষ্য থেকে আমরা আজও কত দূরে ! বাংলাদেশের রাজনীতিতে ও প্রশাসনে সৎ মানুষের নেতৃত্ব খোঁজা যেন মরুভূমিতে মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ানোর মতোই।

ওনার স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে আমি ফিরে দেখছিলাম অদেখা যুগকে– অবিস্মরণীয় কালের সকাল সন্ধ্যাকে। আজকের যুগে বিরল এমন নিবেদিত রাজনৈতিক কর্মী ও ব্যক্তিত্বকে হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে ও তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করবে।

ভিডিও সাক্ষাৎকার। শুক্রবার, ৬ জুলাই, ২০১২। আনুষঙ্গিক তথ্য যা পরে হাজী গোলাম মোরশেদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে (কোস্তারিকা হতে ঢাকায় টেলিফোন সাক্ষাৎকার। বৃহস্পতিবার, ১৬ আগস্ট, ২০১২) তার কিছু অংশ সাক্ষাৎকারের মধ্যে ব্র্যাকেটে উল্লেখিত হলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পাঠানো মো: গোলাম মোরশেদের পদত্যাগপত্র

শ্রদ্ধেয় নেতা, প্রধানমন্ত্রী ও　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　২৫/৬/৭৩
জাতির পিতা,

আমার সশ্রদ্ধ সালাম নেবেন।

১৯৪৫ এর শেষে রশীদ আলী দিবসে গোরা সৈন্যের গাড়িতে আগুন লাগানো থেকে শুরু করে এই সুদীর্ঘকাল দেশের মানুষের কল্যাণ কামনা রাজনীতির উদ্দেশ্য বলে মনে করেছি। দোয়া করবেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যেন এই শিক্ষা থেকে বিচ্যুত না হই।

১৯৬১ তে আপনার নির্দেশে আমি তৈরি ছিলাম। স্ত্রী ও সন্তানদের শাশুড়ির হেফাজতে রেখে আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন ডাক আসবে। জানি না মহম্মদ আলী কীভাবে সংবাদ আদান প্রদান করেছিল, পরে জানতে পারলাম।

আমি নাকি তৈরি ছিলাম না। বুক আমার ভেঙে গেল। রাজনীতির আবাল্য জড়িত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসলাম হয়তো ইচ্ছা করলে ২/১ বার এম.এন.এ হতে পারতাম। কিন্তু যে আঘাত তাতে সব উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল। নিজেকে নির্বাসিত করে ঢাকায় চলে আসলাম। আগরতলা মামলার সময়ই আবার নিয়তি আমাকে সামনের দিকে ঠেলে দিল।

১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ রাত্রে অন্তর থেকে বুঝলাম পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আমাকে ১৯৬১ তে প্রযুক্ত মিথ্যা স্খলনের সুযোগ আমাকে দিয়েছেন তাই আপনার নির্দেশ না মেনে আপনার পাশে থাকবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

এই স্বল্পকালের মধ্যে আপনার স্নেহ ও ভালোবাসা আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

আমি আশা করি এবং পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যে, বাংলার প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গ বন্ধুর সহকর্মী, উপদেষ্টা এবং কর্মচারীরা সকলেই সৎ, সত্যবাদী, দৃঢ় চরিত্র এবং নির্ভীক হন এবং তার নির্দেশ এবং ইচ্ছা ও ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করবে।

প্রধানমন্ত্রীর সহায়ক হিসাবে গত পনরো মাসে তার উপরোক্ত কর্মী ও কর্মচারীদের মধ্যে ঐ সমস্ত গুণরাজির বিপরীত অনেক সময় লক্ষ্য করেছি। আশা করেছিলাম স্বভাবের পরিবর্তন হবে এবং নেতার সম্মান ও সুনাম দেশে ও বিদেশে উদ্ভাসিত হতে থাকবে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জাতির পিতার সম্মান সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন।

পরিশেষে আমার তিনটা নিবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহায়কের পদত্যাগ করিতেছি এবং আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার আবেদন জানাইতেছি।

১. সকল সরকারি দফতর থেকে আর্দালি ও বেয়ারা প্রত্যাহার করে সামন্ততান্ত্রিক নিয়মের অবসানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

২. জাতির এই দুর্দিনে সকল অসৎ, দুর্বল চরিত্র ব্যক্তিদের প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে অপসারিত করা হোক।

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৯৭২ সালের ২৪শে মে প্রদত্ত ১১৪ নির্দেশ কার্যকরী করিবার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতির সময় ও শ্রমের অপচয় বন্ধ করা হোক।

আপনার নির্দেশে যে কোনো সময় যে কোন কাজ করবার জন্য সর্বদা আমি প্রস্তুত আছি।

আপনার বিশ্বস্ত ও অনুগত

(মো: গোলাম মোরশেদ)

PRIME MINISTER'S AIDE

২৫/৮/৭৩

শ্রদ্ধেয় নেতা, প্রধান মন্ত্রী ও
জাতির পিতা,

আমার সশ্রদ্ধ সালাম নেবেন।

১৯৪৫ এর শেষে রশিদ আলী দিবসে গোরা সৈন্যের গাড়ীতে আগুন লাগানো থেকে শুরু করে এই সুদীর্ঘকাল দেশের মানুষের কল্যাণ কামনা রাজনীতির উদ্দেশ্য বলে মনে করছি। দোয়া করবেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যেন এই নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত না হই।

১৯৭১ তে আপনার নির্দেশে আমি তৈরী ছিলাম। স্ত্রী ও সন্তানদের শাশুড়ীর হেফাজতে রেখে আমি অপেক্ষা করছিলাম কখন ডাক আসবে, জানি না মহম্মদ আলী কি ভাবে সংবাদ আপনাকে প্রদান করেছিল, পরে জানতে পারলাম [illegible]। আমি নাকি তৈরী ছিলাম না। দুঃখ আমার [illegible]। রাজনীতির আকাঙ্ক্ষা জড়িত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চাকরায় চলে আসলাম অথচ ইচ্ছা করলে ২/১ বার এম.এন.এ. হতে পারতাম। কিন্তু যে আঘাত তাতে সব উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেল। নিজেকে নির্বাসিত করে চাকরায় চলে আসলাম। আগরতলা মামলার সময়ই আবার নিয়তি আমাকে শাসনের দিকে ঠেলে দিল।

■ ২ ■

১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ রাত্রে অসুর দেশে দুর্নাম পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা আমাকে ১৯৬১ তে প্রত্যক্ষ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আমাকে দিয়েছেন তাই আপনার নির্দেশ মেনে আপনার পাশে থাকবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

এই যুদ্ধ কালের মধ্যে আপনার স্নেহ ও ভালবাসা আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

আমি আশা করি এবং পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যে, বাংলার প্রধান মন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সহকর্মি, উপদেষ্টা এবং কর্মচারীরা সকলেই সৎ, সত্যবাদি, দৃঢ় চরিত্র এবং নির্ভীক হন এবং তার নির্দেশ এবং ইচ্ছা ও কল্পনাকে বাস্তবে পরিনত করবে।

প্রধান মন্ত্রীর সহায়ক হিসাবে গত পনের মাসে তার উপ-রোক্ত কর্মি ও কর্মচারীদের মধ্যে ঐ সমস্ত গুনরাজির বিপরীত অনেক সময় লক্ষ্য করেছি। আশা করেছিলাম স্বভাবের পরিবর্তন হবে এবং নেতার সম্মান ও সুনাম দেশে ও বিদেশে উদ্ভাসিত হতে থাকবে। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় তারা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও জাতির পিতার সম্মান সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন।

PRIME MINISTER'S AIDE

॥ ৩ ॥

পরিশেষে আমার তিনটা নিবেদন জানিয়ে প্রধান মন্ত্রীর মহোদয়ের পদত্যাগ করিতেছি এবং আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার আবেদন জানাইতেছি।

১। সকল সরকারী দফতর থেকে আর্মাবী ও রেজাকার প্রত্যাহার করে সামন্ততান্ত্রিক নিয়মের অবসানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হউক।

২। জাতির এই দুর্দিনে সকল অসৎ, দুর্বল চরিত্র ব্যক্তিদের প্রধান মন্ত্রীর নিকট থেকে অপসারিত করা হউক।

৩। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ১৯৭২ সালের ২৮শে মে প্রদত্ত ১১৪ নির্দেশ কার্যকরী করিবার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া জাতির সময় ও শ্রমের অপচয় বন্ধ করা হউক।

আপনার নির্দেশে যে কোন সময় যে কোন কাজ করবার জন্য সর্বদা আমি প্রস্তুত আছি।

আপনার বিশ্বস্ত ও অনুগত,

(মোঃ গোলাম মোর্শেদ)

* পদত্যাগ পত্রের প্রথম পাতার কাটা অংশটি পত্র লেখকের।

জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়া পদত্যাগ পত্রে (২৫জুন, ১৯৭৩) উল্লেখিত '১৯৬১ তে আপনার নির্দেশে আমি তৈরি ছিলাম' অংশটির ব্যাখ্যা করলেন হাজী গোলাম মোরশেদ।

১৯৬১ সালের মাঝামাঝি সময় আমাকে জানান হলো যে মুজিব ভাই ভারত সীমান্তে যাবেন এবং সেখান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করার প্রচেষ্টা শুরু করবেন। পূর্ব পাকিস্তান ও ভারত সীমান্তের কোনো জায়গায় ক্যাম্প করে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীনের আন্দোলন শুরু করব এবং ভারত সরকার আমাদের সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছে। মুজিব ভাই (বঙ্গবন্ধু), সি.এস.পি রুহুল কুদ্দুস, সি.এস.পি আহমেদ ফজলুর রহমান, মহম্মদ মোহসীন (আওয়ামী লীগের ট্রেজারার-খুলনা) ও আমি এই প্ল্যানে ছিলাম। পাকিস্তান আমলের একমাত্র হিন্দু সি.এস .পি, নামটা মনে নেই, উনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আমরা যদি স্বাধীনতার মুভমেন্ট করতে চাই, ভারত সরকার সাহায্য করবে।* He was a link between Ahmed Fazlur Rahman and ours. উনি এক সময় বরিশালের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আইউব খান মার্শাল ল জারি করার পর উনি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে ট্রান্সপোর্ট কমিশনার হন। ১৯৬১ সাল থেকে আমরা স্বাধীনতা মুভমেন্টের প্রস্তুতি নিতে থাকি। তারপর নাইনটিন সিক্সটি টু'র ফেব্রুয়ারির সেকেন্ড অর থার্ড উইকে মুজিব ভাইয়ের শ্যালক, হাসুর মামা (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) মহম্মদ আলী যশোরে আমার কাছে চিঠি নিয়ে আসলেন।** ওখানে এয়ারফোর্সের রিটার্য়াড অফিসার মিজানুর রহমানের একটি দোকান ছিল। সেই দোকানে তিনি মিজানুর রহমানকে বললেন যে উনি টুঙ্গিপাড়া থেকে এসেছেন এবং গোলাম মোরশেদের বাসা খুঁজছেন। মিজানুর রহমানকে বাসা দেখিয়ে দেওয়ার পর মহম্মদ আলী আমার বাসায় গেলেন। আমি তখন বাসার বাইরে। আমি বাসায় ঢোকার মুখে মিজানুর রহমান বললেন যে টুঙ্গিপাড়া থেকে এক ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। তারপর বাসায় ঢোকার পর মহম্মদ আলী একটা স্লিপ দিলেন। ঐ স্লিপে মুজিব ভাই লিখেছিলেন 'আমি কয়েক দিনের ভেতর আসছি। তুমি তৈরি থেকো।' অর্থ হলো যে আমি গাড়ি নিয়ে রেডি থাকব। উনি সোজা সাদিপুর বেনাপোলের বর্ডার দিয়ে আমাকে নিয়ে ভারতে ঢুকবেন। That was the original plan. আমি তখন মহম্মদ আলীকে বললাম যে মুজিব ভাইয়ের সাথে কথা বলব, তারপর জানাব। কারণ ব্যাপারটা ছিল হাইলি সেনসেটিভ। আমি মহম্মদ আলীকে আগে দেখিনি, আবার মুজিব ভাইয়ের হাতের লেখাও চিনতাম না। যার জন্যে বিশ্বাস করাও মুশকিল ছিল। যে জন্যে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তারপর তখন ফোনও ছিল না এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও তখন এত উন্নত ছিল না যে, তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করব। যাই হোক এদিকে আমাকে না পেয়ে, মুজিব ভাই around third week of February, কুমিল্লা দিয়ে

---

* মুক্তিযোদ্ধা কাশেম আলী আমাকে জানান যে (৮ নভেম্বর, ২০১৪) উল্লেখিত হিন্দু সি. এস. পির নাম ছিল অজিত কুমার দত্ত চৌধুরী।

** এই বইটি প্রকাশিত হবার পর লেখক মঈদুল হাসানের একটি সাক্ষাৎকার (২৩.৪.২০১৪) নেই। তখন তিনি জানান যে, ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে মুজিব কাকু, আব্বু ও মানিক মিয়া প্রমুখের সাথে তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। সুতরাং হাজী গোলাম মোরশেদের কাছে মুজিব কাকুর চিঠিটি পৌঁছায় খুব সম্ভবত জানুয়ারি মাসেই। এ প্রসঙ্গে হাজী গোলাম মোরশেদকে অবহিত করলে তিনি সায় দিয়ে বলেন যে, বয়স এবং এত কাল আগের ঘটনা হবার কারণে হয়তো তিনি জানুয়ারির বদলে ফেব্রুয়ারি বলেছেন।

ইন্ডিয়ায় কসবাতে পৌঁছে গেলেন। আগরতলায় উনি যাননি। কসবা থেকে উনি দিল্লির সাথে যোগাযোগ করলেন।* তখন দিল্লি থেকে উত্তর আসল 'Sorry we can't help you.' তখন উনি ঢাকায় ফিরে আসলেন। এসে শুনলেন পুলিশের ডি.আই.জি ওনাকে খুঁজছেন। উনি বললেন, 'আপনারা নাকি আমাকে খুঁজছেন ?' ওনারা বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে।' তারপর পুলিশ ওনাকে অ্যারেস্ট করল। মুজিব ভাই অ্যারেস্ট হবার পর আমার মামা যশোরের শহীদ মশিউর রহমানের কাছে আমি ব্যাপারটা ডিসক্লোজ করি। আমার তখন চিন্তা হলো যে শেখ সাহেব যে অ্যারেস্ট হলেন তাহলে কি আমাদের মুভমেন্ট ফেল হলো ? তখন দু-এক মাস পরেই কোলকাতায় গেলাম খোঁজ নিতে। ওখানে হোম মিনিস্টার কালীপদ মুখার্জির সাথে দেখা করি। জেল মিনিস্টার ড. জীবন রতন ধরের মাধ্যমে ওনার সাথে আমার যোগাযোগ হয়। ইস্ট পাকিস্তান ত্যাগের আগে ড. জীবন রতন ধর, যশোর ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন ওনার সাথে জানা শোনা হয়। যাই হোক, হোম মিনিস্টার কালীপদ মুখার্জি আমাকে তিন চার দিন অপেক্ষা করতে বললেন। আমি অপেক্ষা করলাম। উনি দিল্লি থেকে সংবাদ নিয়ে আমাকে বললেন 'Nehru has refused to help'.

শেখ সাহেব বাষট্টির অগাস্ট বা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ছাড়া পেলেন। আমি যশোর থেকে ঢাকায় গেলাম ওনার সাথে দেখা করতে। তখন উনি কসবাতে যাওয়ার ঘটনা বললেন। উনি বললেন 'কসবাতে আমি দু-তিন দিন ছিলাম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর জবাবের অপেক্ষায়, কিন্তু আমাকে জানানো হলো যে দিল্লি থেকে বলেছে 'Sorry we can't help you'.

শেখ সাহেব জেল থেকে ছাড়া পাবার পর শিক্ষা দিবস শুরু হয়। ছাত্ররা হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সময় ছাত্ররা সভা ত্যাগ করে। পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি চালায় (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)। গুলিতে কয়েকজন ছাত্র মৃত্যবরণ করে এবং অনেকে আহত হয়। মুজিব ভাই, আমায় নিয়ে বের হলেন মেডিক্যাল কলেজে আহত ছাত্রদের দেখতে। যাবার সময় ফর্মার চিফ মিনিস্টার আতাউর রহমান খান ও শেরে বাংলার সময়ের ফর্মার চিফ মিনিস্টার আবু হোসেন সরকারকে সাথে নিয়ে মুজিব ভাইসহ আমরা যখন নীলক্ষেতের রেলক্রসিং ক্রস করছি, তখন ডেপুটি সেক্রেটারি সি.এস.পি মনিরুজ্জামান সামনের দিক দিয়ে হেঁটে আসলেন। শুনেছিলাম, ছাত্ররা ওনার গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। উনি আমাদেরকে দেখে হুঃ শব্দ করে চলে গেলেন।

(টেলিফোন সাক্ষাৎকার, ১৮ ও ২২ অক্টোবর, ২০১২। কোস্তারিকা– ক্যানাডা।)

---

* মুজিব কাকু আগরতলায় গিয়ে দিল্লীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন, যা তিনি নিজে কারাগারে মঈদুল হাসানের কাছে ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে হাজী গোলাম মোরশেদকে অবহিত করলে তিনি একমত হন এবং তথ্যটি সংশোধন করে আগরতলায় গিয়েছিলেন উল্লেখ করতে বলেন। তবে মূল কথা একই থাকে, তা হলো মুজিব কাকু গোপনে বর্ডার ক্রস করে দিল্লীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন।

সেই সময় : বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে স্মৃতিচারণ
বেগম রোকেয়া মোরশেদের সাক্ষাৎকার

১৮ অক্টোবর, ২০১২, হাজী গোলাম মোরশেদের বাড়িতে ফোন করি। ওনার স্ত্রী রোকেয়া মোরশেদ জানান যে, উনি বর্তমানে ক্যানাডায় ওনার ভাগ্নি ডাক্তার রোকেয়া সুলতানার বাসায় রয়েছেন। উত্তর আমেরিকায় ওনার মেয়ে, ভাই এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন। উনি আমাকে ক্যানাডার ফোন নাম্বারটি দিলেন। তারপর বললেন যে হাজী সাহেবের কাছে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। অনেকেই ওনাকে লিখতে বলেছিল কিন্তু সংসারের নানা ঝামেলায় লিখতে পারেননি। উনি যোগ করলেন 'তুমি যে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছ এজন্য আমি তোমার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ, তোমার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগে'।

স্বামীর সুখ দুঃখের সাথি বেগম রোকেয়া মোরশেদও ব্যক্তিগতভাবে বহু ঐতিহাসিক এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হবার পর উনি মাঝে মাঝে হাজী সাহেবের সাথে বঙ্গবন্ধুর বাসায় যেতেন। সে সময় একবার বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ওনাকে বলেছিলেন যে আগেই ওনারা ভালো ছিলেন। এখন ওনার স্বামী প্রধানমন্ত্রীর পদে। ওনারা সবসময় লোকের চোখের সামনে। এজন্য সবসময় সাবধানে চলতে হয়।

বঙ্গবন্ধু হাজী সাহেবকে অনেক স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। ওনাকে নিয়ে অনেক রসিকতা করতেন। ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাত্র দুদিন আগে হাজী সাহেবের সন্ধানে ওনাদের বাসায় উনি ফোন করেছিলেন। ওনাদের ফোন লাইন বিল দিতে না পারার কারণে কেটে দেওয়া হয়েছিল। ফোন নাম্বার ছিল ২৫৪৬৭০। ১০আগস্ট, প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর অর্ডারে ফোন লাইন পুনঃসংযোগ করা হয়। বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন যে হাজী সাহেব কোথায় ? রোকেয়া মোরশেদ বললেন যে উনি যশোর গিয়েছেন। ওখান থেকে আজমীর শরিফের পথে রওয়ানা দেবেন। বঙ্গবন্ধু বললেন 'তুমি কি একা ?' উনি বললেন 'হ্যাঁ'। তখন বঙ্গবন্ধু বললেন 'তুমি সাবধানে থেকো।' তার দুদিন পরেই ওনাকে পরিবারসহ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো। রোকেয়া মোরশেদ দুঃখ ভরা কণ্ঠে বললেন 'উনি আমাকে সাবধানে থাকতে বললেন অথচ নিজেই সাবধান হননি। এই প্রশ্নটা আমার মনে জাগে। উনি সবাইকে অতি ভালোবাসতেন ও সবাইকে বিশ্বাস করতেন।'

হাজী গোলাম মোরশেদের জামাতা
চৌধুরী আরশাদ হুসাইনের সাক্ষাৎকার

সাতাশে মার্চ (১৯৭১) সকালে কারফিউ তোলার পর আমি আমার শ্বশুরের খোঁজে ধানমণ্ডির ৩২ নাম্বার রোডের বাসায় যাই। বাসার বাইরে দেখি আমার শ্বশুরের গাড়ি- গাড়ির কাচ ভাঙা। বাইরে কেউ নেই। আমি তখন শেখ সাহেবের বাড়ির গেটের ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে ডাকছিলাম 'কেউ আছেন- কেউ আছেন ?' ঠিক তক্ষুনি পাকিস্তান আর্মির একজন মেজর ও পঁচিশ-তিরিশজন সৈন্য আমাকে ঘিরে ধরে। তারা আড়াল থেকে শেখ সাহেবের বাড়ি ওয়াচ করছিল। তারা আমাকে বেঁধে ট্রাকের মধ্যে ফেলে বুট দিয়ে লাথি মারতে থাকে। আমার দাঁত ভেঙে দেয়। শোল্ডার ডিসলোকেট করে দেয়। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে ট্রাকেই ফেলে রাখে। একটু পর পর মারধর আর আমার গায়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতে থাকে। সন্ধ্যায় ধানমণ্ডির একটা স্কুলে আমাকে রাখে। সেখানে অনেক বন্দী ছিল। আমাকে সৈন্যরা জিজ্ঞেস করছিল কেন আমি ঐ বাসায় গিয়েছি। আমি বললাম যে 'লোকজনরা বলছিল যে শেখ সাহেব, আমার শ্বশুর ও সবাইকে মেরে ফেলেছে। তাদের লাশ পড়ে আছে। ডেডবডির তো জানাজা হওয়া দরকার। সেই জন্যেই আমি গিয়েছিলাম।' আমাকে অনেক জেরা করে তারপর যখন শুনল আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইউ.পির, তখন টুয়েন্টি এইটথ মার্চ সকালে আমাকে কাকরাইলের রাস্তায় ছেড়ে দিল।

(টেলিফোন সাক্ষাৎকার। বুধবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২। কোস্তারিকা- বাংলাদেশ।)

শহীদ প্রকৌশলী এ. কে. এম নূরুল হকের স্ত্রী নাসরিন বানু এবং কন্যা হাসু আপার সাক্ষাৎকার

যারা নিভৃতে নীরবে দেশ ও দশের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেন এবং অকাতরে নিজ রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার রক্ত গোলাপটিকে উন্মেলিত করেন, তারা হলেন মহামানব। এদের অনেকের নাম ও অবদান ইতিহাসে অনুল্লেখিত। শহীদ প্রকৌশলী এ. কে. এম নূরুল হক এমনই একজন মানুষ যিনি অন্তরালে রচনা করেছেন ইতিহাস। অত্যন্ত মেধাবী ধীশক্তি সম্পন্ন নূরুল হক পাকিস্তানে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেন। ট্রান্সমিটার তৈরিতে পারদর্শী নূরুল হক স্থাপিত রেডিও কমিউনিকেশন সেটগুলো জনযোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। দেশের বাইরেও তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬১ সালে, তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ উনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তমঘা-এ-ইমতিয়াজ খেতাবে ভূষিত হন। গুণী এই প্রকৌশলী তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও অধীনস্ত কর্মীদের কাছেও আদরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হয়েছেন তার উদার, স্নেহপরায়ণ, দানশীল, ন্যায়নিষ্ঠ ও বিনম্র ব্যক্তিত্বের কারণে। জনযোগাযোগের জন্য তিনি যেমন গড়েছেন টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা, তেমনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন একাধিক দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র ও স্কুল।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে এই অসাধারণ মানুষটির সম্বন্ধে জানতে পারি। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নূরুল হককে তার মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি বাসভবন হতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। উনি ট্রান্সমিটার বানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছেন এবং সেই ট্রান্সমিটারের মাধ্যমেই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণ করা হয়, এই সন্দেহ তারা করেছিল। উনি আর ফিরে আসেননি। ২৫ মার্চ দুপুরে তিনি আমীর-উল ইসলামকে জানিয়েছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে খুলনা হতে ট্রান্সমিটার এনেছেন। আমীর-উল ইসলাম যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ওয়্যারলেসে কী বলবেন, তা কি আমি বলে দেব এবং ওটা লিখে দেব ?' নূরুল হক দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন 'আমি জানি কী বলতে হবে। It will cost my life but I will do it.'

বৃষ্টিস্নাত ঘন সন্ধ্যায়, মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে নূরুল হক প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বিদ্যালয় ও আদর্শ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যখন তার বাস ভবনে পৌঁছি, তখন মনে হলো আমি যেন ফিরে গিয়েছি আমার শৈশব ও কৈশোরের ঢাকা শহরের কোনো এক বাস গৃহে। স্বাধীনতা পূর্ব কালে নির্মিত এই সরকারি বাসভবনটির আশপাশে জাম, কাঁঠাল ও কৃষ্ণচূড়া গাছ। ভেতরে খেলোমেলা টানা বারান্দা ও ঘর। গাছপালা প্রায় বিবর্জিত ঘন বসতিপূর্ণ ঢাকার ফ্ল্যাট কালচারের বিপরীতে এই পুরাতন বাসভবনটির মধ্যে কেমন স্নিগ্ধ ভাব বিরাজমান।

নূরুল হকের স্ত্রী, টিঅ্যান্ডটি আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী নাসরিন বানুর বয়স বর্তমানে চুরাশি বছর। জীবনের বহু চড়াই-উৎরাই পার করে প্রিয়জনকে হারাবার

বেদনা বহন করে, জীবন সায়াহ্নে পদার্পণ করা এই শ্রদ্ধাভাজন নারীর মুখ জুড়ে রয়েছে সুগভীর নির্মলতা ও ছায়া স্নিগ্ধ সৌম্যতা। একচল্লিশ বছর পূর্বে এই বাসা থেকেই পাকিস্তান সেনারা তার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে তুলে নিয়ে যায়। ওনাদের একমাত্র পুত্র এ. কে. এম জিয়াউল হক (বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার) সে সময় দুবছরের শিশু মাত্র। শিশুপুত্র ও প্রথম স্ত্রী হালিমা হকের গর্ভে জন্মাল পাঁচ কন্যা উষা, আশা, নিশা নীরু ও শাহিন হারায় তাদের বাবাকে। হাসু হাপা হারায় পিতৃসম এক মহান ব্যক্তিত্বকে। জাতি হারায় তার এক স্বর্ণসন্তানকে।

নিম্নে নাসরিন বানু ও ওনার কন্যা বনানি বিদ্যানিকেতনের শিক্ষয়িত্রী হাসু আপার সাক্ষাৎকারের প্রাসঙ্গিক অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো।

খালাম্মা, খালু (নূরুল হক) তখন কি পোস্টে কাজ করছিলেন ?

নাসরিন বানু : ইস্টার্ন ওয়্যারলেস ডিভিশনের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়র ছিলেন।

হাসু আপা : উনি ট্রান্সমিটার বানাতে পারতেন। রক্তঋণ নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছিল [মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রকৌশলী স্মৃতিকথা। প্রকাশক রক্তঋণ। রক্তঋণের পক্ষে প্রকৌশলী ইফতিখার কাজল। ডিসেম্বর, ১৯৯১], সেটাতে ট্রান্সমিটারের ছবি আছে। ট্রান্সমিটার বানানোর জন্য পাকিস্তান সরকার তাকে তমঘা-এ-ইমতিয়াজ উপাধি দিয়েছিল (তিনি এক কিলোওয়াট হতে পাঁচ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সমিটার তৈরি করেছিলেন যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।) খান আব্দুস সবুর খান ছিলেন টেলিকমিউনিকেশন মিনিস্টার। নেপালে যখন টেলিকমিউনিকেশন চালু হয় সবুর খান আব্বুকে নেপালে নিয়ে যান এবং ওখানে টেলিকমিউনিকেশন আব্বুই চালু করেন।

খুবই প্রতিভাবান ছিলেন। তখন তো ইন্টারনেট ছিল না–

হাসু আপা : তখন তো স্যাটেলাইটও ছিল না, অনেকটা হাতে কলমে করতে হতো। তাকে বিদেশে অনেক ভালো অফার দিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু উনি যাননি–

কত বড় দেশ প্রেমিক ছিলেন–

উনি বলতেন যা শিখেছি, দেশকেই যতটুকু পারি দেব।

যখন ওনাকে ধরে নিয়ে যায়। আপনি তখন কোথায় ?

আমি বাসায় ছিলাম না। আমি ইডেন কলেজে পড়তাম ও পুরান ঢাকায় একটা বাসায় প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তাম। আমরা ইডেন হোস্টেলে থাকতাম ও বংশালে আমরা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তাম। ওখান থেকে যাতায়াত করতাম। তখন তো ঠিকমত ক্লাস হতো না। আমি একদিন পরে জানতে পারি যে আব্বুকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখনো এ ধরে নেওয়াটা যে এতটা ভয়াবহ, আর যে উনি ফিরে আসবেন না, এটা কিন্তু ভাবতে পারিনি। ভেবেছি জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিয়ে গেছে, আবার চলে আসবেন।

খালাম্মা, এই বাড়িতে আপনারা কবে থেকে আছেন ?

নাসরিন বানু : সিক্সটি নাইন–

পঁচিশে মার্চ যখন গণহত্যা শুরু হলো, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন, এই ঘটনাটি কি বলবেন ?

আমরা এই বাড়িতেই ছিলাম। রাস্তায় রাস্তায় তখন লোকজনকে মারছে। আমাদের বাসায় খিচুড়ি ও অনেক গোশত রান্না হয়েছিল, অনেক লোক এদিক থেকে উঠে এসে [বাসার পিছন দিক

দেখালেন] খেয়ে গেল। উনি তাদেরকে বললেন 'তোমরা গ্রামে চলে যাও।' আর্মির মধ্যেও দু-একজন ওনার ঘনিষ্ঠ ছিল, তারা ওনাকে বলত 'আপনি এখান থেকে চলে যান।' কিন্তু উনি বলতেন 'আমার এখানে staff আছে, ছেলেমেয়েরা আছে, আমি কোথায় যাব ?' সেদিন সকালে উনি টিফিন করেছেন। টিফিন করে অফিসে যাবেন, ড্রাইভারও এসেছে গাড়ি নিয়ে।*

কোনদিন সকালে ?

টুয়েন্টি নাইনথ সকালে।

আর ঐ ক'দিন উনি ঘরেই রইলেন ?

না ঘরে না। উনি অফিসে গিয়েছেন, এসেছেন। শরীরটা ভালো ছিল না ওনার। এখানেও [সামনের লম্বা টানা বারান্দা দেখালেন] উনি কাজ করতেন। অফিসের লোকজন তারাও এখানে আসত এবং এসে কাজ করত।

এই বাসাতেই ?

হ্যাঁ। এই বাসাতে। এই বারান্দায়।

হাসু আপা : বাড়িটা একটা অফিসের মতো ছিল। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি, মোটামুটি বড় এবং আমার যে বোনরা আছে, আমাদেরই ভেতরের ঘরে থাকতে হতো। কারণ সারা বারান্দা জুড়ে পাঁচ ছয়টা টাইপ রাইটার, তখন তো আর কম্পিউটার নাই, টাইপিস্ট টাইপ করছে, লোকজন। বাড়িটাই ছিল একটা অফিস। উনি যদি শারীরিক কারণে অফিসে যেতে না পারতেন, তখন বাড়িতেই অফিস। আবার অফিসে যতক্ষণ কাজ করতেন, বাড়িতে এসেও আবার অফিস করতেন।

উনার অফিসের নাম কী ছিল ?

ইস্টার্ন ওয়্যারলেস ডিভিশন এবং ট্রান্সমিটিং স্টেশন। তখন তো স্যাটেলাইট ছিল না। এটা ছিল ট্রান্সমিটিং স্টেশন। এটা থেকে সারা ওয়ার্ল্ডে খবরাখবর যেত। আর মগবাজার ছিল রিসিভিং স্টেশন। আর এই মাঠটায় (বাড়ির পাশে মাঠ) তখন বড় বড় মাস্ট ছিল। মাস্টের মাধ্যমে ওগুলো [ট্রান্সমিট] হতো। তখন তো স্যাটেলাইট ছিল না। কিন্তু দূরে দূরে মাস্ট ছিল।

মাস্টগুলো দেখতে কেমন ছিল ?

এখন যেমন মোবাইল ফোনের টাওয়ার সেরকম দেখতে–

আটাশ তারিখে (সেদিন কারফিউ তুলে নেওয়া হয়) অফিস থেকে খবর দিল এটার দায়িত্বে কে ?

মিলিটারিরা ?

---

* শহীদ নূরুল হকের চতুর্থ কন্যা নূর উন নেসা নীরু যিনি ২৯ মার্চ ওনার বাবাকে পাকিস্তান সেনারা ধরে নিয়ে যাবার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, লিখিত (৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪) সংশোধনীতে উল্লেখ করেন যে ওনার বাবা সকালে তখনো নাস্তা করেননি। অফিসও সেদিন বন্ধ ছিল। হাসু আপাকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে ওনার মা হয়তো বয়সের কারণে এবং এত বছর আগের ঘটনা ঠিক মনে রাখতে পারেননি। তবে মূল বিষয়টি সম্পর্কে তারা একমত যে প্রকৌশলী নূরুল হককে পাকিস্তান বাহিনী ট্রান্সমিটারের জন্যই ২৯ মার্চ ধরে নিয়ে যায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নীরু আরও জানান যে নূরুল হককে প্রথম দলটি ধরে নিয়ে যাওয়ার পর, পাকবাহিনীর দ্বিতীয় দল পুরো বাড়ি সার্চ করে এবং তারা সার্ভেন্ট রুমের আলমারির ভিতরের পেছনের দিকে লুকানো একটি ট্রান্সমিটার খুঁজে পায়। সে ট্রান্সমিটারটি তারা সাথে নিয়ে যায়।

হ্যাঁ। ওনার কাছে খবর আসল, তারপরে উনি গেলেন [বাড়ির খুব কাছেই অফিস]। তখন ওরা ভালোই আচরণ করল। বলল যে 'তোমরা কাজ চালু কর। তোমার স্টাফদের ডাক। ডেকে সব নর্মাল কর। নর্মালি কাজকর্ম চলবে। ভয় পাবার কিছু নেই।' তখন উনি লোকজন যারা এখানে ছিল, তাদেরই ডেকে নিয়ে অফিস চালু করলেন। এখানে অনেক অফিসের লোকজন ছিল। তারা এখানেই থাকতেন। এই কোয়ার্টারটা তখন শহর থেকে অনেক দূরে ছিল। ষাটের দশকে এখান থেকে (মহাখালী ওয়ারলেস কলোনি) নিউমার্কেট গেলে বলত 'আজকে ঢাকা যাব।'

গাছপালায় ঘেরা ?

হ্যাঁ, গাছপালায় ঘেরা পুরো একটা গ্রামের মতো। কমিউনিকেশনও তখন ভালো ছিল না। যার জন্যে কেউ আসতে চাইত না– কখন রাত বিরাতে দরকার হয়– নাইট ডিউটি থাকতে পারে তারা ভোরবেলা বাড়িতে কী করে ফিরবে– এজন্যেই এখানে কিছু কোয়ার্টার হলো। তো তাদেরই ডেকে নিয়ে অফিস চালু করা হলো।

তারপর খালাম্মা উনত্রিশ তারিখ সকালে কী হলো ?

নাসরিন বানু : উনত্রিশ তারিখ সকালে উঠে উনি নাশতা করলেন।*

ক'টার সময় ?

হাসু আপা : আটটা– আটটা তিরিশ।**

নাসরিন বানু : এরকমই হবে। উনি নাশতা করে রেডি হলেন। গাড়িও এসেছে। ড্রাইভারও এসেছে। কিন্তু দেখা যায় যে আর্মি এসে চারদিক ঘিরে ফেলল।

হাসু আপা : সামনে একটা জিপ, পেছনে কনভয়। জিপটা যখন এসেছে মা-রা বুঝতে পারেনি, ভেবেছে অফিসের এরাই এসেছে। কিন্তু যখন কনভয় থেকে নেমে পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলেছে, তখন বুঝতে পেরেছে যে এটা অন্য কিছু। (আর্মির ভিন্ন দল)

নাসরিন বানু : তখন উনি আমাকে বললেন যে 'ওরা ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিটার বলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি একটু রিজভী সাহেবকে টেলিফোন করে দিয়ো।'

রিজভী সাহেব কে ?

উনি জেনারেল ম্যানেজার ইস্টার্ন ওয়্যারলেস জোনের।

হাসু আপা : এম. ডব্লিউ রিজভী।

উনি পাকিস্তানি (অবাঙালি) ?

নাসরিন বানু : হ্যাঁ পাকিস্তানি। ওনাদের সাথে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি ওনাকে টেলিফোন করি। টেলিফোন ডিসকানেকটেড। ওনাকে পাই না। পরে শুনেছি ওনাকে নিয়ে ওরা, আর্মিরা মিটিং এ আটকে রেখেছিল। যাতে কোনো যোগাযোগ করতে না পারে। আমাদের ওখানে আর একজন ছিল রোজারিও তাকেও ধরে নিয়ে গেছে। রোজারিও ওনার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। উনি ছিলেন অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। এদিকে ড্রাইভার বলছে 'আপনারা কেন থাকলেন। কেন চলে গেলেন না ? আমাদের দেশের সব ব্রেনগুলো নিয়ে যাচ্ছে।'

কোন ড্রাইভার ?

---

* নূর উন নেসা নীরুর লিখিত তথ্য অনুসারে ওনার বাবা বেড-টি খাচ্ছিলেন।

** কন্যা নীরুর মতে "ভোর ৬টা সোয়া ৬টার কাছাকাছি" উত্তরটি হবে। সে সময় নূরুল হক বেড-টি খাচ্ছিলেন। ঐ সময় পাকিস্তানী সেনারা ট্রান্সমিটারের খোঁজে বাসায় ঢোকে।

আর্মিরই ড্রাইভার। কিন্তু বাঙালি। তখন ওরা ঘরে ঢুকে সার্চ করছে, এদিকে ওদিকে ঠোকাঠুকি। কাজের ছেলেদের নিয়ে গিয়েছে। আমার দেবররা ছিল এই ঘরে ওদেরকে নিয়ে গিয়েছে। ওদেরকে নিয়ে মাঠে শুইয়ে রেখেছে–

হাসু আপা : তখন এখানে খোলা মাঠ ছিল, কৃষ্ণচূড়া গাছ এখনো আছে একটি– এ গাছের নিচে মাঠের মধ্যে শুইয়ে রেখেছে। আমার দুই চাচা ছিল ও কাজের লোক।

চাচা– আপনি চিনবেন– খন্দকার রাশেদুল হক (নবা চাচা)– আমিনুল হক বাদশার (বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি) ছোট ভাই।

আপন ভাই ?

না, কাজিন।

আপনার আব্বার ফার্স্ট কাজিন ?

হ্যাঁ। বাড়ির সব পুরুষ মেম্বারকে শুইয়ে রেখেছে। আর তো কেউ নাই। আর হচ্ছে মা আর আমার ভাই, ওর তখন দুবছর বয়স।

খালাম্মা, তারপর ওরা কীভাবে ওনাকে নিল, বেঁধে ?

নাসরিক বানু : না বেঁধে নেয়নি। উনি যাবার সময় ঐ কথাটা আমাকে বললেন যে 'তুমি রিজভী সাহেবকে জানাও যে আমাকে ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিটার করে নিয়ে যাচ্ছে।' তারপর উনি ওদের জিপে উঠলেন। এই যে গেলেন, আর ওনাকে পাইনি– (চোখে পানি, গলা ধরে এল)।

ট্রান্সমিটার সম্বন্ধে তারা কী জিজ্ঞেস করেছে ?

হাসু আপা.: (কান্না ভরা গলা) পরে আমরা শুনেছি, সার্ভেন্টদের তারা জিজ্ঞেস করেছে, 'তোমাদের স্যার কোথায় কাজ করত ? ঠিক করে বল', আর দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখেছে কোনো গোপন কুঠুরি আছে কিনা– এটাই তাদের জানার বিষয়। কোনো গোপন কুঠুরি আছে কিনা, যেখানে বসে কাজ করতেন। ঐ পিছনের বারান্দা থেকে আরম্ভ করে পুরো বাড়ি তারা ঠুকে ঠুকে দেখেছে আর সার্ভেন্টদের জিজ্ঞেস করেছে 'তোমাদের স্যার কোথায় বসে কাজ করত বল।' এখন তারা আর কী বলবে বাড়িতে তো তারা আর তেমন কিছু দেখেনি।

তারপর এখানে আর একজন আফজাল আহমেদ মজুমদার, পানু চাচা বলতাম, উনি শেষদিন পর্যন্ত মা ও আমাদের দেখাশোনা করেছেন। আমরা পরে ওনার বাড়িতেই আশ্রয় নিলাম। এই বাড়িতে তো মা'র পক্ষে থাকার মতো অবস্থা রইল না। তখন মাকে ওনারাই– হাজব্যান্ড-ওয়াইফ নিয়ে গেলেন। এই কলোনিতেই বাসা। ওনার ওয়াইফ কিছুদিন আগে মারা গেছেন। ভদ্রলোক আগেই মারা গেছেন। তখন আমি তো ছিলাম বংশালে। তখন নীরু, আমারই এক বোন, নীরু ছিল এখানে।

আপনারা তখন অপেক্ষাই করছেন ?

নাসরিন বানু : হ্যাঁ। উনি ফিরে আসবেন, ফিরে আসবেন। আমি বিভিন্ন জায়গায় অনেকের সাথে দেখা করেছি, ভেবেছি ওনার খোঁজ পাওয়া যাবে– ওনার খাবার আগে একটা ওষুধ খেতেই হতো। প্যানক্রিয়াটাইটিস-গলব্লাডারের ওষুধ। এই ঔষধটা এখানে পাওয়া যেত না। লন্ডন থেকে আমাদের এক পরিচিত ওষুধটা পাঠাতেন। ঐ ওষুধগুলো নিয়ে ঘুরেছি, ভেবেছি অন্তত এগুলো দিয়ে আসি। যেখানেই থাকুক অন্তত এগুলো খেয়ে তো ঠিক থাকবে !

হাসু আপা : অনেকে বলেছে 'ওনাকে নিয়ে ট্রান্সমিটারের কাজ করাচ্ছে। আপনি ভয় পাবেন না। উনি তো অনেক কাজ জানেন, ওনাকে দিয়ে গোপনে কাজ করাচ্ছে।'

ওরা তো ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিটার বলছিল–

হাসু আপা : হ্যাঁ। তাও শেষ পর্যন্ত আশা ছিল। যেদিন ষোলোই ডিসেম্বর হলো তখন মনে হয়েছিল এখন হয়তো কোনো জায়গা থেকে ফেরত আসবেন। এরকম একটা আশা ছিল।

নাসরিন বানু : কিছুদিন পর বাসায় আসলাম। দেখি আমাদের যত ফটো আছে সব ছিঁড়ে একাকার করে রেখেছে।

কারা করল এসব ?

নাসরিন বানু : ওরাই।

হাসু আপা : অফিসাররা তো ওনাকে নিয়ে চলে গেল। আর যারা কনভয়ে এসেছিল তারা সার্চ করার নামে লুঠপাট করে আরকি ! খন্দকার রাশেদুল হক চাচা– ওনার গলায় একটা চেন ছিল, চেনটা নিয়ে গিয়েছিল ও একটা টেপ রেকর্ডার। প্রায় দেড় দুইমাস পর হঠাৎ দেখি এক আর্মির গাড়ি। আর্মির গাড়ি দেখে ভয়ও পাই। আবার একটা আশা কী জানি ফেরত দিতে এসেছে কিনা ওনাকে। তারপর যাইহোক ওরা আসল। এসে বলল 'সিপাইরা নিয়ে গিয়েছিল আপনাদের জিনিস।' একটা সোনার চেন আর একটা টেপরেকর্ডার দিয়ে গেল। আমরা বারবার জানতে চাইলাম 'উনি কোথায় ?' ওরা বলে 'আমাদের কাজ হলো নিয়ে যাওয়া। এর পরের খবর আমরা জানি না।'

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ওরা যখন সোনা ও টেপ রেকর্ডার ফেরত দিল, ওরা কোনো সোনাদানার লোভে আসেনি, আসার উদ্দেশ্য ছিল ওনাকে নিতে আসা– ওরা বড় কোনো চ্যানেল থেকে ইনস্ট্রাকশন পেয়েই এসেছে যে এনাকে ছাড়া হবে না।– বহু ইঞ্জিনিয়াররা তো তখনো কাজ করছিলেন– প্রথম দিকে। তার মানে ওদের ধারণা ছিল যে ওনার কোনো বিশাল নলেজ আছে কোনো বিষয়ে।

হ্যাঁ। বিশাল কোনো নলেজের খবর পেয়েই ওরা এসেছে এবং ওরা ওনাকে বলেছেও ট্রান্সমিটারের কথা এবং কাজের লোকদেরও বলছিল 'কোথায় বসে বানায় ?' তার মানে ঐ ব্যাপারে তারা শিওর হয়ে এসেছে।

রিজভী সাহেবের সাথে পরে কথা হয়েছিল ?

নাসরিন বানু : হ্যাঁ, রিজভী সাহেবের সাথে পরে কথা হয়েছিল। পরে অবশ্য উনি এখান থেকে চলে গেলেন পাকিস্তানে। যাবার আগে উনি দেখা করে গেছেন। ওনার ওয়াইফও এসেছিলেন। এসে বলে গিয়েছেন 'যদি খোঁজ করে পাই, ভাইকে অবশ্যই আপনার কাছে ফিরিয়ে আনব।'

হাসু আপা : আমি তো বলি ক্লাসে, যারা প্রাণ দিয়েছে একটা নতুন দেশ গড়ার জন্য, ওনারা যদি আজকে দেশটাকে দেখতেন– বা জানি না দেখতে পাচ্ছেন কিনা– তাহলে মনে হয়– ওনারা কষ্ট পাচ্ছেন যে 'এই দেশটার জন্য তো আমরা প্রাণ দেইনি !' অর্থে, বিত্তে না হোক মানসিকতা, নীতি, আদর্শ– যে আদর্শের জন্য এত আত্মাহুতি, কিছু তো হলেও একটু থাকা উচিত ! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দেখা যাচ্ছে আমরা প্যারেন্টরাই আমাদের সন্তানদের দিক নির্দেশনা দিতে পারছি না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরাই দায়ী। আমাদের সন্তানদের আমরা কতটুকু বলি এই যুদ্ধের গল্প ? ওদের কাছে আমাদের কথা পৌছাতে পারছি না। এটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আমাদের অনেক দায়িত্ব। ওরা যে কী হারিয়েছে ওরা জানে না। কিন্তু আমার তো জানি কী হারিয়েছি। সেটা কিছু হলেও পৌছানো দরকার।

আপনার বাবার মতো মানুষ যারা আছেন, তাদের যদি রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে পারি– স্কুল-কলেজে, তাহলে একটা নতুন জেনারেশন সৃষ্টি হবে– যারা হবে অ্যাওয়েকেন্ড– সজাগ।

আমি আপনাকে দুঃখের কথা বলি, আমি তো টিচার, আমি কতবার বললাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে পর্যায়ক্রমে আমাদের বাচ্চাদের নেওয়া উচিত–

ফিল্ড ট্রিপ ?

হ্যাঁ। আমি যখন মিটিং-এ বলি, সবাই বলে উচিত, উচিত কিন্তু সেভাবে তো উদ্যোগ নিচ্ছে না। স্কুল কর্তৃপক্ষই নিচ্ছে না। তারা সেটাকে দায়িত্ব বলে মনে করে না। তারপর আমি বললাম 'আমার বন্ধু রাশেদ' এনে প্রজেক্টরে দেখান যে অল্পবয়সী বাচ্চাদের মধ্যেও কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ অনুপ্রাণিত করেছিল, যুদ্ধে তারা কীভাবে অংশ নেবে এর জন্যে তারা কীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এটা আমাদের এই বয়সী বাচ্চাদের খুব জানা দরকার। এখনো তো যুদ্ধ চলছেই– এখন দেশকে গড়ার যুদ্ধ চলছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের মানসিকতা সম্পন্ন না।

জাতীয়ভাবে ন্যাশনাল পলিসি করতে হবে যে ফিল্ড ট্রিপে যেতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের শুধু বই পড়লেই হবে না। ফিল্ড ট্রিপ, ছবি দেখান... আপনি বলেছেন ঠিক কথা।

আমীর কাকুর কাছে যখন আপনার বাবার কথা শুনলাম আমি তখন ভীষণ আলোড়িত হলাম।

আমীর-উল ইসলাম চাচার অনেক ভূমিকা। না হলে এই জিনিসটা অজ্ঞাত থেকে যেত। আরেফীন বলে এক ছেলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ওপর একটা ফিল্ম করেছে– The Speech– এটা কিছু টি.ভিতেও গত ছাব্বিশ মার্চ দেখানো হয়েছে। এটাও উৎসর্গ করেছে আব্বুর নামে। এটার ওপেনিং টি.এস.সিতে হয়েছিল। এয়ারভাইস মার্শাল এ.কে খন্দকার ওপেনিং করলেন এবং সিডিটা আমার ভাইয়ের হাতে দিলেন। ঐ সিডির মধ্যে আমীর-উল ইসলাম চাচার কথাটা আছে যে আমার বন্ধু টিঅ্যান্ডটির ইঞ্জিনিয়ার নূরুল হক সাহেব আমার কাছে বললেন যে 'বঙ্গবন্ধু আমাকে তো একটা ট্রান্সমিটার জোগাড় করতে বলেছিলেন। রেডি রাখতে বলেছিলেন, আমি তো রেডি রেখেছি। এখন আমি কীভাবে দেব ?' এই কথাগুলো উনি বলেছিলেন। তখন তার মাধ্যমেই ট্রান্সমিটারের ব্যাপারটা জানা গেল। না হলে এটা তো অনেকটা অজানাই ছিল।

ওনারা প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন– ট্রান্সমিটার জোগাড় করেছিলেন। আপনার বাবা জানতেন।

হ্যাঁ। বঙ্গবন্ধু ভাবছিলেন এটার প্রয়োজন হতে পারে।

এজন্যেই মিলিটারিরা এসে স্পেসিফিক ট্রান্সমিটারের কথা জিজ্ঞেস করেছিল ?

হ্যাঁ। ওরা আর কিছু বলেনি। আমরা এখন যোগসূত্র পাচ্ছি– ওরা অনেকটা বড় কিছু সন্দেহ করে ওনাকে নিয়েছে। না হলে সারা বাড়ি ওরা ঠুকে দেখবে কেন ? সার্চ করলে এমনি সার্চ করবে। কিন্তু ঠুকে ঠুকে কেন দেখবে গোপন কোনো কুঠুরি আছে কিনা ? তার মানে ওরা কনফার্মড হয়ে এসেছে যে উনি এরকম কিছু করেছেন।

খালাম্মা, আপনার উপর দিয়ে অনেক দুর্যোগ গিয়েছে। একজন যদি জানে (তার প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে) তার এক ধরনের কষ্ট, আর যে অপেক্ষা করে আছে সারাজীবন যে এখুনি হয়তো ফিরে আসবে... আপনার কি কোনো শব্দ বা আওয়াজে মাঝে মাঝে মনে হতো উনি ফিরে এসেছেন ?

নাসরিন বানু : হ্যাঁ সব সময় মনে হতো– হয়তো ফিরে আসবে– হয়তো ফিরে আসবে। ও আসল তো না !

(ভিডিও সাক্ষাৎকার। রোববার, ৮ জুলাই, ২০১২)

সাংবাদিক জহিরুল হকের সাক্ষাৎকার

সাবেক রিপোর্টার মার্নিং নিউজ
আদি নিবাস খুলনা, বাংলাদেশ

১৯৭৩ অথবা '৭৪ সালে বাজারে ২টাকা স্ট্যাম্পের তীব্র সংকট দেখা দেয়। কালোবাজারিরা স্ট্যাম্পের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। ২ টাকার স্ট্যাম্প ৫০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি করত। এরকম সময়ে তাজউদ্দীন সাহেবের পিআরও (পাবলিক রিলেশনস অফিসার) আব্দুল আউয়াল সাহেব আমাকে মর্নিং নিউজ অফিসে ফোন করে বলেন যে মন্ত্রী সাহেব এক জায়গায় যাবে। উনি আপনাকে সঙ্গে নিতে চান। আমি রিপোর্টার হিসেবে তাজউদ্দীন সাহেবের অনেক অনুষ্ঠান কভার করতাম। সেজন্য আউয়াল সাহেব আমাকে ভালো জানতেন। তাজউদ্দীন সাহেবও আমাকে পছন্দ করতেন। আমি নিউজ এডিটরকে জানালাম যে মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। উনি সঙ্গে সঙ্গেই অনুমতি দিলেন। তাজউদ্দীন সাহেব, ওনার প্রাইভেট সেক্রেটারি আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেব, এসপি ও ডিসিসহ আমরা ঢাকা কোর্টে গেলাম। প্রথমে আমরা সচিবালয়ে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বাসস ও বিসিআই-এর সাংবাদিকরাও ছিলেন। সচিবালয় থেকে তাজউদ্দীন সাহেবসহ ঢাকা কোর্টের চত্বরে। সেখানে মহুরিরা বসে দলিল লেখে ও স্ট্যাম্প বিক্রি করে। তাজউদ্দীন সাহেব সরেজমিনে দেখতে এসেছিলেন যে সত্যি স্ট্যাম্পের সংকট রয়েছে কিনা। উনি আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন যে আপনি বিক্রেতার কাছে যেয়ে ২ টাকার স্ট্যাম্প চান। আমি ওনার কথা অনুযায়ী বিক্রেতার কাছে ২টাকার স্ট্যাম্প চাইতেই সে বলল যে স্ট্যাম্প নেই। সেই মুহূর্তেই তাজউদ্দীন সাহেব সেখানে উপস্থিত হয়ে বিক্রেতাকে বললেন 'স্ট্যাম্পের বাক্স খুলুন দেখি।' বিক্রেতা ঘাবড়িয়ে বাক্স খুলতেই দেখা গেল যে বাক্স ভর্তি ২ টাকার স্ট্যাম্প। তাজউদ্দীন সাহেব তখন আমাকে বাদী করে বিক্রেতার বিরুদ্ধে কেইস করলেন। কিন্তু পরে জানতে পারি যে তৎকালীন পাট প্রতিমন্ত্রী মানিকগঞ্জের মোসলেহউদ্দীন সাহেবের হস্ত ক্ষেপে তার আত্মীয় বিক্রেতা রেহাই পেয়ে যায়।

(ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৪ এপ্রিল, ২০১০। ১লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ
Polo India Club Restaurant, Dupont Cincle. Washington DC, U.S.A)

মনে হয় '৭৩ সাল সেটি। কালিয়াকৈরে, তাজউদ্দীন সাহেব কৃষি ব্যাংকের শাখা উদ্বোধন করলেন। শামসুল হক সাহেবও সেখানে ছিলেন। উনি তখন প্রথম সারির একজন নেতা। যতদূর মনে পড়ে তিনি সমবায় মন্ত্রীও ছিলেন। শাখা উদ্বোধনের পর খবর এল যে কে বা কারা দুইজনকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে হত্যা করেছে। তাজউদ্দীন সাহেব তৎক্ষণাৎ আমাকে, প্রেস ইনফর্মেশন ডিপার্টমেন্টের একজন ফটোগ্রাফার ও কয়েকজন সাংবাদিকসহ ঢাকায় ফিরে

আসার পথে নিহতদের দেখতে যান। গুলিবিদ্ধ লোক দুটি তখনো গাছের সঙ্গেই বাঁধা। তাদের ফটোসহ হত্যাকাণ্ডের খবর মর্নিং নিউজে ছাপা হয়েছিল। শ্রমিক লীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই ওই দুটি নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটে।

২৬ অক্টোবর ১৯৭৪ সালে তাজউদ্দীন সাহেব রিজাইন করেন। ওইদিন দুপুরে, আমি কাজ থেকে বাসায় এসে বিশ্রাম করে প্রেসক্লাবের দিকে রওয়ানা হই। আমি শান্তিবাগ থেকে প্রেসক্লাবে যাওয়ার পথে তাজউদ্দীন সাহেবের পিয়নের সঙ্গে দেখা হয়। পিয়ন বলে যে 'আমার স্যার আজকে রিজাইন করেছেন।' কথাটি শুনে আমি প্রেসক্লাবে না গিয়ে বিকেল চারটার দিকে, ওনার হেয়ার রোডের সরকারি বাসায় পৌঁছি। সেখানে যেয়ে দেখি তাজউদ্দীন সাহেব খুব ভালো মুডে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। ওনার পাশে রাশিয়ার সাবেক রাষ্ট্রদূত, কালিয়াকৈরের শামসুল হক সাহেব, ড. কামাল হোসেন ও আরও ক'জন বসা। কিছুক্ষণ পর ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও বাসস-এর এক সাংবাদিক আসলেন। মওদুদ আহমেদ হেসে বললেন 'তাজউদ্দীন সাহেব, চলেন আমরা একসঙ্গে ল ফার্মে ল প্র্যাকটিস করি।' সেদিন তাজউদ্দীন সাহেবের খুশিভরা চেহারা দেখে মনে হয়নি যে উনি এতবড় পদ থেকে সদ্য রিজাইন করেছেন।

(১৪ এপ্রিল, ২০১০। ওয়াশিংটন ডিসি)

কুখ্যাত চারাচালানদার ম্যানসেরু মিয়া [কোড নাম] সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য তাজউদ্দীন সাহেব চিটাগাং এ যান। তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে সঙ্গে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু আমি যেতে পারিনি, কারণ আমাকে গণপূর্তায়ন মন্ত্রী মতিউর রহমানের দুটি মিটিং কাভার করতে হয়েছিল। একই হেলিকপ্টারে তাজউদ্দীন সাহেব ও মতিউর রহমানসহ আমরা প্রথমে নোয়াখালীর রায়পুরায় যাই। আমাদেরকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে তাজউদ্দীন সাহেব চিটাগাং-এ চলে যান।*

(১৩ জুলাই, ২০১০)

---

* কাস্টমসের সহকারী কালেক্টর আব্দুল লতিফ সিকদার তাঁর নথিপত্র যুক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে তাজউদ্দীন আহমদের সরেজমিনে পরিদর্শনের ফলে চোরাচালানীর বিরুদ্ধে কেসটা গুরুত্ব পায় এবং বিশেষ তদন্তের মাধ্যমে অসাধারণ কেসের প্রেক্ষিত তৈরি করে ও পরিণতি লাভ করে। ঐ কেসে নেপথ্য ব্যক্তিবর্গ জড়িত থাকার সত্য উদ্ঘাটিত হয়। উল্লেখিত বিষয়ে ওনার বিস্তারিত বিবরণ হতে পৃ. ৪০-৪৩ সিমিন হোসেন রিমির লেখা 'আমার ছোটবেলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ' গ্রন্থে (প্রতিভাস, ২০০১, ছয় পরিশিষ্ট) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাজউদ্দীন আহমদ এবং সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের বংশাবলি ও পারিবারিক ইতিহাস

প্রথম পর্ব

১৯৮৩ সালে ছোট কাকু আফসারউদ্দীন আহমদ হাতে লেখা আমাদের পরিবারের একটি বংশাবলি আমাকে দেন। আমি সেখান থেকে কপি করে মূল কপি ছোট কাকুকে ফেরত দিই। ছোট বোন রিমিও আমাদের প্রপিতামহ ইব্রাহীম খাঁর আদি বাসস্থান ময়মনসিংহের নিগুয়ারী হতে আমাদের আত্মীয় মুজিবুর রহমান খানের (বুলবুল) সূত্র থেকে আমাদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য যোগ করে, যা আমার কপি করা বংশাবলির সাথে যোগ দিয়ে উল্লেখ করলাম। মূল বংশাবলিতে কন্যা-সন্তানদের নাম ছিল না। আব্বুর পরিবারের নিকটতম কন্যা বা মহিলাদের নাম, যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এবং চাচাতো ভাই (প্রয়াত বড় কাকা ওয়াজিউদ্দীন আহমদ খানের পুত্র দলিলউদ্দীন আহমদ) দলিল ভাই যে নামগুলো দিয়েছেন তা ওনার সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করা হলো। নিগুয়ারীর মূল বংশাবলি বিশাল। সেখান থেকে এই লেখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উল্লেখ করা হলো।

আব্বু আমাদের কাছে স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ সুদূর মঙ্গোলিয়া থেকে আমাদের দেশে আসেন। হাজার বছর ধরেই চীন, মঙ্গোলিয়া, মধ্য এশিয়া, ইরান, আরব, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে পরিব্রাজক, বণিক, রণকৌশলী যোদ্ধা, ধর্মপ্রচারক, সুফি প্রভৃতি বিভিন্ন দল ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করে। সেই হিসেবে আব্বুর বংশধরদের মধ্যে মঙ্গোলীয় থাকা অস্বাভাবিক নয়। আব্বু, তাঁর নিকটতম পরিবার ও বংশের অনেকেরই শারীরিক গঠন, রং ও চেহারার মধ্যে মঙ্গোলীয় মধ্য এশীয় ছাপ স্পষ্ট। মঙ্গোলিয়া থেকে আব্বুর বংশধরদের একজন, ফকরুদ্দীন শাহ, দিল্লিতে আসেন। (আনুমানিক ১৭০০ শতাব্দীর প্রথমার্ধে- মোঘল শাসনামলে) তিনি দিল্লির মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে প্রশাসনিক 'খান' উপাধি লাভ করেন। একপর্যায়ে তিনি আধ্যাত্মিক লাইনে চলে আসেন। আধ্যাত্মিক জীবনে পদার্পণ করার পর তিনি দিল্লির উচ্চপদ ত্যাগ করে দেশভ্রমণে বের হন। বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে নদীমাতৃক এই দেশ ও সবুজ শ্যামল প্রকৃতি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং মোমেনশাহী (ময়মনসিংহ) জেলার নিগুয়ারী গ্রামে বসতি করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের জন্য তিনি ফকির সাহেব এবং ফকির খাঁ নামেও পরিচিত হন।

ছোট কাকু ও নিগুয়ারী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের বংশাবলির তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।
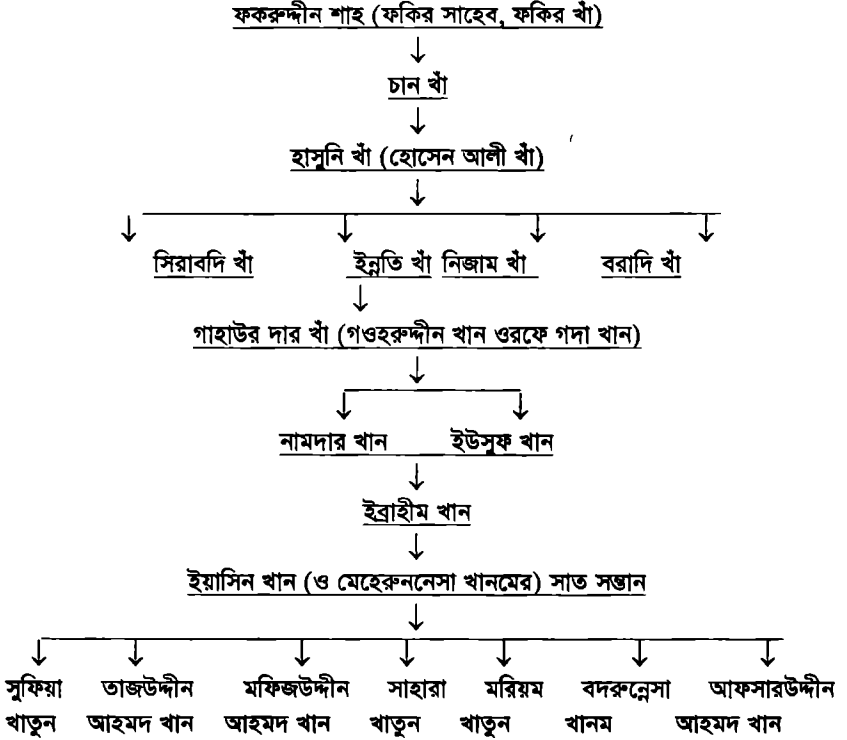
দ্বিতীয় পর্ব

১৯৮৭ সালের গ্রীষ্মকালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় গিয়ে আমি আমার মাস্টার্সের থিসিস লেখার জন্য ফিল্ড ওয়ার্ক শুরু করি; সেই সাথে জেল হত্যাকাণ্ডের ওপর তথ্য সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ। আব্বুর জন্মস্থান, আমার শৈশব ও কৈশোরের মধুর স্মৃতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত, গজারি ও শালবনে ঘেরা, শীতলক্ষ্যা নদীর কূলঘেষা দরদরিয়া গ্রাম (ঢাকা শহর থেকে প্রায় ৫০ মাইল/৮২ কিলোমিটার দূরবর্তী গাজীপুর জেলায় অবস্থিত) ভ্রমণের সময়, পূর্বোক্ত কাজের পাশাপাশি, আব্বুর জন্মস্থান, পারিবারিক ইতিহাস, তাঁর বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে তথ্য জোগাড়ের কাজও শুরু করি।

গ্রামের নাম দরদরিয়া কেন, সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত। কেউ কেউ মনে করেন যে দরদরিয়ার অর্থ হলো দরিয়ার দ্বার। গ্রামটি নদীর কূলে গড়ে উঠেছে বলে এই নামকরণ। পল্লি চিকিৎসক শাহাবুদ্দীন জানালেন যে সাহারা রানী দরদরিয়াসহ এই এলাকা শাসন করতেন বলে মৌজার নামকরণ হয় সাহাবিদ্যার কোর্ট। রানি তাঁর এলাকাকে প্রতিরক্ষা করার জন্য খাল কেটে, শীতলক্ষ্যার পাশ দিয়ে পরিখা গঠন করেন। পরিখাটি আমাদের দরবেশ ফুফুর কবরের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল। রানির দুর্গ ছিল নদীর ওপারে। রানি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মোগল সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছিলেন। ওনার মৃত্যুর বহু পরে, ওনার বাড়ির অনেক নিশানা, যেমন স্বর্ণ, আসবাব ও কাগজপত্র পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে নদীর কিনারে রানির যে টাকার কুঠি বা কোষাগার ছিল, সেটা ভেঙে একজন জেলের নৌকায় পড়ে। সেই জেলে টাকা ভরে ঘরে ফেরে। স্বপ্নে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে সে যেন এই অর্থ মানুষের কল্যাণে খরচ করে। স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ না মানায় জেলে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করে।

বর্ষায় ফুলে ওঠা ভরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আমি স্মরণ করি এক বীর নারীকে। এক ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে।

আমার গ্রামে যাবার খবর পেয়ে আমাকে দেখতে দুই বর্ষীয়ান ফুফু, সুফিয়া খাতুন ও সাহারা খাতুন, দুই-তিন মাইল পথ হেঁটে পার্শ্ববর্তী দিগধা ও বাঘিয়া গ্রাম থেকে দরদরিয়ায় এসেছিলেন। দাদার হাতে গড়া দক্ষিণমুখী বাংলো-স্টাইলের দোতলা কাঠের বাড়ির নিচতলার খাটের ওপর জড়ো হয়ে আমরা স্মরণ করি এক অসাধারণ পিতা ও তাঁর পরিবারের ইতিহাসকে।

সেকালে জন্মতারিখ-সন লিপিবদ্ধ করার রেওয়াজ না থাকায় সবার জন্মতারিখ একদম সঠিকভাবে জানা সম্ভবপর হয়নি। যদিও জন্ম বছর প্রায় সবারই কাছাকাছি অনুমান করা গিয়েছে। আব্বু ও মফিজ কাকুর মতোই প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বড় ফুফু সুফিয়া খাতুন, দাদা ও দাদির মারফত, প্রায় প্রতিটি ভাই ও বোনের জন্মের দিন, মাস, বছরের ব্যবধান স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন, যা উল্লেখ করা হলো।

বিত্তশালী ভূস্বামী দাদা' ইয়াসিন খানের ঔরসজাত ও দাদি মেহেরুননেসা খানমের গর্ভে সাত সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সবার জন্মসাল ইংরেজি সালে ধরা হয়েছে।

- আব্বুর প্রায় আড়াই বছরের বড় বোন সুফিয়া খাতুনের জন্ম বাংলা মাঘ মাসের কোনো এক শুক্রবার। ইংরেজি ১৯২৩ সাল। (বড় ফুফুর বিয়ে হয় সোমবার ২০ চৈত্র। বয়স তখন মাত্র ১৩ বছর।)
- আব্বুর জন্ম বাংলা শ্রাবণ মাসের বুধবার দিবাগত রাত, বৃহস্পতিবার ১৯২৫ সালে। (তাজউদ্দিন আহমদ খান পরবর্তী সময়ে পরিবারের মধ্যে সর্ব প্রথম খান উপাধি ত্যাগ করেন।) পশ্চিমের যে কোঠাঘরে আব্বু জন্মগ্রহণ করেন সেই আদি বসতবাড়িটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভস্মীভূত করে।
- দু'বছর পর মেজ কাকু, মফিজউদ্দীন আহমদের, জন্ম বাংলা ভাদ্র মাস। ১৯২৭ সাল। মফিজ কাকু বেশিদূর লেখাপড়া না করতে পারলেও উনার মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। আব্বুর সাথে উনার চেহারার খুব সাদৃশ্য ছিল।
- মেজ ফুফু সাহারা খাতুনের জন্ম বাংলা চৈত্র মাস। ১৯৩০ সাল।
- সেজ ফুফু মরিয়ম খাতুনের জন্ম বাংলা ভাদ্র মাস। ১৯৩২ সাল।
- ছোট ফুফু বদরুন নেসা খানমের জন্ম (মাস জানা যায়নি) ১৯৩৪ সাল।
- সর্বকনিষ্ঠ, ছোট কাকু আফসারউদ্দীন আহমদ, জন্ম ১ পৌষ। ১৯৩৭ সাল। (আরবি ১ শওয়াল, ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল ফিতরের নামাজের সময় ছোট কাকু জন্মগ্রহণ করেন।) ছোট কাকু পেশায় সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট। প্রাক্তন সাংসদ ও প্রতিমন্ত্রী।

বড় ফুফু সুফিয়া খাতুনের স্মৃতিচারণা ১০ জুলাই, ১৯৮৭

বড়ফুফু আব্বুকে বড় হয়ে উঠতে দেখেন দায়িত্বশীল, শান্ত, সংযমী, মিতভাষী ও স্নেহপরায়ণ মানুষ রূপে। তাঁর মধুর স্বভাব ও চারিত্রিক গুণাবলির কারণে তিনি ছিলেন 'সকলের নয়নের মণি'। তিনি বাল্যকাল থেকেই গাছপালার পরিচর্যা খুব পছন্দ করতেন। গরু বাছুরেরও দেখাশোনা করতেন দায়িত্ব সহকারে। আব্বুর প্রিয় মিষ্টি ছিল গুড়। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম সকলের মধ্যেই ধুতি পরার রেওয়াজ ছিল। আব্বুও বাল্য বয়সে ঘরে ধুতি পরতেন। দাদা জেনারেল শিক্ষা অপছন্দ করতেন। ওনার ইচ্ছা ছিল আব্বুকে কুরআনে হাফেজ করা। দাদার তত্ত্বাবধানে নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত মক্তবে আব্বু বাল্যবয়সেই ১১ পারা পর্যন্ত কুরআন হেফজ করেন। পরে পুরো কুরআন। শুক্রবার লুঙ্গি ও শার্ট পরে জুম্মার নামাজে যেতেন। ছেলে ধর্মীয় ও সাধারণ সব শিক্ষায় সমান পারদর্শিতা লাভ করুক, এই ছিল দাদির মনোভাব। দাদির প্রচণ্ড ইচ্ছা ও আগ্রহের কারণে আব্বু স্কুলে ভর্তি হন বাড়ি থেকে দেড়মাইল দূরে (হাফিজ ব্যাপারির বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত স্কুল) ভুলেশ্বর প্রাইমারি স্কুলে। ভুলেশ্বরে পড়াকালীন প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন প্রথম স্থান লাভ করে। পুরস্কার হিসেবে পান ৯ পয়সার কলম ও দেড় পয়সার দোয়াত। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও প্রথম হন। এবারে প্রথম পুরস্কার পান আল্লাহ্‌র ৯৯ নামের বই এবং আলীবাবা ও চল্লিশ চোরের বই। তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন কাপাসিয়া মাইনর ইংলিশ প্রাইমারি স্কুলে। হেডমাস্টার মফিজউদ্দীন। আব্বুর সব চেয়ে বড় বোন আমাদের দরবেশ ফুফুর শ্বশুর আহমদ ফকিরের বাড়ি তরগাঁওয়ে দু'বছর থেকে কাপাসিয়া প্রাইমারি স্কুলে আব্বু লেখাপড়া করেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষায় আব্বু ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের তিনজন জ্যেষ্ঠ বিপ্লবী যারা নজরবন্দী হয়ে কাপাসিয়ায় ছিলেন তাঁদের সাথে আব্বুর পরিচয় হয় বই পড়ার মাধ্যমে। আব্বুর মেধা ও জ্ঞান পিপাসা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন। তাঁরা আব্বুর

শিক্ষককে অনুরোধ করেন তাঁকে আরও ভালো স্কুলে পাঠানোর জন্য। সেই অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় আব্বু ভীর্ত হন কালীগঞ্জের নাগরীর সেন্ট নিকোলাস ইন্সটিটিউশনে। ক্লাস এইটের মাঝামাঝিতে এসে ভর্তি হন ঢাকার মুসলিম বয়েজ হাই স্কুলে এবং ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরিক্ষার আগে সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে ধানমণ্ডির বাড়ির দোতলায় নাশতার টেবিলে আব্বু স্মৃতিচারণার সময় বলেছিলেন যে ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগের দিন তিনি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বক্তৃতা শুনতে যান। পরীক্ষায় কোলকাতা বোর্ডে (সে সময় বাংলা প্রদেশে মাত্র একটাই বোর্ড ছিল) ১২তম স্থান লাভ করেন। ম্যাট্রিক পাশের পর এক বছর আব্বু লেখাপড়া করেননি ব্রিটিশ শিক্ষা বিরোধী আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে। আব্বুর এই সিদ্ধান্তে দাদি খুব মর্মাহত হয়ে আব্বুকে বকাঝকা করেছিলেন। বড় ফুফুর স্মৃতিচারণার এই জায়গায় ছোট কাকু যোগ করেন যে, আব্বুর লেখাপড়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে দাদি এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে আব্বুকে বলেছিলেন 'তাজউদ্দীন, তুই পড়বি নাকি আমি দা' দিয়ে কোপ দিয়ে নিজে মরে যাব !' আব্বু তাঁর প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন। আবার দাদির মনও রক্ষা করেছিলেন। একসময় তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে চতুর্থ স্থান লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স পাস করে এমএ ক্লাসে ভর্তি হন।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দাদা পরলোকগমন করেন। টেলিগ্রাম যখন করা হয় আব্বু তখন কোলকাতায় পার্টির মিটিঙের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে দরদরিয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। ইতোমধ্যে দাদাকে দুপুরেই দাফন করা হয়। দাদার মৃত্যুর পর আব্বু পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। জ্যৈষ্ঠভ্রাতা (প্রয়াত ১৯৪৪) ওয়াজিউদ্দীন আহমদ খানের পুত্র দলিলউদ্দীন আহমদ, সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আফসারউদ্দীন আহমদ ও ভাগ্নি আনোয়ারা খাতুন আনারকে পরবর্তী সময়ে লেখাপড়ার জন্য ঢাকা শহরে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন।

বড়ফুফু আব্বুর সাথে তাঁর একটি মধুর স্মৃতি স্মরণ করে স্মৃতিচারণা শেষ করলেন। কিশোরী বধূ বড়ফুফু শ্বশুরবাড়ি থেকে পিত্রালয়ে যখন বেড়াতে আসতেন, আব্বু তাঁর পাঠ্যপুস্তক থেকে ছড়া, গল্প ইত্যাদি আগ্রহভরে ওনাকে পড়ে শোনাতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আব্বু পড়তেন সচিত্র শিশুপাঠ। সেই বইটির একটি কবিতা আব্বুর সাথে পড়ে ফুফুও মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। আব্বু যখন সুর করে কবিতাটি পড়তেন, বড়ফুফুও যোগ দিতেন উৎসাহভরে। আমার শরীরে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে, তন্ময় হয়ে, ফুফু, আব্বুর মতোই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দিয়ে আবৃত্তি করলেন কবিতাটি :

পথের ধারে পুকুর পাড়ে ভিখারিদের মেয়ে
সারাটি দিন থাকত বসে পথের দিকে চেয়ে।
কেউ বা দিত পয়সা কড়ি
কেউ বা দিত চাল
কেউ বা কেবল দেখে যেত
কেউ বা দিত গাল।
ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেত দুষ্টু ছেলের দল
নীরবে তার গালটি দিয়ে পড়ত চোখের জল।
রাজার ছেলে সেই পথেতে যেতেন ঘোড়ায় চড়ে
একদিন তার ছুটল ঘোড়া তিনি গেলেন পড়ে।
হাঁ করে সব লোকগুলো দেখল শুধু চেয়ে
আহা বলে দৌড়ে এল ভিখারিদের মেয়ে।
কেঁদে বলে হায় কী হবে কপাল গেছে কেটে

নিজের কাপড় ছিঁড়ে মাথায় পট্টি দিল এঁটে।
আজলা ভরে পুকুর হতে জল দিল সে ঢেলে
রাজার ছেলে সুস্থ হলেন বসলেন আঁখি মেলে।
জিজ্ঞাসিলেন অবাক হয়ে চেয়ে মুখের পানে
কি নাম তোমার কাজের মেয়ে থাক বা কোনখানে।
ভয়ে ভয়ে ভিখারিণী, ভয়ে বা লাজে*
বলে আমার কেউ নেই, ভিখারিদের মেয়ে।
বাবা আমার অন্ধ হলেন মা পড়েছেন বাতে
ভিক্ষা করে যেটুকু পাই, বেঁচে আছেন তাতে।
রাজার ছেলে দিলেন খুলে রত্ন হীরার হার
ভিখারিণী বলে ঠাকুর চাই না অলঙ্কার।
গরিব আমি সোনারুপার কাজ কি বড় মোর ?
মিথ্যা লোকে বলবে মোরে চোর ॥
রাজার ছেলে গেলেন চলে দেখলেন সবাই চেয়ে
সবাই বলে আচ্ছা বোকা ভিখারিদের মেয়ে।
এখন দেখ রাজবাড়িতে রানির মত সুখে
এমন করে বেড়ায় কে গো এমন হাসি মুখে।
কাহার গুণে, প্রশংসাতে দেশ গিয়েছে ছেয়ে
আহা বলে এই কি মোদের ভিখারিদের মেয়ে !

১০ জুলাই, ১৯৮৭

ছোট কাকু সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট (প্রাক্তন সাংসদ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী) আফসারউদ্দীন আহমদের সাক্ষাৎকার

ছোট কাকু, দাদা ও দাদির কাছ থেকে শোনা, আমাদের বংশের ইতিহাস স্মরণ করেন। ছোট কাকুর দাদা, আমার প্রপিতামহ ইব্রাহীম খাঁ (বংশাবলি ও রেওয়াজ অনুযায়ী একই ব্যক্তি কখনো খাঁ বা খান হিসেবে উল্লেখ্য) ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। বলিষ্ঠ শরীরের গড়ন। টকটকে ফরসা গায়ের রং। পিতার একমাত্র পুত্র ইব্রাহীম খাঁ পৈতৃক সূত্রে অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক ছিলেন। ইব্রাহীম খাঁকে নিয়ে তার বাবা ইউসুফ খাঁ তাদের পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহের নিগুয়ারী থেকে তরগার খাঁ বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দরদরিয়া গ্রামের মধ্য দিয়ে সৈয়দ জিকির মোহাম্মদের (সাহেব আলী ব্যাপারির বাবা। নৌকার ব্যবসা ছিল বলে লোকে ব্যাপারি বলত) বাড়ির কাছাকাছি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। জিকির মোহাম্মদ ছিলেন প্রচণ্ড ডাকসাইটে ও রাগী। তিনি যখন ইব্রাহীম খাঁকে দেখলেন তখন তাদের থামিয়ে তার বাবাকে প্রস্তাব দিলেন যে 'এই ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।' প্রস্তাব শুনে পিতা ও পুত্র হতভম্ব। খাঁ পরিবার ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও মিতভাষী। তারা ভাবতেও পারেনি এমনভাবে অচেনা লোককে এক কথায় কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। ইব্রাহীমের বাবা বুদ্ধি করে বললেন যে তরগা থেকে ফেরার পথে দেখা যাবে। তরগার খাঁ বাড়ি বেড়িয়ে তারা দরদরিয়া রাস্তা বদলে তরগা থেকে সরাসরি

---

* এই লাইনটি স্পষ্ট নয়। এত বছর পরও ফুফু সুদীর্ঘ কবিতাটি প্রায় নিখুঁতভাবে মনে যে রেখেছিলেন, সেটিই বড় পাওয়া।

কাপাসিয়ার পথ দিয়ে বর্মির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জিকির মোহাম্মদ সে সময় সেই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে তাদের দেখে ফেলেন। পিতা ও পুত্র নদীর ওপার দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি নদী সাঁতরিয়ে তাদের থামালেন। ইব্রাহীম খাঁ-ই তার মেয়ের জন্য উপযুক্ত, এবং তার মেয়ের বিয়ে এই ছেলের সাথেই হবে, এই সিদ্ধান্তে অটল জিকির মোহাম্মদের মনের আশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হলো। ইব্রাহীম খাঁর বিয়ে হলো জিকির মোহাম্মদের আদরের কন্যার সাথে। ইব্রাহীম খাঁর বাবা ইউসুফ খাঁ ছেলেকে তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে নিগুয়ারীতে ফিরে গেলেন। শ্বশুর এই দরদরিয়া ও শ্রীপুরের সব তালুকদারি লিখে দিলেন ইব্রাহীম খাঁর নামে। নিগুয়ারীর অগাধ ধনসম্পত্তি যা খাঁ বাড়ির ছিল এবং একমাত্র পুত্র ইব্রাহীম খাঁর জন্য রক্ষিত ছিল তা পেছনেই রয়ে গেল। ইব্রাহীম খাঁর একমাত্র পুত্র আমার দাদা ইয়াসিন খাঁর (খান) জন্ম দক্ষিণের ঘরের সামনের উঠানে যে ঘর আগে ছিল, সেখানে।

ইয়াসিন খাঁ শৈশবেই পিতৃহারা হন। সে কালে এই গহীন গজারি, শালবন ও গড় এলাকায় বাঘের উপদ্রব হতো। পাকা বাঘশিকারি ইব্রাহীম খাঁ একদিন রানি বাড়ির দিকে বাঘ শিকারে গেলেন। বাঘকে গুলিবিদ্ধও করলেন। গুলি খেয়ে বাঘ লুকিয়ে পড়ল। পরদিন তিনি সে স্থানে গেলেন বাঘকে খুঁজতে। গুলিবিদ্ধ বাঘটি ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। অতর্কিতে ইব্রাহীম খাঁর ওপরে সে হামলা চালাল। ইব্রাহীম খাঁর হাতের গাদা বন্দুক হঠাৎ জ্যাম হয়ে যাওয়াতে গুলি বের হলো না। বাঘ এই সুযোগে তাঁর শরীরে ১৭টি মরণকামড় বসাল। ইব্রাহীম খাঁর রক্তাক্ত টুপি ছিটকে পড়ল এক পাশে। বাঘের বিষাক্ত কামড়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে সাত দিন পর আমার বড় দাদা ইব্রাহীম খাঁ ইন্তেকাল করেন।

বাঘের প্রসঙ্গ উঠতে মেজ ফুফু সাহারা খাতুন ও বড়কাকার মেয়ে রমিযা আপা আরও কিছু তথ্যের জোগান দিলেন। দাদি খুব সাহসী ছিলেন। একবার গভীর রাতে ছাগলের ঘরের দরজার নিচের মাটি খুঁড়ে এক খুদে বাঘ ছাগলের চামড়া টেনে বাইরে বের করার চেষ্টা করেছিল। বড় কাকিকে (রমিযা আপা ও দলিল ভাইয়ের আম্মা) সাথে নিয়ে দাদি ছাগলের ঘরে ঢুকে দেখেন যে, বাঘ ছাগলকে টানছে। ছাগলের পেট ছিঁড়ে ফালা ফালা। দাদির উপস্থিতি দেখে বাঘ ছাগল ছেড়ে দূরে সরে যায়। বাঘের খোঁজে দাদি বাইরে এসে দেখেন যে বাঘের নীল চোখ ঝোপের আড়াল থেকে জ্বলছে, গনগন করে।

আর একবার এক বাঘ ছাগল নিয়ে দেওয়াল টপকে পালাচ্ছিল। দাদি দরজা খুলে ভীষণ চিৎকার শুরু করেন। দাদির চিৎকারে বাঘ ছাগল ছেড়ে পালায়। আব্বু বলেন যে 'মাকে আমরা বকা দিই বেশি গলা বলে। আজ ওনার গলার জন্য ছাগল ফেরত পেলাম।' ঐ ছাগলটা তখনো মরেনি। ওকে জবাই করে সবাই খেল।

মেজ ফুফুর বয়স তখন ৮/৯ বছর। আব্বু সে সময় দরদরিয়ার বাইরে থেকে লেখাপড়া করছেন। ভরা আষাঢ়ের রাতে দরজা ভেঙে ডাকাত ঘরে ঢুকল। তারা ট্রাঙ্ক ভেঙে দাদির ও বড় কাকির গয়না নিল। দাদার মাথায় কুড়ালের কোপ দেওয়ার সময় দাদি ডাকাতের সামনে এসে কুড়াল ধরলেন। ওই কোপে দাদির হাতের মাঝখানের আঙুলের মাথা কেটে পড়ে গেল। দাদা প্রাণে রক্ষা পেলেন।

প্রতিবেশী মফিজউদ্দীন মুনশীর স্মৃতিচারণা

মফিজউদ্দীন মুনশীর বয়স ওনার হিসেবে আনুমানিক ৬৮ বছর। ওনার বাবা ফজলুর রহমান মুনশীর কাছে আমার দাদা ইয়াসিন খান আরবি ও ফারসি শিক্ষা লাভ করেন। পল্লিচিকিৎসক ডাক্তার শাহাবুদ্দীনের দাদা, সাহেব আলী ব্যাপারির বোনের সাথে ইব্রাহীম খাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তারা দক্ষিণ ও পশ্চিমের দিকে ভিটা করে বসবাস শুরু করে। বাঘ শিকারে যাবার পর

ইব্রাহীম খাঁকে বাঘ ১৭টি কামড় দেয়। সাত দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পিতৃহারা বালক ইয়াসিন খাঁর গ্রামে তখন কোনো মাদ্রাসা বা স্কুল ছিল না। ইয়াসিন খাঁ দুই মাইল দূরে বাঘিয়া গ্রামে হেঁটে যেতেন ওস্তাদের কাছে পড়তে। সেই ওস্তাদের নাম ছিল আব্দুল করিম মুনশী। প্রথম দুই স্ত্রীর মৃত্যুর পর দাদা বিয়ে করলেন একই গ্রামের ভূস্বামী পরান হাজির কন্যা ও নজিমুদ্দীনের বোন, আমার দাদি মেহেরুননেসাকে।

আব্বুর বাল্যকালে প্রতিবেশী আবু মোড়লের বাড়িতে আব্দুর রউফ নামে একজন শিক্ষক বাংলা পড়াত। 'সেই ননফর্মাল স্কুলের প্রথম ছাত্র ছিল তাজউদ্দীন। এর কিছুদিন পর সে হাফিজ ব্যাপারির বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ভুলেশ্বর প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়। সেই স্কুলে তার একজন শিক্ষকের নাম ছিল ইউসুফ আলী।' মফিজউদ্দীন মুনশী স্মৃতিচারণা শেষ করেন।

১১ জুলাই, ১৯৮৭

আব্বুর শিক্ষক, কাপাসিয়া এম. ই (মাইনর ইংলিশ) প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দীন (মফিজ মাস্টার হিসেবে পরিচিত) আহমদের স্মৃতিচারণ।

১৯৩৬ (আনুমানিক) সালে কাপাসিয়া প্রাইমারি স্কুলে তাজউদ্দীন ক্লাস থ্রিতে পড়ত। একদিন তার ক্লাসে ঢুকি। দেখি যে তাজউদ্দীন কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কাঁদছ কেন ?' সে বলল, 'absent ছিলাম, তাই স্যার মেরেছে।' সেই ক্লাসের শিক্ষক দেবেন্দ্রবাবু ছাত্রদের মারতেন। আমি কমনরুমে দেবেন্দ্রবাবুকে ডাকলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন মেরেছেন ?' উনি উত্তর দিলেন, 'বাধা (absent) করেছে, তাই মেরেছি।' আমি বললাম, 'এই সামান্য কারণে কেন মেরেছেন ?' এরপর আমি সব টিচারদের বললাম, 'আপনারা তাজউদ্দীনকে মারবেন না। সে হলো great scholar। সে হলো রত্ন। তার মাঝে আমি বিরাট ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। তাজউদ্দীন যখন ক্লাস নাইনে পড়ে, তখন আমি জোরপূর্বক ট্রান্সফার করিয়ে ঢাকা শহরে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে [তার আগে কিছুদিন মুসলিম বয়েজ স্কুলে পড়েছিলেন] ভর্তির ব্যবস্থা করি। কারণ তার মতো মেধাবী ছেলেকে পড়াবার মতো টিচার গ্রামে ছিল না। যখন তাজউদ্দীনকে সেন্ট গ্রেগরিতে পাঠালাম, তখন তোমার দাদা খুব charge করলেন ওকে একা ঢাকা শহরে পাঠাবার জন্য। আমি ওনাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম যে উনি যেন চিন্তা না করেন। (দাদা পরে সম্মতি দেন এবং আব্বুর লেখাপড়া ও লজিং এর খরচের দায়িত্ব বহন করেন।)

ঢাকা কোর্টের কাছে যে ব্রিজ ছিল তার পূর্ব দিকে সাহেব আলী ব্যাপারির (অন্য ব্যক্তি) বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে তাজউদ্দীন থাকত। গোলাম হোসেন ছিল সাহেব আলীর ভাই, সেও তাজউদ্দীনের সাথে পড়ত। ম্যাট্রিকে তাজউদ্দীন ১২তম স্থান লাভ করে। বাংলাদেশে তখন একটাই বোর্ড ছিল। তাজউদ্দীনের মতো brilliant ছাত্র আমার জীবনে আর পাইনি। সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে তখনকার পাঞ্জাবি গভর্নরের ছেলে (লাস্ট নেম ছিল চৌধুরী) তার সাথে compete করে সে ফার্স্ট হতো। সেই গভর্নরের ছেলের চারজন টিউটর ছিল এবং নিজেও ঐ স্কুলের ফার্স্ট বয় ছিল। তাজউদ্দীন আসার পর তার সাথে সে পারেনি। পরীক্ষার রেজাল্টে তাদের মধ্যে ৩০/৩৫ মার্কসের ডিফারেন্স থাকত। তাজউদ্দীনের বৃহৎ গুণ হলো যে সে সব বিষয়ে সমান ভালো ছিল।

শিক্ষকের প্রতি সম্মান

মফিজ মাস্টার সাহেব স্মৃতিচারণায় আরও বলেন যে ১৯৭১-এ যুদ্ধের সময় তিনি যখন আগরতলা ক্যাম্পে, তখন আব্বু ওনার জন্য ওজুর বদনা ও জায়নামাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। আর

একবার ঐ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি কোলকাতার মুজিবনগরে আব্বুর জন্য কুরআন শরিফ পাঠিয়েছিলেন। কুরআন পেয়ে আব্বু ওনাকে খবর পাঠিয়েছিলেন এই বলে 'মফিজ স্যারের পাঠানো কুরআন যখন হাতে পৌঁছেছে, তখন চিন্তা নেই। দেশ স্বাধীন হবেই।'

বংশাবলির নিম্নোক্ত অংশটি দলিল ভাই (প্রকৌশলী দলিলউদ্দীন আহমদ)-এর ১৪ অক্টোবর ২০০৯, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৯, ৭ জুলাই ২০১১-এর সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত।

ইয়াসিন খানের প্রথম স্ত্রীর (নাম জানা যায়নি) গর্ভে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। প্রথম কন্যার নাম গোলাবুন্নেসা (দরবেশ ফুফু)। দ্বিতীয় কন্যার নাম জানা যায়নি।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইয়াসিন খান দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর (নাম জানা যায়নি) গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

প্রথম পুত্রসন্তানের নাম ওয়াজিউদ্দীন আহমদ খান (দলিল ভাইয়ের পিতা) জন্ম ১৯১৩ বা ১৯১৪ সাল, ও কন্যার নাম সফরুন নেসা।

দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর বৈমাত্রেয় বোন (এক পিতার ঔরসজাত) পরান হাজির কন্যা মেহেরুননেসা খানমকে বিয়ে করেন।

মেহেরুননেসা খানমের গর্ভে সাত সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

প্রথম সন্তান : কন্যা —— সুফিয়া খাতুন

মাঝে এক মৃত পুত্র প্রসব করেন (রিমির তথ্য)

দ্বিতীয় সন্তান : প্রথম পুত্র – তাজউদ্দীন আহমদ খান (জন্ম : ২৩ জুলাই ১৯২৫। পরবর্তী সময়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফরম পূরণ করার সময় তিনি নামের খান অংশটি বাদ দেন)। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত খান উপাধিটি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'খান' খানবাহাদুর উপাধির সাথে সম্পৃক্ত না হলেও ধারণা করা যায় যে তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত উপাধির সাথে মিল থাকায় 'খান' উপাধি ত্যাগ করেন।

তৃতীয় সন্তান : দ্বিতীয় পুত্র – মফিজউদ্দীন আহমদ খান

চতুর্থ সন্তান : দ্বিতীয় কন্যা – সাহারা খাতুন

পঞ্চম সন্তান : তৃতীয় কন্যা – মরিয়ম খাতুন

ষষ্ঠ সন্তান : চতুর্থ কন্যা – বদরুন নেসা খানম (বুলবুল ফুফু)

সপ্তম সন্তান : কনিষ্ঠ পুত্র – আফসারউদ্দীন আহমদ খান

সর্বকনিষ্ঠ কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করার পর আতুড়ঘরেই মৃত্যুবরণ করে। সে সময় দলিল ভাই ও ছোট কাকুর বয়স সাত-আট বছর।

দলিল ভাইয়ের মা, আমাদের বড় কাকির নাম জয়নাবুন্নেসা। আমাদের সবচেয়ে বড় কাকা ওয়াজিউদ্দীন আহমদ খান। ছোট কাকুর সমবয়সী দলিল ভাইয়ের জন্ম আনুমানিক ১৯৩৭ সালে, বাংলা চৈত্র মাসে। ওনার হিসাব অনুযায়ী খুব সম্ভবত ২০ মার্চের আগে। (বাংলা মাস ইংরেজি মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে শুরু হবার কারণে বাংলা মাস শেষ হয়ে থাকে পরবর্তী ইংরেজি মাসে। দলিল ভাইয়ের জন্ম চৈত্র মাসের শুরুতে হওয়ায় উনি অনুমান করেন যে ওনার জন্ম তারিখ হবে ইংরেজি ২০ মার্চের পূর্বে, খুব সম্ভব মার্চের ১৬ তারিখে। বাংলা চৈত্র মাসের ২ তারিখে।)

ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় (দলিল ভাইয়ের চেয়ে ছয় বছরের বড়) বোনের নাম রমিযা আকতার খানম। রমিযা আপার দুই বছরের ছোট ভাইয়ের নাম মোহরউদ্দীন আহমদ খান। ওনার চার বছর পর দলিল ভাইয়ের জন্ম। দলিল ভাইয়ের এক বছরের ছোট বোনের নাম সাঈদা আকতার খানম।

দলিল ভাই খুব অল্পবয়সেই পিতৃহারা হন। ওনার বয়স যখন মাত্র ৮ বছর তখন ওনার বাবা ১৯৪৬ সালের বাংলা ভাদ্র মাসের (অগাস্ট বা সেপ্টেম্বর) কোনো একদিন আকস্মিকভাবে ইন্তে

কাল করেন। সেকালে ওনার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় না করা গেলেও ধারণা করা যায়, হয়তো 'food poisoning' বা খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে উনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগের দিন তিনি চাষিদের (মৌসুমের ফসল কাটার জন্য সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত) বানানো নানা রকম পিঠা ও খাবার খান। রাতে প্রচণ্ড পেটব্যথা শুরু হয় কিন্তু বমি বা বাথরুম কিছুই হয় না। পরদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দাদা মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। দলিল ভাইয়ের বড় ভাই ক্লাস এইটের ছাত্র, মোহরউদ্দীন টাইফয়েড জ্বরে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪৮ সালে। পিতৃহারা দলিল ভাই গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে প্রথম আসেন মফিজ কাকুর সাথে ১৯৫০ সালে। বনবিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আব্বু অভিযোগ করায় বনবিভাগ আব্বুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। সেই মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই দলিল ভাইকে সাথে নিয়ে মফিজ কাকু ঢাকায় আসেন। সাক্ষাৎকারের এই অংশে দলিল ভাই ওনার ঢাকা শহরে প্রথম আগমনকে কেন্দ্র করে একটি মজার ঘটনা বললেন। ঢাকা শহরে উনি মফিজ কাকুর সাথে সদরঘাট ঘুরলেন, ঘোড়ার গাড়িতে করে যাত্রীদের যাতায়াত দেখলেন (মোটরগাড়ি ওনার চোখে পড়েনি) এবং রাতে মজা করে মফিজ কাকুর সাথে সিনেমা দেখলেন। হল থেকে বেরুতে বেরুতে অনেক রাত। উনি বললেন 'ভয়ে আমরা বাসায় ঢুকি না। অনেক রাত, যদি বড় কাকু বকা দেয়। আমরা তখন একটি মসজিদে ঢুকলাম। মফিজ কাকু নামাজ পড়লেন। আমরা সেই মসজিদেই ঘুমালাম। রাতে ভূমিকম্প হলো। সকালে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে দেখি সুইপাররা রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে। একটু পরে দেখি পানি দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। গ্রামে ফেরত যাবার পর সকলে জিজ্ঞেস করল 'ঢাকা শহরে কী দেখলে ?' আমি বললাম যে, রাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ঢাকা শহরের বিল্ডিংয়ের সব ময়লা মাটিতে ফেলা হয়। তারপর সেই ময়লা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। ভূমিকম্পকে তিনি ভেবেছিলেন ঢাকা শহরের ময়লা পরিষ্কারের অভিনব এক পন্থা। ১৯৫১ ও '৫২ সাল থেকে দলিল ভাই অনেকবার ঢাকা শহরে আসেন।

ছোট কাকু আফসারউদ্দীন আহমদসহ আব্বুর সাথে পুরাতন ঢাকার ১৭ কারকুন বাড়ি লেনে বসবাস শুরু করেন ১৯৫৬ সাল থেকে। পিতৃহারা বালিকা ফুফাতো বোন আনার আপা (আনোয়ারা খাতুন) ওনাদের সাথে বড় মামার গৃহে বসবাস শুরু করেন ১৯৫৭ সাল থেকে। রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার কারণে ঢাকা কলেজের ক্লাসগুলোতে আব্বু নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারেননি। ঢাকা কলেজ যেহেতু সরকারি কলেজ ছিল এবং অন্যান্য সরকারি কলেজের মতোই, উপস্থিতির ব্যাপারে এই কলেজের নিয়মকানুন ছিল কড়া, সেহেতু এই কলেজ থেকে আব্বু ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে পারেননি। তিনি বেসরকারি সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে ১৯৪৮ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বোর্ডে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। মাঝে আব্বু কিছুদিন জগন্নাথ কলেজে পড়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে আব্বু অর্থনীতিতে অনার্স সহকারে বিএ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। যুক্তফ্রন্ট ইলেকশন ঐ বছরেই ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। আব্বু শুনেছিলেন যে বিএ পাস ব্যতীত ইলেকশনে হয়তো নমিনেশন দেওয়া হবে না। এ কারণেই তাড়াহুড়া করে বিএ পরীক্ষা দেন ও বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যুক্তফ্রন্টের ইলেকশনে জেতার পর ফজলুল হক হলের ছাত্ররা ওনাকে বিশাল সংবর্ধনা দেয়। হলের ভেতরের দিকে এক সুন্দর বাগান ছিল, সেখানেই তারা তাকে মাথায় তুলে আনন্দ প্রকাশ করে।

বিএ পাস করার পর আব্বু এলএলবি (ব্যাচেলার অব ল') পড়ার জন্য আইন বিভাগে ভর্তি হন। আব্বুর নির্দেশ অনুসারে দলিল ভাই আব্বুর একটা চিঠি ফজলুল হক হলের প্রভোস্টের কাছে পৌঁছান। ঐ চিঠি পেয়ে প্রভোস্ট দলিল ভাইয়ের কাছে ল' কলেজে ভর্তির জন্য রেফারেন্স ও রেসিডেন্স সার্টিফিকেট দেন। আব্বু পূর্ণ উদ্যমে আইন অধ্যয়ন শুরু করেন। দলিল ভাইয়ের ভাষায়, 'ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ল' ফ্যাকাল্টি

ছিল। সেখানে বড় কাকা ক্লাসে যেতেন। আমি একদিন '৫৬ সালে ওনার সাথে ক্লাসে যাই। জেল থেকে উনি ল' পরীক্ষা দেন। কাকি (আম্মা) বই জোগাড় করেন। আমি বইগুলো নিয়ে লালবাগ এসবি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) অফিস থেকে সেন্সর পাস করিয়ে আনি। সিএসপি হাফিজউদ্দীন সাহেবের ছোট ভাই মহিউদ্দীন সাহেবও সিএসপি ছিলেন এবং লালবাগ এসবি অফিসে পোস্টিং পেয়ে সেখানে কর্মরত ছিলেন। উনিই সেন্সর পাসের ব্যবস্থা করেন। বইগুলো যে নিতান্তই আইনের বই এবং আপত্তিকর নয় সে জন্যই জেলের ভেতর পাঠাবার আগে সেন্সর পাসের নিয়ম ছিল। ১৯৬২ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ডেপুটি জেলার ছিলেন খুব সম্ভবত শাহাবুদ্দীন সাহেব। সে সময় আজম খান ছিলেন ঢাকার গভর্নর। অবাঙালি হলেও বাঙালিদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। কাকা জেল থেকে ল' পরীক্ষা দেন ১৯৬৪ সালে। জেল থেকে বের হবার পর ল'র রেজাল্ট বের হয়। বড় কাকাকে প্রায়ই জেলে যেতে হতো। ১৯৬২ সালে হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য বড় কাকাকে আইয়ুব খান সরকার জেলে ঢোকায়। এই শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে আইয়ুব খান বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চেয়েছিল। প্রায় ১০ হাজার লোকের সাথে এই শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আমি তেজগাঁ থেকে প্রসেশনে যোগ দিই। ঐ বছরেই ১ রমজানে আন্দোলনরত কয়েক হাজার লোকের সাথে বন্দী হই। আমাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী করে রাখা হয়। এই শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আসলে ছিল স্বৈরাচারী (ফিল্ড মার্শাল) আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন। বড় কাকা ও অন্য নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন অর্গানাইজ করেন। ১৯৬৪ সালে রাজনৈতিক আন্দোলন যখন দানা বাঁধল তখন সরকারের লেজুড় মুসলিম লীগের মাধ্যমে অবাঙালি বিহারি সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে আইয়ুব খান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগায়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবেই পাকিস্তান সরকার বিহারিদের পূর্ব পাকিস্তানে ঠাঁই দেয়। উদ্দেশ্য ছিল বিহারিদের ব্যবহার করে হিন্দু ও মুসলিম বিদ্বেষকে জিইয়ে রাখা এবং বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা। তাদের উসকিয়ে দেওয়া হয় বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্তিমিত ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ১৯৬৪ সালের ১৪ জানুয়ারি বিশিষ্ট সমাজকর্মী ড. আমির হোসেন চৌধুরীকে সকাল ১০টার দিকে বিহারিরা নবাবপুর রেল লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। উনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য ও হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া লাল হেডিংয়ে ইত্তেফাক পত্রিকায় লিখলেন 'বাঙালি রুখিয়া দাঁড়াও'। বাঙালিরা যখন বুঝতে পারল এবং বিহারিদের পাল্টা আক্রমণ করল তখন সাথে সাথেই কারফিউ জারি হয়ে যায়।

১৪ জানুয়ারি ড. আমির হোসেনকে হত্যার দিনে তেজগাঁ পলিটেকনিকে আমার ফাইনাল পরীক্ষার শেষ দিন ছিল। আমাদের পরীক্ষা শুরু হয় ২ জানুয়ারি থেকে। আমরা যখন পরীক্ষা দিচ্ছি তখন শেখ সাহেব কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। শেখ সাহেব পরীক্ষার হলে একজনের মারফত চিরকুট পাঠালেন। ওনার চিরকুটে আমাদের জন্য নারায়ণগঞ্জে যাবার নির্দেশ ছিল। দাঙ্গা দমন করে শান্তি রক্ষার নির্দেশ দিয়ে তিনি মুন্সিগঞ্জের এমপি বাদশা মিয়াকে একটি চিঠি ও আমাদের জন্য কারফিউ পাস পাঠিয়েছিলেন। আমাদের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইলেক্ট্রনিকস শাখার ফার্স্ট বয় আনিস ও আমি তাড়াহুড়া করে কোনোমতে পরীক্ষা দিয়ে শেখ সাহেবের চিঠি নিয়ে নারায়ণগঞ্জে বাদশা মিয়ার কাছে পৌছে দিই। শেখ সাহেব, বড় কাকু ও নেতৃবৃন্দ দাঙ্গা প্রতিরোধ ও শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার পরও পাকিস্তান সরকার মিথ্যা অভিযোগ (Press and Publication Ordinance এবং পাকিস্তানের দণ্ডবিধির বিভিন্ন

ধারায় তথাকথিত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে সরকার মামলা দায়ের করে) এনে ওনাদের গ্রেপ্তার করে। ওনারা পরে জামিনে মুক্তি পান। কাকু রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার পরও লেখাপড়ার দিকটা ঠিক রেখেছিলেন। মনে আছে, কাকুর সাথে একদিন হেঁটে হেঁটে কারকুন বাড়ি থেকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দক্ষিণ দিকে ল' কলেজে যাই ওনার ফজলুল হক হলের রেসিডেন্স সার্টিফিকেট তুলতে। কারকুন বাড়ি থেকে ল' কলেজ ৩ মাইলের পথ। রিকশায় গেলে ভাড়া তিন বা চার আনা, কিন্তু কাকু সেটিও খরচ করবেন না। বলতেন, হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। উনি অপচয় করতেন না। আবার গরিব-দুঃখীদের জন্য অকাতরে খরচ করাতেও ওনার কোনো কার্পণ্য ছিল না।

কাকুর বিয়ের আগে আমি একই সঙ্গে সংসার চালাতাম ও কলেজেও পড়তাম। উনি MLA (Member of Legislative Assembly – প্রাদেশিক সদস্য) হিসেবে ২০০ টাকা ভাতা পেতেন। তার থেকে ৬০ টাকা চলে যেত বাসা ভাড়াতে। উনি নিজের জন্য ১০/২০ টাকা রেখে বাকি টাকা আমার হাতে তুলে দিতেন। আমি হাটবাজার ও গোটা সংসারের তদারক করতাম। রান্নাবান্না করত গোসিঙ্গার আবুল হাশেম। কাকু চ্যাপা শুঁটকি দারুণ পছন্দ করতেন। শুঁটকি যেদিন রাঁধা হতো সেদিন ভাত short পড়ত। কাকু গুঁড়ামাছও খুব পছন্দ করতেন। মেহমান এলে আবুল হাশেম দই আনত বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে। সেখান থেকে দই কেনার আগে আরও অনেক দোকানে দই চেখে যখন তার পেট ভরত তখন সে যেত বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। এ নিয়ে আমরা খুব হাসতাম। এভাবেই আমাদের সংসার জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। কাকু যখন বিয়ে করলেন তখন কাকির হাতে সংসার তুলে দিয়ে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কাকি দারুণ মজার রান্না করতেন। পুরান ঢাকার লালবাগে কাকি আমাকে মাঝে মাঝে পাঠাতেন বাকরখানি নিয়ে আসতে।

সেই দিনগুলোর স্মৃতি কখনোই ভুলতে পারিনি।

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের বংশাবলি ও পারিবারিক ইতিহাস

আম্মার পিতৃকুল সম্বন্ধে তথ্য নানা বেঁচে থাকতে ওনার কাছ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করি। নানার সব ভাইয়ের ও একমাত্র বোনের পুরা নাম ও বাড়ির ঠিকানা নানার কনিষ্ঠ ভাইয়ের পুত্র সৈয়দ আনওয়ার হোসেনের কাছ থেকে সংগ্রহ করি। নানার পুরা নাম সৈয়দ সেরাজুল হক। জন্ম ইংরেজি ১৮৯৩ সাল, বাংলার বৈশাখ (মে-জুন) মাসে। জন্মস্থান : কুমিল্লা (বর্তমান চাঁদপুর)। ঠিকানা : সৈয়দ বাড়ি; গ্রাম : আজাগড়া; পোস্ট অফিস : ওয়ারুক; থানা : হাজীগঞ্জ (বর্তমান : শাহারাস্তি)।

নানা কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে স্বর্ণপদকসহ আরবিতে বিএ অনার্স পাস করেন। জ্ঞানের সাধক নানা ইংরেজি ও ফারসি ভাষা এবং সাহিত্যেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বিএ পাস করার পর তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ক্লাসে ভর্তি হন এবং কিছুদিন ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তী সময়ে ঢাকা কলেজ থেকে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

নানার সবচাইতে বড় ভাইয়ের নাম সৈয়দ আবদুল হক। খুব সম্ভবত ওনার পরেই এক বোন জন্মগ্রহণ করেন। নাম সৈয়দা রাবেয়া খাতুন। উনি অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন এবং তরুণ বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। নানা তৃতীয় সন্তান, ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। তৃতীয় ভাই সৈয়দ ফজলুল হক। চতুর্থ ভাই সৈয়দ তাহেরুল হক। পঞ্চম ভাই সৈয়দ শামসুল হক (শামু), এবং ষষ্ঠ ভাই সৈয়দ মাহফুজুল হক (মাফু)। আমাদের শামু নানা সৈয়দ শামসুল হক ওনার এলাকায় ব্রিটিশবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের একজন অগ্রণী নেতা ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী তৎপরতার জন্য তাঁকে বহুদিন পলাতক জীবন যাপন করতে হয়। যত দূর মনে পড়ে, ওনার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৭০ সালে। উনি নানাকে দেখতে আমাদের সাতমসজিদ রোডের বাসায় এসেছিলেন। নানার মতোই উনি ৬ফিট লম্বা ছিলেন। ওনার মেদহীন পেটানো শরীর, বাবরি চুল, ও তারুণ্যের দীপ্তিময় চোখ দেখে মনেই হতো না উনি একজন বর্ষীয়ান মানুষ।

আমার প্রপিতামহ, নানার পিতার নাম সৈয়দ মওলানা আব্দুল মজিদ। ওনার ভাইয়ের নাম হাফেজ সৈয়দ মহম্মদ।

ওনাদের পিতার নাম : হাজি সৈয়দ মওলানা জালালউদ্দীন।

প্রপিতামহ : হাজি সৈয়দ মওলানা ফোরকান।

প্র-প্রপিতামহ : হাজি সৈয়দ মওলানা আব্দুল করিম। উনি তৎকালীন কুমিল্লা জেলার ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে চালের একটি দানার মধ্যে তিনি সুরা ইখলাসের আয়াত লিখতে পারতেন। মওলানা আব্দুল করিমের (ওনার পিতা ও পিতামহর নাম জানা যায়নি), প্রপিতামহের

নাম মওলানা হাজি সৈয়দ আহমেদ তানুরী। ওনার জন্ম ও আদি বাসস্থান বাগদাদে। হজরত বড় পীর সাহেব, সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানীর (রহ.) বংশধর।

নানার কাছ থেকে উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর বাকি তথ্য ছোট মামা সৈয়দ গোলাম মওলার কাছ থেকে সংগ্রহ করি। ওনার পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের কাটিং উনি ফাইল করে রেখেছিলেন। সেখান থেকে আমি হাতে কপি করি। ছোট মামার সূত্রমতে নোয়াখালির কাঞ্চনপুরে ওনাদের পূর্বপুরুষ সুফি সাধক সৈয়দ আহমেদ তানুরীর মাজার রয়েছে। উনি দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র আমলে ইরাক থেকে ভারত উপমহাদেশে আসেন। সাধারণের মধ্যে তিনি মীরান শাহ্ নামে পরিচিত ছিলেন। ইত্তেফাক পত্রিকার খবরে (তারিখবিহীন) প্রকাশিত হয়েছিল যে নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চনপুরের মাজার শরিফে হজরত শাহ সৈয়দ আহমদ তনুরীর (সামান্য ভিন্ন বানান) এবং তদীয় ভগ্নি সৈয়দা সালেহা মঞ্জুমা খাতুনের ওরশ মোবারক আগামী ১১ অগ্রহায়ণে অনুষ্ঠিত হবে।

আম্মার মাতৃকুল সম্বন্ধে প্রায় সব তথ্য ও ইতিহাস আম্মার মামাতো বোন সৈয়দা রোকেয়া বেগমের কাছ থেকে সংগ্রহ করি আশির দশকের প্রথমার্ধে। পরবর্তী সময়ে আম্মা ও পরিবারের অন্যান্যরা আরও কিছু তথ্য যোগ করেন।

আম্মার মামাতো ভাই সৈয়দ আবু তাহেরের পুত্র সৈয়দ মাসহুদ বাদশাহ, ও মামাতো বোন সৈয়দা রোকেয়া বেগমের পুত্র সৈয়দ আবু সালেহ মহম্মদ মুজতবা (রনি), আম্মার খালাতো বোন মোসাম্মাৎ তালে আফরোজের (পেয়ারা) পুত্র কাজী ওবায়দুল কবীর (মঞ্জু), আমার ছোট বোন সিমিন হোসেন রিমি এবং ছোট মামা সৈয়দ গোলাম মাওলার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যা রোকসানা ওয়াদুদ (মুন্নী) ও সৈয়দা রেজওয়ানা হকের (সীমা) কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

আমার নানি সৈয়দা ফাতেমা খাতুন ছিলেন পিতামাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। জন্ম ১৯০৪। (পরিবারের ইতিহাস লেখার সময় যাদের জন্মসাল জানা গিয়েছে বা কাছাকাছি অনুমান করা গিয়েছে শুধু তাঁদেরটাই তাঁদের নামের পর উল্লেখ করা হলো।) জন্মস্থান : ফুলবাড়ি, দিনাজপুর। নানির পিতা সৈয়দ গোলাম মোস্তফার জন্ম আনুমানিক ১৮৬২ সালে, হুগলির ইমামবাড়ার জমিদার পরিবারে। তিনি ছিলেন সে যুগের প্রথম বাঙালি মুসলিম MBBS ডাক্তারদের একজন। কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি ডাক্তারি পাস করেন। এই উপমহাদেশে সেকালে হাতেগোনা যে কজন ডাক্তার সার্জারিতে স্পেশালিস্ট ছিলেন তিনি তার মধ্যে একজন। শুধু চিকিৎসক হিসেবেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না, শিক্ষানুরাগী ও দানশীল হিসেবেও তিনি জনসমাজের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেন। উনি ২০০ বিঘার ওপরে জমি স্কুলের জন্য দান করেন। দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত এস. জি. মোস্তফা স্কুল (১৯২০) এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

ওনার ছোট আরও দুই ভাই ছিলেন। মধ্যম ভাই লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি (Bar-at-Law) ডিগ্রি অর্জন করে রংপুরের মুন্সি পাড়ায় স্থায়ী হন। কনিষ্ঠ ভাই ব্যারিস্টার হয়ে লন্ডনে স্থায়ী হন, দেশে আর ফেরেননি। সৈয়দ গোলাম মোস্তফার প্রথম বিয়ে হয় রংপুরে কামারকাছনার জমিদার কন্যার সাথে। বিয়ের পর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। কন্যার নাম ছিল সৈয়দা খাতুন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা বদরুননেসাকে।

এই ঘরে তাঁদের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, নাম সৈয়দ আবদুর রব (১৮৯০)

দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আব্দুর রউফ (১৮৯১)

তৃতীয় পুত্র সৈয়দ আব্দুল লতিফ

চতুর্থ পুত্র সৈয়দ আব্দুল সামাদ

পঞ্চম পুত্র সৈয়দ আব্দুল কাশেম

ষষ্ঠ সন্তান কন্যা সৈয়দা রাবেয়া খাতুন (১৯০২)

সপ্তম ও কনিষ্ঠ কন্যা সৈয়দা ফাতেমা খাতুন (১৯০৪)

আমার নানি ছিলেন সকলের নয়নের মণি। সবচেয়ে ছোট বলে বাবা, মা, বড় ভাই ও বোনেরা অত্যন্ত আদর ও আহ্লাদ করতেন। আদর করে সকলে তাকে ফাতু বলে ডাকতেন। ওনার বড় দুই ভাই সৈয়দ আব্দুর রব ও রউফ পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায় দুই বোনকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর আব্দুর রব সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে বিহারে চলে যান। বহু যুগ পর তিনি সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জীবনের শেষ সাত বছর নানির কাছে অবস্থান করেন। ওনার ঘরে ফিরে আসার নেপথ্য কাহিনি হলো যে তিনি ৩৭ বছর স্রষ্টার উপাসনা ও ধ্যানে মগ্ন থাকার পর গায়েবি আওয়াজ আসে, 'তুমি পেছনে কী ফেলে এসেছ ?' উনি স্ত্রী ও মা'কে পেছনে ফেলে এসেছিলেন। গায়েবি প্রশ্নটির কারণে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রবাদ আছে যে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রবাদগুলো এমন তিনি বাঘের পিঠে করে ফুলবাড়িতে ফিরে আসেন। ঝড় তুফানের সময় নদীর ওপর জায়নামাজ বিছিয়ে মানুষজনের পারাপারের ব্যবস্থা করেন। নানি ওনার আরও কিছু অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেন কিন্তু উনি কারো কাছে বলতে মানা করায় উনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত নানি কারো কাছে প্রকাশ করেননি। আব্দুর রব প্রয়োজন না হলে কথা বলতেন না। অধিকাংশ সময় ইশারায় ভাবের আদান-প্রদান করতেন। নানির হাতের সুজির হালুয়া ও চা ওনার প্রিয় খাবার ছিল।

নানির দ্বিতীয় ভাইয়ের নাম সৈয়দ আব্দুর রউফ। ওনার পুত্রের নাম সৈয়দ আবু তাহের (১৯১৫)। পুত্রবধূ (পঞ্চম ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা) সৈয়দা জাহানারা বেগম।

তৃতীয় ভাই সৈয়দ আব্দুল লতিফের একমাত্র পুত্রের নাম সৈয়দ আব্দুল মোত্তালিব। পুত্রবধূ সৈয়দা রোকেয়া বেগম (পঞ্চম ভাইয়ের তৃতীয় কন্যা)। আব্দুল মোত্তালিব শিশু অবস্থায় মাতৃহারা হন। আমার নানি ওনাকে স্তন্য পান করান এবং নিজ সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করেন। আব্দুল মোত্তালিব কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তিনি District Controller of Food পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।

নানির চতুর্থ ভাইয়ের নাম সৈয়দ আব্দুস সামাদ। উনি দিনাজপুরে বিয়ে করেন। ওনার একমাত্র পুত্রের নাম সৈয়দ শাহ আলম।

পঞ্চম ভাই সৈয়দ আব্দুল কাশেম বিয়ে করেন গাইবান্ধার মেয়ে আকলিমা খাতুনকে। ঐ ঘরে ছয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সৈয়দ আবু তালেব (জন্ম : ১৯১৭)

দ্বিতীয় সন্তান জ্যেষ্ঠ কন্যা সৈয়দা জাহানারা বেগম (জন্ম : ১৯১৯)

তৃতীয় সন্তান মেজ কন্যা সৈয়দা হোসনে আরা বেগম (জন্ম : ১৯২২)

চতুর্থ সন্তান তৃতীয় কন্যা সৈয়দা রোকেয়া বেগম (জন্ম : ১৯২৬)

পঞ্চম সন্তান চতুর্থ কন্যা সৈয়দা দেলওয়ারা বেগম (জন্ম : ১৯৩৬)

ষষ্ঠ সন্তান কনিষ্ঠ কন্যা সৈয়দা রওশন আরা বেগম (রুশু) (জন্ম : ১৯৩৮)

প্রথম [illegible] আবুল কাশেম দ্বিতীয় বিয়ে করেন বারকনা ফুলবাড়ি, দিনাজপুরে। স্ত্রীর নাম [illegible]ন। এই ঘরে তিন সন্তান জন্মগ্রহণ করে :

পুত্র সৈয়দ গিয়াসুদ্দীন আবু কালাম (বাবু)

সৈয়দ জালালউদ্দীন আবু জামাল (সেলিম)

ও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান কন্যা সৈয়দা আঞ্জুমান আরা (রেবা)।

নানির বড় বোন সৈয়দা রাবেয়া খাতুনের বিয়ে হয় বগুড়ায় মুন্সেফ সৈয়দ আব্দুল লতিফের সাথে।

ওনাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সৈয়দ আব্দুল মোজাফ্ফর;

দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক;

ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যা সৈয়দা মোসাম্মাৎ তালে আফরোজ (পেয়ারা ১৯১৮)। ওনার স্বামীর নাম কাজী মজিদুন নবী (১৯১০)।

নানি সৈয়দা ফাতেমা খাতুন ও নানা সৈয়দ সেরাজুল হকের পাঁচ সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া (২০ এপ্রিল ১৯২০)। উনি ব্রিটিশ সরকারের Kings Commission থেকে Captain পদ লাভ করেন। কবি, লেখক ও নাট্যকার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রাম বেতারে উনি ছোটদের আসর পরিচালনা করতেন এবং বেতারে শিল্পকলা ও সাহিত্য আসরেও যোগ দিতেন।

দ্বিতীয় সন্তান জ্যেষ্ঠ কন্যা সৈয়দা হাসিনা খাতুন, গৃহবধূ (১৯২২)।

তৃতীয় সন্তান দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ গোলাম মর্তুজা (১৯২৪)। ব্যবসায়ী। ইনিও সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন ও নিভৃতে কাব্যচর্চা করতেন।

চতুর্থ সন্তান তৃতীয় পুত্র সৈয়দ গোলাম মাওলা (১ অক্টোবর ১৯২৯)। ব্যবসায়ী। সাহিত্য অনুরাগী এবং চিত্রাঙ্কনে পটু ছিলেন। ছোট মামা সৈয়দ গোলাম মাওলার সাথে ছোট মামি (বরিশালের উলানিয়া জমিদার পরিবারের কন্যা) সৈয়দা কামরুন নেসার বিয়ে হয় ১৯৫৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। বিয়ের সময় ছোট মামুর বয়স ২৪ বছর এবং সদ্য চাকরিতে যোগ দিয়েছেন।

পঞ্চম সন্তান, সর্বকনিষ্ঠ কন্যা আমার আম্মা সৈয়দা জোহরা খাতুন (২৪ ডিসেম্বর ১৯৩২, জন্মস্থান : পুরাতন ঢাকা)। মহিলা পরিষদের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট, জাতীয় নেতৃত্বের চরম সংকটের সময় তিনি আহ্বায়িকা (এপ্রিল, ১৯৭৭) হিসেবে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন এবং এই দলকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য।

আব্বু ও আম্মার বিয়ে

১৯৯২ সালে আম্মা যখন যুক্তরাষ্ট্রে আমার কাছে বেড়াতে আসেন তখন আমি আম্মার সাক্ষাৎকারের (১০ নভেম্বর ১৯৯২ বেলা ৩-৩০ ঘটিকা) মাধ্যমে আব্বু-আম্মার বিয়ের কাহিনি লিপিবদ্ধ করি।

এই লেখাতে প্রায় দুই যুগ আগে লিপিবদ্ধ করা আম্মার বিশদ সাক্ষাৎকার থেকে আব্বু ও আম্মার প্রথম পরিচয়ের দিন এবং বিয়ের দিনটি সম্পর্কে কিছু তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলো। আমার জন্ম হবার দিনটি ঘিরে আম্মা যে স্মৃতিচারণা করেছিলেন তা-ও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

আম্মার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অনু খালা ও ওনার স্বামী ইসলাম সাহেব ছিলেন আব্বু ও আম্মার বিয়ের ঘটক। ১১ এপ্রিল অনু খালা আম্মার একটি খোঁপা করা সাইড থেকে তোলা ছবি আব্বুকে

দেখিয়েছিলেন। আম্মার সাথে আব্বুর প্রথম দেখা ১৯৫৯ সালের ১৪ এপ্রিল। ১ বৈশাখ, বাংলার নববর্ষের দিনটিতে। সাক্ষাতের স্থান, বংশালে অনু খালা ও ইসলাম সাহেবের বাসায়। আম্মা যখন ঐ বাড়িতে প্রবেশ করেন, আব্বু তখন বাইরের উঠানে চেয়ারে বসে ইসলাম সাহেবের সাথে টেবিলে রাখা ভাত ও গুঁড়ামাছের চচ্চড়ি খাচ্ছিলেন। আব্বুর পরনে ছিল হাওয়াই শার্ট। আম্মা হাতে কাজ করা একটি থ্রিকোয়ার্টার ব্লাউজের সাথে সাদা সুতির শাড়ি পরেছিলেন।

আব্বু ও আম্মার যখন বিয়ের কথা চলছে তখন বড় মামু আব্বুর গ্রামের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে আব্বুর সম্বন্ধে খোঁজ করেন। সেই ব্যক্তি আব্বুর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরে জানা যায় যে সেই ব্যক্তি ছিলেন আব্বুর বিরোধী দলের। আব্বুর সাথে তাঁর সম্পর্কও ভালো ছিল না। তা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিরোধকে পাশে হটিয়ে আব্বু সম্বন্ধে সত্য বলতে দ্বিধা করেননি।

২৬ এপ্রিল, রোববার, রাত ৮টায় আব্বু ও আম্মার বিয়ে পড়ানো হয়। আম্মার ইচ্ছা অনুযায়ী আম্মার জন্য একরাশ বেলী ফুলের গয়না আব্বু বিয়ের দিন এনেছিলেন। সেই বেলী ফুলের গয়না পরেই আম্মার বিয়ে হয়। বিয়ের আগে আম্মা আব্বুকে বলেছিলেন, 'আমার সোনার গয়নার দরকার নেই। আমি বেলী ফুল ভালোবাসি। তা দিয়েই আমার বিয়ে হোক।'

সমাজের কিছু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রীতি ও সংস্কারকে ওনারা সেদিন চূর্ণ করে দেন, হৃদয়ের মিলনকে প্রাধান্য দিয়ে।

বিয়ের স্থান : কাজি বাড়ি, মগবাজার। ১৯৫৬ সালে ঢাকা কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর নানা পরিবারসহ মগবাজার বিলের উল্টো দিকের বিশাল গাছপালায় ছাওয়া এই বাড়িটি ভাড়া করেন। খালাতো ভাই সাঈদ ভাই এই বাড়ির নতুন নামকরণ করেন 'স্বপ্নদ্বীপ।' এই বাড়িতেই আমার জন্ম।

মেহমান : ৫০-৬০ জন। অধিকাংশই আত্মীয়স্বজন। আব্বুর সাথে এসেছিলেন ছোট কাকু, দলিল ভাই ও আনার আপা।

আব্বুর বন্ধুদের মধ্যে ডাক্তার করিম কাকু বরযাত্রী হয়ে এসেছিলেন। বিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঠিক হওয়ায় বেশি মানুষকে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিয়ের খাবার : খাসির বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট, কাবাব ও মিষ্টি। নানি যেমন রান্নায় পারদর্শী ছিলেন, নানাও কোনো অংশে কম ছিলেন না। বিয়ের খাবার রাঁধা হয়েছিল নানার রেসিপি অনুযায়ী ও নানার তত্ত্বাবধানে।

২৮ জুলাই ২০১১ : আমার জন্মদিনটির স্মৃতিচারণা

আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আম্মাকে টেলিফোন করি। আম্মা বললেন, 'এই ক'দিনের মধ্যেই রোজার মাস শুরু হবে। তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। তোমার জন্ম হয়েছিল ১ রোজার দিন। তুমি জন্মাবার পর তোমাকে দেখে তোমার আব্বুর সে কী আনন্দ ! আঁতুড়ঘরে তোমাকে নিয়ে সারারাত কাটালেন।' নানা-নানির ইচ্ছা ছিল যে ওনাদের বাড়িতে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমি জন্মাবার ৫/৬ দিন আগে আম্মা কারকুন বাড়ি লেন থেকে মগবাজারে নানা-নানির কাছে চলে যান। কাজের পর আব্বু প্রতিদিন আম্মাকে দেখতে মগবাজারে চলে আসতেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আম্মাকে দেখতে এসে আব্বু সে রাতে থেকে গেলেন।

ডা. খোদেজা সরকারের তত্ত্বাবধানে পরদিন ১ রমজান ২৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) সোমবার ভোর ৬টায় আমি ভূমিষ্ঠ হই। সপ্তাহ খানেক পর নবজাতককে নিয়ে আম্মা কারকুন বাড়ি লেনে ফিরে আসেন। আম্মা যেন সেই সময়ে ফিরে গিয়েছেন এমনি এক আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেন, 'তোমার আব্বু সাইকেলে বেঁধে একটি সাদা দোলনা তোমার জন্য নিয়ে এসেছিল। তোমার জন্য সেই সাদা দোলনা কিনে তোমার আব্বুর খুব গর্ব। আমি ঠাট্টা করে বলতাম, ভারি তো এক দোলনা এনেছ মেয়ের জন্য, তাই নিয়ে এত ! আমার ঠাট্টা শুনে তোমার আব্বু খুব অভিমান করলেন। সেই দোলনায় তুমি শুতে আমরা দুজনে দোলা দিতাম। তোমার মুখে যখন একটি দুটি বুলি ফুটছে তোমার আব্বুর সে কী আনন্দ !'

শান্তির সন্ধানে

প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞানকে শিক্ষার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে গণ্য করা হতো। বর্তমানে পাশ্চাত্যে Integrated বা Holistic Education (বাংলায় যার সমার্থক হতে পারে পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা) গুরুত্ব ও চাহিদা বেড়েছে। আধ্যাত্মিক দর্শন ও জাগতিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ক্রমশই বিজড়িত হয়ে পড়েছে। উপলব্ধি বাড়ছে জ্ঞানের একটি শাখা সম্বন্ধে গভীরভাবে জানার জন্য, জ্ঞানের অন্য শাখাগুলো সম্বন্ধে জানারও প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞান বিনীত হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কাছে। আধ্যাত্মিক মতবাদ আরও বোধগম্য হয়ে উঠছে বিজ্ঞানের শাণিত স্পর্শে। আধ্যাত্মিক বিশ্বাস লোভ, বিদ্বেষ ও হিংসাপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিহার করতেই শুধু উপদেশ দেয় না, ঐ বিষয়গুলো সম্বন্ধে চিন্তাও। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা সম্প্রতি মানবদেহের নিউরো পেপটাইড মলিকিউলের কার্যবিধি সম্বন্ধে জানতে পারছি। এই মলিকিউলের অপর নাম হলো মেসেঞ্জার বা সংবাদ-বাহক মলিকিউল, যা আমাদের প্রতি ধরনের চিন্তাকে ছড়িয়ে দেয় একশো ট্রিলিয়ন জীবকোষের মধ্যে। প্রতিটি চিন্তা অনুযায়ী আমাদের দেহের ভেতর প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে। ক্রোধ, বিদ্বেষ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি নেতিবাচক চিন্তা, এমনকি অত্যধিক চিন্তার ফলে Adrenaline অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়ে শরীরের ভারসাম্য বিনষ্ট করে দেয়। শরীর ও মনে নানা প্রকার রোগ ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এই মানুষগুলোর জীবন অতৃপ্তি ও অশান্তিতে ক্লিষ্ট থাকে পর্যাপ্ত ভোগ-বিলাসের মধ্যেও। অন্যদিকে প্রেম ও দয়াপূর্ণ চিন্তার ফলে শরীরে Endorphine, Serotenine, Gaba প্রভৃতি সুখ-প্রদানকারী হরমোনের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৈষয়িক প্রাচুর্য যদি নাও থাকে, সুচিন্তাশীল মানুষ বাস্তবিক অর্থে হয় সুখী ও পরিতৃপ্ত।

Integrated চিন্তাধারায় প্রভাবিত নবযুগের (পাশ্চাত্যে যাকে New Age বলা হয়) সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের অনুরূপেই বর্বরতা ও যুদ্ধবিগ্রহের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন যে, মানুষ যখন উচ্চতর আদর্শচ্যুত হয়, তখনি প্রেম ও জ্ঞানের বদলে হিংসা, লোভ ও অজ্ঞতা স্থান দখল করে নেয়। সামাজিক হিংস্রতা, যুদ্ধ ইত্যাদির উৎপত্তি এভাবেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে লোভে লিপ্ত, অস্ত্রবলে সংগঠিত দল, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল, লুণ্ঠন ও নিয়ন্ত্রণ করছে ভিন্নতাকে পুঁজি করে। কারণ, ভিন্নতাকে পুঁজি করলে ভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর ওপর আঘাত হানা সহজতর হয়। যদিও ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য স্রষ্টার এক অনন্য দান এবং দৃশ্যত বৈপরীত্য কখনোই খণ্ডন করে না এই মহাসত্য যে মানবজাতির উৎপত্তি এক সত্তা থেকে (আল-কুরআন, সুরা নিসাঃ আয়াতঃ ১) বা আদি আমেরিকানদের উপলব্ধি যে গোটা মানবজাতি এক মাকড়সার জালের মতো, তার একটি জাল ছিঁড়লে সম্পূর্ণ

জালটিই বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ আমাদের মানবজাতির ভাগ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা একসূত্রে গাঁথা। কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে অজ্ঞ মানুষ ভুলে যায় ঐ মহাসত্য ও সুগভীর উপলব্ধিকে। ভিন্নতাকে মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও একে অন্যকে জানার এবং জ্ঞান আহরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে না গণ্য করে তাকে ব্যবহার করা হয় একে অন্যের বিরুদ্ধে। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ, তার মনুষ্যত্বের পরিচয়কে অবলুপ্ত করে আঁকড়ে ধরে স্থূল পরিচয়। নিজ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, পেশা, পদ, পদবির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে সে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী থেকে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন চালিকা শক্তিগুলোকে অহংবোধে নিমজ্জিত দল ও প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে থাকে অন্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে। গণমাধ্যম ও গণশিক্ষা-ব্যবস্থা হয় অপপ্রচারণা, নিয়ন্ত্রিত তথ্য (Censored information) কৌশলপূর্ণ উপায়ে প্রচারিত অর্ধসত্য, (Manipulated facts) একপেশে তথ্য ও বিদ্বেষ ছড়ানোর অন্যতম হাতিয়ার। (নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার অভিশাপের চেয়েও অধিকতর অভিশপ্ত ওই ধরনের কুশিক্ষা, অপশিক্ষা ও বিদ্বেষপূর্ণ অপপ্রচারণার দানবীয় ও কলুষিত এই সংস্কৃতি)। উল্লেখ্য যে অনেকে মনে করেন হিংসা, বিদ্বেষ, নির্যাতন, নিপীড়ন ও যুদ্ধ বিগ্রহর কারণ ধর্ম। বাস্তবে দেখা যায় যে পাশ্চাত্য সৃষ্ট দুটি বিশ্বযুদ্ধ, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের লৌহশৃঙ্খলা, ভিয়েতনামযুদ্ধ, ক্যাম্বোডিয়ার কিলিং ফিল্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকে আগ্রাসন, অবরোধ ও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ রাষ্ট্রে জনগণ ধিকৃত পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ধর্ম নয় বরং জাতিসত্তা, ও মুনাফালোভী কর্পোরেট বাণিজ্যিক স্বার্থ ও অজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট। ভিন্ন জাতি সম্পর্কে অজ্ঞ ইয়োরোপীয় ক্রুসেডারদের হাতে জেরুজালেমে অসংখ্য আরব খ্রিষ্টান নিহত হয়েছিল, মুসলিম ও ইহুদি নাগরিকদের সাথে। পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের ধারণা ছিল না যে খ্রিষ্টানরা আরব হতে পারে। তারা হত্যা করছে তাদের সহধর্মীয়দের। অন্যদিকে ধর্ম হতে পারে ভিন্ন জাতির মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ যোগসূত্র এবং নির্যাতিতের আশ্রয়। মুসলিম অধিনায়ক সালাহউদ্দীনের দয়া, সৌজন্য ও মহত্ত্বের কারণে ক্রুসেডাররা তাকে অভিষিক্ত করেছিল সালাহউদ্দীন দ্য গ্রেট নামে। ইয়োরোপের অন্ধকার যুগে, স্পেনের ইসলামি সভ্যতা জ্বালিয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো। লাতিন আমেরিকায় ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের নেতৃত্বে সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল জনগণ নন্দিত লিবারেশন থিওলজি (Liberation Theology)।

এক অর্থে মানুষ যখন তার ইগো–অহংবোধ বা নফস আল-আম্মারাকে নিয়ন্ত্রণ করার সংগ্রাম অব্যাহত রাখছে তখন সৃষ্টি হচ্ছে শান্তি ও সম্প্রীতি। অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত অহংবোধ সৃষ্টি করছে সংঘাত, সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ। অহংবোধে আচ্ছন্ন ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী মানুষ অন্যের অধিকার হরণ করছে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে।

এভাবেই ধীরে ধীরে গোটা জাতির দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পরিবর্তিত হতে থাকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছিল পাকিস্তান জাতিরই অংশ। তারা যখন বাংলাদেশে ব্যাপক হারে গণহত্যা শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বাঙালির বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দেওয়া ঘৃণা কাজ করতে থাকে। ভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, গোত্র বা সম্প্রদায়ের ওপর হামলার আগে সে জাতিকে দানবীয় (Demonize) ও মানবেতর হিসেবে (Dehumanize) চিত্রিত করা গণহত্যার একটি চিরাচরিত পূর্ব-কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে আদিকাল থেকে। বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সেনা প্রশাসন সেই কৌশলটির পূর্ণ ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের নীতিমালা লঙ্ঘন করে যারা লাখ লাখ নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে, অসংখ্য মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে বা তাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করেছে (ইংরেজিতে Rape-এর ক্ষেত্রে Violate বা লঙ্ঘন শব্দটি বহুল

প্রচলিত। বাংলায় প্রায়ই নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠন, মর্যাদাহানি ইত্যাদি ধরনের শব্দের ব্যবহার করা হয়। যাতে করে লজ্জা ও গ্লানির বোঝা বহনের দায়ভার যেন নারীর ওপরই চাপিয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি নারীর প্রতি পাশবিক আচরণ করে, সেই ব্যক্তিরই সম্ভ্রম ও মর্যাদাহানি হয়। গ্লানি, লজ্জা ও অপরাধের বোঝা তারই, নারীর নয়। Violate বা লঙ্ঘন শব্দটির মধ্যে সভ্যতা ও মানবিকতার গণ্ডি লঙ্ঘনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।) তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটা বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও বিচারের প্রক্রিয়া সেখানেই শেষ হয়ে যায় না। ভবিষ্যতে কোনো দল, জাতি বা রাষ্ট্র যাতে বর্বরতা ও গণহত্যার পথ বেছে না নিতে পারে, সে জন্য বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শান্তি শিক্ষার কারিকুলাম গঠন ও তার সঠিক প্রয়োগের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন তার কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে মানবাধিকারের আদর্শকে সমুন্নত রাখে সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখার দায়িত্ব সমাজের সকল সচেতন ও বিবেকবান মানুষের। এই দায়িত্ব শুধু মানবাধিকার সংগঠনগুলোরই নয়। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রই যাতে গৃহীত মানবাধিকারের দলিল বাস্তবে প্রয়োগের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং সে প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সরকারি, বেসরকারি সংগঠন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিটির সহায়তার প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে রুশ হামলার ফলে পাকিস্তানের রিফিউজি ক্যাম্পে বসবাসরত আফগান শিশুদের পাঠ্যপুস্তককে সামরিকীকরণ করা হয়েছিল মার্কিন (USAID-এর) অর্থে।[১]

সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তি, আলোচনা, বা কূটনীতি নয় বরং জঙ্গিবাদই একমাত্র পথ এই ধারণায় বড় হওয়া আফগান শিশুরাই পরিণত হয় তালেবানে। সৌদি আরব থেকে আমদানিকৃত সংকীর্ণ ওয়াহাবি মতবাদ, যা আজ তেলের অর্থে বিশ্বব্যাপী বিষবৃক্ষের মতো গজিয়েছে, ধর্মীয় পুস্তকে তার অবাধ প্রকাশ ও সেই উগ্র মতবাদের প্ররোচনায় তালেবানরা হরণ করে নারীর মানবাধিকার, এবং ভিন্ন ধর্ম ও মতের ওপর আসে নির্মম আঘাত। বাংলাদেশে গণহত্যার দোসর জামায়াতে ইসলামী, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি তথাকথিত ধর্মবাদী, বাস্তবে মানবতাবিরোধী ও উগ্র জঙ্গিবাদী দলগুলো ওয়াহাবিবাদের সমর্থক ও অনুসারী দল।

উল্লিখিত কারণে, মানবাধিকার লঙ্ঘনকে প্রতিরোধের জন্য একটি শক্ত হাতিয়ার হলো সমাজের সর্বস্তরে ন্যায় ও শান্তিধর্মী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো। সকল ধর্ম ও সংস্কৃতি হতে ন্যায়, সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদাহরণগুলোকে তুলে ধরা। ধর্ম যেহেতু আগুনের মতোই শক্তিশালী, যার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু অজ্ঞের হাতে আগুন ধ্বংস নিয়ে আসে, সেহেতু ধর্মকে ব্যাখ্যার একচেটিয়া ভার উগ্র মতবাদের অনুসারীদের হাতে তুলে না দেওয়াই শ্রেয়। শান্তি-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে বিচারের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো ভবিষ্যতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথটি যাতে রুদ্ধ হতে পারে, সেজন্য যেসব রাষ্ট্র বর্বরতা ও গণহত্যার পথ বেছে নিয়েছে, তাদের প্রতি সত্য ইতিহাস প্রকাশের জন্য ও অপরাধের দায় স্বীকারের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবেও চাপ অব্যাহত রাখা। তুরস্ককে যেমন আন্তর্জাতিকভাবে চাপ দেওয়া হয়েছে আর্মেনিয়ায় গণহত্যার দায় স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য। অস্ট্রেলিয়ার সরকার শতাব্দী পর সে দেশের আদিবাসীদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে (১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮) তাদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী হামলা ও বৈষম্যমূলক নীতি প্রণয়ন ও আচরণের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় নোবেল বিজয়ী ধর্মযাজক ডেসমন্ড টুটুর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে 'Truth and Reconciliation' কমিশন। অপরাধীদের উপযুক্ত বিচার, সত্য ইতিহাস প্রকাশ, অপরাধের দায় স্বীকার এবং ক্ষমা প্রার্থনার ফলে, বর্বরতার শিকার মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে ওঠে না। বৈষম্যের শিকার, এবং জীবনের দ্বারপ্রান্তে আসা নারী ও পুরুষের দুঃসহ অতীতকেও পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যা

হতে পারে তার গুরুত্ব ব্যাপক। জাতি খুঁজে পায় তার আত্মবিশ্বাস ও গৌরব। প্রগতির পথ হয় সুগম। যে দল বা রাষ্ট্র বর্বরতা করেছে এবং যে দল বা রাষ্ট্র বর্বরতার শিকার হয়েছে, উভয় দলের নতুন প্রজন্ম, যাদের হাতে রয়েছে জাতির ভবিষ্যৎ তারা মুক্তি পায় যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত মানসিক গ্লানির বোঝা থেকে। শুরু হয় নবযাত্রা শান্তি ও প্রগতির পথে।*

তথ্যসূত্র

১. ওয়াশিংটন পোস্টে এবং সীমা ওয়ালীর বক্তব্যে USAID'র অর্থে আফগান শিশুদের পাঠ্যপুস্তক সামরিকীকরণের বিষয়টি উল্লিখিত হয়। লেখক জর্জ মেইসন ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত আফগানিস্তানে পুনর্বাসন-সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কর্মশালায় সীমা ওয়ালীর বক্তব্যর সময় উপস্থিত ছিলেন।

Seema Wali. She is the recipient of Woman of the Year by Amnesty Internactional for her work on human rights and Afgan Refugee Women. She gave a presentation (June 5, 2002) on Afganistan in which USAID's involvement in militarization of the curriculmn was mentioned. This presentation was delivered at the George Mason University's (GMU) workshop (May 28-June 7), titled "Preparing for the Rehabilitation Effort in Afganistan", which was organized by program on Peace Keeping Policy, currently known as the Peace Operation Policy Program at GMU.

---

* মনস্তত্ত্ব বলে যে যার প্রতি অন্যায় করা হয় এবং সেই অন্যায়ের বিচার যদি না হয়, সে সাধারণত নিজেকে Victim মনে করে বেদনার বোঝা বহন করে আজীবন। যুদ্ধোত্তর সমাজে বা আইন দিয়ে বৈষম্য উত্তোলন করার পরও সেই জাতির মধ্যে মানসিক আঘাত রয়ে যায় বহুকাল পর্যন্ত। অন্য দিকে যে অপরাধ করে, তা সে যতই অস্বীকার করুক, সে-ও বহন করে অপরাধের বোঝা। কখনো Victim পরিণত হয় আগ্রাসীতে, অথবা আত্মবিশ্বাসহীনতায় সে ভোগে, অথবা অপরাধী বেছে নেয় আরও অত্যাচারের পথ বা আত্মধিক্কারের কারণে নেশার আশ্রয়। অত্যাচারিত ও অত্যাচারী দুটো ব্যক্তি বা দলের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া প্রভাবিত করে পরিবার, সমাজ ও জাতিকে।

মুক্তিসংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি ও বিশ্বের বিবেকবান মানুষ

মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রবাসী বাঙালিরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছিলেন তা ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা উদার মনোভাব নিয়ে অর্থ, বিদ্যা ও বুদ্ধি-বল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলেন। যুক্তরাষ্ট্রে সহানুভূতিশীল মূলধারার আমেরিকানরা 'বস্টন ফ্রেন্ডস ফর বাংলাদেশ' সংগঠন গড়ে তোলেন, এবং বস্টনসহ ওয়াশিংটন ডিসিতে গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তান সরকারের কাছে অস্ত্র ও অর্থ প্রেরণ বন্ধের দাবিতে কংগ্রেস ও মিডিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে জোর প্রচারণা ও দুস্থ শরণার্থীদের সাহায্যের লক্ষ্যে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির বুকে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার (BIC) জন্ম লাভ করে।

সংস্কৃতি, বর্ণ ও ভাষার বিভাজন পেরিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বাঙালি ও মূলধারার আমেরিকানরা পরস্পরের হৃদয়ের অতি কাছাকাছি চলে আসেন নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে একাত্ম হয়ে। বিআইসির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগের অধ্যাপক ড. উইলিয়াম গ্রিনাফের সঙ্গে যোগ দেন হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের চিকিৎসাবিদ ড. ডেভিড নেলিন, ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিনের ২৪ বছর বয়সী স্নাতকোত্তর ছাত্র পিসকোরের স্বেচ্ছাসেবক ডেভিড ওয়াইজব্রড, বার্গেন-বেলসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে শিশুবয়সে রক্ষা পাওয়া পোলিশ ইহুদি অ্যানাব্রন টেইলর, ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট ডিগ্রি পরীক্ষার্থী বাংলাদেশের ড. মহসিন সিদ্দিক এবং ২৭ বছর বয়সী স্নাতকোত্তর ছাত্র কায়সার জামান।[১]

মার্কিন চিকিৎসাবিদেরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কলেরা রিসার্চ সেন্টার ও ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। মিসেস টেইলরের স্বামী ড. জেমস টেইলরও কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিআইসি, খ্রিষ্টধর্মীয় শান্তিবাদী কোয়েকার সংগঠন ফ্রেন্ডসসহ বিভিন্ন দল ও ব্যক্তিবর্গের সাফল্যজনক কার্যক্রম সহায়ক হয় বাংলাদেশের পক্ষে মূলধারার মিডিয়ায় ও জনমনে বিপুল সাড়া জাগাতে। হোয়াইট হাউসের বিপরীতে লাফায়েত পার্কে পাকিস্তানি সামরিক সরকার কর্তৃক বাঙালিদের গণহত্যার প্রতিবাদে অনশনরত অ্যানাব্রন টেইলরের ছবি ওয়াশিংটন পোস্টসহ (১০ মে, ১৯৭১) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়। পাকিস্তানি জাহাজে রসদ উত্তোলনের বিরুদ্ধে বাল্টিমোর ও ফিলাডেলফিয়া বন্দরে বহুল প্রচারিত সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। কংগ্রেস পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য বন্ধের উদ্যোগ নেয়। নিক্সন প্রশাসন বাধ্য হয় ৩.৬ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য স্থগিত করতে। কংগ্রেস ১৫০ মিলিয়ন ডলারের মানবিক সাহায্য ভারত ও বাংলাদেশকে প্রদানের অনুমোদন করে।[২]

ওয়াশিংটন ডিসিতে জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. এনায়েতুর রহিম ও তাঁর স্ত্রী জয়েস রহিম মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আন্দোলন ও প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়ার দর্শনের প্রফেসার চার্লস হেনরি কানের উদ্যোগে এবং রেডিও কর্পোরেশন অব আমেরিকাতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার মাযহারুল হকের সহযোগিতায় ঐ ইউনিভার্সিটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলওয়্যার ভ্যালি অব ফিলাডেলফিয়া। যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা মাযহারুল হক এই সংগঠনটির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই ইউনিভার্সিটিতে ফ্রেন্ডস ফর ইস্ট বেঙ্গল নামে চার্লসকানের নেতৃত্বে মার্কিনিদের আরও একটি সংগঠন বৃহদাকারে গড়ে ওঠে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র সরকার তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং স্টেট ইউনিভার্সিটির কিছু বিধি-নিষেধের কারণে সেখানে কর্মকর্তাদের প্রতিবন্ধকতা ছিল বাংলাদেশ নামটি ব্যবহার করার। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ইস্ট পাকিস্তান বাদ দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল নামকরণের। ১৯৭১-এর এপ্রিলে সংগঠন দুটি প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত বাংলাদেশের পক্ষে লবি ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার যাতে পাকিস্তান সরকারকে গণহত্যায় কোনো প্রকার সাহায্য ও সমর্থন না দিতে পারে সেই লক্ষ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য।[৩]

এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সকলেই বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের প্রায় সকলেই তখন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নরত ছিলেন। যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন ড. ফখরুদ্দীন আহমদ, নীনা ফখরুদ্দীন, ড. মোনায়েম চৌধুরী, রওশন আরা চৌধুরী, সুলতান আহমদ, সুফিয়া আহমেদ, ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, ড. পূরবী বসু, ড. রেজাউল করিম, মিসেস করিম, ড. এম. এন ভূঁইয়া, সালমা ভূঁইয়া, রায়হান আলী, মিসেস আলী, ড. মমতাজ আহমেদ, সালেহা আহমেদ, ড. আজিজ মিয়া, সালেহা আজিজ, ডা. মমতাজ আহমেদ, মাহমুদা আহমেদ, আযহার আলী, ড. নূরুল হক সরকার, রাবেয়া সরকার প্রমুখসহ প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে যাঁরা অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের সকলের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।[৪]

মাযহারুল হক নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিলাডেলফিয়া বন্দরে নোঙর ফেলা আল আহমেদি নামের পাকিস্তানি জাহাজের ভেতর ঢুকে পড়েন বাঙালি খালাসিদের উদ্ধার করার জন্য। রাত তখন ১টা এবং তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন নেশা পান করে বেহুঁশ। অফিসারদেরও দেখা নেই। ডেকে তাঁর প্রথম দেখা হয় এক বাঙালি খালাসির সঙ্গে। সে তাঁকে জাহাজের গহ্বরে থাকা অন্যান্য বাঙালি খালাসিদের কাছে নিয়ে যায়। একজন বাঙালিকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। রুটি, মাংস ও গরম চা দিয়ে তারা তাঁকে আপ্যায়ন করে। মাযহারুল হক তাদের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরে তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। তাঁর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৩ জন বাঙালি খালাসির মধ্য থেকে ছয়জন তাঁর সঙ্গে অগাস্ট মাসের সেই গভীর রাতে জাহাজ ত্যাগ করেন। পাকিস্তানি জাহাজ থেকে নেমে আসা এই ছয়জন অগ্রণী খালাসি হলেন মফজল আহমেদ, আবু আহমেদ, সালেহ আহমেদ, মোত্তালেব, জহুরুল ও রমযান আলী। বাকি সাতজন বাঙালি খালাসি কোয়েকার ফ্রেন্ডস সংগঠনের সহায়তায় জাহাজ ত্যাগ করেন। এই খালাসিদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আইনগতভাবে আশ্রয়, চাকরি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় বাংলাদেশের পক্ষে আন্দোলনরত সংগঠনগুলোর সহায়তায়। মাযহারুল হকের স্ত্রী ফরিদা হক হোয়াইট হাউসের সামনে বাংলাদেশের পক্ষে সংগঠিত বিভিন্ন বিক্ষোভে অত্যন্ত তৎপর ভূমিকা পালন করেন। তিনি আদালতে বাঙালি খালাসিদের পক্ষ হয়ে দোভাষীর কাজ করেন। পাকিস্তানি জাহাজ থেকে স্বেচ্ছায় বাঙালি খালাসিদের বেরিয়ে আসার ঘটনাটি ফিলাডেলফিয়া এনকোয়েরারসহ মূলধারার পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোতে সম্প্রচারিত হয়। এই ঘটনাটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উদ্দীপনা ও আগ্রহ বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সুলতানা আলম যুক্তরাষ্ট্রের Longshoreman Association (জাহাজ ঘাটের কর্মচারীদের সংগঠন)-এর কাছে তাঁর যুক্তি ও তথ্যবহুল বক্তব্য

পেশ করে অনুরোধ করেন যে পাকিস্তানি জাহাজ থেকে তারা যাতে রসদ ও মালামাল ওঠানো-নামানো বন্ধ রাখে। মায়ামিতে অনুষ্ঠিত জাহাজ কর্মচারীদের কনভেশনে তাঁর জোরালো বক্তব্য ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে Longshoreman Association তাঁর অনুরোধের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সকল বন্দরে পাকিস্তানি জাহাজ থেকে মাল ওঠানো ও নামানো বন্ধ রেখে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়ার কমিউনিকেশনের প্রফেসর ড. ক্লস ক্রিপেনডর্ফ (Klaus Krippendorf) বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে অজস্র পোস্টার তৈরি করেন। সেই পোস্টারের ভেতর বাংলাদেশের মানচিত্রটিকে একটি লাল বৃত্তের মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তোলেন (বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে তাঁর একটি পোস্টার সংরক্ষিত রয়েছে)। ড. ক্লস তাঁর নিজস্ব ডিজাইনে বাংলাদেশের পক্ষে ফান্ড-রেজিংয়ের জন্য বিশেষ বোতাম তৈরি করে বিতরণ করেন। সিবিএস রেডিও স্টেশন (WCAU) বাংলাদেশের পক্ষে আন্দোলনের পূর্ণ কাভারেজ ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করে।[৫] জগৎ খ্যাত সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন তাঁর বন্ধু পণ্ডিত রবি শংকরের অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে অভূতপূর্ব কর্নসার্ট ফর বাংলাদেশ সংগঠিত করেন।

ভারতে বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নন্দিত ও জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁর তৎপরতার ফলে প্রভাবশীল ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে সহানুভূতির সঞ্চার ঘটে। সাবেক নিজাম মহারাষ্ট্রের গভর্নর নবাব আলী ইয়ার জং বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির চিফ পেট্রন হিসেবে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[৬] বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কবরী (কবরী সারওয়ার) মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবিতে অভিনয় করেন এবং বোম্বেতে (মুম্বাই) অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কনভেনশনে 'আমার সোনার বাংলা' গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।[৭] ভারতীয় বাঙালি লেখিকা মৈত্রেয় দেবীর প্রাণঢালা উদ্যোগে কোলকাতায় বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে এলেও মধ্যপ্রাচ্যের রাজতান্ত্রিক ও একনায়কবাদী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ছিল লজ্জাজনকভাবেই নীরব। গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার সধর্মীয় মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে তারা তাদের প্রভু যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও বন্ধু নরঘাতক পাকিস্তান সরকারের নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করে।

তথ্যসূত্র

১. The Bangladesh Information Center. Washington DC, 1971, by Wajeda J. Rab. Potomac, MD. USA. Oct 26, 2006
২. প্রাগুক্ত
৩. মাযহারুল হকের সঙ্গে লেখকের টেলিফোন ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। ম্যারি ল্যান্ড ও ভার্জিনিয়া। যুক্তরাষ্ট্র। ফেব্রুয়ারি ৪ ও ১২, ২০০৭
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. মুহাম্মদ নূরুল কাদির। দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা। ঢাকা : মুক্ত প্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৫৩-১৫৪, ৩৫৩-৩৫৪
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

এতিমখানায় বোমাবর্ষণ

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতার প্রতিবাদ করায় মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডকে সরিয়ে তার বদলে কিসিঞ্জার নিয়োগ করেন হার্বার্ট স্পিভাককে। কিন্তু হার্বার্ট স্পিভাকও নিশ্চুপ থাকতে পারেননি, যখন তিনি জোরালো এবং চাক্ষুষ প্রমাণ পান যে, রাতের অন্ধকারে (ডিসেম্বর ৮-৯, ১৯৭১) ঢাকা বিমানবন্দরে ভিআইপিদের ব্যবহারের জন্য মোতায়েন ক্ষুদ্র দুই এঞ্জিনযুক্ত বিমানকে (Piaggio P-136-L) পাকিস্তান সরকার ব্যবহার করেছে ঢাকা বিমানবন্দর (তৎকালীন তেজগাঁ এয়ারপোর্ট) থেকে মাইল খানেক দূরবর্তী এতিমখানা ও বেসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণের জন্য। ঐ বর্বরোচিত বোমা হামলায় কয়েক শত নিরীহ এতিম বালক ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ হারায়। এই অমানবিক কাজটি পাকিস্তান সরকার করে ভারতীয় এয়ারফোর্সের ওপর দোষ চাপানোর জন্য। মার্কিন সেক্রেটারি উইলিয়াম রজার্স ও পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের কাছে প্রেরিত তারে (কেবল) অকাট্য প্রমাণাদিসহ স্পিভাক ঘটনাটি বিশদাকারে জানান। তাঁর তারবার্তার শিরোনাম ছিল 'Villainy by Night' যা সাংবাদিক অ্যান্ডারসন তাঁর বইতে উল্লেখ করেন।[১] স্পিভাক, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড, ও জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ সিনিয়রকে (পরিবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি) জোরালো আবেদন জানান যাতে তাঁরা প্রমাণাদি সহকারে পাকিস্তান সরকারের বর্বরোচিত বোমা হামলার ঘটনাটি নিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ও জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি আগা শাহির মুখোমুখি হন।

তথ্যসূত্র

১. Jack Anderson with George Clifford, The Anderson Papers, New York : Ballantine Books, 1974, p.296-299

নিম্নে উল্লেখিত ইংরেজি অংশটি সাংবাদিক লরেন্স লিফস্যুল্টজের সাড়া জাগানো তথ্য সমৃদ্ধ বই Bangladesh: The Unfinished Revolution গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে।

The Murder of Mujib

War Breaks Out As Kissinger Reaches For Peking

In December 1970, two years after the turmoil which ended Field Marshal Ayub Khan's decade of military dictatorship, Pakistan held what was widely considered its first genuinely democratic election since its establishment as a state in 1947. In the 1970 election the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman swept the polls in East Pakistan with a vote sufficient to command a majority in the National Assembly and to make Mujib the Prime Minister of all Pakistan. In West Pakistan the election turned in majorities for Zulfikar Ali Bhutto's Pakistan People's Party in the Punjab and Sindh Provinces, while the National Awami Party of Wali Khan and Khair Bux Marri gained majorities in the Northwest Frontier Province and Baluchistan. Under the agreed electoral procedure the National Assembly would have convened and Mujib would have assumed the position of Prime Minister of all of Pakistan.

This, however, would have meant a dramatic shift in the twenty years of political and economic domination West Pakistan had exercised over the East. Intense political pressure built up in West Pakistan following the December election and prior to the scheduled convening of the National Assembly in March. The object was to find a way of preserving West Pakistan's pre-eminence by extracting prior concessions from Mujib on his declared programme of greater inter-regional equality. The Awami League, having won a democratic election, would concede nothing and called for the convening of the National Assembly as scheduled. The crisis which broke Pakistan apart came to a critical halt on 3 March 1971, when the Martial Law authorities postponed indefinitely the convening of the Assembly. Massive civil disobedience and demonstrations began in East Pakistan. The entire province encompassing all classes went on strike. After two weeks, on March 25th, the Pakistan Army cracked down in

Dacca in the worst moment of violence and general butchery South Asia had ever witnessed during a single night. Pakistan's civil war had begun and the inexorable basis for Bangladesh's independence laid.

We are not concerned with the general history of the civil war, but only with the specific international alignments which developed in 1971 as they relate to the 1975 coup. Relationships which developed in this earlier period emerge with new importance in 1975. However, it should not be forgotten that from the late fifties Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League had been considered pro-Western and pro-American. In 1954 Pakistan was integrated into the archipelago of American military alliances, the league of CENTO and SEATO, while India remained aloof. A year later the Bandung Conference, inspired by Chou En-Lai and Nehru, made non-alignment a touch-stone of Third World politics. In the period 1954-58, just prior to Ayub Khan's coup d'etat, opposition developed within Pakistan over the issue of international alignment with the United States. Mujib's party, the Awami League, split over the issue. The pro-Western faction led by H.S. Suhrawardy and Mujib declared itself in favour of the alliance. A dissenting faction led by Maulana Bhashani declared its opposition and broke off from the Awami League to found what eventually became the (pro-Peking) National Awami Party. Furthermore, Mujib had often expressed his preference for a Westminister-style democratic state. What friends he had in the Western democracies were in general linked to the liberal wings of the Democratic Party in the United States and the Labour Party in England.

However, 1971 in South Asia was a different matter. Kissinger and Nixon were not in the least inclined towards sympathy for the victims of the Pakistan Army's crackdown in East Bengal—even if these very victims had won the national elections. Global realignments were in motion and the Bengal 'problem' appeared as a threatening and annoying sidelight. At the time of the appalling crackdown in Dacca, Pakistan's military head of state, General Yahya Khan, and Pakistan's Ambassador in Peking, K. M. Kaiser, were crucial intermediaries in the first delicate steps of Nixon's reach for the Forbidden City and Tien An Mien. Kissinger was adamant that these negotiations should not be disturbed at any cost. All other questions were subordinate for the U.S. leadership and few outside Nixon and Kissinger's inner circle knew anything of the China initiative. At this stage only four people in the entire United States knew anything of Kissinger's contacts with Peking. Furthermore, underlying Nixon's Republican politics and Kissinger's realpolitik, there was a demonstrable and clear preference for military dictatorships in the Third World. Anti-militarist democratic movements such as Mujib's Awami League in East Bengal were potential hotbeds of yet more radical trends which the United States would never encourage.

So it came about that the Bangladesh movement for independence gathered almost no official support from the United States, despite the unprecedented rebellion within the State Department ranks against Kissinger's standpoint. Following the Pakistani Army's crackdown in Dacca, the Awami League leadership ran for refuge in neighbouring India. Indian support, for strategic reasons, was crucial to the Bengalis as an initial base for military operations and refuge. India's own willingness to back a movement led by the Awami League was obvious in many respects. Both the Awami League and the Indian Congress Party stood for an ostensibly similar ideology: a secular parliamentary state. Moreover, in India's strategic view, the break-up of Pakistan would remove New Delhi's chief national rival in South Asia as long as the war did not become prolonged, and more radical Marxist elements did not achieve dominance in a protracted struggle.

Thus, the Indian Army intervened in the Bangladesh conflict in December 1971, imposing an immediate resolution to the nine months of guerrilla struggle. Prior to the actual intervention and in the face of American hostility, India approached the Soviet Union for superpower backing. The Indo-Soviet Friendship Treaty was signed in August 1971 and the Russians in large part financed India's military expedition. The Awami League's own military and financial dependence on the so-called Indo-Soviet Axis later opened Mujib to attack from more radical Bangladesh nationalists who never wanted India's armed intervention on their behalf. These attacks occurred during 1973-75 when deteriorating economic conditions made many take the view that Bangladesh had traded Pakistani dominance for Indian hegemony.

In 1973, two years after the war, the Carnegie Endowment for International Peace, a Washington-based research foundation affiliated with the quarterly *Foreign Policy,* undertook a major study of U.S. policy during the Bangladesh crisis of 1971. The investigation lasted nine months and was under the direction of Roger Morris, a former member of Kissinger's staff at the National Security Council. Morris had come to the Carnegie Endowment following his resignation from the Nixon Administration. He had separated himself from Kissinger's entourage the day before the American invasion of Cambodia.

Under Morris' supervision the Carnegie study interviewed in detail more than 150 officials of the U.S. State Department, Central Intelligence Agency, Defense Department, Agency for International Development, Office of Public Safety, National Security Council and other agencies which had any connection, even the most tangential, with the Bangladesh crisis. The Carnegie Endowment never issued a final report. Due to internal dissension at Carnegie the study was never completed. Without the knowledge of Morris or others connected with this study, these interviews and other raw research information

have been made available to the present writers. The information they contain, when taken as a whole, is profound and comprehensive.

In an appendix to this Part of the book we discuss in detail information based on the Carnegie Papers which offer rich new insights into the American tilt towards Pakistan in 1971. In particular, we examine the significance of the then secret Kissinger negotiations aimed at America's dramatic *volte face* with China and also analyse the effect America's exclusive obeisance to the Pakistan channel with Peking had on U.S. policy toward Bangladesh. In addition, Richard Nixon's long-standing personal dislike for Indira Gandhi and his old association with Pakistan's military leadership is brought out from interviews with senior U.S. officials.

Calcutta Days 1971: Secret Negotiations and the Mustaque Circle

The details of the 1971 period bear special importance when viewed from the perspective of the violent developments in 1975-particularly the coup d'etat which killed Mujib. The Carnegie interviews with senior U.S. officials conclusively confirm previous reports of the existence of eight secret contacts which took place in Calcutta and elsewhere between U.S. representatives and Bengali officials in 1971. In June of that year the United States began making a tentative attempt to act as a channel between elements of the Bengali leadership which Pakistan did not consider guilty of high treason, and General Yahya Khan, head of Pakistan's military junta. The exact officials and issues involved in these negotiations in Calcutta remain classified information from the American side. But sources with detailed knowledge of the Calcutta events claim all eight contacts were made exclusively with Khondakar Mustaque Ahmed's political coterie. These sources include former members of Mustaque's staff and senior officials in Bangladesh's then Provisional Government. While most of the secret contacts reportedly occurred in Calcutta, other locations are also said to have been used. A senior American official of the state department's Intelligence and Research (I.N.R) Division told the Carnegie researchers, 'He [Kissinger] had been talking to the representatives directly.'

Mustaque was at the time Foreign Minister in the Provisional Government of Bangladesh. Thus, from the American point of view, it might have seemed most natural for the United States to be dealing directly with Mustaque. However, the matter was not that simple. Within the Bangladesh Provisional Government there existed a number of factions and developing trends. The Prime Minister was Tajuddin Ahmad. From Kissinger's point of view he was a man to be circumvented. If it meant anything in the context of the period, Tajuddin was considered pro-Soviet and pro-Indian, in the sense that he recognized the strategic necessity of such an alliance against Pakistan, given American backing of Yahya Khan.

But, most significantly, Tajuddin favoured the unrelenting pursuit of Bangladesh's War of Independence. The refusal of the Pakistan authorities in March 1971 to accept the results of the elections which would have made Mujib the Prime Minister of all Pakistan, combined with the brutal magnitude of the repression, made the Provisional Government's standpoint clear and unconditional; there would be no going back and no negotiated solution short of full independence for Bangladesh. [তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন সম্পূর্ণ রূপেই একজন স্বাধীনচেতা- প্রোবাংলাদেশী রাষ্ট্রনায়ক। বাংলাদেশের জন্য আপসহীন স্বাধীনতা ও বাংলাদেশের কল্যাণ ছিল তার নিবিড় বিশ্বাস ও কর্মের অঙ্গ। অন্য কোনো রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক ততটুকুই ছিল যতটুকু মানবিকতা, সৌহার্দ্য ও দেশের কল্যাণে প্রয়োজন হয়। তাজউদ্দীন আহমদের এই দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই কিসিঞ্জার তাঁকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে, পাকিস্তান ও সি.আই-এর লিংক খন্দকার মোশতাকের সাথে গোপনে সংযোগ স্থাপন করেছিল।]

Tajuddin and virtually the entire Bengali leadership were adamant regarding complete independence. The stage had been reached where it was out of the question for them or for those fighting at the front that a compromise only granting autonomous status to East Bengal within the Pakistan union could be negotiated. This was what Kissinger now belatedly favoured at a point when it was completely unacceptable to a majority of the leadership of the Bangladesh movement. It was too little, coming far too late. With victory in sight, and with world opinion clearly on their side, such a proposition would have been politically absurd to adopt.

The solitary exception to this among the exiled Bengali leadership was Khondakar Mustaque Ahmed. While Tajuddin was identified by reputation with the Indo-Soviet strategic alignment, Mustaque had long been identified as the leading personality of the American lobby within the Awami League leadership. In terms of the Awami League spectrum, Tajuddin was considered a left-wing social democrat in the context of underdevelopment in the Third World. He favoured widespread industrial nationalization in an independent Bangladesh, including foreign capital. Within the confines of internal Awami League politics, Mustaque was Tajuddin's theoretical opposite. Mustaque openly favoured *laissez-faire* capitalism, highly favourable terms for foreign investment, and he opposed nationalization. Tajuddin was known to have been close to a number of members of the banned Pakistan Communist Party in the fifties and sixties. In the early fifties Tajuddin and Mohammed Toaha, later the leader of the Maoist East Bengal Communist Party (Marxist-Leninist), had shared the same house in Dacca. Mustaque, on the other hand, was a deeply religious Muslim and a devout Anti-Communist. [শঠতা, কপটতা, দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্র যার নীতি, সাম্রাজ্যবাদ শক্তির যে ক্রীড়নক, রাতের আঁধারে নির্দোষ প্রাণ যে ছিনিয়ে নেয় কাপুরুষের মতো ও নির্দ্ধিধায়, তাকে ধর্ম প্রাণ মুসলিম আখ্যা দেওয়া তো প্রতিটি ধর্ম প্রাণ মুসলিমের জন্য অবমাননাস্বরূপ। মোশতাকের অনৈতিক আচরণ সম্পর্কে লিফসুল্টজের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ হতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত, মোশতাকের বাহ্যিক ধার্মিক রূপটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।]

The United States, according to Bengali sources, did not open its negotiations with Tajuddin, who was the Prime Minister, but opened secret contacts with Khondakar Mustaque. Tajuddin and the rest of the leadership were kept carefully in the dark. During this period of the negotiations, Mustaque's two most important proteges were his Foreign Secretary, Mahbub Alam Chashi, and a special assistant, Taheruddin Thakur: the 'Mustaque Triangle', as this little group was known among Calcutta's 'Bangladesh Watchers'. Officials of Bangladesh's Provisional Government with intimate knowledge of this period say that Chashi and Thakur played principal roles in the confidential contacts with the United States in 1971. Four years later this same trio-Mustaque, Chashi and Thakur-would arrive together at Bangladesh Radio to announce that Mujib was dead and that Khondakar Mustaque Ahmed had taken over the Presidency of Bangladesh by coup d'etat.

According to these former officials, the agreement between Mustaque and the Americans during the 1971 negotiations constituted the terms for a return to the *status quo ante.* Moreover, these sources report that Mustaque and his Foreign Secretary, Mahbub Alam Chashi, had provisionally agreed to conditions for a separate peace: one which would maintain the unity of Pakistan, if the Pakistan Army would cease military operations, withdraw to barracks and allow new negotiations to begin, ending open warfare. To the Nixon Administration, this seemed a desirable and reasonable solution. For most Bengalis, now irrevocably committed to full independence after what they regarded as Pakistani genocide in East Bengal, this form of compromise was virtual treason to the country's liberation movement. In short, a sell-out. One Bengali compared it to George Washington and the American Continental Congress, on the verge of military victory, suddenly accepting a return to colonial status on the basis of a last minute repeal of the Stamp Act.

In the autumn of 1971 other ministers in the Provisional Government reportedly discovered the secret contacts Mustaque had been having with the United States. Tajuddin, the Prime Minister, is said to have been enraged when he unearthed what had been going on behind the backs of the rest of the Provisional Government. The Indians, who for their own distinct strategic reasons were also fully committed to Bengali independence from Pakistan, were similarly furious. There were demands that Mustaque be sacked as Foreign Minister. He has temporarily allowed to maintain his post for an outward semblance of unity, but exercised little power in the last months of the war. He was denied the right to travel to New York to represent Bangladesh at the U.N. General Assembly. And following independence, Mustaque was removed from the post of Foreign Minister and given the minor portfolio of Commerce. Mustaque's dismissal as Foreign Minister was the first major administrative change that Tajuddin made immediately after the Pakistani defeat. It

was the only major decision carried out prior to Mujib's release from prison in Pakistan in early January 1972. Carnegie's researchers were told by a senior American official of the Intelligence and Research Division, 'We believed that there was a possiblity of negotiating with the Awami League leaders in Calcutta. Unfortunately, later— in October- we learned that we couldn't represent all the factions. And they learned they couldn't ... I can't go into specifics.'

In June 1976, nearly a year after Mujib had been killed and eight months after Mustaque had himself been thrown out of the Presidency by another military upheaval, Lawrence Lifschultz interviewed Mustaque. During the interview Mustaque confirmed the contacts that had taken place in Calcutta in 1971, but refused to specify what had been agreed with the Americans at the time. 'If you want to know,' Mustaque told Lifschultz, 'you go ask Nixon. I am not going to tell you.' In November 1976, a year after the rebellion which toppled him, Mustaque was arrested by the Martial Law authorities in Dacca, charged and tried for corruption. He was fined 100,000 Taka for abuse of his official position, and is now serving a five year prison sentence for corruption, not for the murder of Mujib.

The animosity between Mustaque and Tajuddin never died. Tajuddin never forgot what he regarded as Mustaque's nearly successful covert betrayal of the independence struggle to the Americans and Pakistanis. Mustaque for his part never forgot the humiliation he underwent in his summary dismissal as Foreign Minister by Tajuddin and the pleasure of the Indian authorities at his removal. Four years later, after Mujib was already dead and while Mustaque was himself being toppled from power, a group of as yet publicly unidentified men entered Dacca Central Jail on the night of 4/5 November 1975. During Mustaque's last hours in power his old rival from Calcutta days- Tajuddin Ahmad— was bayoneted to death in his cell, along with three other cabinet ministers from Mujib's government. Mustaque had jailed all four when he had seized power the previous August. Mustaque, in his interview with Lifschultz, denied any involvement in the Dacca Central Jail murders. But sources in the prison's administration, who were at the jail that evening, allege the jail killings were ordered by Mustaque and his compatriots in the military and National Security Intelligence Service, so as to insure there would never be a Mujibist restoration by the Sheik's leading political lieutenants.

During the events of August 1975, it must be remembered, the impression the public had from the outset was that six junior officers, led by Majors Farooq and Rashid of the Bengal Lancers Armoured Corps and the Second Field Artillery, had acted unilaterally and on their own initiative without prior direction or political planning. This was the impression given both by the Majors themselves and the man brought in

at 'a minute past midnight', Khondakar Mustaque. Although Mustaque had been a member of Mujib's new one-party formation (BAKSAL), the young officers claimed Mustaque would, nevertheless, rescue the country from Mujib's tyranny. The Majors gave every impression that the show was theirs, and theirs alone, from start to finish. The 300 men under their command shared the same conviction. They believed it was their finest hour. However, it would last little more than 60 days.

The flaw in this version of events is vital to the purpose it served. By identifying six majors and 300 sepoys of the Armoured and Artillery Corps as the sole actors, it obscured whatever prior political planning had gone into the coup, and gave an aura of innocence to Mustaque's new leadership. Mustaque could then say that what had happened was past, the need now was to bring stability. He could affect the pose of a national statesman, standing above the antagonisms and conflicts which had driven the Majors and Mujib into such a deadly confrontation. Indeed Mustaque was, in the words of his principal propagandist of the period, Enayetullah Khan, 'a man for all seasons'. Moreover, the placing of full responsibility for the coup on the Majors, and not Mustaque, fulfilled the specialist Bonapartist posturing and egoism which the former, now self-appointed Colonels, required. The most important object of the story, however, was to obscure the details of what had gone on in Mustaque's camp prior to August 15th.

The Eminence Grise

Mustaque's most important protege in this period prior to August 15th was Mahbub Alam Chashi. During the Calcutta days he had served as Mustaque's Foreign Secretary. Chashi in the late 1950s had been on the staff of the Pakistan Embassy in Washington and since then had been known within the Pakistn Foreign Service as one who kept up close relationships with his American academic and diplomatic counterparts. Among the myriad factions of the Pakistani bureaucracy, Chashi's ideological commitment to the American lobby was well known. Senior officials who served in Bangladesh's Provisional Government in Calcutta allege Chashi was the principal intermediary in the secret negotiations conducted with the United States.

Without question he is one of the more sophisticated personalities in Bangladesh politics today, and is one of the more cultured political mandarins of Dacca society. As such, he has acquired the mantle of being both an intellectual and a specialist, besides that of a scrappy tactician in the ugliest of situations. Mahbub Alam resigned from Pakistn's Foreign Service in 1967. It was a period when the Green Revolution was being projected throughout South Asia and the entire Third World, as the solution to rural poverty and underdevelopment. As an ideological panacea, it was reaching its peak in the late 1960s. Pakistan, like India, received substantial Western aid linked to new agricultural programmes.

'Green Revolution' planning was the cutting edge of national policy in Pakistan's so-called Decade of Development, a it was christened by the orthodox international economists who conceived it.

When Mahbub Alam resigned from the Foreign Service, he added the suffix *Chashi,* meaning 'farmer' in Bengali, to his name. He then joined the ranks of the green revolutionaries and organized a development project in an area called Rangunia outside of Chittagong where severe flooding had destroyed several thousand acres of *aman* paddy. In his own personal variation on what is known in Bangladesh as the Comilla Model, Chashi organized a co-operative in the Rangunia area which, with a significant infusion of government credit and foreign assistance, he soon turned into an international showcase of capitalist land reform.

During Bangladesh's War of Independence Chashi went back to the business of foreign affairs as Secretary and protege to Mustaque. But after the 1971 debacle of their indiscretion with the Americans, he returned to the safer field of agriculture and the development of a theory and practice of non-socialist rural populism. After independence Chashi took over as Vice-Chairman of the Bangladesh Academy for Rural Development at Comilla, a post he still held at the time of Mujib's death.

We mention all this detail about Mahbub Alam Chashi only because numerous informed sources have spoken of his behind-the-scenes involvement in the coup against Mujib. His interest in the sociology of rural life was not purely academic; it extended to the pinnacle of political power. In the period immediately prior to the coup, a number of planning sessions regarding military action against Mujib are alleged to have taken place under Chashi's direction and mediation at Comilla. According to Comilla Academy sources, in the months before August a number of people, including Taheruddin Thakur, were frequent visitors. In 1975 Thakur, a close personal friend of Chashi's and the other principal personality on Mustaque's '71 Calcutta staff, was serving as Mujib's State Minister for Information.

On the 13th of August, two days before the coup d'etat, Chashi suddenly disappeared from Comilla. In Dacca Major Rashid had already alerted Mustaque to be ready. Chashi, sources allege, was then called in from Comilla. He could not be found by colleagues expecting to meet him on Academy business. But on August 15th he was found. That morning Chashi and Thakur turned up at the Dacca studios of Bangladesh Radio to sit at Khondakar Mustaque Ahmed's side and to announce: 'Mujib is dead. Mustaque is President.' Back at the Comilla Academy, Chashi's colleagues nodded their heads to each other. Now they understood why he could not be found for two days and what all those evening meetings on the Swanirvar agricultural programme had been about. Bangladesh's *Eminence Grise* had momentarily revealed himself.

The military men who actually killed Mujib appear to have been brought firmly into the Mustaque circle's scheme of things only in late

March or early April. The Majors had ideas of their own before that, but lacked a political glove to fit their gun hand into. Mustaque and his political circle were in the process of carefully checking military contacts whom they could adopt and integrate into their own strategy. Major Rashid was a relative of Mustaque's, but Mustaque's group preferred a senior officers' coup d'etat. According to Bangladesh military sources, approaches were made to the Deputy Chief of Army Staff, Major-General Ziaur Rahman, or Zia, as he is generally known. Within the Army's upper echelon it was known that he was becoming more and more restless over the growing corruption of the Mujib regime and the humiliation the army had suffered when it was pulled off anti-smuggling operations in May 1974. In addition, the Army had become increasingly disgruntled with the emergence and grown of a separate paramilitary organization known as the Rakhi Bahini. It was considered to be Mujib's most loyal armed force and principal counterweight to any ambitions Bangladesh's military officers might ultimately develop. The Rakhi Bahini in the 1973-74 period earned a reputation for ruthlessness in the suppression of internal dissent, second only to what the Army itself would do three years later. As a greater share of new equipment and funds found its way to the Rakhi Bahini and drew allocations away from the Army, resentment grew within the traditional military services.

Mustaque's representative in the approach to Zia is alleged by Bangladesh military sources to have been Chashi. General Zia, these sources report, expressed interest in the proposed plan, but reluctance to take the lead in the required military action. Then on 20 March 1975 Major Rashid approached General Zia with his own proposal. The junior officiers had already worked out a plan, he told Zia, and they wanted his support and his leadership. Again Zia temporized. According to Rashid, Zia told him that as a senior officer he could not be involved, but if the junior officers were prepared, they should go ahead.

Having failed to secure reliable leadership for the coup from the senior officer cadre, the Mustaque circle linked up with the junior officers' plot. While they may have preferred a senior officers' coup, they secured the next best option. Once they believed they had Zia's implicit agreement, they were willing to go ahead with a second echelon organization. For their part, with General Zia's neutrality or even tacit support assured, the junior officers could move ahead without fear that Zia would throw his forces against them after the coup. With this set, from April onwards the scheme moved to maturity.[1]

তথ্যসূত্র

1. Lawrence Lifschultz. Bangladesh: The Unfinished Revolution. London: Zed Press, 1979, pp. 111-119

কন্যার ডায়েরি : রক্তঝরা নভেম্বর

আমি ডায়েরি লেখা শুরু করেছিলাম বারো বছর বয়স হতে। কৌতূহলী বা মনকে স্পর্শ করে এমন বিষয় বা ঘটনাগুলোকে লিপিবদ্ধ করতাম আমার গল্প লেখার খাতায়। সে সময় দৈনিক ইত্তেফাকের কচিকাঁচার আসরে আমার লেখা গল্প ছাপা হতো। এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও তার মা অবলম্বনে আমার প্রথম গল্প 'মা' ছাপা হয়েছিল ১৯৭২ সালে ইত্তেফাকের পাতায়। আমি ডায়েরি লিখতাম ওই গল্প লেখার খাতায়। আব্বু, আম্মা ও আনার আপা (আমাদের অতি আদরের প্রয়াত ফুফাতো বোন। আব্বু ও আম্মার স্নেহ ছায়ায় বড় হয়েছেন) নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। তাঁরা লিখতেন মলাট বাঁধানো বা ক্যালেন্ডারযুক্ত ডায়েরির পাতায়। ১৯৭৫ সালে, কালো মলাটওয়ালা ও ছাপার হরফে বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতে বছর, মাস, দিন উল্লেখিত একটি ডায়েরি আমি পাই। বছরের শুরুতে, অনেকেই আমাদের বাড়িতে নতুন বছরের শুভেচ্ছা স্বরূপ ক্যালেন্ডার, অ্যাপয়নমেন্ট বুক ইত্যাদি পাঠাতেন। ওই ডায়েরিটি সেভাবেই পাওয়া। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে উদ্বেলিত কিশোর হৃদয়কে মেলে ধরলাম আমার নতুন ডায়েরির পাতায়। 'আজকে একটি নতুন জিনিস পেলাম। সেটা হচ্ছে একটি ডায়েরি। আমার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, আমি ডায়েরিতে লিখছি।...অষ্টম শ্রেণী হতেই আমার নতুন একটা শখ অথবা অভ্যাস গড়ে উঠল, সেটা হচ্ছে, রোজদিন অথবা মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে যা লিখবার মতো আমি সে সব ঘটনা লিখতাম এবং আমার লিখতে ভালো লাগত। আমার গল্প লেখার খাতাতেই আমি সেসব লিখতাম। সেসময় ডায়েরিতে লিখবার কথা মনে হয়নি এবং ভাবিওনি যে ডায়েরিতেই এসব লেখা উচিত।... হয়তো একটা মুভি দেখে এলাম, মুভিটা খুব ভালো লাগল– আমার মনের গভীরে প্রবেশ করল, ঘরে ফিরে আমার ঠিক তক্ষুনি মুভিটা সম্বন্ধে কিছু লিখতে ইচ্ছে করবে আমি তক্ষুনি আমার গল্প লেখাব খাতাটি টেনে নিয়ে কিছু লিখতে বসে গেলাম।...তারপর বহু ঘটনা যা আমার ভালো লেগেছে দুঃখ লেগেছে ইত্যাদি খাতায় লিখতাম। সকালে-দুপুরে-বিকেলে যে সময়ই সময় পেতাম লিখে যেতাম। ...এখন আমার একটি ডায়েরি হয়েছে। তাই আমার বেশ আনন্দ লাগছে, আবার একটু গর্বও হচ্ছে, কেন বলতো ?'

(রোববার, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫)

কিশোর বয়সের আবেগ আপ্লুত উচ্ছ্বসিত ভাবনা ! ভোগবাদী যুগের তখনও বিস্ফোরণ ঘটেনি। নতুন বইয়ের গন্ধ, ডায়েরির মলাটের স্পর্শ, রোজার ঈদের চাঁদ দেখার আনন্দ সবই যেন স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতো অমূল্য সম্পদরাজির মতো। সেদিন, আমার জীবনের প্রথম ডায়েরিটি পেয়ে আমি আনন্দিত। গর্বিত। তখন কে জানত, যে এক স্বপ্ন পিয়াসী কিশোরী ওই একই ডায়েরিতে ধারণ করবে তার জীবনের সবচেয়ে বেদনার স্মৃতিকে !

মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারী-দিশারী, আপসহীন, সংগ্রামী নেতা তাজউদ্দীন আহমদের মর্মান্তিক ও অকাল-মৃত্যুকে তার কন্যা গেঁথে রাখবে রক্তাক্ষরে তার প্রথম পাওয়া ডায়েরিতে !

আমার ডায়েরি হতে

সোমবার, ৩ নভেম্বর, ১৯৭৫ ইংরেজি
১৮ কার্তিক, ১৩৮২ বাংলা
২৭ শওয়াল, ১৩৯৫ আরবি

আজ সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে স্কুল যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ভাবলাম যাব না। কিন্তু তারপর ভাবলাম যাই। তারপর যেই নাস্তা খেতে যাব, আম্মা এসে বললো আমার স্কুল যাওয়া হবে না। বাইরে খুব গোলমাল লেগেছে। বাসা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি তো শুনে বেশ হতভম্ব হয়ে গেলাম। প্রথমে ভাবলাম বিশেষ কিছু না। কিন্তু তার পরই দেখলাম অবস্থা সুবিধার নয়। আমাদের বাসার একদম নিচ দিয়ে দুবার করে হেলিকপ্টার উড়ে গেল। তারপর ফাইটার জেট ঘনঘন উড়ে যেতে লাগলো। আম্মা, রিমি, মিমি দেখি ততক্ষণে সব কিছু গুছিয়ে প্রস্তুত। আমি তখন জামাকাপড় একটা ব্যাগে ভরলাম। তারপর আমরা নানাসহ, মফিজ কাকুর (আব্বুর সহদর, পরিবারসহ আমাদের সাত মসজিদ রোডের বাড়ির কাছে, ধানমন্ডির ১৯নং রোডে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। ১৯৭৭ সালের ২৮ জুলাই, লিভার সিরোসিস রোগাক্রান্ত মফিজ কাকু পরলোক গমন করেন) বাসায় এসে উঠলাম। আম্মা লালু ফুফুর (অ্যাডভোকেট মেহেরুননেসা) বাসায় ছিলেন দুপুর পর্যন্ত। ওখানে অনেক খবরটবর এসেছে। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। মফিজ কাকুর বাসায় আছি। কবে বাসায় যাব ঠিক নেই।*

বুধবার, ৫ নভেম্বর, ১৯৭৫
২০ কার্তিক, ১৩৮২
২৮ শাওয়াল, ১৩৯৫

আমার জীবনে একি ঘটে গেল ? কেন এমন ঘটলো ? আব্বু আর নেই। এ পৃথিবী ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। গতকাল সকাল থেকেই শুনছিলাম আব্বুকে নাকি রোববার রাতে জেলে ঢুকে গুলী করে মেরেছে। আমি বিশ্বাস করিনি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। ভেবেছি আব্বুকে মারবে কেন ? মারবে কেন ? হাসান ভাই ও আমি পাগলের মত রিকশায় চড়লাম। আব্বুর খবর শুনলাম। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। বাসায় এলাম ঘরে গেলাম। চিৎকার করে সবার আড়ালে কাঁদলাম। কাঁদবার পর যেন পথ দেখতে পেলাম। আব্বু যেন হাসছে, বলছে 'চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে' ! মনকে শক্ত করলাম। যতক্ষণ লাশ না দেখেছি, বিশ্বাস করতে পারিনি। লাশ এলো দেখলাম। সবার সাথে কাঁদলাম। তারপর থেকে আমার একি হলো ! চোখে যে জল আসছে না। আমি পাথর হয়ে গেছি। আম্মার দিকে তাকিয়ে মনকে পাষাণ বেঁধেছি। আমরা শুধু আব্বুকে হারাইনি সারা দেশের একটা সম্পদ হারিয়েছি। অমানুষিক হত্যা ! জেলে ঢুকে রাতের বেলা পশুর মত গুলি করে মেরেছে ! আব্বু তো মরেনি ঘুমিয়ে আছে সারা পৃথিবীর নীপিড়িত মানুষের অন্তরে। আব্বুর আদর্শ, আব্বুর কাজ কত মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবিত ছিল ! দেশের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই যেন আব্বু দূরে চলে গেল ! কে এখন পথ দেখাবে ? আর তো কোনো নেতা নেই !

আব্বু আমার আব্বু !

---

* আমার এই ১৯৭৫ সালের প্রথম পাওয়া ডায়েরিতে ইংরেজি, বাংলা ও আরবি মাসের দিন, তারিখ ও বছর যেভাবে উল্লেখিত ছিল সেভাবেই প্রকাশিত হলো।

শুক্রবার, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৫
২২ কার্তিক, ১৩৮২
২ জিলকদ, ১৩৯৫

রাতে খাবার পর আমি, আম্মা, রিমি, মিমি, সোহেল মধ্যের ঘরে এবং ছোট কাকু, হাসান ভাই ও ভুলু ভাই (দলিল ভাইয়ের সমন্দি) আমার ঘরে শুয়ে পড়লো। রাত ১টার দিকে হঠাৎ ছোট কাকু দরজা ধাক্কা দিলেন। আম্মা উঠে খুলে দিলেন–আর সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাড়ি গুলির শব্দে কেঁপে উঠতে লাগলো। (কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে ঢাকা সেনানিবাসে সিপাহী অভ্যুত্থান) শেল, কামান দাগার আওয়াজে আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। পাগলের মত যে যেমন কাপড় পরা ছিলাম তা পরে নিচে নেমে এলাম। তারপর মাথা নিচু করে বেবীদের বাসা দিয়ে দিশেহারা হয়ে সবাই নীরব জনশূন্য রাস্তা দিয়ে মফিজ কাকুর বাসার দিকে দৌড়ুতে লাগলাম। ভুলু ভাই সোহেলকে নিয়ে দৌড়িয়ে আসছিল। আমি টেলিফোনের তারের সাথে একটা ভীষণ ধাক্কা খেলাম। তারপরই আবার রাস্তা ধরে ছুটে মফিজ কাকুর বাসার সামনে দাঁড়ালাম। গেট তালা বন্ধ। আম্মা, আমি, রিমি, হাসান ভাই, মিমি সবাই গেট টপকে ভেতরে এলাম। আমার হাত পা আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমার সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ১৯৭৫
২৯ কার্তিক, ১৩৮২
৯ জিলকদ, ১৩৯৫

আপাতত এখন বড় মামার বাসায় (রাজাবাজারে, ব্যবসার কারণে বড় মামু তখন ঢাকা চিটাগং যাতায়াত করতেন) থাকতে হবে। পরে বড় মামা এসে আমাদের চিটাগং নিয়ে যাবে ১৫/১৬ দিনের জন্য। টাকা পয়সার এখন তো বেশ সমস্যা। কবে যে সেটেল হব তারও কোনো ঠিক নেই। আব্বুর চল্লিশার আগে আমাদের বাসায় (৭৫১ সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি) চলে যাব ওখানে থাকব। ধানমন্ডির বাসা ভাড়া দেবে এত দুঃখ লাগছে এ জন্য কিন্তু না দিয়েও তো কোনো উপায় নেই, টাকা আসবে কোথা থেকে। আব্বু যে চলে গিয়েছে আমি কিছুতেই অনুভব করতে পারি না। মনে হয় বিদেশে গিয়েছে। রাতের বেলা ঘুম ভাঙলে মনে হয় সবই তো ঠিক আছে কিন্তু তারপরই মনে হয় না, সমস্ত জীবনের গতিটাই ওলোট-পালট হয়ে গিয়েছে যার কোনো স্থিতি নেই। মানুষের জীবনটা কি ? অথচ তাই নিয়ে মানুষের এত গর্ব। এত অহংকার !

বুধবার, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭৫
৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮২
১৪ জিলকদ, ১৩৯৫

আজ সকাল বেলায় আম্মার সাথে (বড়) মামীসহ বাসায় গেলাম। (জেল হত্যাকাণ্ডের পর, নিরাপত্তার কারণে প্রায় আড়াই মাস আমরা বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা পুলিশ যখন-তখন আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে হেনস্থা করতো।) গিয়ে আমার কি যে ভালো লাগলো বলবার নয়। আবার কষ্টও লাগলো। কত শত স্মৃতিতে ভরা আমাদের বাসা। আর নিজের বাসার মত এত মধুর কিছু পৃথিবীতে নেই। আমার রুম খুলে আমি বিছানায় বসেছিলাম অনেকক্ষণ। আব্বুর কথা বারবার মনে পড়ছিল। জীবন্ত মানুষ আজ স্মৃতি হয়ে গেল কত তাড়াতাড়ি।

আমার বইগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে আদর করলাম। ওরা আমার প্রাণ। প্রত্যেকটা বই আমার কত কষ্টের জমানো। ওগুলো আমাকে কত জ্ঞান দিয়েছে। যার জন্য ওরা আমার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বাসায় এসে খেতে বসলাম চারটায়। ছোট কাকু ও হাসান ভাই এসেছিল। সন্ধ্যায় সাঈদ ভাই, আনার আপা, রিমি, মিমি এলো। তারপর যাওয়ার সময় সোহেলকে* নিয়ে গেল।

শুক্রবার, ২১ নভেম্বর, ১৯৭৫
৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৮২
১৬ জেলকদ, ১৩৯৫

আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাসায় ছিলাম। অনেক ফকির আজ খেয়েছে। আম্মা বাসায় গিয়ে আব্বুর রুমে ঢুকে কেঁদে ফেলেছিল। আব্বুর স্মৃতিতে ভরা ঘর-বারান্দার প্রতিটি স্থান কেমন করে ভোলা যায় সে কথা। আম্মার অবস্থা দিনদিন খারাপ হচ্ছে। বিশেষ করে কাল থেকে। জেলখানা থেকে আব্বুর রক্তমাখা সেন্ডেল, জামা ফেরত পাঠিয়েছে। আম্মা ওগুলো দেখেছে। আব্বুর রক্তমাখা ঘড়ি, জামা, স্যান্ডেল দেখে আম্মা সারারাত কেঁদেছে। আম্মাকে কি বলে আজ সান্ত্বনা দেব। ঈদের পর আমরা আম্মাকে নিয়ে চিটাগংয়ে বড় মামার আর একটা বাসায় যাব। তাতে করে ওখানে থাকলে আম্মার মনটা হয়তো ভালো থাকবে। আব্বু কত তাড়াতাড়ি স্মৃতি হয়ে গেল ! আকাশে যখন লক্ষ তারা মিটিমিটি করে হাসে, তখন মনে হয় ওই একটি তারার মধ্যেই আব্বু হাসছে ফিকফিকিয়ে।

প্রকাশিত। ঠিকানা : নিউইয়র্ক, ৬ নভেম্বর, ২০০৯

৩ নভেম্বর : কালরাতের রক্তশিখা

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা সাঈদুর রহমান প্যাটেলের সাথে আমার প্রথম ফোনালাপ ও পরিচয় ঘটে ২৩ জুলাই, ২০১১তে আব্বুর ৮৬তম জন্মবার্ষিকীর দিনটিতে। মিশরের জাতীয় বিপ্লব দিবসও উদ্‌যাপিত হয় ঐ একই দিনে।

বেশ ক'বছর আগে জেল হত্যা দিবসের এক স্মরণসভায় সেই মর্মান্তিক দিনটির প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। বক্তব্যটির একটি প্রতিবেদন নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'ঠিকানা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সূত্রে ওনার নাম জানতে পারি এবং ক্যালিফোর্নিয়া আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা তওফিক খান তুহীনের মাধ্যমে ওনার ফোন নাম্বার যোগাড় করি। শুরু হয় পরিচয়।

ঢাকার গেণ্ডারিয়া হাইস্কুলের ছাত্র প্যাটেল রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন ১৯৬৬ সাল থেকে। ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকা নগর পূর্বাঞ্চল ছাত্রলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ঐতিহাসিক বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি (স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিম নামেও ব্যাপক পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেন। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওনাকে বন্দী করা হয়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের নিউ জেল বিল্ডিংয়ের ৩নং কক্ষে তিনি, মনসুর আলী, আবদুস সামাদ আজাদ, বঙ্গবন্ধুর বোনের জামাই সৈয়দ হোসেন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে কারাবন্দি ছিলেন। পাশের ২নং কক্ষে

---

* একমাত্র ছোট ভাই সোহেল তখন ৫ বছরের শিশু মাত্র।

ছিলেন কামরুজ্জামান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ১নং কক্ষে তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আসহাবুল হক, কোরবান আলী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, এম.পি. দেলওয়ার হোসেন প্রমুখসহ মোট আটজন নেতৃবৃন্দ থাকতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ওনাদেরকে বন্দী করা হয়। ফোনালাপে ওনার কাছ থেকে জানতে পারি সেই ভয়াল রাতের ঘটনা।

৩ নভেম্বর দিবাগত রাত (সোমবার) ৩:১৭ মিনিটে প্যাটেল শুনতে পান পাগলাঘণ্টির আওয়াজ। কাঁসার ঘণ্টি গম্ভীর শব্দে ঢং ঢং করে বাজছিল। একই সাথে করুণ সুরে বিউগল ও ক্ষণে ক্ষণে হুইসেলের শব্দে নিশীথ রাতটা কেমন যেন আতঙ্কপূর্ণ হয়ে উঠছিল। সামাদ আজাদ সাহেব একজন পাহারারত সিপাইকে জিজ্ঞেস করলেন 'মিয়া সাব কী হয়েছে ?' সিপাই জানাল যে সেও কিছু জানে না। তারপর ঝনঝন চাবির শব্দে ১নং রুমের দরজা খোলার শব্দ ওনারা পেলেন। প্রধান সুবেদার জব্বার খানের কাছে লকআপের চাবির গোছা থাকত। এরপর ২নং রুমের লকআপ খোলার শব্দ পেলেন। প্রথম রুম থেকে ততক্ষণে কোরবান আলী, আব্দুস কুদ্দুস মাখন, এম.পি. দেলওয়ার হোসেনসহ মোট ৬জনকে সবচাইতে বড় প্যাটেল সাহেবদের ৩নং রুমে ঢোকানো হয়েছে। মনসুর আলী ওজু করে পাঞ্জাবি পরলেন। দাড়িওয়ালা এক পাহারাদার নায়েব আলী মনসুর আলীর কোমরে ধাক্কা দিয়ে তাগাদা দিল ১নং রুমে যেতে। মনসুর আলী চলে যাবার সময় প্যাটেল ওনাকে ভরসা দিতে গিয়ে বললেন, 'চাচা, আপনি যান। ওরা বোধহয় সিগনেচার নিতে এসেছে।' মনসুর আলী সাহেব তখন প্যাটেলের দিকে এমন এক করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন যা বর্ণনার অতীত। উনি বুঝতে পেরেছিলেন ঐটাই তাঁর শেষ যাওয়া। প্যাটেলের ভাষায় 'মনসুর আলীকে ১নং রুমে নেয়ার ১/২ মিনিটের মধ্যেই চারটা স্টেনগানের ম্যাগাজিন ছুটল। ৫টা সিঙ্গেল রাউন্ড গুলির আওয়াজও পেলাম। পরে শুনেছি যে জেলখানার ঐ পাহারাদার নায়েব আলী দৌড়ে গিয়ে হত্যাকারী আর্মিদের বলেছে 'একটা কিন্তু বাইচা আছে।' মনসুর আলী নাকি তখনও বেঁচে ছিলেন ও পানি পানি বলে কাতরাচ্ছিলেন। আর্মিরা গাড়ির কাছ থেকে আবার ভেতরে এসে বেয়নেট চার্জ করে মনসুর আলীকে। চোখের পানি সামলাতে সামলাতেই সাক্ষাৎকার নিতে থাকি। ফোনের ওধার থেকে শুনতে পাই প্যাটেল সাহেবের বেদনাসিক্ত গলার স্মৃতিচারণ।

১৫ আগস্ট বিকেল ৫টার দিকে প্যাটেল সাহেব ফোন করলেন। জানালেন যে জেলহত্যাকাণ্ডের কিছুদিন আগে আব্বুর সাথে বিশেষ কিছু কথোপকথন, যা ওনার স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার সাথে শেয়ার করতে চান। আমি সেই মুহূর্তে বাঁধাছাদায় ব্যস্ত। সুদীর্ঘ ২৭ বছর উত্তর আমেরিকার মেরিল্যান্ড স্টেটে প্রবাস জীবনযাপনের পর পাড়ি জমাচ্ছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সামরিক-বাহিনী-বিহীন কোস্তারিকা রাষ্ট্রে। আমার স্বামী জীবনসাথি আমর খাইরি আবদাল্লা ভাইস রেক্টর ও প্রফেসার হিসেবে কর্মরত কোস্তারিকায় স্থাপিত জাতিসংঘ ম্যান্ডেটেড ইউনিভার্সিটি ফর পিসে। আমি মুভ করছি শুনে প্যাটেল সাহেব বললেন যে মুভ করার পর উনি আব্বুর সাথে কথোপকথনের বিষয়টি বলবেন। ততক্ষণে আমি বাঁধাছাঁদার কাজ ফেলে কাগজ-কলম হাতে নিয়ে বসেছি। অমূল্য স্মৃতিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাছে ফেলে না রাখাই শ্রেয়। আবার এক ঐতিহাসিক দিনে লিপিবদ্ধ করলাম কালের হিরণ্যগর্ভ হতে উত্তোলিত ইতিহাসকে। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস; কোস্তারিকায় মাতৃভাষা দিবস এবং ক্যাথলিক চার্চের মাতা মেরীর স্বর্গারোহণ দিবস; সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিন ; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের দিন ও জাতীয় শোকদিবস। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, আমার জন্মদিনে তরুণ রাজনৈতিক নেতা আ.স.ম আবদুর রব ওনার উপহার দেওয়া রবি ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ'র পাতায় লিখেছিলেন, 'রিপি, আজ তোমার জন্মদিন। কারো মৃত্যুদিন। বড় হয়ে মনে রেখো।'

আব্বুর ইঙ্গিতবাহী স্বপ্ন

প্যাটেল সাহেবের ভাষায় নিম্নোক্ত বিবরণটি ধারণ করা হলো :

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের ১ তারিখ। বিকেল বেলা। তাজউদ্দীন সাহেব ১ নম্বর রুমের দরজার সামনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে দাঁড়ানো। আমরা তখন বাইরে হাঁটছিলাম। ওনাকে দেখে আমরা সালাম দিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হলো যে উনি যেন কিছু বলতে চাচ্ছেন। তাই আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সাথে মাখন ভাই ও বোধহয় ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক হাসিমুদ্দীন পাহাড়ীও ছিলেন। তাজউদ্দীন সাহেব কথা বলার সময় এক হাত মুখের কাছে এনে কথা বলতেন। ৭১-এ মুজিবনগরে যখন দেখা হয় তখনও ওনার এই অভ্যাসটি লক্ষ করেছিলাম। উনি এক হাতের আঙুল মুখের সামনে ধরে ও অন্য হাত পেটের ওপর নাভির কাছে রেখে আমাদের বললেন, 'আমার মনটা বেশ খারাপ। পরপর দুইবার বঙ্গবন্ধুকে স্বপ্নে দেখলাম। প্রথম স্বপ্নে দেখি বঙ্গবন্ধু আমাকে ডাকছেন। [আম্মার সাথে ঐ একই দিন, ১ নভেম্বর জেলে খুব অল্প সময়ের সাক্ষাৎকারে আব্বু প্রথম স্বপ্নটির উল্লেখ করেছিলেন।] আর গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে আমি ৩২নং রোডে ওনার বাড়িতে গিয়েছি। বঙ্গবন্ধু আমাকে হাত ধরে ওনার কালো মার্সিডিজের মধ্যে বসিয়ে বললেন, 'চলো টুঙ্গিপাড়ায় যাই।' দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখে উনি খুব বিচলিত বোধ করেন। উনি বলেন, 'এই স্বপ্ন খুব একটা ভালো ইঙ্গিত করে না।' তাজউদ্দীন সাহেব খুব প্র্যাক্টিকাল মানুষ ছিলেন। স্বপ্ন বা অলৌকিক কাহিনি তিনি সহজে বিশ্বাস করতেন না। অথচ দেখলাম যে ঐ স্বপ্নগুলো তিনি খুব সিরিয়াসলি নিয়েছেন। একটা কথা তিনি শুধু আমাকে বলেছিলেন। বোধহয় তখন অক্টোবরের শেষের দিক। আমরা সেলের চতুর্দিকে হাঁটার পাকা রাস্তায় হাঁটছিলাম। আমরা বন্দী অবস্থায় এক্সারসাইজ করতাম, আসন করতাম, ব্যাডমিন্টন খেলতাম ও হাঁটতাম। এভাবে সময় কাটাবার চেষ্টা করতাম। সেদিনও তাজউদ্দীন সাহেব ও আমি হাঁটছিলাম। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সেদিনও খুব আদর করে বললেন, 'কি খুব মন খারাপ ?' আমি বললাম, 'বঙ্গবন্ধু চলে গিয়েছেন। কিন্তু আপনারা লিডাররা তো আছেন। আমাদের মনোবল এখনও রয়েছে।' আমি ওনাকে কখনো লিডার বা নেতা সম্বোধন করতাম। আব্দুস সামাদ আজাদকে সামাদ ভাই ডাকতাম। আমার উত্তরের পর উনি বললেন, 'আশা করি তোমরা ডিসেম্বরের মধ্যে বের হয়ে যাবে। কিন্তু দেশের একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি হতে পারে। আমাদের সাবধান থাকতে হবে।' তাজউদ্দীন সাহেব চলে গেলেন বহুদিন হলো। কিন্তু ওনার সাথের অমূল্য স্মৃতি ও কথাগুলো এখনো মনে স্পষ্ট।

(টেলিফোন সাক্ষাৎকার : ম্যারিল্যান্ড-ক্যালিফোর্নিয়া, ২৩ জুলাই ও ১৫ আগস্ট, ২০১১।
প্রকাশিত, ঠিকানা : নিউইয়র্ক, ৪ নভেম্বর, ২০১১)

আব্বুর অমর বাগান : সাদা শেফালী ও রক্তজবার অর্ঘ্য

৩ নভেম্বর জেল হত্যাকাণ্ডের শোকাবহ দিনটিতে প্যাটেল সাহেবের আরও একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। উনি বললেন, আজকের দিনে চার নেতার কথা খুব মনে পড়ছে। এই দিনের স্মরণে দুটি বিশেষ বিষয় জানাতে চাই।

প্রথম স্মৃতিটি তাজউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করে। উনি জেলখানার একপাশের পচা নর্দমা ও ইটপাথরে ভরা জায়গা পরিষ্কার করে বাগান করেছিলেন। উনি একজন কৃষকের মতোই দক্ষ হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতেন। ওনাকে বাগানে কাজ করতে দেখে আমরাও ওনাকে সহায়তা করতাম।

ওনাদেরকে [চার নেতাকে] হত্যার পর কুষ্টিয়া জেলার বিশিষ্ট নেতা ড. আসহাবুল হক, তাজউদ্দীন আহমদের নিজ হাতে গড়া ফুলের বাগানে চারটি রক্ত-লাল জবা ফুলের গাছ লাগান, চার নেতার স্মরণে। আমি সাদা শেফালী ফুলগাছ লাগাই। উনি বললেন যে ঐ গাছে ফুল হতে তো কয়েক বছর লেগে যাবে। আমি বললাম, 'হয়তো আমার সযত্নে গড়া ঐ গাছে ফুল দেখে যেতে পারবো।' সত্যিই তাই হলো। আমাকে দীর্ঘ ছয় বছর কারাগারে আটক রাখা হয়। সেই সুদীর্ঘ সময়ে তাজউদ্দীন সাহেবের বাগানটির চারপাশ ও ইটের দেওয়াল জুড়ে লাগানো শেফালী গাছ ভরে গেল অজস্র ফুলে। আমি সত্যই চার নেতার স্মরণে লাগানো গাছে ফুল দেখে যেতে পারলাম।

(কোস্তারিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে টেলিফোন সাক্ষাৎকার
বৃহস্পতিবার, ৩ নভেম্বর, ২০১১)

জেলহত্যার ওপর টেলিফোনে ছোট সাক্ষাৎকার

হোসনে আরা (মেজ কাকি)

আমরা সে সময় তোমার মফিজ কাকুসহ ১৯ নং রোডে মধুবাজারে থাকতাম। ৩ নভেম্বর সকালে হঠাৎ রেডিও বন্ধ হয়ে যায়। তোমার মফিজ কাকু বাবুলকে পাঠালেন তোমাদের বাসায় খবর আনতে। মাথার ওপর তখন জঙ্গি বিমান ঘোরে। বাবুল যেয়ে বলে, 'মামানি , অবস্থা ভালো না'। তোমার আম্মা বাবুলকে বললেন কি মারাত্মক স্বপ্ন দেখলাম ! মধ্যগগনের সূর্য রক্তের মতো লাল আলো তোমার মামার গায়ে ফেলছে।'

রিপি : আম্মা এই কথা বাবুলকে বলেছিল ?

কাকি : হ্যাঁ, বলেছিল। আমার ভাই মেজর আতাউর রহমান ৪ তারিখে জেলগেটে ডিউটিতে ছিল। সে ষোলো জন বিডিআর-এর পুলিশ দিয়ে দেয়, যাতে ভাই সাহেবের লাশ চুরি না হয়। মনসুর আলী ও নজরুল ইসলাম সাহেবের ট্রাকেও সে ষোলো জন করে পুলিশ দিয়ে দেয়। কামরুজ্জামান সাহেবের লাশ হেলিকপ্টারে করে রাজশাহীতে যায়।

ভোর রাতে তোমাদেরকে নিয়ে তোমার মফিজ কাকাসহ তোমার আব্বার লাশ দেখতে যাই। তোমার মফিজ কাকা দেওয়ালে মাথা ঠুকরে বলছিল– আমি বাঁচতে চাই না। ভাই সাহেবকে যারা মেরেছে তাদেরকে মেরে আমি মরতে চাই। আমি তখন তোমাদেরকে ধরে কাঁদছিলাম।

(২৮ জুন, ২০১০)

দিপি ইসলাম

বড় কাকার শরীরের তিন জায়গায় গুলি দেখেছিলাম। উরু, পায়ের গোড়ালি ও কোমরের এক পাশের মাংস ঝুলে থাকতে দেখেছিলাম। রিমি আমাকে বলে যে চল মনসুর আলীর বাসায় ওনাকে দেখতে যাই। তখন আমি ও রিমি ছোট। জানতাম না যে ওই পরিস্থিতিতে একাকী যাওয়া বিপজ্জনক। সোহেল বড় কাকার লাশের মাথার কাছে অনেকক্ষণ বসে ছিল। তারপর আবার একা একা ঘুরছিল। মিমি একতলা দোতলা করছিল।

(২৮ জুন, ২০১০)

নজরুল ইসলাম খান (বাবুল)

মেজ মামা বললেন, রেডিও হঠাৎ কেন বন্ধ হলো ? দেখ তো ভাবির কাছে গিয়ে খবর নাও। মেজ মামা অসুস্থ থাকায় উনি না যেয়ে আমাকে পাঠালেন। সকাল ৮টার দিকে। মামানি তখন বারান্দার ডাইনিং টেবিলের স্পেসে বসা। উনি আমাকে মধ্যগগনের সূর্যের স্বপ্নের কথা বললেন। আমি ভাবলাম যে সূর্য দেখা তো ভালো। এটা ভালো স্বপ্ন। হয়তো মামার কাছে ভালো দায়িত্ব আসবে। আমি তখন চলে গেলাম। তোমরা সকাল ৯টার দিকে গাড়ি করে নানাসহ মফিজ মামার বাসায় আসলে।

(২৮ জুন, ২০১০)

আমার নোট: বাবুলের তথ্য সঠিক কারণ আম্মা সকাল ৭টার দিকে স্বপ্নের কথা আমাদের জানায়। আম্মা তখন জেগে উঠেছেন।

ড. এম. এ করিম

সকাল ৭-৩০টার দিকে অ্যাডভোকেট মেহেরুননেসার বাসার সামনে তোমার আম্মাকে জেলহত্যার খবর জানাই। ভোরবেলায় ডাক্তার সেকান্দার, জেলের কাছেই বকশিবাজারে চেম্বার ছিল, আমাকে ফোন করে জানান যে জেলখানার ভেতরে গুলি করে হত্যা করেছে। আমাদের ছাত্রজীবন থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের বন্ধু তাজউদ্দীন আর নেই।

আমি তাজউদ্দীনের উরুতে বুলেটের ক্ষত দেখি। কোমরের দিকে তাকাইনি। ওর চেহারা ছিল শান্তিপূর্ণ– clean shaved.

(২৮ জুন, ২০১০)

আফসারউদ্দীন আহমদ

ছোট কাকু, ৩রা নভেম্বর জেল গেটে কে গিয়েছিল?

আমি যাইনি জেলগেটে। 'শাহিদ সাইন করে লাশ নেয়।' খুররম যায়নি। মেজর আতাউর রহমান তখন জেলগেটে ডিউটিতে ছিল।

কবরস্থানে আমি গিয়েছিলাম। পুলিশের বাধায় খুব বেশি লোক কবরস্থানে যেতে পারেনি। ভাই সাহেব ব্লিডিং হয়ে মারা গিয়েছে।

কোথায় গুলি লেগেছিল ?

পায়ের মধ্যে গুলি লেগেছিল। সুমির বাবা সাঈদকে বললে, ও বলতে পারবে কোথায় কোথায় গুলি ছিল।

(২৮ জুন, ২০১০)

সামসুল আলম চৌধুরী (সাঈদ ভাই)

আব্বুর শরীরের কোথায় গুলি দেখেছিলেন ?

(সাঈদ ভাই সাথে সাথে উত্তর দেন) মোট তিনটা গুলি লেগেছিল। পায়ের গোড়ালির জয়েন্টে একটা, উরুতে একটা আর একটা নাভি হতে ৬/৭ ইঞ্চি দূরত্বে ডান কোমরের হাড়ের সন্ধিক্ষণে। কিডনি বরাবর। গোসল করানোর সময় আমি দেখেছি। হাইয়ের বাবাও দেখেছে।

(২৮ জুন, ২০১০)

আমার নোট : সাঈদ ভাইয়ের তাৎক্ষণিক উত্তর ও ডিটেইল বর্ণনা শুনে বোঝা গেল যে গুলির স্থানগুলো ওনার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। অন্যরা আব্বুর পুরো শরীর দেখেনি।

দিপি, সাঈদ ভাই ও হাইয়ের বাবা সম্পূর্ণ বর্ণনা দেয়।

রিমি : হাইয়ের বাবা দেখেছে মোট ৩ জায়গায় গুলি ছিল।

(২৮ জুন, ২০১০)

দলিলউদ্দীন আহমদ (দলিল ভাই)

আমি ভায়লিনকে নিয়ে টঙ্গি থেকে ঢাকায় আসি। জেলহত্যার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই আমি, আফসার, খালেদ খুররম আরও কজন ট্রাকে করে বনানিতে যাই দাফন করতে। বড় কাকুর জানাজার আগে কালিয়াকৈরের এমপি, পরে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত শামসুল হক সাহেব ও পুলিশের আইজি বললেন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ক্যান্টনমেন্টে গোলমাল চলছে। লাশ এখুনি নিতে হবে বনানিতে।

(২৮ জুন, ২০১০)

নার্গিস আক্তার

ক্যানাডা প্রবাসী নার্গিস জানায় যে তার বাবা নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের নেতা শামসুজ্জোহা ছিলেন মনসুর আলীর কক্ষে। যখন ৩রা নভেম্বর রাতে আর্মিরা এল। উনি ওজু করলেন। শামসুজ্জোহা বললেন, ওজু করলেন কেন ? মনসুর আলী বললেন– তিনি আশংকা করছেন যে মেরে ফেলবে।

(৬ জুলাই, ২০১০)

কন্যার ডায়েরি : হৃদয়ের পাতা হতে

আমার ডায়েরি ১৯৭৪
আমার আব্বুর রিজাইনের দিনটি, ২৬ অক্টোবর ১৯৭৪

হিমার চিঠির উত্তর লিখছিলাম, রিমি এসে খবর দিল আব্বু রিজাইন দিয়েছেন। শুনে অবশ্য খুব বেশি অবাক লাগলো না। কারণ গত সপ্তাহেই আব্বুর রিজাইন দেওয়ার কথা ছিল। একটু আগেই রিজাইন দিলেন আব্বু। আম্মা হাসিমুখে বললেন– আমরা আরহাম সিদ্দিকী কাকুর বাড়ির ওপর তলায় থাকব। আমাদের সেই ধানমন্ডির বাড়িতে ফিরে যাব না। যে বাড়ি থেকে আমি শেষবারের মতোই হয়তো চলে এসেছিলাম প্যান্ট ফ্রক পরিহিতা অবস্থায়।

আমার ঘরের চারদিকে তাকালাম– জানালা দিয়ে চোখ পড়লে দেখা যায়, নিবিড় একরাশ গম্ভীর গাছ, সবুজ পাতা, পাখীর অশান্ত কিচির-মিচির। আমার ঘিয়ে রঙের দেয়ালে আটকানো রাশি রাশি রঙিন ছবি। একটি ছোট্ট মেয়ে হেটে যাচ্ছে ঝুড়ি হাতে, একটি হরিণ, একটি ক্রিসমাস ট্রি, আমার হাতে আঁকা দেয়ালের মাঝের নীল পাহাড় ও রক্তিম সূর্য। সবাইকে ফেলে যেতে হবে। আমার ঘরের মিষ্টি ঘ্রাণটি আমি আর অনুভব করবো না। আমার শেষ কৈশোরের পড়ন্ত বেলায় দাঁড়িয়ে একটা অস্থায়ী বাড়ির জন্য প্রাণের কি এক অজ্ঞাত নিবিড় টান অনুভব করছি। অস্থায়ী এ বাড়ি আমার মনে চিরদিনের জন্যই স্থায়ী ছাপ ফেলেছে।

(আমার গল্প ও কবিতা লেখার খাতাটিই ডায়েরি হিসেবেও ব্যবহৃত হতো।)

আমার ডায়েরিতে আব্বুর রিজাইন সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া, ২৭ অক্টোবর, ১৯৭৪

আজকের আবহাওয়া কালকের মতোই।

আব্বু রিজাইন দিয়েছেন। চারিদিকে বহু মানুষের ভীড়। বাড়ী সরগরম। পৃথিবীতে কি প্রলয় ঘটছে ?

রাস্তায়, ঘাটে, হাটে-বাজারে আজ আব্বুর পদত্যাগ নিয়েই আলোচনা চলছে, গণকণ্ঠ আজ Hot cake-এর মতো বিক্রি হয়েছে।

গণকণ্ঠে সত্যিকারের খবরই প্রকাশ হয়েছে।

জনপদ এবং অভিমত এবং People পেপারেও ভালো লিখেছে।

Holiday পেপারের খবর কিছুটা অসত্য হলেও বেশ ভালো লিখেছে।

গতকাল রাত ১টায় বিবিসি থেকে ১৫ মিনিট ধরে আব্বুকে নিয়েই আলোচনা চলেছে।

রাস্তাঘাটে সবাই শেখ মুজিবুর রহমানকে ছি ছি করছে।

আমরা আর দু'দিন পরেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আব্বু তো যেদিন রিজাইন দিয়েছিলেন সেদিনই যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাব কোথায় ? ধানমন্ডির বাড়ীর ভাড়াটিয়া উঠে যাবে দু মাস পর, ততদিন আমাদের ভাড়া বাসায় থাকতে হবে। বংশাল বা কোথায় যেন বাড়ী পাওয়া গেছে। বিশেষ করে আব্বুর ইচ্ছে ছিল, আমাদের বাড়ী যেন ওল্ড টাউনেই হয়, লোকালয়ের মাঝে। পড়াশোনা নিয়ে আমার বেশ অসুবিধা হবে, কারণ সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। স্কুলে যাওয়ার পথে অসুবিধা হবে কারণ গাড়ী নেই, এবং স্কুল বহু দূরে এবং আমাদের পক্ষে রিকশায় যাতায়াত নিরাপদ নয়। চারিদিকে কত রকম লোকের আনাগোনা। বলা তো যায় না। আব্বু সেদিন-ই সরকারি গাড়ী বন্ধ করে দিয়েছেন। ওল্ড টাউনে জীবনেও থাকিনি, আমরা সব ভাইবোন মানুষ হয়েছি ধানমন্ডিতেই খোলামেলা জায়গায়। এখন এই পরিবেশ মানিয়ে নিতেই হবে। আমার একটা অভিজ্ঞতাও হবে এ নিয়ে। যাক গে আমি মানিয়ে নিতে পারব, এই আশা করি। সব কিছুর অভিজ্ঞতা না হলে চলবে কেন ?

(পরে অবশ্য ভাড়াটিয়ারা উঠে যাওয়ার পর আমরা আমাদের ধানমন্ডির বাড়ীতেই ফিরে যাই।)

আমার ডায়েরি ১৯৭৫*

শুক্রবার ৪ ফেব্রুয়ারি। ১লা ফাল্গুন ১৩৮১, ২ সফর, ১৩৯৫

আজ রাত। পয়লা ফাগুন। চারিদিকে বাতাসের লুটোপুটি। চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে কালোমেঘের আড়ালে। শীত নেই। দূর বহু দূরে রাতের আকাশ কোথায় যেন মিশেছে। আমি তার পার পাই না। দুরন্ত বাতাস আর ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি কোথা থেকে যেন। আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া !

আমার সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি মনে পড়ছে :

"বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠেছে গুঞ্জরী
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোক মঞ্জুরী
কিশলয় কিশলয় নৃত্য উঠে দিবস শর্বরী
বনে জাগে গান"

---

* আমার এই ১৯৭৫ সালের প্রথম পাওয়া ডায়েরিতে ইংরেজি, বাংলা ও আরবি মাসের দিন, তারিখ ও বছর যেভাবে উল্লেখিত ছিল সেভাবেই প্রকাশিত হলো।

রোববার ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১০ ফাল্গুন ১৩৮১, ১১ সফর ১৩৯৫

আজকে সকাল বেলায় উঠবার কথা ছিল, কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙলেও হাতের ব্যথায় উঠতে পারলাম না। ইনজেকশন দিয়ে হাতটা এত ব্যথা করছিল যে বলবার নয়। এমনিই শুয়েছিলাম, তারপর হাতের ব্যথা একটু কমলে প্রায় ন'টার সময় বিছানা থেকে উঠলাম। পাশের ঘরে দেখি রিমি, মিমি অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আজকে রবিবার। সুতরাং ভোর ৬টায় আর ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাবার তাড়া নেই। আম্মা দেখি সোহেলকে অ, আ শেখাচ্ছে। সোহেল বেচারার অবস্থা কাহিল। একবার 'ঠ'কে ট বলছে আর একবার 'ট'কে ঠ বলছে। তার পর হাসান ভাই এলো। খাবার টেবিলে আম্মা, আমি, হাসান ভাই, রিমি, মিমি, সোহেল, সবাই বসেছি। এরপর এল করীম কাকু। ব্যাস আরম্ভ হলো রাজনীতির আলাপ। হংকং থেকে যে সাপ্তাহিক রিভিউ বের হয়, সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কড়া সমালোচনা ছিল। সাংবাদিক যিনি লিখেছেন– নাম David Hearst. আম্মা সেটা করীম কাকুকে পড়তে দিলেন। আর একটা রিভিউ নিয়ে পড়া হলো– সেটা হচ্ছে আব্বু ও মুজিব কাকুকে নিয়ে। আব্বুর ছবি দিয়ে তার নিচে লেখা হয়েছে– "Victim of imperialism". তার পর আমার খুব মজা লাগছিল আর আগ্রহ লাগছিল রাজনীতির কথা শুনতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউ.এস.এ, ইন্ডিয়া আরো সব দেশের রাজনৈতিক দলের কথা বেশ মন দিয়েই শুনলাম।

বেলা ১২টার দিকে বিয়েবাড়িতে যাবার কাপড় পরে নিলাম। রাখীর বিয়েতে অনেকক্ষণ সবাই রইলাম। এরপর বিউটি আপাদের বাসায়। বিউটি আপাকে না পেয়ে আবার ফিরে এলাম। বাসায় এসে *সাঁঝের বেলার রূপকথা* পড়লাম। তারপর পড়তে বসলাম।

শনিবার ১ মার্চ, ১৯৭৫, ১৬ ফাল্গুন ১৩৮১, ১৭ সফর ১৩৯৫

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমরা সবাই চিটাগাংয়ে গিয়েছিলাম। সমুদ্রে গোসল করতে আমার ভীষণ মজা লাগে। আমি অনেক দূরে যাই। সাঁতার আমি একদম জানিনা, তবুও আমার ভয় হয় না।

এক দিন সন্ধ্যায় আমি সাগরতীরের সূর্যাস্ত দেখেছিলাম– সারা সমুদ্রে যেন আবিরের লাল রঙ লেগেছে। সূর্যটা মনে হয় অর্ধেক পানির ভেতরে অর্ধেক আকাশ আর সমুদ্রের সীমারেখায়– সে কী দৃশ্য ! সেদিন সূর্যাস্ত দেখতে গিয়ে আমার একটি কথাই মনে হয়েছিল– এই অস্ত যাওয়া, এই যে সমুদ্রের তীর, এই যে পানি, বালির ওপর খেলছি– এসব এখন সত্য, কিন্তু আর কয়েক মুহূর্ত পরেই মিথ্যে হয়ে যাবে।– সেগুলো তখন আমার মধুর কল্পনা হয়ে যাবে। আর ক'ঘণ্টা পরেই এই মুহূর্তটাকে আমি আর ফিরে পাবনা।

আব্বু-আম্মার সাথে আমি রাত ১০/১১টার দিকে কক্সবাজারের সমুদ্রে গিয়েছিলাম। সেদিন সমুদ্রের পানি অনেকখানি ভরে গিয়েছে– ভরা জোয়ার তখন। শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। আকাশে এমন সুন্দর চাঁদ আমি দেখিনি কখনও। চাঁদের আলো টুকরো টুকরো হয়ে সমুদ্রের কালো জলে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার তখন মনে হয়েছিল – এটা বোধ হয় রূপকথার রাজ্য।

শুক্রবার ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৫, ৪ বৈশাখ ১৩৮২, ৬ রবিউস সানি ১৩৯৫

আমার লেখার অন্য কোনো কারণ নেই। শুধু লিখলাম এই ঐতিহাসিক দিনটি স্মরণ করে। আজ ১৮ই এপ্রিল, চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহারে মাস্টারদার বিপ্লবীদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধের সূচনা হয়। এ দিনই ভারত স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে, শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক'জন দুঃসাহসী বিপ্লবী ইংরেজ শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আজ মাস্টারদার স্বপ্ন সফল হয়েছে। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। আজকের এই ভারতবর্ষ কি মাস্টারদার কাম্য ছিল ? যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার

দেশপ্রেমিক প্রাণ দিয়েছিলেন, আজকের ভারতবর্ষের নেতারা ও মানুষেরা কি তার মূল্য দিতে পেরেছেন ? শহীদ দেশপ্রেমিকদের স্বপ্ন দরিদ্র বিক্ষুব্ধ আজকের ভারতবর্ষকে ঘিরে ছিল কি ?

বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল, ১৯৭৫, ১০ বৈশাখ ১৩৮২, ১২ রবিউস সানি ১৩৯৫

আমি যখন আমার জীবনের এক বিশেষ সুখের মুহূর্তের কোনো গান শুনি, তখন সে গান যেমনই হোক না কেন ভালো লাগে। এমনকি পরবর্তীকালে আবার যখন সে গানটি শুনি তখন মনের মধ্যে সেই সুখের ছবিটাই ভেসে ওঠে। গানটার সাথে আমার আগেকার সুখময় মুহূর্ত মিলে একাকার হয়ে যায়।

আমার তিন-চার বছর বয়সের একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমরা ধানমন্ডির বাসায় নতুন এসেছি তখন। একদিন ভীষণ ঝড় হয়েছিল। আমাদের বারান্দায় মেলে দেওয়া কাপড়গুলো উড়ছিল আর ছোট কাকু তখন তার ধরে একটা গান গাইছিলেন– "ঝড় এসেছে বাউল বাতাস"– ছোটকাকুর গানের সুর যেন ঝড়ে মিশে গিয়েছিল। তার পর আমার মনে পড়ে সে সময় আব্বু-আম্মা বেতের চেয়ারে বারান্দায় বসে ছিলেন। আর বৃষ্টির মধ্যে টাউন সার্ভিসগুলো চলছিল। সে জন্য এখন যখনই 'ঝড় এসেছে বাউল বাতাস' গানটা শুনি– আমার মনে পড়ে সেই দৃশ্য– হুহু করে বাতাস উড়ছে .... দূরে সেই গানের সুর শুনতে পাচ্ছি।

সোমবার, ২৮ জুলাই, ১৯৮৬। বেথেসডা, ম্যারিল্যান্ড

আমার বাবা আমার স্মৃতি হতে বিন্দুমাত্রও ক্ষয় হয়নি। অনেক ভেবেছি এটা কেন হলো ? "চোখের আড়ালে তো মনেরও বাহিরে " কেন এখানে প্রযোজ্য হলো না। এ তো এগারো বছরের ব্যবধান। তাছাড়া বাবার কাছাকাছি তো কোনদিনও হবার সুযোগ পাইনি। আসলে না ভোলার কারনটা তাই। আমার জীবনে তিনি আলো ছায়ার মতো লুকোচুরি খেলেছেন– জেলের জানালার শিক ও জনগণের হাত ধরে আজও তার উপস্থিতি আমার মনে তেমনিভাবেই। তাছাড়া আমার বাবার স্বপ্ন সফল হয়নি, সেই ব্যথাতুর উপলব্ধির প্রগাঢ়তায় তার উপস্থিতি আমার মনোরাজ্যে আরও ব্যাপক ও গভীর। আশ্চর্য ! এই এগারো বছর পরও আমি চমকে উঠে ভাবতে চেষ্টা করি, বাবা কি সত্যই নেই ! স্মৃতির ঝুলি হাতড়ে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি বাবার সাথের ছোটবেলা ! স্মৃতির ভরা ঝুলিতে ও কটা ঘটনা মাত্র হাতে গোনা, অথচ কত অসামাণ্য ! ভাবতে চেষ্টা করি এখন তার সাথে দেখা হলে কী ভাবে কথা বলব ?

রোববার, ১০ আগস্ট, ১৯৮৬। বেথেসডা, ম্যারিল্যান্ড

স্বপ্নে দেখি আব্বু ও আমরা টেবিলে খাচ্ছি। আব্বু যেন কোনদিন যায়নি। আব্বুর আলাদা বাথরুম ও সুন্দর বাথটাব। আম্মা যেন আব্বুর জন্য আলাদা খাবার তৈরি করেছেন। আব্বুর চেহারা প্রশান্ত সুন্দর। সেই মিতভাষী– পূর্ণ চেহারা। আজকাল আব্বু সমন্ধে ভাবতে গিয়ে প্রায়ই একটা ধারণা জন্মায়। ১১ বছর আব্বু নেই। এটা মানুষের হিসাবে। এ হিসাব ঠিক নাও হতে পারে। হয়ত ১১ ঘণ্টা বা সেকেন্ড তিনি নেই। সময় তো একটা গণ্ডীতে আওতাভুক্ত করে রাখবার পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বাইরেও একটা সময় নিশ্চয়ই আছে। সে হিসেবে দিনকাল বলে কিছু নেই।

শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭। বেথেসডা, ম্যারিল্যান্ড

আজ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনে আমার কবিতা পড়ার কথা ছিল, ২১শে উপলক্ষে। আজ দুপুরে না করে দিলাম। মনটায় বড় ঝড় উঠেছে। কিছুতেই কবিতা লিখতে পারলাম না। গতকাল আম্মার চিঠি পড়ে হঠাৎ মাঝপথে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি কেন এত কষ্ট দিচ্ছ ? এ কী লীলাখেলা

তুমি করছ ?' কেন, কেন, কেন, কেন, এমন হলো ? স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা, নির্ভীক, অভিমানী দেশপ্রেমিককে কেন হত্যা করা হলো ? কেন বিচার হলো না ? কেনই বা দেশ আজ স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে ? কেন দেশে শান্তি নেই ? এই প্রশ্নের ঝড়ে প্রতিদিন মনটা উত্তর খুঁজে পায় না। সারা দেশের বুকে যেন এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন! আমার আম্মার চোখ ভরা পানি।

শনিবার, ২৫এপ্রিল, ১৯৮৭। বেথেসডা, ম্যারিল্যান্ড

আব্বুকে নিয়ে ২টা স্বপ্ন দেখলাম গত মাসে। হাসিনা আপা গত মাসে অর্থাৎ ১৫মার্চ '৮৭তে ওয়াশিংটনে আসার পর। দেখি উজ্জ্বল আলোর নিচে একটা সোফায় বসে আব্বু কী যেন লিখছেন আর হাসিনা আপা দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ঘরের মাঝে। আর একটা স্বপ্ন দেখলাম যে আমাদের ঘরের দরজা ঠেলে মুজিব কাকু যেন ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকছেন।

শুক্রবার, ১০ জুলাই, ১৯৮৭। দরদরিয়া, গাজীপুর

গতকাল দরদরিয়া এলাম। সমস্ত প্রকৃতি মনে হয় হারানো জনকে ডেকে নিল। গ্রামবাসীরা এসেছে দেখতে। তারা এমনিতে ও আসে বহু দূরান্ত হতে তাজউদ্দীন আহমদের ভিটা দেখতে। আম্মা শত শত আম, কাঁঠাল, কলা, রাবার, মেহগিনি গাছ ও ফুল লাগিয়ে শোভাবর্ধন করেছেন। গ্রামবাসীর অভিলাষ পাওয়ার পাম্প আম্মা বসিয়ে দিয়েছেন নিজের গয়না বিক্রি করে। এ বছরই সর্বপ্রথম ইরি ধান হলো, আমাদের গ্রামে এই পাওয়ার পাম্পের জন্য। ক্ষুদির সবচেয়ে ছোট বোন এবার কলেজে ভর্তি হয়েছে। সে লঞ্চে করে নদী পার হয়ে ক্লাস করে। তাকে পড়িয়েছে আম্মাই। আম্মা যে মহৎ ও আদর্শ প্রণোদিত কাজ করেছেন তার তুলনা হয় না।

গ্রামের পরিবেশই আলাদা। আমেরিকার সবুজের চাইতে আমাদের গ্রামের সবুজ অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। শ্যামল গাছ, দুধারে বন, গজারি বন, পুকুর, কাঠের বাড়িটি– বহু ইতিহাস ! পল্লি চিকিৎসক শাহাবুদ্দিন যাকে গ্রামে সকলে ডাক্তার বলে ডাকে, দেখালেন আব্বু কোথায় বসতেন, কোথায় হাঁটতেন। তিনি বলতেন, আমি শুধু দরদরিয়ার মন্ত্রী নই, পুরো বাংলাদেশের। শুধু দরদরিয়ার উন্নতি আমার একমাত্র কাম্য নয়। সন্ধ্যার আঁধারে, লিচু গাছের বাতাসে, ঝিঁঝি পোকার ডাকে, নিথর প্রকৃতির ভাষাতে শুনছিলাম অন্য জগতের গান– শহর হতে গ্রামের জীবন কত আলাদা। এসেছেন অগণিত লোক– আব্বুর ছেলেবেলার কথা হচ্ছে। ছোট কাকু সাথে। শহরের ব্যস্ততা কারও মাঝে নেই। শুধু যেন ব্যাপক সময়ের সাথে আমি এক হয়ে যাচ্ছি। কারা যেন বলছে– জোনাকের আলোতে– এখানে সময় অনেক– স্মৃতিও বেদনার ভারে লুণ্ঠিত। নেই প্রিয়জন– আমার বাবা– আমার পূর্বসূরী।

জেল হত্যাকাণ্ড
এক দুঃসহ সময়ের স্মৃতিচারণ

১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায়– জেল কর্তৃপক্ষ, ৩ নভেম্বরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার অভ্যন্তরে নিহত, তাজউদ্দীন আহমদের লাশ, ভাগ্নে (বড় বোন সুফিয়া খাতুনের পুত্র) মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদের (শাহিদ) কাছে হস্তান্তর করেন। সেই দুঃসহ সময়ের স্মৃতি ও তথ্য যুক্তরাষ্ট্র হতে, বাংলাদেশে শাহিদ ভাইয়ের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করি।

নিজ পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনো সাক্ষাৎকার, তথ্য ও বিবরণ লিপিবদ্ধ ও সংগ্রহ করা সুকঠিন কাজ। তার পরও এক রক্তঝরা ইতিহাসের বেদনাদায়ক পর্বটিকে উন্মুক্ত করতে হয়েছে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। জাতীয় ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়, এই জেল হত্যাকাণ্ড ও আরও ঘটে যাওয়া নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্য দরকার সত্য ইতিহাস জানা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তি অর্জন করা। জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সম্মিলিতভাবে সহায়তা করা। আমি শুধু একজন পিতাকেই হারায়নি, হারিয়েছি এক অনন্য মানুষকে। জাতি হারিয়েছে ভবিষ্যতের দিক-দিশারী, সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক, বিশ্ব দৃষ্টিসম্পন্ন এক বিশাল নেতাকে। ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক মহান নেতার আবির্ভাব তখনই সম্ভবপর হবে, যখন আমরা আন্তরিকভাবেই প্রচেষ্টা নেব অতীতকে জানার ও সুযোগ্য মানুষ ও নেতার জীবনাদর্শ হতে শিক্ষা নেওয়ার।

আবু সাঈদ : আমি সে সময় মিরপুর ৬ নম্বরে জনতা ব্যাংকে চাকরি করি। নভেম্বরের ৪ তারিখ, দুপুর ১২টার দিকে আমার ম্যানেজার আমাকে বললেন যে জেলখানায় পাগলা ঘন্টি বেজেছে। বড় মামার (তাজউদ্দীন আহমদ) কাছে শুনেছিলাম যে জেলে পাগলা ঘন্টি বাজা বিপদের সংকেত। তখন আমি ওখান থেকে সোজা ধানমণ্ডিতে মামির কাছে যাই। ওনাকে পাগলা ঘন্টি বাজার কথা বলি। মামি আমার কথা শুনে চুপ করে থাকলেন। এরপর আমি ওই ধানমণ্ডির সেন্ট্রাল রোডে রহমত আলী (শ্রীপুর আওয়ামী লীগের নেতা) সাহেবের বাসায় গেলাম ঘটনা জানতে। ওনাকে বাসায় পেলাম না। ওনার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি কোথায় ? উনি বললেন যে রহমত আলী সাহেব মাহবুব আলম চাষীর বাসায় গিয়েছেন। (চারতলা বাসা) নিচতলায় বন্ধু মিজানের সঙ্গে দেখা। সে-ও জানতে এসেছে। তার হোন্ডায় চড়ে, তাকে নিয়ে গেলাম নাজিমউদ্দীন রোডে, জেলের ডাক্তার মায়েনুদ্দীন সাহেবের বাসায়। উনি আমাদের গাজীপুর এলাকার লোক। আমার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল।

উনি তখন বাজারে গিয়েছেন। আমরা ওনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। উনি বাজার থেকে ফিরে, আমরা অপেক্ষা করছি দেখা সত্ত্বেও বাজারের ব্যাগ নিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেন। অন্যদিন হলে উনি আপ্যায়ন করাতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। যাই হোক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর উনি দেখা করলেন। আমি গত রাতে জেলে পাগলা ঘন্টি বাজার

ব্যাপারে ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি বললেন, 'আমিও শুনেছি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি গতকাল জেলে ডিউটিতে যাননি ?' উনি বললেন, 'না, যাইনি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন যাননি ?' উনি অনিচ্ছাসহকারে জবাব দিলেন, 'আমি ছুটিতে ছিলাম।' ওনার উত্তর দেওয়ার ধরন শুনে মনে হলো উনি কিছু লুকাচ্ছেন। আমরা চলে আসার সময় উনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'জেলে একটা কিছু ঘটেছে, পরে জানতে পারবেন।' ওনার কাছ থেকে সঠিক কোনো উত্তর না পেয়ে আমি খুব রাগান্বিত হয়ে চলে এলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বড় মামার বাসায় এসে শুনি জেলহত্যার খবর জানাজানি হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে মোহাম্মদপুর থানার ওসি বড় মামার বাসায় এসে খবর দিলেন যে, জেলখানায় আত্মীয় গেলে কর্তৃপক্ষ তার কাছে লাশ হস্তান্তর করবে। তখন আমি ওসির গাড়িতেই জেলে গেলাম। আমার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। সন্ধ্যা ৭টার দিকে জেলখানায় পৌঁছি। সেখানে কামরুজ্জামান সাহেবের ভাই ইতি সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। উনি জানালেন যে উনি সম্মতি দিয়ে এসেছেন যে ওনার (কামরুজ্জামান) লাশ রাজশাহীতে দাফন করা হবে। সেই অনুযায়ী হেলিকপ্টার দিয়ে লাশ রাজশাহীতে নেওয়া হয়।

মামার লাশ হস্তান্তরের আগে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে জানাজা কোথায় হবে ? আমি বললাম যে, লাশ প্রথমে বাসায় নেব, তারপর ঠিক হবে কোথায় জানাজা হবে। তারা তখন বঙ্গভবনে ফোন করে। তাদের বহুক্ষণ সময় লাগে অনুমতি পেতে। একসময় কর্তৃপক্ষ আমাকে বলে যে 'আপনি চলে যান। আর বলে যান কোথায় দাফন হবে, আমরা সেখানেই লাশ পাঠিয়ে দেব।' কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। বললাম যে, 'আগে লাশ হস্তান্তর করেন। তারপর কোথায় দাফন হবে সে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।' সন্ধ্যা ৭টা হতে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত আমি জেলগেটের সামনে বসা। ওই রাতের পরিবেশ ছিল যুদ্ধের সময়ের মহড়ার মতো জনমানবশূন্য, নীরব, নিস্তব্ধ। রাত ১১টার দিকে জেলগেটের সামনে বিডিআর-এর মেজর আতাউর রহমানের সঙ্গে দেখা হয়। উনি আমার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তাজউদ্দীন সাহেবের কী হন ?' আমি বললাম, 'ভাগ্নে হই।' উনি বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি ইপির (তাজউদ্দীন আহমদের সহোদর মফিজউদ্দীন আহমদের কন্যা) মামা। আমি জেলগেটে পাহারায় আছি।' আমি বললাম যে জেল কর্তৃপক্ষ বঙ্গভবনে ফোন করছে। লাশ হস্তান্তরের জন্য ক্লিয়ারেন্স নিচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে মাঝপথে কেউ আবার লাশ নিয়ে যায় কি না। মেজর আতা আশ্বস্ত করলেন। বললেন, 'অসুবিধা হবে না। আপনি লাশ নিয়ে যেতে পারবেন।' শেষ পর্যন্ত বহু দেরি করে, গভীর রাতে আমার স্বাক্ষর নিয়ে মামার লাশ হস্তান্তর করে ঢাকার সদর নর্থের এসডিওর পক্ষের একজন। ডিআইজি প্রিজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশসহ পুলিশের ট্রাকে লাশ নিয়ে যখন বাসায় ফিরি তখন গভীর রাত। বাসায় এসে কাউকে পাইনি। সে সময় লাশ নামানোর লোক পাইনি। হাই-এর বাবা (বারেক মিয়া) পাশের বাসায় লুকিয়ে ছিল। তাকে ডাকাডাকির পর সে আসে। লাশের পাশে আমি একা বসা। ফকির শাহাবুদ্দীনকে (এটর্নি জেনারেল) ফোন করলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসলেন। উনি বললেন, 'তুমি একা এখানে ?' আমি বললাম, 'জি'। উনি লাশ সংরক্ষণের জন্য বরফ ও চা-পাতার ব্যবস্থা করলেন। একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন বরফ ও চা-পাতাসহ। প্রতিবেশীর বাসায় মামানি ছিলেন। ওনাকে খবর দিলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গেই আসলেন। উনি যেন এক নিস্তব্ধ পাথরের মূর্তি। মামানির সেদিনের শোকাহত চেহারার বর্ণনা করা কঠিন।

৫ তারিখ সকালে ডাক্তার করিম সাহেব আমার সামনেই মামার শরীরের গুলির ক্ষত দেখেন। আমি তাকাতে পারিনি। ময়েজউদ্দীন সাহেব এসে বললেন যে আর্মি বাধা দিচ্ছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তারা মামা ও জেলে নিহত নেতাদের লাশ দাফন করতে দেবে না। আব্দুল মালেক উকিল মামাকে শেষ দেখা দেখতে আসেন। তারপর ওনার সঙ্গে আমিও কাছেই মনসুর আলী

সাহেবের আত্মীয়ের বাসায় যাই। সেখানে মনসুর আলী সাহেবের লাশ রাখা হয়েছিল। মালেক উকিল সাহেব ওই আত্মীয়ের বেডরুম থেকে বঙ্গভবনে ফোন করেন। আমি শুনলাম যে উনি ফোনে বলছেন যে 'খালেদ মোশাররফের কাছে আমাদের অনুরোধ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমরা একটু মাটি চাই এমন একজন মানুষের জন্য, যিনি দেশটাকে স্বাধীন করেছেন। তাজউদ্দীন সাহেবকে দাফনের জন্য একটু মাটি চাই।' মালেক উকিল মামার কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। বঙ্গভবন থেকে বলা হলো ওনার ফোন নাম্বার দিতে। বলা হলো যে ওনাকে কল ব্যাক করা হবে। মালেক উকিল বঙ্গভবন থেকে ফোনের অপেক্ষায় সেখানে রইলেন। আমি ওই সময় বড় মামার বাসায় চলে আসি। বাসায় পৌঁছে দেখি জানাজা বাদেই মামাকে বনানিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি তখন দৌড়ে পুলিশের আইজি ও ডিআইজিকে বললাম যে মালেক উকিল বঙ্গভবনে কথা বলছেন, যাতে ওনাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাফন করা হয়। আমার কথা শুনে ওনারা ওয়্যারলেস হাতে করে পুলিশের জিপে উঠে আবাহনী মাঠের দিকে গেলেন। সে সময় ট্রাক থেকে মামার লাশ আমরা নিচে নামাই। আমগাছের নিচে মামাকে রাখার পর সেখানেই মেজ মামা বড় মামার জানাজা পড়ান। পুলিশের বাধায় ও ভয়ে বহু লোকই বনানি গোরস্তানে যায়নি। আমরা বনানিতে পৌঁছার পর দেখি যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলী সাহেবদের লাশ দাফন হয়ে গিয়েছে।

এত বছর পরও যখন ওই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে হয়, তখন আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। আমি ব্যক্তিগতভাবে শুধু একজন মামাকেই হারায়নি, আমি হারিয়েছি একজন মহান নেতাকে। মামা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একক নায়ক। ওনার নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন হয়। ওনার দৃঢ় মনোবল ও নেতৃত্ব না থাকলে এত সহজে দেশ স্বাধীন হতো না। তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীও আত্মসমর্পণ করত না। অথচ ওনার কোনো মূল্যায়ন হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতেই চায় না। আওয়ামী লীগ বলে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণায় দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর ওদিকে বিএনপি মনে করে জিয়াউর রহমানের ঘোষণায় দেশ স্বাধীন হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে যে একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য চারটি মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন।

এক. হলো ভূখণ্ড
দুই. সার্বভৌমত্ব
তিন. জনগণ ও
চার. সরকার।

বঙ্গবন্ধু বা জিয়াউর রহমান সরকার গঠন করে রাষ্ট্রকে পরিচালিত করেননি। বা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করেননি। সেই কৃতিত্ব তাজউদ্দীন আহমদের। তিনি ওই চারটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন।

(সাক্ষাৎকার জুন ২৮, ৩০ ও ১৩ জুলাই, ২০১০)

তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি

উল্লেখিত ডায়েরিগুলো, সিমিন হোসেন রিমি সম্পাদিত, তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি (প্রতিভাস প্রকাশনা) হতে উল্লেখিত হলো। বাংলায় অনূদিত ডায়েরির পাশে, তরুণ রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র আব্বুর স্বহস্তে ইংরেজিতে লেখা ডায়েরি উল্লেখ করা হলো।

২৮ নভেম্বর '৪৭, শুক্রবার

৬-১৫ মিনিটে উঠেছি। সকাল সোয়া ৭টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। রাতে পড়াশোনা হলো না।

সকালে নাঈমউদ্দিন সাহেব এলেন। তিনি কামরুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। সাড়ে ১১টার দিকে শওকত সাহেব আমার কাছে এসে সাইকেলের দাম বাবদ নগদ ১০/- টাকা নিলেন।

বিকেল ৪টায় বলিয়াদি প্রেসে গিয়ে প্রুফ নিলাম। ৫টার দিকে কামরুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। ওয়াদুদ সেখানে ছিল। শামসুল হুদা সন্ধ্যা পর্যন্ত এলেন না। আমি তার কাছে গেলাম এবং ৭টা নাগাদ তাকে নিয়ে এলাম।

কামরুদ্দিন সাহেব সরদার বাড়িতে গিয়ে কাদের সরদারকে আনলেন। আউয়াল ও সামসুজ্জোহাও তার সাথে এলেন। একজন ভদ্রলোকসহ ক্যাপ্টেন শাহজাহানও এলেন। এতিম ছাত্র ও এতিমখানার জন্য সবকিছু শামসুল হুদাকে করতে হবে। কামরুদ্দিন সাহেব আউয়াল সাহেব ও সামসুজ্জোহাকে সঙ্গে নিয়ে তফাজ্জল আলীর কাছে গেলেন। আমি রাত সাড়ে ৮টার দিকে ফিরলাম।

আজ থেকে খুব ঠান্ডায় ভুগছি। শরীর খারাপ সত্ত্বেও রাত ১২টা পর্যন্ত প্রুফ দেখলাম। ১২টার দিকে বিছানায় গেলাম।

আবহাওয়া কিছুটা খারাপ।

বি. দ্র. আমি মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। হয়তবা প্রচণ্ডতর একটি, যখন দেখলাম কামরুদ্দিন সাহেবসহ কেউই এতিমখানার ছাত্রদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। সামান্য একটু চেষ্টার পরিবর্তে ছেলেগুলোকে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম ও তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর প্রথম, অষ্টম শ্রেণীর ফার্স্টবয় এবং সপ্তম শ্রেণীর মেধাবী এবং কুশলী কারিগরি ছাত্রগুলো, তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে হারাবে। এসব দরিদ্র এতিম ছেলেদের জন্য কেউ এতিমখানার ক্ষমতাধর ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। যদিও অতীতে এমন দেখা গেছে আমরা কালু, নূরুল হুদা ও আফতাবউদ্দিন ভূঁইয়া এবং অন্যদের জন্য গুরুত্বহীন বিষয়ে কত চেষ্টাই না করেছি। আমরা সংসদীয় রাজনীতির জন্য সময় দিতে পারি॥ কিন্তু যখন এসব ছেলেদের জন্য কিছু করতে চাই তখন সময়ের প্রশ্ন আসে। এ

ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিবেক ও স্বার্থের সাথে প্রতারণা করছি। আমাদের সব ভালো ভালো কথা জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। নির্দোষ ছেলেরা ! আমরা ভালোভাবেই জানি তাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।

২৯ জানুয়ারি '৪৮, বৃহস্পতিবার

সকাল সাড়ে ৬টায় ঘুম থেকে উঠেছি। সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। তারপর আর পড়াশোনা হলো না।

মখদুমী লাইব্রেরির হিসাব মেটানোর জন্যে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নাঈমউদ্দিন সাহেব এলেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে চলে গেলেন।

বিকেল সাড়ে ৩টায় নাজির লাইব্রেরিতে গিয়ে মহিউদ্দিনকে পেলাম না। সাড়ে ৫টা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করলাম।

৬টায় বসিরউদ্দিনের কাছে গেলাম, তারপর টাইম হলো। ঘড়ি তখনো মেরামত হয়নি। শনিবার যেতে হবে। সন্ধ্যে ৭টায় পুনরায় নাজির লাইব্রেরিতে এলাম, কিন্তু মহিউদ্দিনকে পাওয়া গেল না। সাড়ে ৭টায় মেসে ফিরলাম।

৯টায় বিছানায় ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া স্বাভাবিক।

৩০ জানুয়ারি, ৪৮, শুক্রবার

সকাল ৭টায় ঘুম থেকে উঠে ১০টা পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম। তারপর আর কোনো পড়াশোনা হয়নি।

১টার সময়ে নাঈমউদ্দিন সাহেবের একটি স্লিপ পেলাম। তিনি ২০টি টাকা চেয়েছেন। তাঁর জন্য ২০ টাকার একটি চেক দিয়েছি।

পৌনে পাঁচটায় ফজলুর রহমান এবং হাবিবুল্লাহকে সঙ্গে করে বের হলেন। লীগ অফিসে কিছুক্ষণ থেমেছি। মুজিব, শওকত, কালু, নুরুল হুদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ৫-৩০ মিনিটে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। ফজলুর রহমান এবং হাবিবুল্লাহ চলে গেল। হজরত আলীকে সঙ্গে করে ডা. করিমের কাছে এলাম। সেখানে ৭টা পর্যন্ত ছিলাম। সেখান থেকে সন্ধ্যে ৭টা ১৯ মিনিটে বসিরউদ্দিনের কাছে গেলাম। তার কাছ থেকে লেখার কপি নিলাম না।

সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটে কামরুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে ক্যাপ্টেন শাহজাহান সাহেবের বাসায় এলাম। সেখানে জলিলকেও দেখলাম।

আহা কি দুঃখের দিন। (শুক্রবার) : 'স্যাড নিউজ : বিষাদের বার্তা।

ঠিক রাত ৮টার সময়ে জলিল আমায় বলল : গান্ধীজীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

আমি এ কথা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু শাহজাহান সাহেবও এই খবর ঠিক বলে বললেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। প্রায় ৩ মিনিট আমার স্নায়ুগুলো যেন বিবশ হয়ে রইল। খবরটা শুনে আমার কণ্ঠ থেকে কেবল একটা চীৎকার-ধ্বনি বেরিয়ে এল। ৮-২০ মিনিটে কামরুদ্দিন সাহেব নীচে নেমে এলেন। তিনি ভয়ানকভাবে বিমূঢ় হয়ে গেছেন।

রাত সাড়ে ৮টায় নূরজাহন বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলাম। বেচারাম দেউরীতে রেডিওতে নিজের কানে সেই খবর শুনলাম। রাত ৯টায় ফজলুল হক হলে এলাম। সেখান থেকে ঢাকা হলে গেলাম। সেখানে ৯-৩০ মিনিট থেকে ১০টা পর্যন্ত রেডিওতে পণ্ডিত নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেলের ভাষণ শুনলাম। বাসায় ফিরলাম রাত ১১টায়। বিছানায় যখন গেলাম, তখন রাত ১২টা।

আবহাওয়া স্বাভাবিক।

মৃত্যু : আমি জীবনে এই প্রথম মৃত্যুর আঘাত পেলাম। মানুষের মৃত্যুর আঘাত। অথচ মানুষের মৃত্যুকে আমি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করি।

মহাত্মা গান্ধী : কাথিওয়ারের পোড় বন্দরে জন্মগ্রহণ। অক্টোবরের ২ তারিখ : ১৮৬৯ সাল। মৃত্যু : বিরলা ভবন : নয়াদিল্লী। ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ সাল। সময় ৫-৪০ মিনিট, অপরাহ্ণ (আই.এস.টি) : হত্যাকারীর বুলেট বর্ষণে মৃত্যু। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর ৩ মাস ২৮দিন।

গান্ধীজী অন্যান্য দিনের মতো ৫-১০ মিনিটে (আই.এস.টি.) তাঁর প্রার্থনা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। একটি লোক উঠে দাঁড়াল। সে পিস্তলের ৩টা গুলি করল। একটা গুলি মহাত্মার বুক ভেদ করে গেল। আর দুটো তাঁর তল পেটে বিদ্ধ হয়েছে। তাঁর নিদারুণ রক্তপাত ঘটেছে। ৩০ মিনিট পরেই মহাত্মা গান্ধী বিরলা ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হত্যাকারীকে জনতা সাথে সাথেই ধরে ফেলেছে। তার নাম নাথুরাম গডসে। সে বম্বের লোক। একজন মারাঠী। 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার সম্পাদক।

একথা স্মরণ করতে হয় যে, মাত্র ১০ দিন আগে ২০ জানুয়ারি একটা লোক গান্ধীজী যখন তাঁর সান্ধ্য প্রার্থনায় ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। কিন্তু সে লোকটা গুলি করেও পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

আমার কাছে মৃত্যু একটা সাধারণ ব্যাপার, স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি কারুর মৃত্যুতে কোনোদিন শোক প্রকাশ করিনি। আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যুর কথা আমার এখনো স্মরণ আছে। ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্য আমার মনে কোনো দুঃখবোধ জাগেনি। তেমন দুঃখবোধের কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

আমার বাবার মৃত্যুর কথাও আমার মনে আছে। মাত্র এক বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বছরটা শেষ হতে আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি। তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমি কোলকাতায় ছিলাম–তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাঁর মৃত্যুতেও আমার মনের মধ্যে কোনো দুঃখ জাগেনি। তাঁর মৃত্যুতে কেবল কাঁধের উপর পারিবারিক বোঝার ভারটা যেন জীবনে প্রথমবারের জন্য বোধ করলাম।

আমার মনে আছে, বাবার মৃত্যুর খবর শোনার মাত্র ১৫ মিনিট পরেই আমি ৪টা পরাটা এবং এক বাটি মাংস খেয়েছিলাম। আমার তো একথাও মনে আছে, তার পরের রাতে, যে বিছানাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেই বিছানাতে আমি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিলাম।

✓ 30.1.48 Rise 7 a.m. Study 7-30 a.m. to 10 a.m.
— No study afterwards.
// At 1 p.m. Naimuddin sent a slip for
20/- — gave a cheque of 20/-
At 4-45 p.m. went out with Fazlur Rahman
& Habibullah — halted in League office — Mujib
Showkat, Kalu, Nurul Huda were present — Came
out at 5-30 p.m. — Fazlur Rahman & Habibullah gone
— with Hazrat Ali — came to Dr. Karim — remained

Time upto 7 p.m. — Came to Basiruddin at 7-15 p.m.
— He did not take the copy.
// Came to Mr. Shahjahan's house at 7-45 p.m.
to meet Kamruddin Sb. — Jalil was there

Sad day (Friday) — Sad news.

Just at 8 p.m. Jalil told me that Gandhiji
was shot dead — I could not believe —
Mr. Shahjahan corroborated. — I was puzzled
and for about 3 minutes I remained in nervousness
— at the first utterance of news a peculiar
harsh cry like voice came out of my voice
— Kamruddin Sb came down at 8-20 p.m.
he was very much upset.
At 8-30 p.m. came out from Shahjahan's building
— heard the news of Radio at Bechuram's Dewry with
my own ears — came to J. H. Hall at 9 p.m.
& then to Dacca Hall — heard Pandit Nehru's
speech and that of Sardar Patel from 9-30 p.m. to
10 p.m. — Came back at 11 p.m.
Bed at 12 p.m. / Weather normal.

For the first time I got shock from human
death which I always take for a very usual
thing to happen.

Mahatma Gandhi — born at
Porbandar, Kathiwar, on 2nd October
1869 — died at Birlabhaban, New
Delhi, on 30th January, 1948 at
5-40 p.m. (I.S.T.) from assailants' bullet
shot. — He was 78 years 3 months 28 days

Gandhiji was as usual proceeding towards the dias of his evening prayer meeting at 5-10 pm (I.S.T.) when one man stood up and shot 3 round pistol bullet one penetrating Mahatma's chest and two others his abdomen — he fell senseless — Manu Gandhi and Ava Gandhi supported him — he was profusely bleeding — after 30 minutes he breathed his last in Birla Bhaban

The Assailant was immediately caught by the audience — His name is Nathuram Vinayak Godse — he is a Bombey Marahtta — Editor of Hindu Rashtra

It is to be remembered that only on 20th January, 10 days before, one man threw Bomb towards Gandhiji while he was addressing the gathering of his prayer meeting in the evening — but that time he escaped.

31·1·48 Rise 8 A.m. No. Study

Attended the Condolence meeting at the University premises — Began under presidency of Dr. Hasan at 12-30 p.m. — dissolved at 2 P.M. — Messrs. Dr. M. Hosain, Dr. Sm. Hosain, Kazi Motahar Hosain, Prof. Muzaffar Ahmed Chowdhury, B.A. Siddiqui & others spoke.

At 2-30 p.m. went to Rly station to get news paper — People were rushing for paper in such a way as not seen even in the 3rd class Booking Office of the Cinema Halls of Dacca — Man upon man.

৩১ জানুয়ারি '৪৮, শনিবার

সকাল ৮টায় ঘুম থেকে উঠলাম। কোনো পড়াশোনা হলো না।

ইউনিভার্সিটি চত্বরে শোক সভায় গেলাম। ১২-৩০ মিনিটে ড. এম. হাসানের সভাপতিত্বে সভা শুরু হলো। শেষ হলো ২টায়। যাঁরা বক্তৃতা করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন : ড. এম. হোসেন, ড. এস. এম. হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রফেসর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, বি. এ. সিদ্দিকী। এ ছাড়াও অন্যান্য বক্তা ছিলেন।

২-৩০ মিনিটে রেল স্টেশনে গেলাম খবরের কাগজের জন্য। লোকে খবরের কাগজের জন্য এমনভাবে দৌড়াচ্ছে, ভিড় করছে যে, সে ভিড় ঢাকার সিনেমা হলের থার্ড ক্লাসের কাউন্টারের ভিড়কে ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের উপর মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। একজন আর একজনকে চেপে ধরছে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। একের পায়ের নিচে অপরের চাপা পড়ছে। একজনকে মাড়িয়ে আর একজন চেষ্টা করছে খবরের কাগজের একটু টুকরাও পেতে পারে কিনা। সেখানে যদি পাওয়া যায় এই লোকটির খবর। লোকটিকে এতদিন কি তারা এমনভাবে সত্যই ভালোবেসেছিল ? কোনো কিছু পাওয়ার জন্য মানুষের এমন ভিড় আমি জীবনে আর দেখিনি। কী নিদারুণ চাহিদা কাগজের। আর কাগজের কী দাম !

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিনের সংবাদপত্রের চাহিদা আর মূল্যের স্মৃতি আমার আছে। যে কাগজে সে দিনের মর্মান্তিক খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল, তখন পয়সা দিয়ে তার একটা পুরো কাগজ আমরা কিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ পুরো কাগজ নয়। একজন আর একজনের সঙ্গে ভাগ করে কিনেছে খবরের কাগজ। এমনি তার চাহিদা। এক ঘণ্টার মধ্যে কাগজ সব শেষ হয়ে গেল। কোনো কাগজ আর পাওয়া গেল না। তবু লোকের ভিড় কমল না। তারা অপেক্ষা করতে লাগল যেন আবার ট্রেনে কাগজ আসবে। তারই জন্য অপেক্ষা।

৩-৩০ মিনিটে নাজির লাইব্রেরিতে গেলাম। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রয়াত মহর্ষির শেষকৃত্যের ধারা বিবরণী ৬-১৫ মিনিট পর্যন্ত শুনলাম। সাড়ে সাতটায় মেসে ফিরে এলাম। ১০টায় বিছানায় গেলাম।

সমস্ত শহরে হরতাল হয়েছে। ঢাকার জন্য এ দৃশ্য অভাবিত। ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে শোক মিছিল বেরুল। ৫টায় শ্রীশ চাটার্জীর সভাপতিত্বে করোনেশন পার্কে শোক সভা এবং মৌন প্রার্থনা হলো। কোনো বক্তৃতা নয়।

সূর্য অস্তমিত হলো। এবং অস্তমিত হলো মানবতার পথের দিশারী আলোকবর্তিকা। তাহলে কি অন্ধকার নেমে এল। আলো এবং অন্ধকার। অন্ধকার এবং আলো। দিনের পরে তো রাত্রির আগমন এবং দিনের আগমনে নিশার অপসারণ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। তার পরে তো সূর্যের কিরণ। ক্ষীণতনু নতুন চন্দ্র। কিন্তু তারপরে তো আনন্দময় পূর্ণ চন্দ্রের আবির্ভাব। হতাশার শেষ তো আশাতে। সংকটময় মুহূর্ত তো তিরোহিত হয় বিস্মৃত অতীতে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের সৃষ্টিতে রূপায়িত হয়। জগৎ তো থেমে থাকে না। অনিবার তার এই চক্র।

যে মানুষটির শোকে আজ আমরা মুহ্যমান, সে লোকটি তো অন্ধকারের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আলোতে পৌঁছেছিলেন। তাঁকেও তো অন্ধকারে আলোর অন্বেষণে উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে। অথচ কী বিস্ময় ! তিনি নিজেই তো ছিলেন একটি আলোকবর্তিকা। আলোককে কি তুমি ধ্বংস করতে পার ? আলোর কণিকা আমাদের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থিত হতে পারে। কিন্তু তাতে কী ? ধ্রুবতারার দূরত্ব অকল্পনীয়। কিন্তু বিজন মেরুতে অভিযানকারীর সেইই তো একমাত্র দিক নির্ধারক। যুগ থেকে যুগ। তার চোখের ক্ষুদ্র কল্পনাটিও আমাদের পথের দিশা প্রদান করে। তাহলে বেদনা কেন ? বহু যুগের এই ধ্রুবতারার কাছ থেকে আমরা নির্দেশ গ্রহণ করব। তাঁর ফেলে যাওয়া পায়ের চিহ্ন ধরে আমরা অগ্রসর হব। তিনি শান্তি লাভ করুন। 'আমিন'।

১১টা ৪৫ মিনিটে, সকালে (আই. এস. টি.) মহাত্মার মরদেহকে বিরলা ভবন থেকে শোভাযাত্রা করে বহন করে আনা হলো। শবাধারটি বহন করেছে সামরিক বাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ। কারণ ভারত মহাত্মার শেষকৃত্যকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বলে ঘোষণা করেছে।

৪-২০ মিনিটে শবাধার যমুনার তীরে রাজঘাটে এসে পৌঁছল। ৪-৩০-এ দেহটিকে চিতায় শায়িত করা হলো। উত্তর দিকে রক্ষিত হলো তাঁর শিরদেশ। দেবদাস গান্ধী দেহটির ওপর চন্দন কাঠের একটি স্তূপকে স্থাপন করলেন। বিকেল ৪-৫৫ মিনিটে (আই.এস.টি.) রামদাস গান্ধী চিতায় অগ্নি সংযোগ করলেন। ৫টার মধ্যে মহাত্মার দেহ ভস্মে রূপান্তরিত হয়ে গেল। মহাত্মার শিয়রে পণ্ডিত রামদাস শর্মা মন্ত্র পাঠ করলেন।

মহাত্মার চিতায় ১৫ মণ চন্দন কাঠ, ৪ মণ ঘি, ২ মণ সুগন্ধী, ১ মণ নারকেল এবং ১৫ সের কর্পূরের সমাহার ঘটেছিল।

আমার আর কিছু না থাক চুল আঁচড়াবার বিলাস আছে। হোক সামান্য। তবু তো বিলাস। আজ কিন্তু সেটুকুও আর রইল না। আজ আর আমার গোসল হলো না। ৪৮ ঘণ্টা ধরে আমার কেশবিন্যাসও ঘটল না। আমার মনে আছে, একবার ১০ মহররমে মুখে স্নো মেখেছিলাম বলে ওয়াসেফ সাহেব মুসলিম লীগ অফিসে আমাকে তিরস্কার করেছিলেন। সে দিন আমি জবাব দিয়ে বলেছিলাম : দুঃখের এমন প্রকাশে আমি বিশ্বাসী নই। কিন্তু সেই আমিই গত দুদিন ধরে আমার কেশ বিন্যাসকে পরিত্যাগ করেছি। অন্তরের এক তাগিদে, বিস্মৃতির এক অপরিহার্যতায়।

straggling the one, suffocating the other and
trampling yet another was rushing forward to get
at least a scrap of paper where in lay the
news of their hitherto unfelt beloved friend
— I never saw such a crowd aiming at
getting something — I remember the demand and high
price of papers which published the sad demise
of the great Poet Robindranath — yet a then
a full paper was got at paying — but this time
the paid others shared the scraps — such was
the demand — within 1 hour no paper was
available — people were searching and caring
for papers as if mail has had to arrive still.
— At 3-30 pm went to Nazir Library —
heard the Cremation Ceremony of the
great Sage over A.I.R. upto 6-15 pm.
— Back to mess at 7-30 pm — Bed at 10 pm.
/ Whole City observed Hartal — an
unprecedented scene for Dacca City
/ Condolence procession went out from
Victoria Park — met in a Condolence meeting
at Coronation Park under presidency of Srish
Chatterjee at 5 pm — Silent prayer — no speech.

To me death is a common and natural
thing — I never mourn for anybody's death.
I remember the death of my elder brother which
took place in 1944. — I was absent during his
death — but I could not find any reason why
I should be sorry for him.

I remember the death of my own father only one year before — a few days to complete the year — I was at Calcutta during his death in spite of his will — mourning was completely absent in me — I only felt the burden of the family for the first time — I remember that I took 4 potatoes and a complete full cup of meat just about after 15 minutes of the receipt of the news of my father's demise and I also remember how I slept a sound sleep at the next night of my father's death in the very place where he breathed his last.

But the case is different with me at the death of Gandhiji. I wanted to shake off the melancholy in me as weakness. I took my night meal at 12 pm in spite of my will. But I could not sleep well against my will. While I was awake I saw in Gandhiji. Then slumber caught me due to tiredness it took me to Gandhiji.

In the past the same I spoke against this great soul for political achievement though not from conviction. To strengthen Muslim League was to weaken Congress; and the best way of weakening Congress was to belittle Mahatma Gandhi, the very soul of the great organization. This was the only explanation of my conduct.

২১ মার্চ '৪৮, রবিবার

সকাল সাড়ে ৭টায় ঘুম থেকে উঠেছি। পড়াশোনা হলো না।

বিকেল সোয়া ৩টায় আসগর সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে এফ. এইচ. এম. হলে গেলাম সেখানে নাঈমউদ্দিন সাহবের সঙ্গে দেখা হলো।

বিকেল সাড়ে ৪টায় রেসকোর্স ময়দানে কায়দে আযমের জনসভায় গেলাম। কায়দে আযম এলেন সোয়া ৫টায়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে নবাবের বক্তৃতার পর কায়দে আযম পৌনে ৬টায় তার বক্তৃতা শুরু করলেন। পৌনে ৭টা পর্যন্ত ১ ঘন্টা বক্তৃতা করলেন। তিনি মন্ত্রিসভা ও মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার চালালেন এবং সাম্প্রতিক ভাষা আন্দোলনের নিন্দা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, উর্দুই হবে রাষ্ট্র ভাষা। পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা বাংলা হবে কি না সে ব্যাপারে চূড়ান্তরূপে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন। ছাত্রদেরকে সাবধান করে দিলেন এবং প্রায় সরাসরি তাদেরকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এফ. এইচ. এম. হলে ফিরে এলাম। তোয়াহা সাহেব অ্যাসেমব্লি হলের সামনে ন্যাশনাল গার্ডদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন। তারপর জনাব মোহাজের ও জহিরউদ্দিনও বক্তৃতা করলেন।

রাত ৯টার দিকে মেসে ফিরে এলাম। ১১টায় ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া স্বাভাবিক।

আজ সকাল থেকে ঠান্ডায় ভুগছি।

বিঃ দ্রঃ কায়দে আযমের ভাষণ এ প্রদেশের সবাইকে আহত করেছে। প্রত্যেকেই নিদারুণ বিরুক্ত– তিনি দলের ওপরে উঠবেন সবাই সে আশাই করেছিল।

২৪ মার্চ '৪৮, বুধবার

সকাল সাড়ে ৭টায় ঘুম থেকে উঠেছি। পড়াশোনা হলো না।

১০টার দিকে শওকত সাহেব এসে নারায়ণগঞ্জে দলের জনসভার কথা জানালেন।

সাড়ে ১১টায় তোয়াহা সাহেব এলে তাকে নিয়ে কামরুদ্দিন সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি বেরিয়ে গেছেন। আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে ১২-৪৫ মিনিটে নারায়ণগঞ্জ রওনা হয়ে সোয়া ১টায় সেখানে পৌছলাম। ২টায় কামরুদ্দিন সাহেব ছাড়া সবাই হাজির। তোয়াহা সাহেব সভা মুলতবির প্রস্তাব দিলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। সভা আগামীকাল সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। বিকেল সাড়ে ৩টায় আমরা ঢাকায় ফিরে কামরুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। সেখানে কাসেম ও অলি আহাদ উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র লীগের ব্যাপারে আলোচনার জন্য আব্দুর রহমান চৌধুরীকে সাথে নিয়ে তোয়াহা সাহেব বিকেল সাড়ে ৫টায় কায়দে আযমের সঙ্গে দেখা করলেন। শাহ আজিজের উপস্থিতিতে তাদের আলোচনা প্রায় ঘণ্টাধিককাল স্থায়ী হলো। কায়দে আযম ইস্ট পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্ট লীগের ব্যাপারে একমত হলেন এবং একটা গঠনতন্ত্র তৈরি করে নতুন করে শুরু করতে বললেন। তিনি অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্ট লীগকে বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কায়েদে আযম রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম কমিটিকে একটা সাক্ষাৎকার দিলেন। আমরা তার সামনে একটা স্মারকলিপি দিলাম। কিন্তু কায়দে আযম আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে দিলেন না। তিনি উর্দুর পক্ষে তাঁর নিজস্ব মতামত দিতে লাগলেন যা চরমভাবে যুক্তিহীন। তিনি আমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, আমরা যেন উর্দুকে আমাদের মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করি। তিনি যা বললেন, 'তোমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত উর্দু'। আমরা হয়ত কিছুটা হলেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে পারতাম, যদি না শামসুল হক সাহেব তাঁকে উত্তেজিত

করতেন। সোয়া সাতটা পর্যন্ত আলোচনা হলো। কায়দে আযম অনেক ঘটনা অস্বীকার করলেন। হয় এসব ব্যাপারে তিনি জানেন না, না হয় ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি এটা করছিলেন।

এফ. এইচ. হল হয়ে মেসে ফিরলাম। হলে প্রায় রাত ৯টা পর্যন্ত দেড়ঘন্টা ধরে আলোচনা করলাম।

১১টায় ঘুমাতে গেলাম।

আজ বেশ ভালো লাগছে।

আবহাওয়া স্বাভাবিক।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, শুক্রবার

সকাল ৭টায় উঠেছি। পড়শোনা হয়নি।

বেলা ১২টায় ডি.এফ.ও.র অফিসে গেলাম। কিন্তু তিনি তার অফিস রুমে ছিলেন না। ছিলেন উপর তলায়। বেলা সোয়া ১২টায় স্টেশনে ফজলুর সঙ্গে দেখা করলাম এবং আজিজ মিয়ার কাছে কিছু নির্দেশ পৌঁছে দেয়ার জন্য তাকে বললাম। জালালও বাড়ি যাচ্ছে। বেলা ১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলি, ইসলামপুর, দিগবাজার, ইংলিশ রোড, চক প্রভৃতি এলাকা ঘুরে বেড়ালাম। হিন্দুদের ওপর কিছু মুসলমানদের ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করতে করতে। রাত কাটালাম কামরুদ্দিন সাহেবের বাসায়।

আবহাওয়া : মধ্যদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। দিনের তিন-চতুর্থাংশ সময় এক পশলা বৃষ্টি হলো। রাত থেকে জোরে বাতাস বইছে।

বি. দ্র. স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো ঢাকা আজ দুপুর ১২টা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করল। গত তিন/চার দিন ধরে কোলকাতায় যে দাঙ্গা চলছিল এটা তারই ধারাবাহিকতার ফল। শরণার্থীরা বিশেষ করে বিহারিরা এই গোলযোগের জন্য দায়ী। স্থানীয় জনগণ যদিও এসবের বিপক্ষে নয়, তবে তারা উদাসীন। সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম লুট, হত্যা আর অগ্নিসংযোগ চলল। পুলিশ এসব বন্ধ করার কোনো চেষ্টাই করল না। অবাঙালি পুলিশেরা বরং উৎসাহ যোগাচ্ছিল। পুরো প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল। সরকারের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কারফিউয়ের ঘোষণা দেয়া হলেও তা কার্যকর করা হলো না। বর্তমান গোলযোগের উৎপত্তি নিহিত আছে ভারত ইউনিয়নের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার প্রতিপক্ষদের মধ্যে। মূলত গত সপ্তাহে কোলকাতায় মুসলমানদের উপর যা ঘটেছে এটা নিঃসন্দেহে তারই বহিঃপ্রকাশ। উদ্দেশ্যমূলক না হলেও পূর্ব বাংলা অ্যাসেমব্লির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এম. এল.এ দের একটি অবিবেচক পদক্ষেপ এই ঘটনাকে গুরুতর করে তোলে। সংসদের কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব-বাংলার সংখ্যালঘুদের 'রক্ষা' করার জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন, এই প্রদেশের মুসলমানদের অসন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এম.এল.এ দের এই পদক্ষেপগুলো যতই সরল বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ নাগরিক অধিকার বোধ থেকেই উৎসারিত হোক না কেন এর বিরুদ্ধে অতি উদারপন্থীদের ঠিক সন্দেহ না হলেও অসন্তোষ ছিলই।

এছাড়াও সচিবালয়ের কেরানিদের আরো একটি অপরিকল্পিত পদক্ষেপের ফলে বিস্ফোরণ উন্মুখ এক বারুদের স্তূপে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়া হলো। যখন কেরানিরা ভারতীয় দূতাবাসের সামনে মিছিল করে এসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব সি. এম. সেনের কাছে তাদের অনুভূতি বর্ণনা করে ভারত প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে প্রশংসিত হয়। সি. এম. সেন আমাদের মুখ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। শরণার্থীরা, বিশেষত বিহারিরা যারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তারা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। বেচারা কেরানিদের সাংবিধানিকভাবে পদক্ষেপ নেয়ার আন্তরিক ইচ্ছা মারমুখী জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এই

জনতা কেরানিদের চারপাশে জড়ো হয়েছিল এবং যাদের অধিকাংশই ছিল শরণার্থী। দাঙ্গাকারীদের এই আক্রমণের ফলে প্রথমে আক্রান্ত হয় সংখ্যালঘুদের বিষয়-সম্পত্তি এবং তারপর ব্যক্তি। ক্রমবর্ধমানভাবে পূর্ণোদ্যমে হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকল। দোকানপাট ইতোমধ্যেই লুণ্ঠিত হয়েছে। হিন্দুদের জীবনটাই দুষ্কৃতিকারীদের মনোযোগের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিছু পরিবার সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপকসংখ্যক বিচ্ছিন্ন সহিংসতার ঘটনাও ঘটছে। চলন্ত ট্রেনের কামরায় নৃশংসভাবে হত্যার খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

সরকার বিচ্ছিন্ন হিন্দু পরিবারগুলোর জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খুলেছে। প্রধান প্রধান সড়কগুলো সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বিকেল ৫টা থেকে বাড়িয়ে সকাল ৮টা পর্যন্ত করা হয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও ডানে বামে চতুর্দিকে মানুষ নিধন চলছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের পক্ষে এবং দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করছে না।

১০ তারিখ থেকে জীবনের উপর হামলা চলছে। দাঙ্গাকারী জনতার রোষ কমে এলে ঘটনা শান্ত হবার কোনো চিহ্ন নেই।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, শনিবার

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি।

৯টায় রায়েদের কাচারি ঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে আসিরুদ্দিন মোল্লার সুপারিশ করা দরখাস্ত পেলাম। কাচারি ঘরে অনানুষ্ঠানিক মিটিং হলো। স্থানীয় গণ্যমান্য মুসলিম ব্যক্তিবর্গ, আবিদ বেপারি, হাসেন মৃধা, নবাব পালান প্রমুখ প্রায় ৪০ জন হিন্দু ও মুসলিম ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে গোলযোগ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের অবস্থান এবং ঘটনার প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করলাম। তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এখানে উপস্থিত সবাই সরকারের পাশে থাকা এবং গোলযোগ বন্ধের শপথ করল। বেলা আড়াইটায় বরামার উদ্দেশে রওনা হলাম।

বরামাতে হেডমাস্টার মফিজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। সেই সময় কাপাসিয়া থানার সেকেন্ড অফিসার একজন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে সেখানে ঝোয়াদিতে ২টি ভৌমিক পরিবার এবং ৩টি শুক্লাদাস পরিবারকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে দেখলাম। বাড়ি ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ব্রজেন্দ চন্দ্র ভৌমিক সেকেন্ড অফিসারের কাছে এজাহার দিলেন।

স্থানীয় মুসলমানরা তাদেরকে রক্ষা করেছে। মীর মোহাম্মদ নামে একজন গুন্ডাদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে গেলে গুন্ডাদের হাতে আহত হন। ঠিক সন্ধ্যায় সেকেন্ড অফিসার ও আমি মীর মোহাম্মদের বাড়িতে গেলাম। এরপর সঞ্জীব রায়ের বাড়ি হয়ে বরামাতে ফিরে এলাম। সঞ্জীব রায়ের বাড়ির পাশে ৪টি অগ্নিদগ্ধ বাড়ি দেখলাম। সেখানে কোনো বাসিন্দা ছিল না।

আমরা রাত সাড়ে ৮টায় বরামাতে সভা করলাম। সভায় অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। শাহেদ আলি বেপারি, হুসেইন আলি খাঁসহ আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দাঙ্গার কারণে সর্বস্তরে যে ক্ষতিকর কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে আমি তার উপর জোর দিয়ে দীর্ঘসময় ধরে বক্তব্য রাখলাম এবং শান্তির জন্য আবেদন জানালাম। উপস্থিত সবাই সমস্বরে তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করবেন বলে শপথ উচ্চারণ করলেন।

স্কুলের হেডমাস্টার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং স্থানীয় মুসলমানরা বরামার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের রক্ষা করেছে। রাতের খাবার শেষে পুলিশের সেকেন্ড অফিসার হুসেইন খানের বাড়িতে গেলেন এবং আমরা রাতে বরামাতে থেকে গেলাম।

রাত প্রায় ১২টার দিকে ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া : স্বাভাবিক। প্রায় শীতহীন রাত।

15.2.50

Rise: with sunrise.

In the morning Abdul Khan, Waris Ali, Tafazzal, Cherag Ali Moral etc came talked about DFO's coming the next day.

In the noon went for arbitration making to Bhaleswar between Cheraj Ali - Moral & Sahad Ali over land sold by the former. Returned in late noon.

In the afternoon went to Hajibari Skt. Returned after evening. Amsar talked about Ayub Ali's action regarding Foresters affairs.

Mofizuddin returned from N.rayanpur.

Weather: Normal as before.

P.S. Aziz mia came & took a petition written by me for CO.

18.2.50

Rise: early morn.

To Raid Katchari at about 9 A.M. & had the petition of ~~Sirajuddin Molla accompanied. Held an informal~~ meeting in the Katchari. Almost all leading muslims of the locality including Abid Bepari, Hashem Mridha, Nabar palan etc. numbering about 40 persons both Hindus & Muslims attended. Explained the real position & the stand of Pak Govt. regarding present disturbances. High tension prevailed. All present promised to stand by Govt. and stop the disturbance. Left for Borama at about 2-30 P.M.

In Barama met the Hd Master Mr. Mofizuddin. At this moment II Officer of Kapasia appeared there with an armed constable. He led us to the places of occurrence. At Jhowadi we found 2 Bhowmic & 3 Sukladas families at distress. Houses were burnt to ashes. One Brojendra Ch. Bhowmic lodged ejahar with the S.I. Local muslims gave them protection. One Mir Mahamad was wounded by the goondas when he was protesting against their action. The S.I. & I took meal just in the evening in Mir Mahamad's house.

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, বৃহস্পতিবার

ভোর সাড়ে ৫টায় উঠেছি।

সকালে আমি যখন পুকুরে গোসল করতে গিয়েছিলাম তখন রফিক আমার বিছানার বালিশের নিচ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়। নাশ মিয়া, জয়তুনের বাপ প্রমুখের সহায়তায় ১৪৭ টাকা আট আনার মতো তার কাছ থেকে উদ্ধার করা গেল। এই ঝামেলার কারণে আমি সকালের ট্রেন ধরতে পারলাম না।

বেলা ১২টা ১৪ মিনিটের ট্রেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। একই কামরায় আমার সহযাত্রী ছিলেন এফ করিম ও ডা. আহসানউদ্দিন। রাজেন্দ্রপুর থেকে উঠলেন হাসান মোড়ল। স্কুল সম্পর্কিত বিষয়াবলি, তার দায়িত্ব ও ২৪.০২.৫২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ম্যানেজিং কমিটির সভা নিয়ে আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ট্রেন থামতেই আমি এবং এফ করিম সেখানে নেমে গেলাম। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিশাল জনসমাবেশ। মেডিক্যাল কলেজ ও অ্যাসেমব্লি হলের কাছে এইমাত্র পুলিশের টিয়ার গ্যাস ছোড়ার বিষয়ে লোকজন বলাবলি করছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রায় ২০ মিনিটের মতো থেমে ডিপিআই অফিসে গেলাম। মুসলিম এডুকেশন ফান্ডের গ্রান্ট-ইন-এইডস সম্পর্কিত সহকারীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে জানালেন এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি স্মারক পাঠিয়ে দেবেন। বেলা ৩টার দিকে আমি ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল.ম।

ইডেন ভবনের দ্বিতীয় গেটের কাছে আকবর আলী বেপারির সঙ্গে রেনুকে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তারক সাহার বাড়ি ও বরমি বাজারের দোকানটি তিনি কিনে নেবেন। এটি কিনতে টাকার জন্য তিনি জমি বিক্রি করবেন। তার সঙ্গে কথা বলে বাসে উঠলাম এবং বেলা সাড়ে ৩টায় এসডিও (উত্তর)-এর আদালতে উপস্থিত হলাম। এসডিওর সঙ্গে তার খাস কামরায় দেখা করলাম বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে।

আমাদের স্কুল ও ২৪.২.৫২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ম্যানেজিং কমিটির সভা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করলাম। প্রধান শিক্ষকের বিষয়াবলি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনাটি কীভাবে সুরাহা করা যায় সে ব্যাপারে আমার পরামর্শের সঙ্গে তিনি একমত হলেন। তিনি আমাকে ৩.৩.৫২ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির একটি সভা আয়োজন করার জন্য বললেন। তখন তিনি শ্রীপুর থাকবেন। এরই মধ্যে তিনি আমার অনুরোধে শ্রীপুরের উদ্বাস্তু মিস্ত্রিদের ত্রাণের আবেদন অনুমোদন করলেন। তার চেম্বার ছাড়লাম বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটে। আদালতের রেস্তোরাঁয় সিআইবির অ্যাসিস্ট্যান্ট মহিউদ্দিন ও আমাকে সাদির মোক্তার নাস্তা খাওয়ালেন। বিকেল পাঁচটার দিকে আদালত ছেড়ে এলাম।

কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করলাম এবং দেরি না করে তাঁর সঙ্গে ৯৪ নবাবপুর এএমএল অফিসে এলাম। মিনিট পাঁচেকের জন্য সেখানে থেমে কেমব্রিজ ফার্মেসিতে গেলাম। জহির ভাই–এস এম জহিরউদ্দীনও আমাদের চা দিলেন।

ডা. করিম ও আমি মেডিক্যাল কলেজে গেলাম। পুলিশের গুলিতে আহত ও নিহতদের মৃতদেহ দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। ডা. করিম চলে গেলেন। আমি মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ইতস্তত ঘোরাফেরা করে রাত ১১টায় যোগীনগরে ফিরে গেলাম।

রাতের খাবারের পর ভাবির সঙ্গে কথা বললাম রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত।

বিছানায় গেলাম রাত ১টায়।

আবহাওয়া : স্বাভাবিক। অপেক্ষাকৃত কম ঠান্ডা।

বি. দ্র. আজ দুপুরে খেতে পারিনি।

গভীর রাতে সাড়ে ৩টায় পুলিশ বাহিনী আমাদের বাড়ি ঘেরাও করল এবং যুবলীগের অফিসে তল্লাশি চালাল। তারা ক্ষতিকর বা অবৈধ কিছু খুঁজে পেল না। যুবলীগের অফিস লাগোয়া আমার শোবার ঘর, তাই আমি ঘর থেকে সরে পড়ায় তারা আমার উপস্থিতি টের পায়নি।

ভোর ৪টায় তারা চলে গেল। এরপর আর ঘুমাইনি।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট চলছে। গতকাল থেকে এক মাসের জন্য সিআর. পিসি, ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আজ বিকেলে অ্যাসেমব্লি বসেছে। ধর্মঘট পালনকারী ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অ্যাসেমব্লি হাউসের কাছে জড়ো হয়; যাতে তাদের কণ্ঠ অধিবেশনে উপস্থিত এমএলএরা শুনতে পান।

প্রথমে শুরু হলো গ্রেফতার করা। এরপর কাঁদনো গ্যাস ছোড়া হলো। তারপর গুলি চালানো হলো মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসে। গুলিতে চারজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হলো ৩০ জন। জানা যায় ৬২ জনকে জেলে পোরা হয়েছে। আরও শোনা যায় পুলিশ কয়েকটি মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে। বেসরকারি সূত্রের দাবি, মৃতের সংখ্যা ১০ থেকে ১১ জন।

অক্টোবর ১৪, ১৯৭৪ সোমবার : দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক পূর্বদেশ

খাদ্য সংকটকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে; নিরন্ন মানুষকে বাঁচাতে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসুন : অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, বর্তমান জাতীয় দুর্যোগকালে উট পাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকলে চলবে না। বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। অবিলম্বে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে জাতীয়ভাবে খাদ্য সংকটের বাস্তব সমাধানের পথে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি গতকাল ঢাকা বিমানবন্দরে এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, সকল দল ও মতের নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে বর্তমান খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী পন্থা গ্রহণের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অনুরোধ করবেন। তিনি তার বক্তব্য দ্বারা কোনো সর্বদলীয় বা জাতীয় সরকার গঠনের কথা বলছেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেছেন যে, সে প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বর্তমান সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। কদিন আগের উপ-নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে। তিনি বলেন, খাদ্য সমস্যাকে অবশ্যই রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র বক্তৃতা, বিবৃতি, শ্লোগান দিয়ে সংকটের সমাধান হবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৫৬ সালের সর্বদলীয় খাদ্য কমিটির কথা উল্লেখ করেন।

অর্থমন্ত্রী আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলেন, মানুষ না খেয়ে মরছে– এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। এর অবসান ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, মাটি আর মানুষ নিয়ে দেশ– বাংলাদেশ এখন সার্বভৌম, তার মাটি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু মানুষ না থাকলে কাকে নিয়ে রাজনীতি, কার জন্যই বা রাজনীতি। মানুষ যখন মরে যাচ্ছে তখন নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা যায় না। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে যারা ব্যর্থ হবে তাদের ব্যক্তি নির্বিশেষে ছাঁটাই করা দরকার। এমনকি আমি যদি হই আমাকেও বাদ দেয়া উচিত। মোটকথা যে কোনো মূল্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মতো বর্তমান সঙ্কট মোকাবেলা করে মানুষ বাঁচাতে হবে।

জনৈক সাংবাদিক বর্তমান গণঐক্য জোটের পরিপ্রেক্ষিতে তার দলমত নির্বিশেষে খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দাবি করলে অর্থমন্ত্রী বলেন, আমি গণঐক্য জোটকে আরো ব্যাপকভিত্তিক (ব্রড বেজড) করার কথা বলেছি। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, আমি মনে করি কিছুসংখ্যক (মাইক্রোস্কপিক মাইনরিটি–) লোক যারা বিদেশের এজেন্ট, তারা ছাড়া এ দেশের

সকল মানুষ দেশপ্রেমিক। তাছাড়া বিরোধী দল করলেই মানুষ অ-দেশ প্রেমিক হয় না। দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, কেউ অভিজাত বিপণী কেন্দ্রে মার্কেটিং করবে আর কেউ না খেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে এ অবস্থা চলতে দেয়া যেতে পারে না। তিনি আরো বলেন, যারা আজ না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে পথে-ঘাটে পড়ছে-মরছে, তারা আমাদের মানবতাবোধের প্রতি বিদ্রুপ করে বিদায় নিচ্ছে। তিনি জানান যে, বিদেশ সফরকালে তিনি বিদেশি সংবাদপত্রে বাংলাদেশে অনাহারে মৃত্যুর সচিত্র খবর পাঠ করে ব্যথিত হয়েছেন। লন্ডনে ব্রিটিশ টেলিভিশনে তিনি বাংলাদেশে অনাহারে মৃত্যু এবং এরই পাশাপাশি এক শ্রেণীর মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার দুই বিপরীত মর্মান্তিক ছবি দেখেছেন। তিনি দেখেছেন ঢাকার রাজপথে না খেয়ে মরে যাওয়া মানুষের লাশ আর তারই পাশাপাশি নাইট ক্লাবে এক শ্রেণীর মানুষ বেআইনীভাবে আমদানিকৃত দামি বিদেশি মদ এবং আস্ত মুরগি খাচ্ছে। তিনি জানান যে, লন্ডনে বসে নিজ দেশের দুই বিপরীত ও অমানবিক দৃশ্য দেখে তিনি মর্মাহত ও লজ্জিত হয়েছেন।

তিনি দুঃখ করে বলেন, দেশের মানুষ যখন না খেতে পেয়ে মরছে, তখন কালো টাকার মালিকরা তাদের সম্পদ আরো বাড়ানোর জন্য অবৈধ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। তিনি বলেন, ভিক্ষাবৃত্তি সকল অধঃপতন ও দুর্নীতির মূল কারণ। আমরা স্থায়ীভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হতে পারি না। আমাদের দেশে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। সেই সম্পদ আহরণ করে গণ-মানুষের মধ্যে সুষম বন্টনের মাধ্যমে আমাদের সুষম জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজ করে যেতে হবে। যদিও অনেক আগে থেকেই আমাদের তা করা উচিত ছিল।

অর্থমন্ত্রী দেশের বিত্তবান লোকদের কৃচ্ছ্রতা সাধনের জন্যেও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যাদের নাই তাদেরকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের কথা বলে মরতে বলতে পারি না। আমরা সবাই সহানুভূতিশীল হলে এ পরিস্থিতির বেদনা কিছুটা প্রশমিত হতো।

জনাব তাজউদ্দীন আহমদ আরো বলেন, সরকারি দলই হোক আর বিরোধী দলই হোক– কারো হাতে অস্ত্র থাকা উচিত নয়। এতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও উপদলের মধ্যে অনাস্থার মনোভাব সৃষ্টি হয়। সাংবাদিকদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'আপনারা কেন সরকারের ভালোমন্দ তুলে ধরছেন না ? কেন বাস্তব অবস্থা তুলে না ধরে জনগণকে শুধু আশার বাণীই শোনাচ্ছেন ? অমুক দেশ থেকে চাল আসছে, গম আসছে, সাহায্য পাওয়া যাবে– এইটুকু লিখলেই চলবে না। কীভাবে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে, কীভাবে সকল মানুষকে একত্রিত করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে তার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

পরিশেষে তিনি বলেন যে, একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ

বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশ্যে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে প্রচারিত)

স্বাধীন বাংলাদেশের বীর ভাই-বোনেরা

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল গণ-মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাদের যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তাদের মূল্যবান জীবন আহুতি দিয়েছেন। যতদিন বাংলার আকাশে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা রইবে, যতদিন বাংলার মাটিতে মানুষ থাকবে, ততদিন মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের বীর শহীদদের অমর স্মৃতি বাঙালির মানসপটে চির অম্লান থাকবে।

২৫ মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্তলোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নর-হত্যাযজ্ঞের শুরু করেন তা প্রতিরোধ করবার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আপনারা সব কালের সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের সাথে আজ একাত্ম। পশ্চিম-পাকিস্তানী হানাদার দস্যুবাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আপনারা গড়ে তুলেছেন তা এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে আপনাদের এ অভূতপূর্ব সংগ্রাম সর্বকালের প্রেরণার উৎস হয়ে রইল। প্রত্যেকদিনের সংগ্রামের দিনপঞ্জি আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করছে, বিশ্বের কাছে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করছে।

আপনাদের অদম্য সাহস ও মনোবল, যা দিয়ে আপনারা রুখে দাঁড়িয়েছেন ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দস্যুদের বিরুদ্ধে, তার মধ্য দিয়ে আপনারা এইটেই প্রমাণ করেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে ধূলি-কাদা আর রক্তের ছাপ মুছে এক নতুন বাঙালি জাতি জন্ম নিল। পৃথিবীর কাছে আমরা ছিলাম শান্তিপ্রিয় মানুষ। বন্ধু-বাৎসল্যে, মায়া ও হাসিকান্নায়, গান, সংস্কৃতি আর সৌন্দর্যের ছায়ায় গড়ে ওঠা আমরা ছিলাম পল্লী-বাংলার মানুষ। পৃথিবী ভাবত, আমরাও ভাবতাম, যুদ্ধ রণডংকা আমাদের থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আজ ?

আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শের পতাকা সমুন্নত রেখে আমরা আবার প্রমাণ করেছি যে, আমরা তিতুমীর-সূর্য সেনের বংশধর। স্বাধীনতার জন্যে যেমন আমরা জীবন দিতে পারি, তেমনি আমাদের দেশ থেকে বিদেশি শত্রু-সৈন্যদের চিরতরে হটিয়ে দিতেও আমরা সক্ষম। আমাদের অদম্য সাহস ও মনোবলের কাছে শত্রু যত প্রবল পরাক্রম হোক না কেন, পরাজয়

বরণ করতে বাধ্য। আমরা যদি প্রথম আঘাত প্রতিহত করতে ব্যর্থ হতাম তাহলে নতুন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হয়ত কিছুদিনের জন্যে হলেও পিছিয়ে যেত। আপনারা শত্রুসেনাদের ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের মোকাবেলা করেছেন এবং তাদেরকে পিছু হটে গিয়ে নিজ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছেন। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ মুক্ত। বৈদেশিক সাংবাদিকরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াতে পারেন এবং আপনাদের এ বিজয়ের কথা তারা বাইরের জগৎকে জানাচ্ছেন।

আজ প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা গ্রাম-বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে। হাজার হাজার মানুষ আজকের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই.পি.আর.-এর বীর বাঙালি যোদ্ধারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামের যে যুদ্ধ তার পুরোভাগে রয়েছেন এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ, আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এদেরকে সমর কৌশলে পারদর্শী করা হয়েছে ও শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র ও গোলা-বারুদ দিয়ে বাংলার ও মুক্তিবাহিনীকে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। সাগরপারের বাঙালি ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন আমাদেরকে অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন।

সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মোশাররফকে আমরা সমর পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছি। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আমাদের মুক্তিবাহিনী অসীম সাহস ও কৃতিত্বের সাথে শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন এবং শত্রু সেনাদেরকে সিলেট ও কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্টের ছাউনিতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন। আমাদের মুক্তিবাহিনী শীঘ্রই শত্রুকে নিঃশেষ করে দেবার সংকল্প গ্রহণ করেছে।

চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি অঞ্চলে সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্টলার ভাইবোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রুকে মোকাবেলা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রতিরোধ স্ট্যালিনগ্রাডের পাশে স্থান পাবে। এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য চট্টগ্রাম আজ শত্রুর কবলমুক্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের কিছু অংশ ছাড়া চট্টগ্রাম ও সম্পূর্ণ নোয়াখালি জেলাকে 'মুক্ত এলাকা' বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেজর শফিউল্লাহর ওপর। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল এলাকা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে আমাদের মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের এই তিনজন বীর সমর পরিচালক ইতোমধ্যে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এবং একযোগে ঢাকা রওনা হবার পূর্বেই পূর্বাঞ্চলের শত্রুদের ছোট ছোট শিবিরগুলোকে সমূলে নিপাত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ই.পি.আর-এর বীর সেনানী মেজর ওসমানের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার। কুষ্টিয়ার ঐতিহাসিক বিজয়ের পর আমাদের মুক্তিবাহিনী সমস্ত এলাকা থেকে শত্রুবাহিনীকে বিতাড়িত করেছে এবং শত্রুসেনা এখন যশোর ক্যান্টনমেন্টে ও খুলনা শহরের একাংশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। মেজর জলিলের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে ফরিদপুর-খুলনা-বরিশাল-পটুয়াখালির।

উত্তরবঙ্গে আমাদের মুক্তিবাহিনী মেজর আহমদের নেতৃত্বে রাজশাহীকে শত্রুর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন। মেজর নজরুল হক সৈয়দপুরে ও মেজর নওয়াজেশ রংপুরে শত্রুবাহিনীকে

সম্পূর্ণ অবরোধ করে বিব্রত করে তুলেছেন। দিনাজপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয়েছে। রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছাড়া জেলার বাকি অংশ এখন মুক্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের এ অভূতপূর্ব সাফল্য ভবিষ্যতে আরও নতুন সাফল্যের দিশারী। প্রতিদিন আমাদের মুক্তিবাহিনীর শক্তি বেড়ে চলেছে। একদিকে যেমন হাজার হাজার মানুষ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে তেমনি শত্রুর আত্মসমর্পণের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর একই সঙ্গে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে শত্রুর কেড়ে নেয়া হাতিয়ার। এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি বেতার কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।

আপাতত আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মুক্ত এলাকায়। পূর্বাঞ্চলের সরকারি কাজ পরিচালনার জন্যে সিলেট-কুমিল্লা এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের আর একটি কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

আমরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তারা যেন স্বচক্ষে এবং সরেজমিনে দেখে যান যে স্বাধীন বাংলাদেশ আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। সাথে সাথে আমরা সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্র ও পৃথিবীর সমস্ত সহানুভূতিশীল ও মুক্তিকামী মানুষের কাছে ও 'রেডক্রস' ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সাহায্যের আহ্বান জানাচ্ছি। যারা আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক অথচ বর্বর ইসলামবাদ শক্তি যাদের এই মানবিক কাজটুকু করবার বিরুদ্ধে নিষেধ উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা এখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

আমরা যদিও বিদেশ থেকে পাঠানো ত্রাণ-সামগ্রীর জন্যে কৃতজ্ঞ, কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, আজকের দিনে বাংলাদেশের জন্যে সবচেয়ে বড় ত্রাণের বাণী বয়ে আনতে পারে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত হাতিয়ার, যা দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং রক্ষা করতে পারে তার ও তার প্রিয় পরিজনের জান, মান আর সম্ভ্রম।

বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্রাগারের আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত জেনারেল ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী আজ আমাদের শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র বাঙালির কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার এক পৈশাচিক উন্মত্ততায় মত্ত। আমরা সেইসব বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে মানবতার নামে আবেদন জানাচ্ছি, যেন এই হত্যাকারীদের হাতে আর অস্ত্র সরবরাহ করা না হয়। এ সমস্ত অস্ত্র দেয়া হয়েছিল বিদেশি শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে– বাংলার নিষ্পাপ শিশুদেরকে ও নিরপরাধ নর-নারীকে নির্বিচারে হত্যা করার জন্যে নিশ্চয়ই এ অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যে অস্ত্র কেনা হয়েছে এবং যাদের টাকায় ইয়াহিয়া খানের এই দস্যুবাহিনী পুষ্ট, আজ তাদেরকেই নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা অস্ত্র সরবরাহকারী শক্তিবর্গের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, শুধু অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করলেই চলবে না, যে অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে সে অস্ত্র দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস বন্ধ করতে হবে।

পৃথিবীর জনমতকে উপেক্ষা করে আজও ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দস্যুরা বাংলাদেশের বুকে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা সমস্ত দেশের কাছে অস্ত্র সাহায্য চাচ্ছি এবং যারা জাতীয় জীবনে স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে এসেছেন ও নিজেদের দেশেও হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তারা আমাদের এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবে না, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের কাছে যে অস্ত্র সাহায্য আমরা চাইছি তা আমরা চাইছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে– একটি স্বাধীন দেশের মানুষ আর একটি স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে। এই সাহায্য আমরা চাই শর্তহীনভাবে এবং আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি তাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রতীক হিসেবে– হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার এবং আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে, যে অধিকার মানবজাতির শাশ্বত অধিকার। বহু বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। স্বাধীনতার জন্যে যে মূল্য আমরা দিয়েছি তা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্র হবার জন্যে নয়। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন সার্বভৌম একটি শান্তি কামী দেশ হিসাবে রাষ্ট্র পরিবারগোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান আমাদের প্রাপ্য। এ অধিকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার।

আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা, আপনারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাকুন না কেন, আজকে মাতৃভূমির এই দুর্দিনে সকল প্রকার সাহায্য নিয়ে আপনাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। বিদেশ থেকে অর্থসংগ্রহ করে অস্ত্র কিনে আমাদের মুক্ত এলাকায় পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা অতি সত্বর সে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে তার মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার কাজে।

ইতোমধ্যেই আমাদের বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেকেই নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। যাদের হাতে আজও আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারিনি তাদের আহ্বান জানাচ্ছি, যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিন। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, শীঘ্রই আপনাদের হাতে আমরা আধুনিক অস্ত্র তুলে দিতে পারব। ইতোমধ্যে প্রত্যেক আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং নেবার জন্যে নিকটবর্তী সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যাদের হাতে আধুনিক অস্ত্র নেই তাদেরও এই জনযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং ক্ষমতা রয়েছে। শত্রুর ছত্রী ও গুপ্তবাহিনীকে অকেজো করে দেবার কাজে আপনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন। সম্মুখসমরের কাজ না করতে পারলেও আপনি রাস্তা কেটে, পুল উড়িয়ে দিয়ে এবং আরো নানাভাবে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে শত্রুকে হয়রান ও কাবু করতে পারেন। নদীপথে শত্রু যাতে না আসতে পারে তার সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে ও সবদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। নদীপথে সমস্ত ফেরি, লঞ্চ ও ফ্ল্যাট অকেজো করে দিতে হবে। এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্যে স্থানীয় এলাকার সমর পরিচালকের সাথে সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে এবং তার আদেশ ও নির্দেশাবলি মেনে চলতে হবে।

যুদ্ধে অংশ নেয়া ছাড়াও বাংলাদেশকে সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্বকেও অবহেলা করলে চলবে না। শাসনকার্যে অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বাঙালি অফিসারদের মধ্যে যারা এখনো আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেননি, তারা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা তাদেরকে মুক্ত এলাকায় চলে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি। অনুরূপভাবে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সমস্ত বুদ্ধিজীবী, টেকিনিশিয়ান, ইনজিনিয়ার, সংবাদপত্রসেবী, বেতার শিল্পী, গায়ক ও চারুশিল্পীদের, তারা যেন অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আমাদের সামনে বহুবিধ কাজ– তার জন্যে বহু পারদর্শীর প্রয়োজন এবং আপনারা প্রত্যেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করবার সুযোগ পাবেন। আমরা বিশেষ করে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে বাংলাদেশের এই সংঘবদ্ধ জনযুদ্ধে সামিল হতে আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা আন্দোলনকে চিরাচরিত রাজনৈতিক গণ্ডির ঊর্ধ্বে রাখবার জন্যে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

হানাদার শত্রুবাহিনীর সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতা করা বা সংস্রব রাখা চলবে না। বাংলাদেশে আজ কোনো মীরজাফরের স্থান নেই। যদি কেউ হঠাৎ করে নেতা সেজে শত্রু

সৈন্যের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক গোর থেকে গাত্রোত্থান করতে চায়, যাদেরকে গত সাধারণ নির্বাচনে বাংলার মানুষ ঘৃণ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা যদি এই সুযোগে বাংলাদেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তবে বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, তারা সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশবাসীর রোষবহ্নিতে জ্বলে খাক হয়ে যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশের উপর একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই স্বাধীন জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য। হয়ত কোথাও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতি দেখা যেতে পারে।

আমাদের উচিত হবে যতদূর সম্ভব ব্যয়সংকোচ করা এবং জিনিসপত্র কম ব্যবহার করা। দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের কাছে বিশেষ অনুরোধ তারা যেন মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং জিনিসপত্রের দাম যাতে সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে না যায় তার দিকে দৃষ্টি রাখেন।

এ যুদ্ধে যে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী তাতে সন্দেহের কারণ নেই। আপনারা ইতোমধ্যে সাহস ও ত্যাগের বিনিময়ে যে বিজয় অর্জন করেছেন শত্রুপক্ষ আজকে তা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে। তারা ভেবেছিল যে, আধুনিক সমর সজ্জায় এবং কামানের গর্জনের নিচে স্তব্ধ করে দেবে বাঙালির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। আর চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে বাঙালিকে তারা বুটের নিচে নিষ্পেষণ করবে। কিন্তু তাদের সে আশা আজ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। আমরা তাদের মারমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে আছি এবং তাদেরকে যে প্রতিনিয়ত হটিয়ে দিচ্ছি এতে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাদের খাদ্য সরবরাহের সকল পথ আজ বন্ধ– ঢাকার সাথে আজ তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। উড়োজাহাজ থেকে খাবার ফেলে এদেরকে ইয়াহিয়া খান আর বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না। ওদের জ্বালানি সরবরাহের লাইন আমাদের মুক্তিবাহিনী বন্ধ করে দিয়েছে। ইয়াহিয়ার উড়োজাহাজ আর বেশি দিন বাংলাদেশের আকাশে দেখা যাবে না। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝখানে ওরা আজকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। বাংলাদেশের আকাশে শীঘ্রই ঝড়ের মাতম শুরু হচ্ছে। ওরা জানে ওরা হানাদার। ওরা জানে ওদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভ্রুকুটি ও ঘৃণা। ওরা ভীত,– ওরা সন্ত্রস্ত,– মৃত্যু ওদের সামনে পরাজয়ের পরোয়ানা নিয়ে হাজির। তাই ওরা উন্মাদের মতো ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে।

পৃথিবী আজ সজাগ হয়েছে। পৃথিবীর এই অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে বিশ্বের মানুষ যেখানে ওরা এ ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। বিশ্বের মানুষ আজ আর ইসলামাবাদ সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মিথ্যা যুক্তি আর অজুহাত স্বীকার করে নিতে রাজি নয়। যে সমস্ত সাংবাদিক বাংলাদেশের এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন তারা ইয়াহিয়ার এই অন্যায় ও অমানবিক যুদ্ধ আর ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে নিন্দা জানাচ্ছেন। অপরপক্ষে যে সমস্ত সাংবাদিক আমাদের মুক্ত এলাকা পরিদর্শন করছেন তারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষের এই বীর প্রতিরোধ যুদ্ধের খবর আর বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ইয়াহিয়া সরকারের ধ্বংস ও তাণ্ডবলীলার চাক্ষুষ প্রমাণ।

ইতোমধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া এবং ভারতবর্ষ এই নির্বিচার গণ-হত্যার বিরুদ্ধে তাদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে এবং সোভিয়েট রাশিয়া অবিলম্বে এই হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন বন্ধ করবার আহ্বান জানিয়েছে। গ্রেট বৃটেনও বাংলাদেশের এ অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত পাকিস্তানি বিমান মৃত্যুর সরঞ্জাম নিয়ে ঢাকা আসার পথে জ্বালানি সংগ্রহ করছিল, তাদেরকে জ্বালানি সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহল ও ব্রহ্মদেশ।

যদিও কোন কোন দেশ বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে অভিহিত করেছেন, তবু এ কথা এখন দিব্যলোকের মতো সত্য হয়ে গেছে যে, সাড়ে সাত কোটি

মানুষকে পিষে মারার চেষ্টা, তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করে দেবার ষড়যন্ত্র একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরিগণিত হয়েছে এবং এই সমস্যা আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি ভাইদের বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ জানিয়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার সংগ্রামে সাহায্য ও সহানুভূতি চেয়ে পাঠাচ্ছি।

আমাদের যে সমস্ত ভাইবোন শত্রুকবলিত শহরগুলোতে মৃত্যু ও অসম্মানের নাগপাশে আবদ্ধ, আদিম নৃশংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাহস ও বিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথ চেয়ে আছেন তাদেরকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারি না। যারা আমাদের সংগ্রামে শরিক হতে চান তাদের জন্যে রইল আমাদের আমন্ত্রণ। যাদের পক্ষে নেহাৎই মুক্ত এলাকায় আসা সম্ভব নয় তাদেরকে আমরা আশ্বাস এবং প্রেরণা দিচ্ছি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে, শহীদ ভাইবোনদের বিদেহী আত্মার পক্ষ থেকে। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ইনশাআল্লাহ, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস; কারণ প্রতিদিনই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে এবং আমাদের এ সংগ্রাম পৃথিবীর স্বীকৃতি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ পরাজয় মেনে নেয়ার আগে শত্রুরা আরো অনেক রক্তক্ষয় আর ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করবে। তাই পুরাতন পূর্ব-পাকিস্তানের ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবার সংকল্পে আমাদের সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে এক মুহূর্তেরও জন্যেও ভুলে গেলে চলবে না যে এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ এবং সত্যিকার অর্থে এ কথাই বলতে হয় যে, এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-জনতা তাদের সাহস, তাদের দেশপ্রেম, তাদের বিশ্বাস, স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তায় তাদের নিমগ্নপ্রাণ, তাদের আত্মাহুতি, তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় জন্ম নিল এই নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলপ্রসূ হয়ে উঠুক আমাদের স্বাধীনতার সম্পদ। বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্যে রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালি ভাইবোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। যারা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাদের রক্ত আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; গণ-মানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক 'জয় বাংলা', 'জয় স্বাধীন বাংলাদেশ'।

TAJUDDIN CALLS FOR ARMS AID

Text of Mr. Tajuddin Ahmad's broadcast on April 14, 1971.

The Bangladesh Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmad, today invited the world Press and diplomatic and political observers to tour the liberated areas and see for themselves the realities in his free country.

In a broadcast over the Swadhin Bangla Betar Kendra Mr. Ahmad, also asked friendly Governments and people as well as international agencies like the Red Cross to establish direct contact with the Bangladesh Government and render help.

Laying special emphasis on arms help which was "a permanent need for Bangladesh today", the Prime Minister said arms were immediately needed to repel the aggressors.

He also appealed to countries supplying arms and ammunition to Pakistan to suspend forthwith their supplies to an "army of murderers who were killing innocent men, women and children".

(THE TIMES OF INDIA, New Delhi-April 15, 1971)

এপ্রিল ১৭, ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ :

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে, তারা আমাদের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি দেখে যাবার জন্য বহু কষ্ট করে, বহু দূর-দূরান্ত থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

আমি কিছু বলবার আগে প্রথমেই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সংবাদপত্রসেবী এবং নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধিদের যে, তারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আগাগোড়া সমর্থন দিয়ে গিয়েছেন এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। যদিও ইয়াহিয়া সরকার তাদেরকে এবং তার সেই দস্যু বাহিনী বিদেশি সাংবাদিকদের ভেতরে আসতে দেয়নি, যারা ভেতরে ছিলেন তাদেরও জবরদস্তি করে ২৫ তারিখ রাতেই বের করে দিয়েছেন। আমি আপনাদের আরো ধন্যবাদ দিচ্ছি, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই জন্য যে, আমার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম কোনো অবস্থাতেই যাতে ব্যাহত না হয় এবং কোনো অবস্থাতেই সে সংগ্রামকে ভুল ব্যাখ্যা না দেয়া হয় সে জন্য আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আবেদন জানাব ভবিষ্যতেও আপনারা দয়া করে চেষ্টা করবেন যাতে সঠিক সংবাদ পরিবেশিত হয়, যাতে কোনো দুস্কৃতকারী বা কোনো শত্রু বা এজেন্ট ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের আন্দোলনের কোনো রকম ভুল ব্যাখ্যা করতে না পারে, ভুল বোঝাতে না পারে। সেই সাথে আমি আপনাদের আরো অনুরোধ জানাব আমাদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে হ্যান্ড আউট যাবে সেটাকেই বাংলাদেশ সরকারের সঠিক ভাষ্য বলে ধরে নেবেন, সেটাকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে নেবেন। আর আমি আপনাদের আরো একটি অনুরোধ জানাব, জানি না কীভাবে সেটা সম্ভব হবে, আমাদের বাংলাদেশের মাটি থেকে আপনারা কীভাবে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন, কীভাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে লিয়াজোঁ করতে পারেন সেই ব্যাপার আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এবং সেই ব্যাপারে আপনাদের পরামর্শ আমরা অত্যন্ত সাদরে, আনন্দের সাথে গ্রহণ করব।

এখন আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমার ভাষ্য তুলে ধরব।

"বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্ত। পাকিস্তানের ঔপনিবেশবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে গণ-হত্যার আসল ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচারের মুখে বিশ্ববাসীকে অবশ্যই জানাতে হবে কীভাবে বাংলার শান্তিকামী মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছিল। তবেই তারা বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত আশা আকাঙ্ক্ষাকে সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে আওয়ামী লীগ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ৬-দফার আলোকে বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন। ১৯৭০-এ আওয়ামী লীগ এই ৬-দফা নির্বাচনী ইশতেহারের ভিত্তিতেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে মোট ১৬৭টি আসন লাভ করেছিল। নির্বাচনী বিজয় এতই চূড়ান্ত ছিল যে, আওয়ামী লীগ মোট শতকরা আশিটি ভোট পেয়েছিল। এই বিজয়ের চূড়ান্ত রায়েই আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

স্বভাবতই নির্বাচন পরবর্তী সময়টি ছিল আমাদের জন্য এক আশাময় দিন। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের এমনি চূড়ান্ত রায় ছিল অভূতপূর্ব। দুই প্রদেশের জনগণই বিশ্বাস করেছিলেন যে, এবার ৬-দফার ভিত্তিতে উভয় প্রদেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হবে। তবে সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টি তাদের নির্বাচন অভিযানে ৬-দফাকে এগিয়ে গিয়েছিল। কাজেই ৬-দফাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য জনগণের কাছে এই দলের জবাবদিহি ছিল না। বেলুচিস্তানের নেতৃস্থানীয় দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছিল ৬-দফার পূর্ণ সমর্থক। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৬-দফার আলোকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিল। কাজেই প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয় সূচনাকারী ৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান গণতন্ত্রের আশাপ্রদ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত বহন করেছিল।

আশা করা গিয়েছিল যে, জাতীয় পরিষদ আহ্বানের প্রস্তুতি হিসেবে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনায় বসবে। এমনি আলোচনার প্রস্তাব এবং পাল্টা প্রস্তাবের ওপর গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য আওয়ামী লীগ সব সময়ই সম্মত ছিল। তবে এই দল বিশ্বাস করেছে যে, যথার্থ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখার জন্য গোপনীয় সম্মেলনের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদেই গঠনতন্ত্রের ওপর বিতর্ক হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল যথাসত্বর জাতীয় পরিষদ আহ্বানের জন্য। আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে লেগে গেল এবং এ ধরনের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সব আইনগত এবং বাস্তব দিকও তারা পরীক্ষা করে দেখল।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর আলোচনার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে। এই বৈঠকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের ৬-দফা ভিত্তিক কর্মসূচিকে বিশ্লেষণ করলেন এবং ফল কী হতে পারে তারও নিশ্চিত ভরসা নিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান তার নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকলেন। তিনি এমন এক ভাব দেখালেন যে, ৬-দফায় সাংঘাতিক আপত্তিজনক কিছুই তিনি খুঁজে পাননি। তবে পাকিস্তান পিপলস পার্টির সাথে একটি সমঝোতায় আসার ওপর তিনি জোর দিলেন।

পরবর্তী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং আওয়ামী লীগের সাথে ঢাকায় ২৭ জানুয়ারি '৭১। জনাব ভুট্টো এবং তার দল আওয়ামী লীগের সাথে গঠনতন্ত্রের ওপর আলোচনার জন্য এ সময়ে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন।

ইয়াহিয়ার ন্যায় ভুট্টোও গঠনতন্ত্রের অবকাঠামো সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আনয়ন করেননি। বরং তিনি এবং তার দল ৬-দফার বাস্তব ফল কী হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রতিই অধিক ইচ্ছুক ছিলেন। যেহেতু এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল না সূচক, এবং যেহেতু এ নিয়ে তাদের কোনো তৈরি বক্তব্যও ছিল না, সেহেতু, এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপস ফরমুলায় আসাও সম্ভব ছিল না। অথচ দুই দলের মধ্যে মতানৈক্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টার দুয়ার সব সময়ই খোলা ছিল। এই আলোচনা বৈঠক থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন পর্যায় থেকে আপস ফরমুলায় আসা সম্ভব সে সম্পর্কেও জনাব ভুট্টোর নিজস্ব কোনো বক্তব্য ছিল না।

এখানে একটি কথা আরো পরিষ্কারভাবে বলে রাখা দরকার যে, আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এ ধরনের কোনো আভাসও পাকিস্তান পিপলস পার্টি ঢাকা ত্যাগের আগে দিয়ে যাননি। উপরন্তু তারা নিশ্চয়তা দিয়ে গেলেন যে, আলোচনার জন্য সব দরজাই খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনার পর পাকিস্তান পিপলস পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিতীয় দফায় আরো অধিক ফলপ্রসূ আলোচনায় বসবেন, অথবা জাতীয় পরিষদে তারা ভিন্নভাবে আলোচনায় বসার জন্য অনেক সুযোগ পাবেন।

পরবর্তী পর্যায়ে জনাব ভুট্টোর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত সবাইকে বিস্মিত ও হতবাক করে। তার এই সিদ্ধান্ত এ জন্যই সবাইকে আরো বেশি বিস্মিত করে যে, শেখ মুজিবের দাবি মোতাবেক ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথা মতোই ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন। পরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য সমস্ত দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনের অভিযান শুরু করেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিষদের অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখা। এ কাজে ভুট্টোর হস্তকে শক্তিশালী করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর লে. জেনারেল ওমর ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের ওপর পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। জবাব ভুট্টো ও লে. জেনারেল ওমরের চাপ সত্ত্বেও পি.পি.পি. ও কাইয়ুম লীগের সদস্যগণ ব্যতীত অপরাপর দলের সমস্ত সদস্যই ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিমানে পূর্ব-বাংলায় গমনের টিকিট বুক করেন। এমনকি কাইয়ুম লীগের অর্ধেক সংখ্যক সদস্য তাদের আসন বুক করেন। এমনও আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছিল যে. পি.পি.পি-র বহু সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঢাকায় আসতে পারেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেও যখন কোনো কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া তার দোস্ত ভুট্টোকে খুশি করার জন্য। শুধু তাই নয়, জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব-বাংলার গভর্নর আহসানকেও বরখাস্ত করলেন। গভর্নর আহসান ইয়াহিয়া প্রশাসনে মধ্যপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। বাঙালিদের সংমিশ্রণে কেন্দ্রে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তাও বাতিল করে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তার হাতে তুলে দেয়া হলো।

এমতাবস্থায় ইয়াহিয়ার সমস্ত কার্যক্রমকে কোনক্রমেই ভুট্টোর সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে বাংলাদেশের গণ-রায় বানচাল করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। জাতীয় পরিষদই ছিল একমাত্র স্থান যেখানে বাংলাদেশ তার বক্তব্য কার্যকরী করতে পারত এবং রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারত। এটাকে বানচাল করার চেষ্টা চলতে থাকে। চলতে থাকে জাতীয় পরিষদকে সত্যিকার ক্ষমতার উৎস না করে একটা 'ঠুটো জগন্নাথে' পরিণত করার।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের প্রতিক্রিয়া যা হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল তা-ই হয়েছে। ইয়াহিয়ার এই স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য সারা বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। কেননা বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো ইচ্ছাই ইয়াহিয়া খানের নেই এবং তিনি পার্লামেন্টারি রাজনীতির নামে তামাশা করছেন। বাংলাদেশের জনগণ এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এক পাকিস্তানের কাঠামোতে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। ইয়াহিয়া নিজেই আহ্বান করে আবার নিজেই যেভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন তা থেকেই বাঙালি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তাই তারা এক বাক্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপ দিতে থাকেন।

শেখ মুজিব এতদসত্ত্বেও সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ৩ মার্চ অসহযোগ কর্মসূচির আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি দখলদার বাহিনীকে মোকাবিলার জন্য শান্তির অস্ত্রই বেছে নিয়েছিলেন। তখনো তিনি আশা করছিলেন যে, সামরিক চক্র তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পাবে। গত ২ ও ৩০ মার্চ ঠান্ডা মাথায় সামরিক চক্র কর্তৃক হাজার হাজার নিরস্ত্র ও নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার মুখে বঙ্গবন্ধুর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শেখ সাহেবের অসহযোগ আন্দোলন আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টি করলেন এক নতুন ইতিহাস। বাংলাদেশে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন যেভাবে এগিয়ে গেছে মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এত কার্যকরী অসহযোগ আন্দোলন কোথায় সাফল্য লাভ করেনি ! পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলেছে দেশের সর্বত্র। নতুন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য পাওয়া গেল না হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি। পুলিশ এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসসহ গণ-প্রশাসন বিভাগের কর্মচারীগণ কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। জনগণ সেনাবাহিনীর সরবরাহ বন্ধ করে দিল। এমনকি সামরিক দপ্তরের অসামরিক কর্মচারীগণ তাদের অফিস বয়কট করলেন। কেবল কাজে যোগদান থেকে বিরত থেকে তারা ক্ষান্ত হলেন না, অসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের লোকেরাও সক্রিয় সমর্থন ও নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করলেন শেখ সাহেবের প্রতি। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়া তারা অন্য কারো নির্দেশ মেনে চলবেন না।

এ অবস্থার মুখোমুখি হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন না হয়েও অসহযোগের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণে আওয়ামী লীগ বাধ্য হলো। এ ব্যাপারে শুধু আপামর জনগণই নয়, বাংলাদেশের প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন লাভ তারা করেছিলেন। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলি সর্বান্তকরণে মাথা পেতে মেনে নিলেন এবং সমস্যাবলির সমাধানে আওয়ামী লীগকে একমাত্র কর্তৃপক্ষ বলে গ্রহণ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ফাটল ধরলে দেখা দেয় নানাবিধ দুরূহ সমস্যা। কিন্তু এসব সমস্যাবলির মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দপ্তরের কাজ যথারীতি এগিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের কোনো আইনানুগ কর্তৃপক্ষ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকগণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা স্বাভাবিক সময়েও অন্যদের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। আওয়ামী লীগ ও ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি জনগণের সর্বাধিক সমর্থন দৃষ্টে জেনারেল ইয়াহিয়া তার কৌশল পাল্টালেন। ৬ মার্চ ইয়াহিয়াকে একটা কনফ্রন্টেশনের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে মনে হলো। কেননা তার ঐ দিনের প্ররোচনামূলক বেতার

বক্তৃতায় সঙ্কটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপালেন আওয়ামী লীগের ওপর। অথচ যিনি ছিলেন সঙ্কটের স্থপতি সেই ভুট্টো সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বললেন না। মনে হয় তিনি ধারণা করেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তা নির্মূল করার জন্য ঢাকার সেনাবাহিনীকে করা হয় পূর্ণ সতর্কীকরণ। লে. জেনারেল ইয়াকুব খানের স্থলে পাঠানো হলো লে. জেনারেল টিক্কা খানকে। এই রদবদল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সামরিক জান্তার ঘৃণ্য মনোভাবের পরিচয়।

কিন্তু ইতোমধ্যে মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও শেখ মুজিব রাজনৈতিক সমাধানের পথে অটল থাকেন। জাতীয় পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে তিনি যে ৪-দফা প্রস্তাব পেশ করেন তাতে যেমন একদিকে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের ইচ্ছা, অপরদিকে শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর জন্য ইয়াহিয়াকে দেয়া হয় তার শেষ সুযোগ।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলদের ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে সামরিক শক্তিকে জোরদার করার জন্য কালক্ষেপণ করা। ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর ছিল আসলে বাংলাদেশে গণ-হত্যা পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এটা আজ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, অনুরূপ একটি সঙ্কট সৃষ্টির পরিকল্পনা বেশ আগেভাগেই নেয়া হয়েছিল।

১ মার্চের ঘটনার সামান্য কিছু আগে রংপুর থেকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত ট্যাঙ্কগুলো ফেরত আনা হয়। ১ মার্চ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানি কোটিপতি ব্যবসায়ী পরিবারসমূহের সাথে সেনাবাহিনীর লোকদের পরিবার পরিজনদেরও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতে থাকে।

১ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের সামরিক শক্তি গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করা হয় এবং তা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলে। সিংহলের পথে পি.আই.এ-এর কমার্শিয়াল ফ্লাইটে সাদা পোশাকে সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের বাংলাদেশে আনা হলো। সি ১৩০ পরিবহন বিমানগুলোর সাহায্যে অস্ত্র এবং রসদ এনে বাংলাদেশে স্তূপীকৃত করা হয়।

হিসাব নিয়ে জানা গেছে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামসহ অতিরিক্ত এক ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে আমদানি করা হয়। ব্যাপারটা নিরাপদ করার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরকে বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সমগ্র বিমান বন্দর এলাকায় আর্টিলারি ও মেশিনগানের জাল বিস্তার করা হয়। যাত্রীদের আগমন-নির্গমনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড সংগঠনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একদল এস. জি. কমান্ডো গ্রুপ বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছেড়ে দেয়া হয়। ২৫ মার্চের পূর্ববর্তী দুই দিনে ঢাকা ও সৈয়দপুরে যেসব কুকাণ্ড ঘটে এরাই সেগুলো সংঘটন করেছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে একটা উত্তেজনার পরিবেশ খাড়া করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য।

প্রতারণা বা ভণ্ডামির এই স্ট্রাটেজি গোপন করার অংশ হিসেবেই ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে তার আলোচনায় আপসমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৬ মার্চ আলোচনা শুরু হলে ইয়াহিয়া তৎপূর্বে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ইয়াহিয়ার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের ক্ষমতা হস্তান্তরের ৪-দফা শর্তের প্রতি সামরিক জান্তার মনোভাব কী ? জবাবে ইয়াহিয়া জানান যে, এ ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো আপত্তি নেই। তিনি আশা করেন যে, ৪-দফা শর্ত পূরণের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপদেষ্টাগণ একটা অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

আলোচনাকালে যে সব মৌলিক প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো হলো :

১। মার্শাল ল বা সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রেসিডেন্টের একটি ঘোষণার মাধ্যমে একটা বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২। প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৩। ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবেন।

৪। জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হবেন।

আজ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জাতীয় পরিষদের পৃথক পৃথক অধিবেশনের প্রস্তাবের বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অথচ ইয়াহিয়া নিজেই ভুট্টোর মনোনয়নের জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ প্রস্তাবের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া সেদিন নিজেই বলেছিলেন যে, ৬-দফা হলো বাংলাদেশের এবং কেন্দ্রের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের এক নির্ভরযোগ্য নীলনকশা। পক্ষান্তরে এটার প্রয়োগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সৃষ্টি করবে নানারূপ অসুবিধা। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানি এম.এন.এ. দের পৃথকভাবে বসে ৬-দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্র এবং এক ইউনিট ব্যবস্থা বিলোপের আলোকে একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার মধ্যকার এই নীতিগত মতৈক্যের পর একটি মাত্র প্রশ্ন থেকে যায় এবং তা হলো অন্তর্বর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন। এক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ এই মর্মে একমত হয়েছিলেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে যে শাসনতন্ত্র রচিত হতে যাচ্ছে মোটামুটি তার আলোকেই কেন্দ্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন মীমাংসার এই সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম. এম. আহমদকে বিমানে করে ঢাকা আনা হয়। আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের সাথে আলাপ-আলোচনায় তিনি স্পষ্টভাবে এ কথা বলেন যে, রাজনৈতিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৬-দফা কার্যকরী করার প্রশ্নে দুর্লভ কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। এমনকি অন্তর্বর্তী পর্যায়েও না।

আওয়ামী লীগের খসড়ার ওপর তিনি যে তিনটি সংশোধনী পেশ করেছিলেন তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, সরকার এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন যে ব্যবধানটুকু ছিল তা নীতিগত নয়, বরং কোথায় কোন শব্দ বসবে তা নিয়ে। ২৪ মার্চের বৈঠকে ভাষার সামান্য রদবদলসহ সংশোধনীগুলো আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে। অতঃপর অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাদের শেষ দফা বৈঠকে মিলিত হওয়ার পথে আর কোনো বাধাই ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে হয়, কোনো পর্যায়েই আলোচনা অচলাবস্থায় সম্মুখীন হয়নি। অথচ ইয়াহিয়া বা তার উপদেষ্টারা আভাস-ইঙ্গিতেও এমন কোনো কথা বলেননি যে, তাদের এমন একটা বক্তব্য আছে যা থেকে তারা নড়চড় করতে পারেন না।

গণ-হত্যাকে ধামা-চাপা দেয়ার জন্য ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে আইনগত ছত্রছায়ার প্রশ্নেও আজ জোচ্চুরির আশ্রয় নিয়েছেন। আলোচনায় তিনি এবং তার দলবল একমত হয়েছিলেন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল তিনিও সেভাবে একটা ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনগত ছত্রছায়ার ব্যাপারে ভুট্টো পরবর্তীকালে যে ফ্যাঁকড়া তুলেছেন ইয়াহিয়া তা-ই অনুমোদন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইয়াহিয়া ঘুণাক্ষরেও মুজিবকে এ সম্পর্কে কিছু জানাননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় পরিষদের একটা অধিবেশন বসা দরকার ইয়াহিয়া যদি আভাস-ইঙ্গিতেও এ কথা বলতেন তাহলে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই তাতে আপত্তি করত না। কেননা এমন একটা

সামান্য ব্যাপারকে উপেক্ষা করে আলোচনা বানচাল করতে দেয়া যায় না। তাছাড়া জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগুরু দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভয় করার কিছুই ছিল না। দেশের দুই অংশের জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পৃথক পৃথক বৈঠকের যে প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সম্মতি দিয়েছিল, তা শুধু ভুট্টোকে খুশি করার জন্যই করা হয়েছিল। এটা কোনো সময়ই আওয়ামী লীগের মৌলিক নীতি ছিল না।

২৪ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগ উপদেষ্টাদের মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠকে জনাব এম. এম. আহমদ তার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। এই খসড়া প্রস্তাবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জেনারেল পীরজাদার আহ্বানে একটা চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। দুঃখের বিষয় কোনো চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং জবাব এম. এম. আহমদ আওয়ামী লীগকে না জানিয়ে ২৫ মার্চ করাচি চলে গেলেন।

২৫ মার্চ রাত ১১টা নাগাদ সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় এবং সেনাবাহিনী শহরে 'পজিশন' গ্রহণ করতে থাকে। মধ্যরাত্রি নাগাদ ঢাকা শহরের শান্তিপ্রিয় জনগণের ওপর পরিচালনা করা হলো গণ-হত্যার এক পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মসূচি। অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নজির সমসাময়িক ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে দেননি কোনো চরমপত্র। অথবা মেশিন গান, আর্টিলারি সুসজ্জিত ট্যাঙ্কসমূহ যখন মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও ধ্বংসলীলা শুরু করে দিল তার আগে জারি করা হয়নি কোনো কারফিউ অর্ডার। পরদিন সকালে লে. জেনারেল টিক্কা খান তার প্রথম সামরিক নির্দেশ জারি করলেন বেতার মারফত। কিন্তু ৫০ হাজার লোক তার আগেই প্রাণ হারিয়েছেন বিনা প্রতিরোধে। এদের অধিকাংশই ছিল নারী ও শিশু। ঢাকা শহর পরিণত হয় নরককুণ্ডে, প্রতিটি অলিগলি ও আনাচেকানাচে চলতে লাগল নির্বিচারে গুলি। সামরিক বাহিনীর লোকদের নির্বিচারে অগ্নিসংযোগের মুখে অন্ধকারে বিছানা ছেড়ে যেসব মানুষ বের হওয়ার চেষ্টা করল তাদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় মেশিনগানের গুলিতে।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মুখেও পুলিশ ও ই.পি.আর বীরের মতো লড়ে গেল। কিন্তু দুর্বল, নিরীহ মানুষ কোনো প্রতিরোধ দিতে পারল না। তারা মারা গেল হাজারে হাজারে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সেনাবাহিনী যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে আমরা তার একটা নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রস্তুত করছি এবং শীঘ্রই তা প্রকাশ করব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে, সব বর্বরতা ও নিষ্ঠুতার কাহিনি আমরা শুনেছি, এদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা তার সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে তিনি তাদের দিয়ে গেলেন বাঙালি হত্যার এক অবাধ লাইসেন্স। কেন তিনি এই বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন, পরদিন রাত ৮টার সময় বিশ্ববাসীকে জানান হলো এর কৈফিয়ত। এই বিবৃতিতে তিনি নরমেধযজ্ঞ সংগঠনের একটা ব্যাখ্যা বিশ্ববাসীকে জানালেন। তার বক্তব্য একদিকে ছিল পরস্পর বিরোধী এবং অন্যদিকে ছিল মিথ্যার বেসাতিতে ভরা। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেও যে দলের সাথে তিনি শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন সে দলের লোকদের দেশদ্রোহী ও দলটিকে অবৈধ ঘোষণার সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বা আলাপ-আলোচনায় কোনো সঙ্গতি খুঁজে পেল না বিশ্ববাসী। বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল এবং জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু আসনের অধিকারী আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করে গণপ্রতিনিধিদের হাতে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদাকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অবাধ মত প্রকাশের প্রতি তামাশা ছাড়া মানুষ আর কিছু ভাবতে পারল না। তার বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো যে, ইয়াহিয়া আর যুক্তি বা নৈতিকতার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে চান না এবং বাংলাদেশের মানুষকে নির্মূল করার জন্য জঙ্গি আইনের আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর।

পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে যে শত সহস্র মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হিসেবে বিরাজ করছে। পূর্ব পরিকল্পিত গণহত্যায় মত্ত হয়ে ওঠার আগে ইয়াহিয়ার ভাবা উচিত ছিল তিনি নিজেই পাকিস্তানের কবর রচনা করছেন। তারই নির্দেশে তার লাইসেন্সধারী কসাইরা জনগণের ওপর যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তা কোনোমতেই একটা জাতীয় ঐক্যের অনুকূল ছিল না। বর্ণগত বিদ্বেষ এবং একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়াই ছিল এর লক্ষ্য। মানবতার লেশমাত্রও এদের মধ্যে নেই। উপরওয়ালাদের নির্দেশে পেশাদার সৈনিকরা লজ্ঘন করেছে তাদের সামরিক নীতিমালা এবং ব্যবহার করেছে শিকারি পশুর মতো। তারা চালিয়েছে হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচারে ধ্বংসলীলা। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এর নজির নেই। এ সব কার্যকলাপ থেকে এ কথারই আভাস মেলে যে, ইয়াহিয়া খান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মনে দুই পাকিস্তানের ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। যদি না হতো তাহলে তারা একই দেশের মানুষের ওপর এমন নির্মম বর্বরতা চালাতে পারত না। ইয়াহিয়ার এই নির্বিচারে গণহত্যা আমাদের জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে অর্থহীন নয়। তার এ কাজ পাকিস্তানের বিয়োগান্ত এই মর্মান্তিক ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, যা ইয়াহিয়া রচনা করেছেন বাঙালির রক্ত দিয়ে। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া বা নির্মূল হওয়ার আগে তারা গণহত্যা ও পোড়া মাটি নীতির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে শেষ করে দিয়ে যেতে চায়। ইত্যবসরে ইয়াহিয়ার লক্ষ্য হলো অ মাদের রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী মহল ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্মূল করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শহরগুলোকে ধূলিস্যাৎ করা, যাতে একটি জাতি হিসেবে কোনোদিনই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি।

ইতোমধ্যে এ লক্ষ্য পথে সেনাবাহিনী অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যে বাংলাদেশকে তারা দীর্ঘ ২৩ বছর নিজেদের স্বার্থে লাগিয়েছে, শোষণ করেছে, তাদেরই বিদায়ী লাথির উপহার হিসেবে সেই বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তান থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে পড়ল।

অসহযোগের পর গণহত্যার এমন জঘন্যতম ঘটনা আর ঘটেনি। অথচ বৃহৎ শক্তিবর্গ বাংলাদেশের ঘটনার ব্যাপারে উট পাখির নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। তারা যদি মনে করে থাকেন যে, এতদ্বারা তারা পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন, তাহলে তারা ভুল করেছেন। কেননা, পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান নিজেও মোহমুক্ত।

তাদের বোঝা উচিত যে, পাকিস্তান আজ মৃত এবং ইয়াহিয়া নিজেই পাকিস্তানের হত্যাকারী। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটা বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন শিশু রাষ্ট্রকে লালিত পালিত করছেন। দুনিয়ার কোনো জাতি এ নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক কাল হোক দুনিয়ার ছোট বড় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে এ নতুন জাতিকে। স্থান দিতে হবে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জে।

সুতরাং রাজনীতি এবং মানবতার স্বার্থেই আজ বৃহৎ শক্তিবর্গের উচিত ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তার লাইসেন্সধারী হত্যাকারীদের খাঁচায় আবদ্ধ করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা। আমাদের সংগ্রামকে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ যে সমর্থন দিয়েছেন তা আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করব। গণচীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের কাছ থেকেও আমরা অনুরূপ সমর্থন আশা করি এবং তা পেলে সে জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাব। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের উচিত তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং তারা যদি তা করেন তাহলে ইয়াহিয়ার পক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর একদিনও হামলা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ হবে অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর সৃষ্ট ভস্ম ও ধ্বংসস্তূপের ওপর একটা নতুন দেশ গড়ে তোলা। এ একটা দুরূহ ও বিরাট দায়িত্ব। কেননা আগে থেকেই আমরা বিশ্বের দরিদ্রতম জাতিসমূহের অন্যতম। এছাড়া একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মানুষ এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণপণে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে। সুতরাং তাদের আশা আমরা ব্যর্থ করতে পারি না। তাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতেই হবে।

আমার বিশ্বাস, যে জাতি নিজে প্রাণ ও রক্ত দিতে পারে, এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, সে জাতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে বিফল হবে না। এ জাতির অটুট ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে কোনো বাধা বিপত্তি টিকতে পারে না।

আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট বড় জাতির বন্ধুত্ব। আমরা কোনো শক্তি, ব্লক বা সামরিক জোটভুক্ত হতে চাই না– আমরা আশা করি শুধুমাত্র শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে সবাই নিঃসংকোচে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কারো তাঁবেদারে পরিণত হওয়ার জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের মানুষ এত রক্ত দেয়নি, এত ত্যাগ স্বীকার করছে না। আমাদের এই জাতীয় সংগ্রামে, তাই আমরা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থনের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিলম্ব ডেকে আনছে সহস্র মানুষের অকাল মৃত্যু এবং বাংলাদেশের মূল সম্পদের বিরাট ধ্বংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন, আর কালবিলম্ব করবেন না, এই মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং এতদ্বারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের চিরন্তন বন্ধুত্ব অর্জন করুন।

বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বের আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেননা, আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। জয়বাংলা।"

ছয় দফা

মুখবন্ধ

একটি রাষ্ট্রের উন্নতি, অগ্রগতি, সংগতি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে উহার আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর। সেই শক্তির উৎস সন্তুষ্ট জনচিত্ত। আঠারো বছর পূর্বে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও ইহার রাষ্ট্রীয় কাঠামো গণসমর্থনের মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে নাই। পাকিস্তানের মূল ভিত্তি ১৯৪০ সালের যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল পরবর্তীকালে ঐ মূল ভিত্তি হইতে বিচ্যুতিই এই অবস্থার আসল কারণ। এই বিচ্যুতি ঘটাইবার মূলে ছিল একটি কায়েমি স্বার্থবাদী শোষক দলের স্বার্থান্বেষী কারসাজি। ইহারা ইসলাম ও মুসলিমের নামে সারা পাকিস্তানের গোটা সমাজকে শোষণ করিয়া নিঃশেষ করিতেছে; অপরদিকে পাকিস্তানের ভৌগলিক অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই বিশেষ মহলই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের নামে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় গড়িয়া পূর্ব পাকিস্তানে অবাধ শোষণ চালাইয়া যাইতেছে। ফলে একদিকে পূর্ব পাকিস্তানি জনসাধারণ সর্বহারায় পরিণত হইতেছে, অপরদিকে জুলুমের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিবাদ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝি ও তিক্ততার সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে অবাধ শোষণ চালাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ মহল ঐক্য ও সংগতির জিগির তুলিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। বিগত আঠারো বছর ব্যাপী আবেদন-নিবেদন ও আন্দোলনের মাধ্যমে উক্ত মহলকে বোধগম্য কারণেই বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করিতে সম্মত করান সম্ভব হয় নাই। বরং নানারূপ সূক্ষ্ম কৌশলে ইহারা উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বৈরীভাব সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া চলিয়াছে।

সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে দেশের প্রকৃত অবস্থা, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানিদের নাজুক অবস্থা, সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে এবং দেশের সংগতি, নিরাপত্তা ও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সবল কেন্দ্রীয় শক্তির কার্যকারিতার শ্লোগানীরূপের অসারতাও প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তানের কোনো মঙ্গলকামীকে, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার-বঞ্চিত অসহায় জনসাধারণকে, আর সস্তা বুলিতে ধোঁকা দেওয়া চলিবে না। তাঁহারা আজ দেশের প্রকৃত সংহতি, নিরাপত্তা, শক্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির সঠিক পন্থা নিরূপণ ও আশু বাস্তবায়নের দাবি করেন।

পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান সম্ভূত প্রশ্নে বিগত আঠারো বছরব্যাপী সঞ্চিত প্রজ্ঞা ও সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের শিক্ষার আলোকে বিচার করিলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ছয় দফা কর্মসূচি উপরে উল্লেখিত গণদাবির প্রশ্নে এক বাস্তব, সুষ্ঠু ও কার্যকরী

উত্তর। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই ছয়-দফা কর্মসূচির প্রতিফলন উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের ঈপ্সিত কল্যাণ, প্রকৃত সংগতি ও কার্যকরী নিরাপত্তা বিধান করিবে বলিয়া সকল বাস্তব চিন্তাশীল মহলের বিশ্বাস। এই কর্মসূচিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা প্রভৃতি অপরিহার্য মূল বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থার সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। এই ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বর্তমানে নাজুক পূর্ব পাকিস্তান সকল বিষয়ে সরল ও শক্তিশালী হইয়া সারা পাকিস্তানকেই অধিক শক্তিশালী ও সুসংহত করিবে এবং উভয় অঞ্চল সমতালে অগ্রসর হইয়া যে কোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করিতে সক্ষম হইবে।

শেখ সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচি প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে এক বিশেষ মহল সবিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানকে ভালোবাসেন এবং উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মঙ্গল ও নিরাপত্তা কামনা করে এমন কেহ এই কর্মসূচির পাইকারি নিরোধিতা করিতে পারেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তবে কায়েমি স্বার্থবাদী মহল ও তাহাদের অনুগতদের কথা আলাদা। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থনিহিত নাই এমন কোনো ভালো কর্মসূচিকে কখনো সমর্থন দিয়াছে তাহার নজির বিশ্ব ইতিহাসে নাই, বরং নিজ স্বার্থের পরিপন্থী হইলে ইহারা যে মরিয়া হইয়া উহার বিরোধিতা করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণ বর্তমান। তাই আমি শেখ সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সাধারণ মানবাধিকারে আস্থাবান সকল মহলের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই কর্মসূচির ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬% ভাগ অধিবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির সন্ধান পাইবেন এবং তাহাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে সুদৃঢ় তথা পাকিস্তানকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইবেন।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের কাছে আমার আরজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হইয়া তাহারা যেন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর জীবন-মরণ সমস্যাগুলো বাস্তবের আলোকে বিচার করিয়া দেখেন। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচি পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কোনো কর্মসূচি নহে। একজন সাধারণ পূর্ব পাকিস্তানির ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইগণও পাকিস্তানের উন্নতি, অগ্রগতি, সংগতি ও নিরাপত্তার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথাও ভাবেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে শক্তিশালী করিবার দাবি উঠিলে কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের মতো আতঙ্কিত না হইয়া যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তাহারা এই দাবির প্রতি সমর্থন দিবেন ইহাই স্বাভাবিক ও আমি ইহাই বিশ্বাস করি।

তাজউদ্দীন আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

ভারতের সাথে বিগত সতেরো দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নতুনভাবে চিন্তা করে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বাস্তব যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পই দেশকে এই অস্বাভাবিক জরুরি অবস্থাতেও চরম বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষা করেছে।

এই অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাকিস্তানের দুটি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশতেহারটির লক্ষ্য তাই। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমি দেশবাসী জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের আজিকার কর্ণধারদের কাছে নিম্নলিখিত ছয়-দফা কর্মসূচি পেশ করছি।

শেখ মুজিবুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

প্রস্তাব-১
শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি
দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের। আইন পরিষদের (Legislatures) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম। এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব-২
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে- যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩
মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে :

(ক) সমগ্র দেশের জন্যে দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব-৪
রাজস্ব কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সব রকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এক্তিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোই মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব-৬

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংগতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

ছয় দফা পুস্তিকার প্রকাশনা সূত্র : নূরুল ইসলাম কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে ১৫নং পুরানা পল্টন ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং সেগুনবাগান প্রেস, সেগুনবাগান, ঢাকা হইতে মুদ্রিত ১৭/২/৬৬, মূল্যঃ ২৫ পয়সা।

চিঠিপত্র ও উপাত্ত

এপ্রিল, ১৯৭১
যুদ্ধাবস্থায় দরদরিয়া গ্রাম থেকে আবু আহসান (হাসান) কে লেখা
সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের চিঠি।

এপ্রিল, ১৯৭১

স্নেহের হাসান
আশা করি ভাল আছ। বাসা থেকে কিভাবে সে রাতে বিভীষিকাময় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পরদিন কারফিউর মধ্যে দেওয়াল টপকিয়ে অন্য বাসায় যেয়ে তারপর পর পর ৭ দিন কোথায় কিভাবে কাটিয়ে তারপর এখানে কিভাবে এসেছি সে ইতিহাস কোন একদিন শুনতে পারবে, ৭ কোটি মানুষের সাথে ছেলেমেয়ে নিয়ে মিশে আছি–এটাই মহা সান্ত্বনা। ভাল আছি।

নদী পথে তুমি এখানে আসতে পার, রাস্তায় বা ট্রেনে সম্ভবই নয়। তুমি যদি ঢাকায় থাক, বাসার দিকে খেয়াল রেখ, সেখানে শুধু আব্বা আছেন। ঢাকার পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যেতে পারে, শহরে কারোই থাকাটা সেফ নয়, বুদ্ধি বিবেচনা মত চলিও।

বাসার কিছু মূল্যবান জিনিষপত্র সুযোগ মত অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে পারলে লুটের হাত থেকে হয়ত রক্ষা পেত। উপরতলায় রুমে আমার পেডেস্টাইল পাখাটা আছে। নিচে ঘরের পাখাগুলোও খুলে সরিয়ে ফেলা দরকার।

ফতুল্লায় 'গ্রীনওয়েজ কোল্ড স্টোরেজ' আছে ফতুল্লার পথে হাতের ডানে পড়বে। সেখানে গিয়ে হামিদ সাহেবের ভাই আছে, তার সাথে দেখা করে আমার কথা বলবে কিছু টাকা দেবার জন্য, দরকার হলে এই চিঠির এই অংশ দেখিও। পাঁচশত টাকা দিতে বলিও। বাচ্চার জন্য 'বড় তিন টিন ল্যাকটোজেন', দুই টিন 'ফ্যারেক্স', দেড় সের তালমিস্ত্রি দিও। আর ঔষধের মধ্যে, কাশির ঔষধ, একটা 'বিনাড্রিল', একটা 'ফেনসিডিল' এ্যসকারবন tablet 100 mg এক শিশি।

বাসায় যেয়ে দিদারকে বলে অথবা তুমি নিজে মধ্যের ঘরে কোনায় ছোট আলমারির ড্রয়ারে বাচ্চার সব কাপড় আছে– খুব অসুবিধা হচ্ছে– গরম কাপড়ও বাচ্চার সেখানেই আছে ওগুলো দিয়ে দিও, আর বেবিখাটের ড্রয়ারেও সার্ট প্যান্ট আছে। সব বুদ্ধি মত ব্যবস্থা করিও।
বৌ, কনক কেমন আছে। সবার জন্য দোয়া রইল।*

মামি।

---

* আমাদের দরদরিয়া গ্রাম থেকে হাসান ভাইকে লেখা আম্মার চিঠি। এ চিঠি লেখার সময় আম্মা জানতেন না যে পাকিস্তান আর্মি আমাদের বাসায় ক্যাম্প স্থাপন করেছে। চিঠি পেয়ে আমাদের বাসার সামনে এসে হাসান ভাই দেখেন আমাদের পুরো বাড়ি আর্মিরা ঘেরাও করে রেখেছে। আর্মির প্রশ্নের উত্তরে নানাকে দেখতে এসেছেন একথা বলে ভেতরে ঢুকে নানাকে দেখেই কোনমতে প্রাণ নিয়ে বের হয়ে আসেন।

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে লেখা চিঠি।

PRIME MINISTER

New Delhi,
December 6, 1971

Dear Prime Minister,

My colleagues in the Government of India and I were deeply touched by the message which His Excellency the Acting President Syed Nazrul Islam and you sent to me on December 4. On its receipt, Government of India once again considered your request to accord recognition to the People's Republic of Bangladesh which you lead with such dedication. I am glad to inform you that in the light of the circumstances which prevail at present, Government of India have decided to grant the recognition. This morning I made a statement on the subject in our Parliament. I enclose a copy.

The people of Bangladesh have gone through much suffering. Your young men are engaged in a self-sacrificing struggle for freedom and democracy. The people of India are also fighting in defence of the same values. I have no doubt that this companionship in endeavour and sacrifice will strengthen our dedication to great causes and the friendship between our two peoples. However long the road and however exacting the sacrifice that our two peoples may be called upon to make in the future, I am certain that we shall emerge triumphant.

I take this opportunity to convey to you personally, to your colleagues and to the heroic people of Bangladesh my greetings and best wishes.

I should also like to take this opportunity to convey through you to His Excellency Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangladesh the assurances of my highest esteem.

Yours sincerely,

(Indira Gandhi)

His Excellency Mr. Tajuddin Ahmed,
Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Mujibnagar.

PRIME MINISTER

New Delhi,
December 6, 1971

Dear Prime Minister,

My colleagues in the Government of India and I were deeply touched by the message which His Excellency the Acting President Syed Nazrul Islam and you sent to me on December 4. On its receipt, Government of India once again considered your request to accord recognition to the People's Republic of Bangla Desh which you lead with such dedication. I am glad to inform you that in the light of the circumstances which prevail at present, Government of India have decided to grant the recognition. This morning I made a statement on the subject in our Parliament. I enclose a copy.

The people of Bangla Desh have gone through much suffering. Your young men are engaged in a self-sacrificing struggle for freedom and democracy. The people of India are also fighting in defence of the same values. I have no doubt that this companionship in endeavour and sacrifice will strengthen our dedication to great causes and the friendship between our two peoples. However long the road and however exacting the sacrifice that our two peoples may be called upon to make in the future, I am certain that we shall emerge triumphant.

I take this opportunity to convey to you personally, to your colleagues and to the heroic people of Bangla Desh my greetings and best wishes.

I should also like to take this opportunity to convey through you to His Excellency Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangla Desh the assurances of my highest esteem.

Yours sincerely,

Indira Gandhi

(Indira Gandhi)

His Excellency Mr. Tajuddin Ahmed,
Prime Minister of the People's Republic of Bangla Desh,
Mujibnagar.

আব্বু তাঁর সুশৃঙ্খল অভ্যাস অনুযায়ী চিঠির কোনায় চিঠি পড়ার তারিখ, সময় বেলা ৩-২৫ মিনিট ও স্বাক্ষর প্রদান করেন।

২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে সিংগাপুর হতে তাজউদ্দীন আহমদকে লেখা ড. মাহফুজুল হকের চিঠি।

Dr. M. Huq
Physics Department
University of Singapore
Singapore-10
December 20, 1971

Hon'ble Mr. Tajuddin Ahmed,
Prime Minister,
People's Republic of Bangladesh

Honourable Prime Minister,

On behalf of the citizens of Bangladesh and sympathisers, living in Singapore and Malaysia, I extend our heartiest congratulations to the Government of Bangladesh for the superb leadership in liberating our country from the brutal Pakistani regime. Our greatest felicitations to our valiant Mukti Bahini for their supreme sacrifices for our beloved motherland.

Our great joy at this auspicious moment has been marred by the shocking news of the butchery of more than a hundred intellectuals of our country by the sub-human Pak Military authority. This latest inhuman action has steeled our determination to demand proper action against the culprits. We, hereby, fully back the call by a great friend of our cause, Rt. Hon'ble John Stonehouse, M.P. in his call for a Nuremberg type trial of all the war criminals including those who are outside Bangladesh.

While we fully support the stand taken by your Government that full protection will be extended to all foreign nationals we, hereby demand that nobody be allowed to escape the punishment under any pretext.

Our heartfelt sympathies for the berieved families and friends of all the Shahids who lost their lives in the liberation struggle.

We, hereby, place our services at the disposal of the Government of Bangladesh.

'JOY BANGLA'

Yours sincerely,

(Mahfuzul Huq)

২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যাকে ধিক্কার, ভারত ও বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও সৈন্যবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন মেডিক্যাল কলেজ নাগপুর হতে তাজউদ্দীন আহমদকে চিঠি।

Students Association Medical College, Nagpur.
1971-72

P. M'S OFFICE
29 DEC 1971

K. H. Nathani
President

Pradeep Chandak
General Secretary

Miss Meera Walia
Vice President
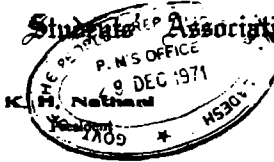
M. L. Dixit
Jt. Gen. Secretary

Jayshree Deshmukh
Ladies Representative

Patron : Dr. V. B. Pathak
Dean Medical College

Officer-in-charge : A. M. Sur
Prof. of Pediatrics

Ref. No. S.A.M.C./1971.   Date 21st Dec 1971.

To,
The Prime Minister of
Bangla Desh, Dacca. (Bangla Desh)

Respected Sir,

The Students Association Medical College, Nagpu strongly condemn the Pakistani Agression on India and genosid in Bangla Desh. We congratulate the leadership of both Indi and Bangla Desh and their respective soldiers on their mag ficiant performance and victory. We also extend our sympathi for the families who have been bereaved in this struggle.

Thanking you,

Yours sincerely,

(Pradeep Chandak)
General Secretary
Students Association
Nagpur.

দিল্লী হতে হাই কমিশনার এ. আর মল্লিকের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে লেখা চিঠি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দূতাবাস
নতুন দিল্লী

High Commission For
People's Republic of Bangladesh
New Delhi

No. Pot 247/72

November 11, 1972

My dear Minister Saheb,

I am sure you have, by now, received all information in connection with our membership of the Colombo Plan. Mr. Faizur Razzak of the Planning Commission must have also handed over to you a brief report on the deliberations of the Conference.

2. I was kept extremely busy all these days with a number of pressing problems and a series of important meetings. Besides the Colombo Plan meetings, I had to, simultaneously, take part in the discussions that took place last week in the Ministry of Foreign Affairs between the delegations of our two countries. On top of this crowded programme, I was also kept extremely busy with the organisation of our Asian Fair activities in Delhi. But then, I did the job assigned to me by you in connection with our participation in the Colombo Plan conference and ensuring, through participation, our admission into that body. I made every effort not only to neutralise opposition of various quarters to Bangladesh's candidature for membership but also worked hard to facilitate our entry into the organisation. Through sustained efforts and pursuation, I am happy to say, it was possible for us not only to neutralise Iran, a steadfast friend of Pakistan, but also to make South Vietnam agree, eventually, to withdraw their objections to our entry on procedural grounds. You will be happy to know that because of my personal contacts and friendly relations with Ambassadors of various countries posted here at Delhi, and my past acquaintances with leaders of some delegations, it was possible to persuade some of them to speak in our support against objections raised by South Vietnam. Even the Ambassador of Afghanistan a country which is yet to recognise Bangladesh could be persuaded to speak strongly in support of our application for membership. I feel happy that our efforts have been crowned with success and we have been unanimously admitted into the august body. In my address to the delegates I dwelt at length on the varied and complex nature of problems facing us and the urgent need for assistance and guidance

of the member countries of the Colombo Plan and also appropriately expressed our gratitude to all members including, even, South Vietnam.

3. Mr. Faizur Razzak has indicated in his report the steps that we have now to take in pursuance of our objective to receive the necessary assistance from the Colombo Plan Club. I am sure, that things will, under your able guidance, move in the right direction and we shall succeed, in due course, to obtain substantial help- both financial and technical– from the Colombo Plan organisation in our efforts to accomplish the challenging task of reconstructing our war-ravaged country and regenerating our shattered economy.

4. I hope this finds you, Begum Saheba and the members of your family in health and happiness.

With warmest regards.

Yours sincerely,

(A. R. Mallick)

Mr. Tajuddin Ahmed,
Finance Minister,
Government of Bangladesh,
Dacca.

HIGH COMMISSION FL
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANG.
NEW DELHI

No. পিএ-২৫৭/৭২   November 11, 1972.

My dear Minister Saheb,

I am sure you have, by now, received all information in connection with our membership of the Colombo Plan. Mr. Faizur Razzak of the Planning Commission must have also handed over to you a brief report on the deliberations of the Conference.

2. I was kept extremely busy all these days with a number of pressing problems and a series of important meetings. Besides the Colombo Plan meetings, I had to, simultaneously, take part in the discussions that took place last week in the Ministry of Foreign Affairs between the delegations of our two countries. On top of this crowded programme, I was also kept extremely busy with the organisation of our Asian Fair activities in Delhi. But then, I did the job assigned to me by you in connection with our participation in the Colombo Plan conference and ensuring, through participation, our admission into that body. I made every effort not only to neutralise opposition of various quarters to Bangladesh's candidature for membership but also worked hard to facilitate our entry into the organisation. Through sustained efforts and pursuation, I am happy to say, it was possible for us not only to neutralise Iran, a steadfast friend of Pakistan, but also to make South Vietnam agree, eventually, to withdraw their objections to our entry on procedural grounds. You will be happy to know that because of my personal contacts and friendly relations with Ambassadors of various countries posted here at Delhi, and my past acquaintances with leaders of some delegations, it was possible to pursuade some of them to speak in our support against objections raised by South Vietnam. Even the Ambassador of Afghanistan

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দূতাবাস
নতুন দিল্লী

HIGH COMMISSION FOR THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
NEW DELHI

a country which is yet to recognise Bangladesh - could be pursuaded to speak strongly in support of our application for membership. I feel happy that our efforts have been crowned with success and we have been unanimously admitted into the august body. In my address to the delegates I dwelt at length on the varied and complex nature of problems facing us and the urgent need for assistance and guidance of the member countries of the Colombo Plan and also appropriately expressed our gratitude to all members including, even, South Vietnam.

3. Mr. Faizur Razzak has indicated in his report the steps that we have now to take in pursuance of our objective to receive the necessary assistance from the Colombo Plan club. I am sure, that things will, under your able guidance, move in the right direction and we shall succeed, in due course, to obtain substantial help - both financial and technical - from the Colombo Plan organisation in our efforts to accomplish the challenging task of reconstructing our war-ravaged country and regenerating our shattered economy.

4. I hope this finds you, Begum Saheba and the members of your family in health and happiness.

With warmest regards,

Yours sincerely,

(A. R. Mallick)

Mr. Tajuddin Ahmed,
Finance Minister,
Government of Bangladesh,
Dacca.

১৭ এপ্রিল, ১৯৭৩

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দীন আহমেদের চিঠি।

Ministry of Foreign Affairs
Government of the
People's Republic of Bangladesh
Dacca.

No.IF-5/73. April 17,1973.

Subject: War Crime Trials.

My dear Ambassador/High Commissioner/Charge d'Affaires,

This is in continuation of our circular letter of even number dated 9th April,1973. We have already communicated to you the joint declaration of Bangladesh and India to settle the outstanding humanitarian problems in the sub-continent. The statement of the Bangladesh Government regarding the trial of the Pakistani POWs issued separately was also conveyed to you.

2. It is possible that Pakistan might reject the joint declaration with a view to extorting some concessions on the question of the trial of its POWs. However, , to justify its stand Pakistan is most likely to invoke purely political considerations as Pakistan is aware that the trials are justifiable under the accepted principles of international law and this view has already found favour with various professional circles around the world.

3. Pakistan might take the plea that notwithstanding the legal position such trials of POWs would complicate the process of normalisation of relations in the sub-continent. Pakistan might further suggest that should Government of Bangladesh so desire, particularly so after the overwhelming victory of the Awami League in the recent elections, it should not hold the trials if only on the ground that such trails cannot but vitiate further the atmosphere in the sub-continent and bring "to a point of no return".

4. This position is both untenable and unacceptable. "The point of no return" is a meaningless concept and/ [illegible]ds Bangladesh is not acting in anger or vengeance in holding the trials. This is demonstrated by the fact that although a large number of Pakistani POWs could be held responsible for commission of crimes such as murder, rape etc., in Bangladesh only a very limited number of POWs are being brought to trial. The trials have been organised to uphold the rule of law and compulsions of justice. Bangladesh's stand on this score has recently been further

vindicated when the UN Human Rights Commission unanimously resolved that all those who are responsible for crimes against humanity irrespective of where and when the crimes have been committed should be brought to trial. Secondly, Pakistan is being unreasonable and dishonest in trying to shield such criminals by holding out a threat that such a step would hinder the process of normalisation of relations among the countries of the sub-continent. Thirdly, one must also consider that in the background of cruelties and atrocities committed by the Pakistan occupation forces in Bangladesh the demand for trials have been universal and no democratic government can overlook such strong sentiments of its own people. Fourthly, when after more than two and a half decades the Nazi war criminals are being hunted all around the world and brought to book, there is no reason why these people whose crimes are no less should go scot free.

5. It is, therefore, clear that Pakistani arguments are nothing but attempts at blackmailing Bangladesh and in the process it is vetoing the settlement of pressing humanitarian issues to suit its convenience.

6. Further it is possible that Pakistan might try some Bangalee civilian and army personnel, in retaliation to the trials of its POWs, on some cooked-up charges. The world is aware that the Bangalees now forcibly detained in Pakistan violated no provisions of international or Pakistani laws. The circumstances, and the fact that such trials, would be held after the announcement of trials of Pakistani POWs would make it very clear that the move is nothing but an act of sheer vengeance and judicial reprisal.

7. I should, therefore, be grateful if you should make special efforts in briefing the Governments of your accreditation and other appropriate circles including the press on these issues on the above lines.

Yours sincerely,
(Fakhruddin Ahmed)

To
All Heads of Bangladesh Missions Abroad
(Except Honorary Consulates).

Copy to all Directors-General in the Ministry.

২৪ জুলাই, ১৯৭৪
স্ট্যাম্প সংক্রান্ত বিষয়ে ট্রেজারি অফিসার জনাব মহিউদ্দিনের নোটস

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ সাহেব আজও সকালে টেলিফোনের মাধ্যমে আমাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করেন এবং আজ বিকালে তাঁর কাছে রিপোর্ট করতে বলেন।

১। এ সপ্তাহে স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের কেন স্ট্যাম্প দেওয়া হয়নি ?

২। স্টকে স্ট্যাম্প থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণকে কেন প্রয়োজন মতো দেওয়া হয় না ? লাইনে দাঁড়িয়ে স্ট্যাম্প না পেয়ে লোকে কেন ফিরে যায় ?

৩। সুষ্ঠুভাবে স্ট্যাম্প সরবরাহের ব্যাপারে আমি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি ?

প্রয়োজনবোধে আমি নিজে যেন কাউন্টার খুলে ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের চালান পাস করি – এ নির্দেশ তিনি আমাকে টেলিফোনের মাধ্যমে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আমি মাননীয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) সাহেবের সাথে আলাপ করেছি। তাঁর নির্দেশ মতো এই নোট লিখছি।

১. প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের (সদর ও মফস্বলের) চালান পাস করা হয়। প্রতি সোমবার বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সদরের ভেন্ডারদের এবং প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত মফস্বলের ভেন্ডারদের স্ট্যাম্প ডেলিভারি দেওয়া হয়।

গত বৃহস্পতিবার স্টক পজিশন ভালো না থাকা সত্ত্বেও ভেন্ডারদের চালান (প্রত্যেক দুই হাজার টাকা হারে) পাস করা হয়, কারণ সোমবারের আগেই অ্যাসিসট্যান্ট কন্ট্রোলার সাহেব স্ট্যাম্প আমাদের দিতে পারবেন বলে কথা দেন। কিন্তু অ্যাসিসট্যান্ট কন্ট্রোলার সাহেবের স্টোরকিপার হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আক্রান্ত হয়ে গত শুক্র ও শনিবার ছুটিতে থাকেন এবং গত সোমবার সারা দেশে স্মারক ডাকটিকিট সরবরাহের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় মাত্র গতকাল দুপুরে আমরা ট্রেজারিতে স্ট্যাম্প সরবরাহ পাই। এই স্ট্যাম্প ডবল লকের খাতাপত্রে এনট্রি করতে এবং ডবল লক থেকে বের করতে গতকাল বিকেল সোয়া ৫টা বেজে যায়। সুতরাং আজ বিকেলে আমরা ভেন্ডারদের স্ট্যাম্প সরবরাহ করতে সক্ষম হই। সংশ্লিষ্ট ডিলিং অ্যাসিসট্যান্ট সকালে চালান পাস করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

অ্যাসিসট্যান্ট কন্ট্রোলার সাহেবের স্টোরকিপার অকস্মাৎ দু-একদিনের জন্য ছুটিতে গেলে সরবরাহ বন্ধ থাকে। কারণ অন্য কেউ এটা ডিল করতে গেলে চার্জ মেকওভার টেক ওভারের প্রশ্ন ওঠে।

অ্যাসিসট্যান্ট কন্ট্রোলার ও তার স্টোরকিপার অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারী।

২. প্রতি সপ্তাহে সোম ও বুধবার সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত উর্ধ্বমূল্যের (একশো টাকার ওপরে) স্ট্যাম্প বিক্রির জন্যে জনসাধারণের চালান পাস করা হয়। একশো টাকার নিম্নমূল্যের স্ট্যাম্পের জন্যে কোনো চালান পাস করা হয় না। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেন্ডারদের কাছ থেকে জনসাধারণ তা কিনতে পারেন।

উর্ধ্বমূল্যের স্ট্যাম্প কেনার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে চালান পাস করা হয়। চালান পাসের নির্ধারিত দিনে প্রায় তিন-চারশো লোক লাইনে দাঁড়ান। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র দুশো-সোয়া দুইশো চালান পাস করা যায়। নির্ধারিত সময়ের বাইরে চালান পাস করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার সময় পান না, কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক বেলা দেড়টার পরে কাউন্টার বন্ধ করে দেন এবং আগের দিনের পাস করা চালান পরের দিনে গ্রহণ করেন না।

অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে লাইনে দাঁড়ানো জনসাধারণের মধ্যে প্রায় আধাআধি স্ট্যাম্পের কালোবাজারি থাকেন। তাঁরা প্রায় নিয়মিত চালান পাসের জন্য লাইনে দাঁড়ান। এদের বাদ দেওয়ার জন্যে ট্রেজারি অফিসের রুমে চালান পাস করতে নিয়ম করা হয়েছে। একজন করে ট্রেজারি অফিসারের ঘরে ঢোকেন এবং প্রবেশকারী ম্যাজিস্ট্রেট চালান দেখে ডিলিং অ্যাসিসট্যান্টকে সিল দেওয়ার নির্দেশ দেন। কাউকে কালোবাজারি সন্দেহ হলে তিনি তাঁর চালান পাস করেন না অথবা জমি বিক্রেতাকে সঙ্গে আসতে বলেন।

প্রয়োজনের তুলনায় স্ট্যাম্পের সরবরাহ সীমাবদ্ধ। স্ট্যাম্পের দুস্প্রাপ্যতার জন্যে স্ট্যাম্প-ভেন্ডারদের মধ্যে স্ট্যাম্প মজুদের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রেজারিতে স্ট্যাম্পের যে স্টক আছে, জনসাধারণ ও ভেন্ডারদের চাহিদামাফিক তা সরবরাহ হলে এক-দেড় সপ্তাহে তা শেষ হয়ে যাবে। অথচ সরবরাহ পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বাংলাদেশের সবখানেই স্ট্যাম্পের দুস্প্রাপ্যতার প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্ট্যাম্প ভেন্ডাররা ও একশ্রেণীর লোক এই সুযোগে দুই পয়সা কামিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় সমগ্র হয়েছেন।

স্ট্যাম্পের জন্যে অর্থমন্ত্রণালয়ে যে ইনডেন্ট পাঠানো হয় চাহিদার তুলনায় তা থেকে অনেক কম স্ট্যাম্প পাস করা হয় এবং এই পাস করা স্ট্যাম্পও ঠিক মতো সরবরাহ করা হয় না। আগে ট্রেজারিতে প্রায় এক বছরের চাহিদা মেটানোর মতো স্ট্যাম্প মজুদ থাকত। সেই তুলনায় বর্তমানে ট্রেজারিতে দালিলিক স্ট্যাম্পের মজুদ পরিমাণ অতি নগণ্য। বর্তমানের চাহিদাদৃষ্টে মনে হয়, ঢাকা ট্রেজারি থেকে বছরে আনুমানিক ১২ (বারো) কোটি টাকার দালিলিক স্ট্যাম্প বিক্রি করা যায়, কিন্তু আজ ২৪-৭-৭৪ তারিখে এই স্ট্যাম্পের মজুদ পরিমাণের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৩৬,৬৯,৬৪৪/৩০ টাকা। সহকারী স্ট্যাম্প কন্ট্রোলারের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, আগামী মাসে তাঁরা ১,৩৬,৩০০০০/০০ টাকা মূল্যের দলিলি স্ট্যাম্প আমাদের সরবরাহ করতে পারবেন।

মাননীয় জেলা প্রশাসক মহিউদ্দিন
২৪/৭/৭৪
ট্রেজারি অফিসার
ঢাকা

তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা গ্রন্থে উল্লেখিত, "মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের যে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তার রূপরেখা*

জাতীয় মিলিশিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা

বাংলাদেশ সরকার
দেশরক্ষা বিভাগ

---

*তথ্যসূত্র : তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা। সম্পাদনা সিমিন হোসেন রিমি। ঢাকা : প্রতিভাস, ২০০৬, পৃ. ৪২৪-৪২৭।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সমগ্র জনসাধারণ ও সরকারের পক্ষ হইতে মুক্তিবাহিনীর (নিয়মিত ও গণবাহিনী) সকল সদস্যকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সংগ্রামী শক্তিগুলির সদস্যবর্গ সম্মিলিত ও এককভাবে যে দেশপ্রেম, সাহস ও তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধে যাঁহারা লড়াই করিয়াছেন তাঁহাদের রক্ত বৃথা যায় নাই।

স্বাধীনতার সংগ্রাম জয়যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এক্ষণে তদপেক্ষা গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদিগকে এখন দেশের পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থনীতিকে দ্রুততার সহিত পুনর্গঠন করিলে এবং স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনিলেই কেবল চলিবে না, জাতির ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অবিলম্বে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিতে হইবে। ইহা একটি দুরূহ কার্য। যে দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, উৎসর্গ [উৎসাহ] ও কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ আমরা সকলেই, বিশেষ করিয়া মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযুদ্ধে প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার মাধ্যমই কেবল ইহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

কাজেই গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নতুন সমাজ গঠনকল্পে মুক্তিবাহিনীর সকল সদস্যকে তাঁহাদের শক্তি ও প্রয়াসকে সঠিক খাতে প্রয়োগের আবেদন জানাইতেছেন। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সরকার অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করিবেন :

দেশের স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য আমাদের নিয়মিত সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রয়োজন আছে। আমাদের যে সমস্ত অফিসার এবং জোয়ানরা মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীরূপে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে। নিয়মিত ব্যাটিলিয়নের জন্য আমাদের আরও অফিসার ও জোয়ান প্রয়োজন রহিয়াছে। গণবাহিনীর মধ্যেই জনশক্তির এক উত্তম অংশ নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং-এর প্রয়োজন আছে। গণবাহিনী হইতে অফিসার ও জোয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নূতন অফিসার ক্যাডার এবং অন্যান্যদের ট্রেনিং দিবার জন্য অচিরেই জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমী স্থাপিত হইবে। কমিশন্ড ও নন-কমিশন্ড অফিসার মনোনয়নের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে সিলেকশন বোর্ডসমূহ গঠন করা হইবে। মুক্তিসংগ্রামের বীর সেনানীরা বাংলাদেশের নবগঠিত স্থলবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীতে নেতৃত্ব প্রদান করিবেন বলিয়া সরকার আন্তরিকতার সহিত আশা পোষণ করেন।

নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আশু প্রয়োজন। শান্তি ও শৃঙ্খলা ছাড়া আমরা একটা নূতন সমাজ পুনর্গঠন করতে পারি না। আমরা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছি। গণতন্ত্রের মূলনীতি বজায় রাখার জন্য শহীদেরা আত্মদান করিয়াছেন এবং আমরা যদি নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারি তবে গণতন্ত্র নিরর্থক। আমাদের আচরণ এখন অবশ্যই সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে। আইনের শাসন মানিয়া চলে এই রুল সকল নাগরিককে রক্ষা করিতেই হবে। দোষীকে শাস্তি দিতেই হইবে; তবে উহা উপযুক্ত আইন-সম্মতভাবেই করিতে হইবে। আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল এবং আমাদের লোকদের উপর নৃশংসতা চালাইয়াছিল তাহাদেরও

শাস্তি পাইতে হইবে। তাহাদের বিচার হইবে। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন একটি বিচার পদ্ধতি, একটি প্রশাসন-যন্ত্র ও জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে একটি পুলিশ বাহিনী।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি নূতন পুলিশ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহা জনগণেরই পুলিশ বাহিনী হইবে এবং পূর্বের মত জনগণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইবার হাতিয়ার হইবে না। এইরূপ গণ-পুলিশ বাহিনী আমাদের বীর গণ-বাহিনীর লোক দ্বারাই উপযুক্তভাবে সংগঠন করিতে হইবে। সুতরাং সরকার পুলিশ অফিসার ও পুলিশ গণ-বাহিনীর সদস্যগণ হইতে নির্বাচন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নির্বাচন বোর্ড গঠন করা হইবে।

আমাদের প্রিয় দেশকে অতি দ্রুত পুনর্গঠনের জন্য এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সকল প্রাপ্য সম্পদ (মাল-মসলা ও জনশক্তি) কাজে লাগাইবার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অবশ্যই বাড়াইতে হইবে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নক্সা তৈরির জন্য আমাদের বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, ডাক্তার, কারিগর এবং সর্বপ্রকার দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। বর্বর শত্রু আমাদের সমাজের রত্নস্বরূপ বুদ্ধিজীবীদিগকে– যাঁহারা আমাদের উন্নতির সোপানে পৌঁছাইতে পারিবেন– ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। আমরা বহু অমূল্য জীবন হারাইয়াছি। আমাদের শুধু এই ক্ষতিই পূরণ করিতে হইবে না বরং উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে আমাদের নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। যুদ্ধের ধ্বংসাবলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মুছিয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে আমরা নূতন সমাজ গঠনের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করিতে পারি। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মনে করেন যে, মুক্তিবাহিনী প্রতিভাসমূহের এক অপূর্ব ভাণ্ডার– যাঁহারা দেশ পুনর্গঠন, উহার অর্থনৈতিক কাঠামো পুনরুদ্ধার এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উন্নতি লাভের জন্য এক নূতন নেতৃত্ব দান করিতে সক্ষম। সরকার সরকার আশা করেন যে, মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ, বিশেষ করিয়া যাঁহারা মুক্তি-যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য লেখাপড়া ছাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের জাতীয় উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা উচিত। এই সমস্ত বিষয় স্মরণে রাখিয়া সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা তাঁহাদের শিক্ষা ও ট্রেনিং সমাপ্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক শিক্ষালয় ও অন্যান্য কারিগরি কেন্দ্রে ভর্তি হইতে আগ্রহী সরকার তাঁহাদিগকে সকল প্রকার সুযোগ দিবেন। সরকার দেশের সকল স্থানে নতুন নতুন কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করিতেছেন।

যাঁহারা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অচিরেই উপযুক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে।

উপরোক্ত নীতিগুলি কার্যকরী করার জন্য সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে, তাঁহারা তালিকাভুক্ত হইয়া থাকুন বা না-ই থাকুন, একটি জাতীয় মিলিশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনা নিম্নরূপ হইবে :

(১) অনতিবিলম্বে একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হইবে এবং তালিকাভুক্ত হউক বা না হউক, সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে ইহার আওতায় আনা হইবে।

(২) প্রত্যেক মহকুমায় সেই এলাকার গেরিলাবাহিনীর জন্য শিবির প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শিবিরগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা এমনিভাবে করা হইবে যেন এইসব যুবককে পুনর্গঠন কাজের উপযোগী করিয়া প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়া সম্ভবপর হয়।

(৩) মহকুমা-ভিত্তিক শিবিরগুলি সেই এলাকার সমস্ত গেরিলাবাহিনীর মিলন-কেন্দ্র হইবে।

(৪) উর্দ্ধপক্ষে এগারজন সদস্য লইয়া জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হইবে।

(৫) প্রত্যেক মহকুমা-শহরে জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য মহকুমা বোর্ড থাকিবে। মহকুমা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা অনধিক এগারোজন হইবেন। সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(৬) প্রতিটি শিবিরে অস্ত্রশস্ত্র কার্যোপযোগী অবস্থায় রাখা, গুদামজাত করা ও হিসাবপত্র রাখার জন্য একটি করিয়া অস্ত্রাগার থাকিবে।

(৭) ট্রেনিং-এর কার্যসূচি এমনভাবে প্রস্তুত করা হইবে যেন এইসব যুবককে নিম্নে বর্ণিত ভূমিকা পালনের উপযোগী করিয়া তোলা যায়–

(ক) যেন তাঁহারা দেশের দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ হইতে পারেন।

(খ) যখনই নির্দিষ্টভাবে প্রয়োজন হইবে তখনই যেন তাঁহারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুনর্বহালে উপযোগী হইতে পারে।

(গ) দেশের পুনর্গঠন কার্যে সরাসরি সহায়তা হয় এমন বিভিন্ন কাজের উপযোগী হন।

(৮) অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অপুষ্টিকর খাদ্য এবং অপর্যাপ্ত বেতন ও ভাতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গেরিলাদের এক বিরাট অংশ কষ্টভোগ করিয়াছেন। সেজন্যই, তাঁহাদের খাদ্য, বাসস্থান ও ভাতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইবে।

বিজিপি-১০৭এ-৭১-৭২-৫ হাজার।

উৎস : গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত ও সরকারী মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত।

উপরিল্লিখিত কাজগুলি ছাড়াও সিভিলিয়ান বোর্ড নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে গণবাহিনীর সদস্যদের সুবিধা হইবে।

/ ১ / ক্যাম্পে জমায়েত হওয়ার পর গণবাহিনীর যে সকল সদস্য পুনঃ স্কুলে প্রত্যাবর্তনের জন্য ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বিভিন্ন স্কুল কলেজে ভর্তি হইতে সাহায্য করা।

/ ২ / পুলিশ বাহিনী, বাংলাদেশ স্থল, জল ও নৌ বাহিনীতে ও অন্যান্য সরকারী চাকুরীতে যাহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সর্বপ্রকার সহায়তা দান করা।

ooocoooooooo

তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের নেপথ্য

আব্বু বলেছিলেন 'পারিপার্শ্বিকতাকে উপলব্ধি করার নামই হলো শিক্ষা'।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব হলো, শিক্ষার্থীর হৃদয়ে পারিপার্শ্বিকতাকে উপলব্ধির উপকরণের যোগান দেওয়া, তাদের চিন্তা ও চেতনাকে শানিত করা এবং শিক্ষাকে জনকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত করা। দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক দলীয়করণের শিকার হয়েছে। জাতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামনে দল ও মতের উর্ধ্বে আদর্শ ও সৎ নেতৃত্বের উদাহরণ তুলে ধরা হয়নি; ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করা হয়নি। এর ফলে তরুণ সমাজ হয়েছে বিভ্রান্ত ও জাতি হিসেবে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে ব্যাহত।

সুদীর্ঘ ২৮ বছর আমার প্রবাসে কেটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ শিক্ষার্থী হিসেবে আমার অভিবাসী জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষকতা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করতে যেয়ে বারবারই অতি জানা সত্যটিই মনে জেগেছে। শিক্ষার বিকল্প নেই। উন্নত রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির মূল কারণ হলো উন্নত মানের শিক্ষা ও পরিবেশ। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিষ্কলুষ শিক্ষার প্রবর্তন ঘটান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জনে সহায়তা প্রদান। আলোকিত, সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্বের জীবন আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা সঠিক পথটি চিনে নিতে পারে। শান্তি শিক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে, বাংলাদেশে যখনি এসেছি ঐচিন্তাগুলো আরও জোরদার হয়েছে এবং ঐ চিন্তা হতেই তাজউদ্দীন আহম্মদ ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের ভাবনা ও স্বপ্ন মনে উদয় হয়েছে।

২০১০ সালে জর্ডানে, আমার স্বামী ড. আমর খাইরি আবদাল্লার চিন্তার ফসল University for Peace South Asia Africa and Middle East (UPSAM) প্রজেক্টের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. হারুন অর রশীদ ও শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ড. ডালেম চন্দ্র বর্মনের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উত্থাপন করি। তারা আমার প্রস্তাবটিকে উৎসাহ ভরে সমর্থন করেন ও ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে ঢাকায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ড. আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিকীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনিও আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাদের সকলের সহযোগিতা ও সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয় তাজউদ্দীন আহমেদ মেমেরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড। ১৭ এপ্রিল, ২০১১, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভার প্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিনটিতে উপচার্যের বাসভবনে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চেক হস্তান্তর করি। বাংলাদেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, তাজউদ্দীন আহমদের আদর্শ ও স্মৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ট্রাস্ট ফান্ডটির

লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ড মূলত চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। (বিস্তারিত ইংরেজিতে লেখা প্রস্তাবে উল্লেখিত)।

১. শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগে ব্যাচেলর অনার্স পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণিতে শীর্ষ মার্কস প্রাপ্ত ছাত্র বা ছাত্রীকে তাজউদ্দীন আহমদ পিস স্কলার গোল্ড মেডেল (শান্তি স্বর্ণ পদক), পিস স্কলার সার্টিফিকেট ও মার্স্টাস ক্লাসে এক বছরের বৃত্তি প্রদান।

২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সচ্ছল নয় এমন ছাত্রীকে (শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগ) ফিমেল এমপাওয়ারমেন্ট বৃত্তি প্রদান।

৩. তাজউদ্দীন আহমদের জন্ম দিবসে, তার জীবন-আদর্শের ওপর ভিত্তি করে বাৎসরিক Memorial Lecture এর আয়োজন।

৪. তাজউদ্দীন আহমদের জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তার ভূমিকা, এবং বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রামে তার অবদানকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

আব্বুর উচ্চ বিদ্যাপীঠ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগে তাজউদ্দীন ট্রাস্ট ফান্ডটি প্রতিষ্ঠার কারণ হলো যে বিশ্বের বিভিন্ন অঙ্গনে ও খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষার চাহিদা বেড়েছে। বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই বিভাগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আজ যে অশান্তি, সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস ক্রমবর্ধমান, সেই দুঃসহ ও নৈরাজ্যকর অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন আলোকিত, দক্ষ ও সুযোগ্য প্রজন্মকে গড়ে তোলা। যারা হিংসা ও অজ্ঞতাকে পরিহার করবে। তারা প্রেম ও জ্ঞানের বলে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ করবে এবং শান্তির পথে দিক নির্দেশনা করবে।

কোস্তারিকা, ২৯ মে, ২০১২।

তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড আয়োজিত প্রথম বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতা ২০১২

এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগ আমাকে অনুরোধ জানায় তাজউদ্দীন আহমদ ট্রাস্ট ফান্ড আয়োজিত (২০১২), প্রথম বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতার বিষয়টি কী হবে, তা লেখার জন্য। বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করতেই মনে হলো সুশাসনের সাথে আব্বুর নিবিড় সর্ম্পকের কথা।

সেই চিন্তা অনুযায়ী রচনা প্রতিযোগিতার বিষয়টি নিম্নে উল্লেখিত হলো।
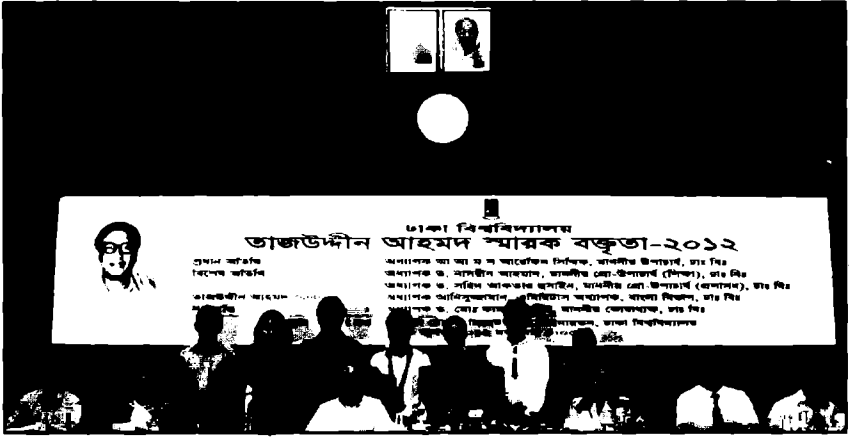
তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের প্রথম স্মারক বক্তৃতা, শান্তি স্বর্ণপদক, বৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন, ঢাকা, ৩ জুলাই, ২০১২

রচনার বিষয় : সুশাসন ব্যতীত কোনো রাষ্ট্রের অগ্রগতি দুরূহ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা ও অবদান কিংবদন্তিতুল্য। দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার ৪০বছর পরও সমাজের সর্বস্তরে সুশাসনের অভাব পরিলক্ষিত। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্ত রায়গুলোকে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কর্ম ও জীবনের আলোকে চিহ্নিত সমস্যাবলির সমাধান কী হতে পারে সে বিষয়ে রচনা লেখার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে, সংক্ষিপ্ত আকারে 'সুশাসন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উত্তরণ ও তাজউদ্দীন আহমদ' এই নামে শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগ হতে রচনা প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়।

৩ জুলাই, ২০১২ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন প্রফেসার এমেরিটাস ড. আনিসুজ্জামান। বক্তৃতার শিরোনাম 'তাজউদ্দীন আহমদের স্বদেশ ভাবনা।' অনুষ্ঠানে অনুরাগ চাকমাকে (প্রথম শ্রেণীতে বি. এ অর্নাস ক্লাসে প্রথম স্থান প্রাপ্ত শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগ) তাজউদ্দীন আহমদ

পিস স্কলার অ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ও শান্তি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। ফারহানা ফেরদৌসকে (শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগ) ফিমেল এমপাওয়ারমেন্ট বৃত্তি প্রদান করা হয়।

রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন :

মোহাম্মদ আবদুল হান্নান (প্রথম পুরস্কার, শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগ)
মো: আযহারুল ইসলাম (দ্বিতীয় পুরস্কার, আন্তজার্তিক সম্পর্ক বিভাগ)
কবিতা ইসলাম (তৃতীয় পুরস্কার, আন্তজার্তিক সর্ম্পক বিভাগ)
মো: হাবিবুর রহমান (চতুর্থ পুরস্কার, শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগ)
মুত্তাকী বিন কামাল (পঞ্চম পুরস্কার, শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগ)

রেজিস্টারের দপ্তর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮০-২-৯৬৬১৯০০/৪০২৮
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল : duregstr@bangla.net

নং- রেজিঃ/শিক্ষা-৪/১১/-৪৭৬১৭-২১ তারিখ: ১২/৪/২০১১

১। কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২। রেজিস্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩। ডিন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪। মিসেস শারমিন আহমেদ, বাড়ি নং ১৮/এ ৬ষ্ঠ তলা
সড়ক-৩, বনানী (পুরাতন ডি.ও.এইচ.এস) ঢাকা

প্রিয় মহোদয়

আদিষ্ট হয়ে আপনাকে জানাচ্ছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য মিসেস শারমিন আহমেদ আগামী ১৭-০৪-২০১১ তারিখ রোজ রবিবার অপরাহ্ণ ৩.০০ ঘটিকায় উপাচার্য মহোদয়ের নিকট চেক হস্তান্তর করবেন।

অনুগ্রহপূর্বক উপাচার্য মহোদয়ের বাসভবনস্থ অফিস কক্ষে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে সবিনয় অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

রেজিস্টার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- Name: Tajuddin Ahmad Trust Fund
- Founder: Sharmin Ahmad
- Fund Money: Tk 10, 00, 000.00
- Board of Trustees:
    Treasurer, DU, Chairman
    Pro-Vice Chancellor, DU, Member
    Dean, Faculty of Social Sciences, DU, Member
    Dean, Faculty of Arts, DU, Member
    Chairman, Dept.of Peace and Conflict Studies, DU.

- Member
  Sharmin Ahmad, Founder
  Founder's Representative
  Registrar, DU, Member-Secetary
- Objectives
- To award a gold medal, certificate and a scholarship for a period of 12 months at a rate of TK.1000.00 to a student studying in Master's class having the highest score in First Class in the Bachelor of Honors Examination in Peace and Conflict Studies, Dhaka University;
- To award a stipend for a period of four years at the rate of TK.1000.00 per month to a female student who is not financially solvent of 1st year BSS (Honors) class of the Department of peace and Conflict Studies, Dhaka University.
- To hold an annual Memorial Lecture on the birth day of the First Prime Minister of Bangladesh, Tajuddin Ahmad. The subject matter of the Lecture will be related to the life, works and political philosophy of the national leader, Tajuddin Ahmad and his leadership role in the National liberation war of the Bangalees and in their independence movement.The lecture would be delivered by such a person, who is essentially a learned researcher and who believes in the spirit of Bangalee nationalism, war of independence and liberation war of Bangladesh. A reasonable amount of honorarium would be provided for the Lecture as per the decision of the Board of Trustees.The Lecture would be printed and the copies of the Lecture would be distributed among the participants.
- To arrange an annual Essy competition among the students of the University of Dhaka. The Subject matter of the Essay will be the life, works and political philosophy of Tajuddin Ahmad and his role in organizing the national liberation war and independence movement of the Bangalees and on his thinking of building of an exploitation and discrimination free progressive and democratic society in Bangladesh. There will be provisions for 1st, 2nd and 3rd prize, which will be handed over to the winners on the day of the annual Memorial Lecture. The amount of the prize money will be decided by the Boards of Trustees.

Professor AAMS Arefin Siddique
Hon'ble Vice Chancellor,
University of Dhaka, Dhaka

Subject: Establishment of Tajuddin Ahmad Trust Fund

Dear Sir,
With due respect, I would like to express my ardent desire to establish a Trust Fund in the loving memory of my father, the First Prime Minister of Bangladesh, Tajuddin Ahmad at the University of Dhaka to help the activities of the Department of Peace and Conflict Studies. I would like to propose the name of the Trust Fund as Tajuddin Ahmad Trust Fund. The objectives and other details are available in the attached document.

If you would please allow and permit us to establish the Trust Fund, I would like to hand over the cheque worth Tk 10,00,000.00 (Taka Ten Lakhs) to you at your earliest convenient date and time.

It may be mentioned here that I would gladly consider any necessary changes and /or adjustments.

With Regards
Sincerely Yours

Sharmin Ahmad

Sharmin Ahmad

March 24, 2011

মায়ের সাথে লেখক। ২৯ জুন ২০১২

তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের জ্যৈষ্ঠ কন্যা শারমিন আহমদের জন্ম ঢাকা শহরে। ১৯৮৪ সাল থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী। তিনি ১৯৯০ সালে ওয়াশিংটন ডিসির জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেলোশিপ ও উইমেন্স স্টাডিজ স্কলারস অ্যাওয়ার্ডসহ উইমেন্স স্টাডিজে মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শিশু শিক্ষার ওপরেও মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেন।

বিশ্বের পেশাজীবী নারীদের অন্যতম বৃহত্তম মানব উন্নয়ন সংগঠন দ্য সোরপটিমিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অব দ্য আমেরিকাস, ওয়াশিংটন ডিসি, "আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সমঝোতা রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের" জন্য তাঁকে "উইমেন অব ডিস্টিংশন" অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

শিক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কাউনটির অন্যতম ম্যারিল্যান্ডের মন্টগোমারি কাউনটি পাবলিক স্কুলের জন্য কাউনটির মিডিয়া বিশেষজ্ঞ তাঁর প্রথম প্রকাশিত দ্বিভাষিক বই হৃদয়ে রংধনু-দ্য রেইনবো ইন এ হার্ট কে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ আর্টস কারিকুলামের জন্য উচ্চ অনুমোদনসহ বইটিকে "অসামান্য" ও "ভাল সম্পদ" অভিহিত করেন। সমাজে বিশেষত শিশু-কিশোরদের মধ্যে শান্তি শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হিসেবে বইটি বর্তমানে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে যার নাট্য সংলাপ রচনা এবং সহপ্রযোজনা তিনি করেছেন। শারমিন, যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত প্রগতিশীল ইসলামী নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিনারেত অব ফ্রিডমের সাবেক পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট এবং সংহতি নারী সংগঠনের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে নারী উন্নয়নের পক্ষে অবদান রেখেছেন। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, শান্তি শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দলগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার প্রয়াসে বিবিধ কর্মশালার আয়োজন এবং পরিচালনা তিনি করে থাকেন। ভ্রূণের সুষ্ঠুবিকাশে বাবা মায়ের সচেতনতা ও ভূমিকা, তরুণদেরকে সন্তান ধারণের আগেই পরিবেশ, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ে সুশিক্ষিত করা সম্পর্কে তিনি প্রিনেটাল এডুকেশন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেন যা ছিল বাংলাদেশে সর্বপ্রথম। ওয়াশিংটন পোস্ট সংবাদপত্র তাঁর ওপর বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাঁর সম্পাদকীয় চিঠি এবং প্রবন্ধ দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালসহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বেইজিং এ অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন, তেহরানে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠনের সম্মেলন এবং জাতি সংঘের নারী এবং মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলনসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ শিক্ষা বিভাগে এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানে তিনি তাজউদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পিতার অমর স্মৃতির প্রতি নিবেদিত তাঁর ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.tajuddinahmad.com

তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর রচিত *৩ নভেম্বর : জেল হত্যার পূর্বাপর* বইটিও পাঠকদের দৃষ্টি কেড়েছে।

তাঁর পরবর্তী প্রকাশিতব্য বইয়ের নাম : *মুক্তির কাণ্ডারী তাজউদ্দীন : কন্যার অভিবাদন।*

ISBN 978-984-776-173-2 ■ Price: Taka 425.00 US$ 15.00